পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা: পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নের সুরক্ষায় ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞানের ভূমিকা

LIVELIHOOD OF BIRHOR TRIBES IN PURULIA DISTRICT: A SOURCE OF INDIAN INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEM AND ITS ROLE FOR SUSTAINABILITY OF ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

THE THESIS SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF EDUCATION JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA FOR THE AWARD OF THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ARTS (EDUCATION)

SUBMITTED

BY

SUNNY BASKEY

REGISTRATION NO: A00ED1301319

SUPERVISED BY

PROF. (Dr.) BISHNUPADA NANDA

DEPARTMENT OF EDUCATION

JADAVPUR UNIVERSITY

2025

THE THESIS

আমার গবেষণার কাজটি আমার মা স্বর্ণ বাস্কে এবং বাবা স্বর্গীয় নিবারণ বাস্কে এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম

CERTIFICATE

Certified that the Thesis, entitled, "পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা: পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নের সুরক্ষায় ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞানের ভূমিকা" Submitted by me for the Award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts (Education) at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Bishnupada Nanda, Department of Education, Jadavpur University and that Neither this Thesis nor any part of it has been submitted before for any other Degree Or Diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned By the Supervisor

Professor (Dr.) Bishnupada Nanda

DR. BISHNUPADA NANDA
PROFESSOR
DEPARTMENT OF EDUCATION
JADAVPUR UNIVERSITY

Department of Education

Jadavpur University

Date: 14.08.2025

Candidate

Sunny Baskey

Department of Education

Jadavpur University

Date: 14.08.2025

স্বীকারোক্তি

(Acknowledgement)

এই গবেষণা কার্যটি সম্পূর্ণ করতে যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথমেই আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ডিন (ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস) মহাশয় / মহাশয়া বিভিন্ন সময়ে গঠনমূলক দাপ্তরিক সংক্রান্ত কাজের মাধ্যমে আমাকে সহায়তা প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এবং আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। উনি বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ প্রদান এবং উপযুক্ত নির্দেশনা দানের মাধ্যমে আমার গবেষণার কার্যটি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন। উনার নিঃশর্ত সহযোগিতা আমার গবেষণাটিকে তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন। আমার গবেষণার আরএসি (RAC) বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সনৎ কুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞ। উনি বিভিন্ন সময় গবেষণা সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রকাশ বিশ্বাস মহাশয় ও বিভাগীয় অধ্যাপক মুক্তিপদ সিনহা, অধ্যাপক সমির চক্রবর্তী, অধ্যাপক ললিত লালিতাভা মহাকুদ এবং অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকা মহাশয়/মহাশয়া, অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন সময় গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে আমাকে সহায়তা প্রদান করেছেন। উনাদের প্রতি আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে যাদের অবদান সব থেকে আগে তারা হলেন পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী মানুষজন। তাঁদের কাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ কালে আমাকে বিভিন্ন ভাবে

সহযোগিতা করেছেন এবং মূল্যবান তথ্য দিয়ে গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের প্রতি সারাজীবন আমার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান (কলকাতা) গ্রন্থাগারে বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ প্রমুখদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। উনাদের অনুমতি পেয়ে এই সকল গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা, বই, গবেষণা ধর্মী পত্রিকা ব্যবহারের মাধ্যমে আমার গবেষণা কার্যটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের বরিষ্ঠ এবং অনুজ দাদা, দিদি, ও ভাই প্রতি বিশেষভাবে অনেক ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞ। পিঙ্কি মণ্ডল, ছট্টু মণ্ডল, সৌরভী আটা, দেবাশিষ সিং, অমল দাস, প্রসেনজিৎ কাঁপাস, বিন্দেশ্বর টুডু, বিশ্বজিৎ সর্দার, তাপাস নায়াক, শম্পা দাস, মানস ভূঁইয়া, তামল সরেন এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন সময় গবেষণার কার্যটি সম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রেরনা দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন।

অবশেষে যাদের কথা না বললে আমার গবেষণা কার্যটি সম্পূর্ণ অসম্ভব তারা হলেন আমার অভিভাবক এবং পরিবার। বাবা স্বর্গীয় নিবারণ বাস্কে, মা স্বর্ণ বাস্কে এর আশীর্বাদ, পরামর্শ, ভালোবাসা আমার গবেষণার কার্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমার বোন সবিতা বাস্কে এবং স্ত্রী সুমিতা হেমব্রম, কাকা সুরেন বাস্কে গবেষণার কার্যে সহায়তা করেছে ও অনুপ্রেরনা দিয়েছে। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞ। এবং আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ স্যার এর পরিবার বিভিন্ন ভাবে আমায় প্রেরণা দিয়েছেন এবং সহায়তা করেছেন উনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তারিখ:

সানি বাস্কে

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

(Contents)

ক্রমিক সংখ্যা		পৃষ্ঠা সংখ্যা
A	শংসাপত্র (CERTIFICATE)	i
B	বিবৃতি (DECLARATION)	ii
C	স্বীকারোক্তি (ACKNOWLEDGEMENT)	iii
D	সূচীপত্র (CONTENTS)	v
E	ছকের তালিকা (LIST OF TABLE)	xiii
F	নকশার তালিকা (LIST OF FIGURE)	xiii
G	পরিশিষ্টের তালিকা (LIST OF APPENDICES)	xv
H	সংক্ষিপ্তকরণ (ABBREVIATIONS)	xvi
I	মুখবন্ধ (PREFACE)	xviii
	প্রথম অধ্যায় **ভূমিকা** **(Introduction)**	১-১৬৭
১.১	**আদিবাসী জীবনের প্রেক্ষাপট**	১
১.২	**আদিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ এবং আদিবাসী উন্নয়নের পন্থা**	১৭
১.২.১	আদিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ	১৭
১.২.২	ভারতে আদিবাসী উন্নয়নেরপন্থা	৩২

১.৩	**আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিক অধিকার এবং বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা**	৩৫
১.৩.১	সাংবিধানিক অধিকার	৩৫
১.৩.২	পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৩৬
১.৩.৩	আদিবাসীদের উপ-পরিকল্পনা	৪৮
১.৩.৪	আদিবাসীদের বিকাশে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ	৫১
১.৪	**পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট**	৬০
১.৪.১	পুরুলিয়া জেলা হিসাবে সৃষ্টি হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	৬১
১.৪.২	পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট	৭৪
১.৪.২.১	ভৌগোলিক সীমারেখা	৭৪
১.৪.২.২	পুরুলিয়া জেলার আবহাওয়া	৭৬
১.৪.২.৩	পুরুলিয়া জেলার নদ নদী	৭৭
১.৪.৩	পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক চিত্র	৯৩
১.৪.৩.১	পুরুলিয়া জেলার শিল্প ও কলকারখানা	৯৪
১.৪.৩.২	কৃষি	৯৫
১.৪.৩.৩	বনজ সম্পদ	৯৬
১.৪.৩.৪	পর্যটন শিল্প	৯৮
১.৪.৩.৫	গৃহ পালিত পশু	১০০
১.৪.৪	পুরুলিয়া জেলার উৎসব সমূহ	১০০
১.৪.৫	পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার	১২৩

১.৪.৬	পুরুলিয়া জেলার ভাষা এবং ধর্ম	১২৫
১.৫	**পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা**	১২৬
১.৫.১	সাঁওতাল	১২৮
১.৫.২	মুন্ডা	১৩৪
১.৫.৩	ভূমিজ	১৩৭
১.৫.৪	ওঁরাও	১৪২
১.৫.৫	হো	১৪৭
১.৫.৬	কোড়া	১৫১
১.৫.৭	বেদীয়া	১৫৩
১.৫.৮	মালপাহাড়িয়া	১৫৫
১.৫.৯	বিরহড়	১৬০
	তথ্যসূত্র (References)	১৬৩
	দ্বিতীয় অধ্যায় **সাহিত্য সম্পর্কিত সমীক্ষা** **(Review and Related Literature)**	১৬৮-২২৫
২.১	ভূমিকা	১৬৮
২.২	সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা এবং সাহিত্য	১৭০
২.৩	জ্ঞানের ব্যবধান	২১৫
২.৪	গবেষণার প্রশ্ন	২১৮
২.৫	উদ্দেশ্য সমূহ	২১৯

২.৬	অধ্যয়নের সীমাবদ্ধতা	২২০
	তথ্যসূত্র (References)	২২১
	তৃতীয় অধ্যায় **গবেষণার পদ্ধতি** **(Research Methodology)**	২২৬-২৮৬
৩.১	গবেষণার নকশা, গুনগত এবং নৃতাত্ত্বিকগত গবেষণা নকশা	২২৬
৩.১.১	শিক্ষাবিজ্ঞানে গুনগত পদ্ধতিতে গবেষণার নকশা	২২৬
৩.১.১.১	পর্যবেক্ষণ	২৩৩
৩.১.১.২	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন	২৩৪
৩.১.১.৩	ফোকাস দল আলোচনা	২৫০
৩.২	পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকের পার্শ্বচিত্র	২৫৫
৩.২.১	বাঘমুণ্ডি ব্লকের প্রেক্ষাপট	২৫৫
৩.২.১.১	ভুপতিপল্লী গ্রামের প্রেক্ষাপট	২৬৪
৩.২.১.২	বাড়েরিয়া গ্রামের প্রেক্ষাপট	২৬৫
৩.২.২	বলরামপুর ব্লকের প্রেক্ষাপট	২৬৬
৩.২.২.১	বেড়সা গ্রামের প্রেক্ষাপট	২৭৫
৩.২.৩	ঝালদা-১ ব্লকের প্রেক্ষাপট	২৭৬
৩.২.৩.১	ডাকাই গ্রামের প্রেক্ষাপট	২৮৩
	তথ্যসূত্র (References)	২৮৪

	চতুর্থ অধ্যায় **সংগৃহীত গুণগত তথ্য এবং বিশ্লেষণ** **(Collection of Qualitative Data and its Interpretation)**	২৮৭-৪৪৪
৪.১	**ভূপতিপল্লী গ্রাম (Bhupotipolly Village):**	২৮৮
৪.১.১	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য	২৮৮
৪.১.২	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	২৯১
৪.১.৩	পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা	২৯৫
৪.১.৪	উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য	২৯৯
৪.১.৫	ভূপতিপল্লী গ্রামের বিশেষ ছবি	৩০২
৪.২	**বাড়েরিয়া গ্রাম (Bareria Village):**	৩০৮
৪.২.১	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩০৮
৪.২.২	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩১১
৪.২.৩	পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা	৩২১
৪.২.৪	উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩২৫
৪.২.৫	বাড়েরিয়া গ্রামের বিশেষ ছবি	৩২৯
৪.৩	**ডাকাই গ্রাম (Dakai Village):**	৩৩৬
৪.৩.১	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩৩৬
৪.৩.২	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩৩৯
৪.৩.৩	পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা	৩৪৬

৪.৩.৪	উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩৪৯
৪.৩.৫	ডাকাই গ্রামের বিশেষ ছবি	৩৫১
৪.৪	**বেড়সা গ্রাম (Bersa Village):**	৩৫৮
৪.৪.১	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন থেকে সংগৃহীত তথ্য	৩৫৮
৪.৪.২	ফোকাস গোষ্ঠী আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩৬০
৪.৪.৩	পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা	৩৬৫
৪.৪.৪	উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩৬৮
৪.৪.৫	বেড়সা গ্রামের বিশেষ ছবি	৩৭০
	পঞ্চম অধ্যায় **বিরহড়দের সমাজ ব্যবস্থা** **(Social System of Birhors)**	৩৮২-৪৪৪
৫.১	ভারতে বিরহড়দের সম্বন্ধে একটি সাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমি	৩৮২
৫.২.১	বিরহড়দের জীবনচর্চা	৩৮৭
৫.২.১.১	বিরহড়দের আদি বাসস্থান	৩৮৭
৫.২.১.২	বাসস্থানের উদ্ভিদ এবং প্রাণিজ সম্পদ	৩৮৮
৫.২.১.৩	বিরহড়দের বাসস্থানের আবহাওয়া	৩৮৯
৫.২.১.৪	বিরহড়দের শ্রেণীবিভাগ	৩৮৯
৫.২.১.৫	বিরহড়দের প্রাত্যহিক জীবন	৩৯২
৫.২.১.৬	বিরহড়দের শারীরিক গঠন ও ভাষা	৩৯৪
৫.২.১.৭	বিরহড়দের সমাজ ব্যবস্থা এবং শিকার পদ্ধতি	৩৯৪

৫.২.১.৮	বিরহড়দের গোত্র, গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য এবং বিবাহ পদ্ধতি	৩৯৮
৫.২.১.৯	উৎসব অনুষ্ঠান	৪৩০
৫.২.১.১০	বিরহড়দের মৃত্যু ও মৃত দেহের সৎকার	৪৩৭
৫.২.১.১১	ধর্ম বিশ্বাস ও দেব-দেবী	৪৪১
	তথ্যসূত্র (References)	৪৪৪
	ষষ্ঠ অধ্যায় **আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন** **(Indigenous Knowledge and Sustainable Development)**	৪৪৫-৪৯৫
৬.১	আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান	৪৪৫
৬.১.১	বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান	৪৫১
৬.১.২	ওষধি গাছ সমূহ	৪৫৪
৬.১.৩	জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় দেশীয় জ্ঞানের ব্যবহার	৪৫৫
৬.১.৪	বনজ সম্পদের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় ভেষজ জ্ঞানের ব্যবহার	৪৫৫
৬.১.৫	মৃত্তিকা এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ সমূহের ব্যবস্থাপনায় দেশীয় জ্ঞানের ব্যবহার	৪৫৭
৬.২	স্থিতিশীল উন্নয়ন	৪৫৮
৬.২.১	স্থিতিশীল উন্নয়নের নৈতিকদিক সমূহ	৪৬৩
৬.২.২	স্থিতিশীল উন্নয়নে বিরহড় আদিবাসীদের ভূমিকা	৪৬৬
	তথ্যসূত্র (References)	৪৮৭

	সপ্তম অধ্যায় **গবেষণার ফলাফল এবং আলোচনা** **(The Findings from Research and Discussion)**	৪৯৬-৫২৬
৭.১	গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল	৪৯৬
৭.২	আলোচনা	৫০৪
৭.৩	শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য	৫১৬
৭.৪	পরবর্তী গবেষণার সুযোগ	৫১৯
৭.৫	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৫২০
	তথ্যসূত্র (References)	৫২১
	গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)	৫২৭
	সারাংশ (Summary)	৫৩৮
	পরিশিষ্ট (Appendices)	**I-XXXV**

ছকের তালিকা

(LIST OF TABLE)

ক্রমিক সংখ্যা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.১	পশ্চিমবঙ্গে চল্লিশটি জনগোষ্ঠীর তালিকা	৩৩
১.২	পুরুলিয়া জেলার আবহাওয়ার তালিকা	৭৬
৩.১	বাঘমুণ্ডী ব্লকের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ ছক	২৫৮
৩.২	বলরামপুর ব্লকের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ ছক	২৬৮
৩.৩	ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ ছক	২৭৭
৩.৪	ঝালদা-১ ব্লকের অর্থনৈতিক এবং শ্রমিকদের সম্পর্কিত তথ্যের ছক	২৮০

নকশার তালিকা

(LIST OF FIGURE)

ক্রমিক সংখ্যা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.১	জনগোষ্ঠীদের ভৌগোলিক বণ্টনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	২৭
১.২	জনগোষ্ঠীদের ভাষাগত সংযুক্তির ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	২৮
১.৩	জনগোষ্ঠীদের জাতিগত চারিত্রিকতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	২৯
১.৪	জনগোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক নকশা উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস	৩০
১.৫	জনগোষ্ঠীদের ইন্টিগ্রেশন স্তরের শ্রেণীবিন্যাস	৩১
১.৬	জনগোষ্ঠীদের অর্থনৈতিক একীকরণ ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস	৩২
১.৭	পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে পুরুলিয়া জেলার মানচিত্রের নকশা	৬১
১.৮	পুরুলিয়া জেলার মানচিত্র	৭৪
১.৯	পুরুলিয়া জেলার নদনদীর মানচিত্র	৭৭
১.১০	দামোদর নদীর মানচিত্র	৮৩

১.১১	পুরুলিয়া জেলার সাক্ষরতার হার সম্পর্কিত তথ্য	১২৪
১.১২	পুরুলিয়া জেলার ভাষা সম্পর্কিত তথ্য	১২৫
১.১৩	পুরুলিয়া জেলার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত তথ্য	১২৬
১.১৪	আদিবাসীদের মুণ্ডা শাখা ভাষার তালিকা	১২৭
৩.১	**বাঘমুন্ডি ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থানের মানচিত্র**	২৫৭
৩.২	বাঘমুণ্ডি ব্লকে সাক্ষরতা হার সম্পর্কিত নকশা	২৫৯
৩.৩	বাঘমুণ্ডি ব্লকের অর্থনৈতিক এবং শ্রমিক সম্পর্কিত তথ্য	২৬০
৩.৪	বাঘমুণ্ডি ব্লকে ভাষা সম্পর্কিত নকশা	২৬৩
৩.৫	বাঘমুণ্ডি ব্লকে ধর্মাচরণ সম্পর্কিত নকশা	২৬৩
৩.৬	**বলরামপুর ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থানের মানচিত্রের নকশা**	২৬৯
৩.৭	বলরামপুর ব্লকে সাক্ষরতার হার সম্পর্কিত নকশা	২৭০
৩.৮	বলরামপুর ব্লকের অর্থনৈতিক ও শ্রমিক সম্পর্কিত নকশা	২৭১
৩.৯	বলরামপুর ব্লকে ভাষা সম্পর্কিত নকশা	২৭৩
৩.১০	বলরামপুর ব্লকে ধর্মাচরন সম্পর্কিত নকশা	২৭৪
৩.১১	**ঝালদা-১ ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থানের মানচিত্রের নকশা**	২৭৮
৩.১২	ঝালদা-১ ব্লকের সাক্ষরতা হার সম্পর্কিত নকশা	২৭৯
৩.১৩	ঝালদা-১ ব্লকে ভাষা সম্পর্কিত নকশা	২৮২
৩.১৪	ঝালদা-১ ব্লকে ধর্ম চারন সম্পর্কিত নকশা	২৮২
৪.১	ভূপতিপল্লী গ্রামে (PRA) চিত্র	২৮৮
৪.২	বাড়েরিয়া গ্রামে (PRA) চিত্র	৩০৮
৪.৩	বেড়সা গ্রামে (PRA) চিত্র	৩৩৬
৪.৩	ডাকাই গ্রামে (PRA) চিত্র	৩৫৮
৬.১	উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির নকশা	৪৬৩

পরিশিষ্ট

(APPENDICES)

ক্রমিক নাম্বার		পৃষ্ঠা সংখ্যা
পরিশিষ্ট – I	নতুনত্ব প্রতিবেদনের ছবি প্রতিলিপি	II
পরিশিষ্ট –II	তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র-১	IV
পরিশিষ্ট –III	তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র-২	V
পরিশিষ্ট –IV	সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র	VI
পরিশিষ্ট –V	প্রকাশিত গবেষণা পত্র	VII
পরিশিষ্ট –VI	সেমিনার উপস্থাপনায় শংসাপত্র	XV
পরিশিষ্ট –VII	প্রকাশিত গবেষণা পত্র	XVI
পরিশিষ্ট –VIII	সেমিনার উপস্থাপনায় শংসাপত্র	XXIV
পরিশিষ্ট –IX	পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা পত্র	XXV
পরিশিষ্ট –X	প্রকাশিত গবেষণা পত্র	XXXII
পরিশিষ্ট –XI	সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা পত্র	XXXV

LIST OF ABBREVIATIONS

- BRGF : Backward Regions Grand Fund
- CBD : Convention Biological Diversity
- CSS : Central Sponsored Schemes
- DVC : Damodar Valley Corporation
- DTGS : Development of Tribal Groups
- EMRS : Eklavya Model Residential School
- FGD : Focus Group Discussion
- FK : Folk Knowledge
- GDP : Gross Domestic Product
- IK : Indigenous Knowledge
- ITDA : Indian Tribal Development Association
- ITDP : Indian Tribal Development Project
- JREDA : Jharkhand Renewable Energy Development Agency
- JTDS : Jharkhand Tribal Development Society Limited
- MADA : Modified Area Development Agency
- MHRD : Ministry of Human Resource Development
- MTA : Ministry of Tribal Affairs
- NCERT : National Council for Educational Research and Training
- NDC : National Development Council
- NEP : National Education Policy
- NSFDC : National Scheduled Financial Development Corporation
- PFMP : Participatory Forest Management Programme
- PRA : Participatory Rural Appraisal
- PTG : Primitive Tribal Groups
- PVTG : Particular Vulnerable Tribal Group

- RMSA : Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
- RRA : Rapid Rural Appraisal
- SCA : Special Central Assistance
- SDG : Sustainable Development Goal
- SEDG : Socially Economically Disadvantage Groups
- SG ; Sacred Grouves
- SHG : Self Help Group
- SMPTBS : Special Multiple Tribal Blocks
- SSA : Sarva Shiksha Abhiyan
- ST : Scheduled Tribe
- TDBs : Tribal Development Blocks
- TEK : Traditional Ecological Knowledge
- TEK : Traditional Environmental Knowledge
- TFYP : Tribal Fife Year Plan
- TK : Traditional Knowledge
- TSP : Tribal Sub-Plan
- UDISE : Unified District Information System for Education
- UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural
- UNPFII : United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues
- WBSETCL : West Bengal State Electricity Transmission Company
- WCED : World Commission on Environment and Development
- WIPO : World Intellectual Property Organization

মুখবন্ধ

(RREFACE)

ভারতবর্ষে প্রথম প্রাচীন কাল থেকে বসবাসকারী সম্প্রদায় হল আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়। সমগ্র ভারতে ৭০০ টির বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। সারা বিশ্বে মোট ভাষার ৬০ শতাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ তাঁদের নিজেদের ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বে বিভিন্ন দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করেন, যেমন- আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, চীন প্রভৃতি। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষজন বসবাস করেন, যেমন- মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি। ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ আদিবাসী জনসংখ্যা। ভারতে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন এখনও পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও ভারতের রাজ্যগুলিতে এরা দরিদ্রদের মধ্যেও এরা দরিদ্র। আদিবাসীরা সংবিধানে 'ট্রাইব' বা 'ট্রাইবাল' নামে পরিচিত। তবে প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসীরা নিজেদেরকে 'হড়' এবং 'আদিবাসী' বলেই পরিচয় দিয়েছেন। আদিবাসীরা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, প্রথা, ওষধি দেশীয় জ্ঞান প্রভৃতিকে বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মকে প্রদান করে এখনও পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছেন।

২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪০ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। এর মধ্যে ৩ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী হল বিরহড়, লোধা এবং টোটো যারা Particularly

Vulnerable Tribal Group (PVTG) হিসাবে চিহ্নিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বেশির ভাগ জেলায় বিরহড়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করেন, তবে বেশির ভাগ বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষরা রয়েছেন পুরুলিয়া জেলায়। বিরহড় শব্দটি দুইটি শব্দ থেকে এসেছে, 'বির' শব্দের অর্থ হল 'জঙ্গল' বা 'Jungle' এবং 'হড়' শব্দের অর্থ হল 'মানুষ' বা 'Human' অর্থাৎ বিরহড় শব্দের অর্থ হল 'জঙ্গলের মানুষ' (Human of Jungle) বা 'জঙ্গলের রাজা' (King of Jungle)। বিরহড়রা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার রাজ্যে Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) হিসাবে চিহ্নিত। বিরহড় জনগোষ্ঠীর মানুষরা পাহাড়, গভীর জঙ্গলে, নদীর ধারে এবং পাহাড়ের শিরায় বসবাস করতেন। প্রাচীন কাল থেকেই বিরহড়দের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, প্রথা, রীতিনীতি, বাদ্যযন্ত্র, প্রকৃতির প্রতি ধর্মীয় বিশ্বাস, উৎসব, পরব প্রভৃতি রয়েছে। তাঁদের অর্থনীতি হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ, মধু, মোম, শাল পাতা, দড়ি তৈরির জন্য চিহরলতা সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে। পূর্বে বিরহড়দের স্থায়ী কোনো ঘরবাড়ি ছিল না, তাদের জীবনযাত্রা যাযাবর গোষ্ঠীর মতো ছিল, তাই জঙ্গলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন ও গাছের পাতা লতা দিয়ে ঝুপড়ি বা ছাওনি বানিয়ে স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করতেন। অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের মতো বিরহড়রা বিভিন্ন উৎসব, পরব পালন করেন, যেমন- বাহা, কারাম, সহরায়, মাঘসিম, সেন্দ্রা, ছাতা, পাতা প্রভৃতি। বিরহড় আদিবাসীরা বিভিন্ন উৎসব এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন, যেমন- মাদল, ধামসা, ল্যাগড়া, কাঁসর, বানাম, বাঁশি প্রভৃতি। বিরহড়দের ধর্মীয় বিশ্বাস বলতে তাঁরা প্রকৃতিকেই সর্বচ্চ ঈশ্বর 'মারাং বুরু' কে বিশ্বাস এবং পূজা করেন। তাই আদিবাসীরা পাহাড়, জঙ্গল, নদী, সূর্য, চাঁদ, মাতৃভূমি জাহের আয়ঃ প্রভৃতিকে পূজা করেন। অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের মৃত দেহকে

শ্মশানে পোড়ালেও বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের মৃতদেহকে কবর বা সমাধি দেয়। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিরহড়রা তাদের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে তাঁদের সমাজ-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ভাণ্ডারকে টিকিয়ে রেখেছেন। তাঁদের দেশীয় জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে স্থিতিশীল উন্নয়নে সহযোগিতা করেছেন ও জল, জঙ্গল, পাহাড়কে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং রাখছেন। বিরহড়দের গ্রামে এখনও পর্যন্ত উচ্চবিদ্যালয় নেয়। প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চপ্রাথমিক স্কুল শিক্ষা শেষ করে উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তবে পুরুলিয়া জেলার বিরহড় শিশুরা চতুর্থ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে তাঁরা স্কুল ছুট হচ্ছে। খুবই কম সংখ্যক বিরহড় ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে। তবে বর্তমানে একটি মেয়ে (বাড়েরিয়া গ্রাম) ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি কলেজে লেখাপড়া করছে। ২০২৫ সালে এই প্রথম বার একসাথে ৪ জন বিরহড় ছাত্রী (বাঘমুণ্ডি ব্লকের অধীনে) মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে বর্তমানে বিরহড় গ্রামগুলিতে নিজেদের ভাষায় এবং 'অলচিকি' এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত আগ্রহে বিরহড়, সাঁওতাল এবং মুড়া শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা PVTG এবং BCW Fund থেকে বিরহড়দের জন্য (ভূপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা, ডাকাই গ্রাম) আবাস যোজনা অর্থাৎ বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে এবং পুরুলিয়ায় জলের সমস্যার কারণে কিছু গ্রামে জলের ট্যাঙ্ক, নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গবেষক সমগ্র গবেষণার কার্যটি মোট ৭ টি অধ্যায়ে সম্পন্ন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও ভূমিকা, আদিবাসী জীবনের প্রেক্ষাপট, আদিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ, আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার এবং উন্নয়ন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির

সুপারিশ, পুরুলিয়া জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ইত্যাদি রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য সমূহের পর্যালোচনা করেছেন, জ্ঞানের ঘাটতি, গবেষণার প্রশ্ন, উদ্দেশ্য সমূহ, গবেষণার সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়া পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর এবং ঝালদা-১ ব্লকের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এবং চারটি গ্রাম ভূপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা, ডাকাই গ্রামের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষক বিরহড়দের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার বিরহড় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জীবন চর্চা, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, বিবাহ পদ্ধতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, গোত্র, শিকার পদ্ধতি, উৎসব অনুষ্ঠান, মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষক গবেষণায় ভারতে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ভূমিকা, আদিবাসীদের বিভিন্ন চিরাচরিত জ্ঞানের মাধ্যমে কি ভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নে অবদান রেখেছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে গবেষক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণ করেছেন, আলোচনা, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য, পরবর্তী গবেষণার সুযোগ, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গবেষক এই গবেষণায় বিরহড়দের জীবনযাত্রা এবং ভারতে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে অবদান সম্পর্কে জানার জন্য পুরুলিয়া জেলায় তিনটি ব্লকের অধীনে চারটি অধ্যুষিত গ্রামের বিরহড় আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সুতরাং গবেষক এই গবেষণায় বিরহড়দের জীবনযাত্রা এবং আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে অবদান সম্পর্কে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

(Introduction)

১.১ আদিবাসী জীবনের প্রেক্ষাপট:

ভারতবর্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বহুত্তের ধারণা। এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, গাছপালা, এবং পশুপাখি বসবাস করে যাদের প্রকৃতিও পরস্পর থেকে ভিন্ন। ভারতের এই বহুত্ব ও ভিন্নতা বর্ণময় হয়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রায় ৬৬৫ ধরনের আদিবাসী মানুষ ভারত ভূমিতে বসবাস করেন। আবার কারো কারো মতে ভারতবর্ষে প্রায় ৭০৫ রকমের আদিবাসী মানুষ রয়েছে (Ministry of Tribal Affairs, 2014, p.34)। বিশাল দেশ ভারতবর্ষে এক ঘেয়ে জনজীবনের মধ্যে উদ্দীপনা দানকারী নতুন ধরনের ছোঁয়া লেগেছেএ বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী মানুষদের উপস্থিতির জন্য। সকল ধরনের আদিবাসী মানুষের ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, জীবনর্চচা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য– যা একটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে অন্য একটি আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীরা ভারত ভূমির বিভিন্ন পরিবেশে আধুনিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করেন। ভারত ভূমিতে আদিবাসীরা অ-আদিবাসী সমাজ থেকে এক পৃথক সত্ত্বা বিশিষ্ট সম্প্রদায়। ২০১১ সালে আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে আদিবাসীদের জনসংখ্যা প্রায় ১০,৪২,৮১,০৩৪ জন যা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ %। এই বিশাল সংখ্যক আদিবাসী মানুষজনের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন প্রায় ৯,৩৪,১১,১৬২ জন

এবং শহর এলাকায় বসবাস করেন প্রায় ১,০৪,৬১,৮৭২ জন। গ্রামীণ মোট জনসংখ্যায় ১১.৩% হলেন বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী মানুষ এবং শহর অঞ্চলে এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২.৮%। ভারতবর্ষে প্রতি ১০০০ জন আদিবাসী পুরুষ পিছু আদিবাসী মহিলার সংখ্যা ৯৯০ জন। আজও পর্যন্ত শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পৃথিবীতেই আদিবাসী মানুষরা অ-আদিবাসী মানুষজনের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। আদিবাসী মানুষ জনের এই পশ্চাৎপদতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অধিক। অপেক্ষাকৃত উন্নত রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়াতেও আদিবাসীরা তাঁদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদির নিরিখে সাধারণ মানুষদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন এবং যে কোন রাষ্ট্রের দরিদ্রদের মধ্যেও এরা দরিদ্র। ভারতবর্ষে আদিবাসীরা এখনও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলেই স্বীকৃত (Ministry of Tribal Affairs, 2014, p.25), এমনকি একবিংশ শতাব্দীতেও ভারতের আদিবাসীদের একটি বর অংশ দিনে তিন বেলা খাবার টুকুও সংগ্রহ করতে পারেন না।

যীশুখ্রিস্টের জন্মের ২৪০-২৪২ বছর পূর্বে ল্যাটিন শব্দ 'ট্রাইবাস' ('Tribus') বলতে বোঝাতো তিনটি গ্রামীণ আদিবাসী গোষ্ঠী- 'টাইটেস', 'র‍্যাম্নেস' এবং 'লুসেরস'। এই গোষ্ঠীর মানুষরা রোম শহরের বাইরে বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করতেন। তাই মনে করা হয় যে এই তিনটি গোষ্ঠী অর্থাৎ 'ট্রাই' থেকে 'ট্রাইবাস' শব্দের উৎপত্তি। কোন কোন নৃতাত্ত্বিক মনে করেন যে 'ট্রাইব' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Phule' অথবা 'Trifu' শব্দ থেকে (Mitra, 2008, p.17)। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলিতে 'ট্রাইব' বা 'আদিবাসী' শব্দটি এসেছে 'Dasyus' শব্দ থেকে যার অর্থ হল সর্ব সাধারণকে বাদ দিয়ে বাকিরা হলেন আদিম অধিবাসি (Vidyarthi & Rai, 1985, p.26)। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিকরা আদিবাসীদের চিহ্নিত করেছেন Bhils, Dasas, Draviras, Drimides, Abhiras, Kiratas, Kollas, Nishadas, Sabaras, and

Pulindas (Vidyarthi & Rai, 1985 p.26; Hasnain, 2011, p.25)। কোন কোন নৃতাত্ত্বিক মনে করেন যে আদিবাসীরা হলেন 'Aboriginals' (Sir Harbert Resley, A.V. Thakar, Mr. Elwin)। আদিবাসী বা ট্রাইবদের কোন কোন নৃতত্ত্ববিদরা বলেছেন- Primitive Tribe (Dr. Huttol), Hill Tribes (Sir Baines), Jungle People (Sir Baines), Forest Tribes (Sir Baines), BackWard Hindus (G.S. Ghurye), Submerged Humanity (Das & Das, Memoria, 1957, pp.19-20)। আধুনিক কালে বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা এই সকল প্রাচীন আদিবাসীদের বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছেন- আদিবাসী, জনজাতি, আদিমজাতি, পাহাড়ি, বনবাসি, মূলবাসি ইত্যাদি। Vidyarthi and Rai (1985, p.25) এর মতে ভারতের সংবিধানে আদিবাসীদের 'Scheduled Tribe' বলে স্বীকার করা হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন আদমশুমারিতে (1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941) আদিবাসীদের বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করেছেন (Vidyarthi & Rai, 1985, p.63)। সুতরাং ভারতের আদিবাসীদের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সময়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি আদিবাসী সমাজের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি (Xaxa,2008, p.29)। ১৯৬৫ সালে 'Lokur Committee' বলেছেন আদিবাসী সমাজের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই গুলি হল- Primitive Traits, Distinct Culture, Geographical Isolation, Shyness of Contact with the others and Community at Large, Backwardness (Department of Social Security, Government of India, 1965, p.7)।

ভারতীয় সংবিধানে Article-366(25) -এ আদিবাসীদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে "Scheduled Tribe means such tribes or tribal communities as parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article-342, to be

Scheduled Tribes for the purpose of this Constitution" (Das Basu, Ray, Nandi, & Sen Gupta, 2007, p.961)।

Fuchs -এর মতে, "As far as 'India Tribes' go, the essentials seem to be only a comparatively simple and primitive economy, combined with a certain degree of residential instability, a simple, though not always, classless social organization, and especially that feeling of being a different and separate social unit-apart from the majority communities of India. The social and political solidarity expressed either by a common name, a common distinct language or dialect, endogamy, similar customs and traditions of a social and religious nature appear less important".

Oxford Dictionary – মতে, "A Tribe is a group of people in a primitive or barbers stage of development acknowledging authority of a chief and usually regarding themselves as having a common ancestor".

"A social division in a traditional society consisting of linked families or community with a common culture and dialect" is termed as tribe (Concise Oxford English Dictionary, 2007, p.1539)

ড: রিভার্স (Dr. Rivers) বলেছেন- "তারা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনের জটিলতা নেই যারা এখনো একই ভাষায় কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়ম-কানুন রক্ষার জন্য যাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রাম করে থাকে তারাই আদিবাসী"।

স্বাধীনতার পর সংবিধানে আদিবাসী শব্দটির পরিবর্তে 'ট্রাইব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেটির বাংলা প্রতিশব্দ হয় উপজাতি বা খন্ড জাতি বা জনজাতি। ট্রাইব শব্দটি যেমন আদি

কালের আদিম জনগোষ্ঠীর সকল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারে অপরদিকে ট্রাইব শব্দটির মধ্যে দিয়ে নেতিবাচক চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়। বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপজাতি কথাটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল এবং ঝাড়গ্রাম, সিউড়িতে উপজাতি সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। কিন্তু উপজাতি শব্দটির উপকথাটি হীন বা তুচ্ছ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেখানে আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে 'উপজাতি' শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর মানব সমাজ থেকে দেশের সুপ্রাচীন জনগণ যেন ভিন্ন এটা বলতে চেষ্টা করা হয়েছে অন্যায় ভাবে। যেহেতু ভারতবর্ষের আদি প্রথম মানব গোষ্ঠী হল আদিবাসীরা সেই অর্থে আদিবাসীদের উপগোষ্ঠী বা উপজাতি বলা একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যুগ যুগ ধরে যারা এই ভারতবর্ষের ভূমিতে বসবাস করে এবং সভ্যতা গড়ে তুলেছে তারাই তো ভারতের মূল জাতি এবং এদের সংস্কৃতিই হল ভারতের মূল সংস্কৃতি। আদিবাসীরা উপজাতি বা জনজাতি শব্দ ব্যবহার করেন না, এই শব্দে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে, তারা নিজেদেরকে সুপ্রাচীনকাল থেকে 'আদিবাসী' ও 'হড়' বলে পরিচয় দেন। আদিবাসীরা সবসময়ই নিজেদেরকে আদিবাসী বলতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে আদিমতম পর্যায়ে রয়ে গেছেন বলেই পরবর্তীকালে সামাজিকভাবে আদিবাসী হিসেবে পরিচিতি পান।

সুতরাং উপরের সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আদিবাসীদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যাবে যেমন-

১) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর একটি নিজস্ব ভাষা রয়েছে, এবং এই ভাষার দ্বারা নির্দিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীকে বোঝায়।

২) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি বলে তারা স্বীকার করে।

৩) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সামাজিক প্রথা এবং রীতিনীতি।

৪) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস কিছুটা পৃথক হলেও বহু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসে বহু ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একই।

৫) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে এবং অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতি থেকে বহু অংশে পৃথক।

৬) প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ রয়েছে যেগুলি তারা নিজস্ব সামাজিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সময়ে ব্যবহার করে থাকে।

৭) অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠী অত্যন্ত প্রাচীন অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এখনো জীবিকা নির্বাহ করেন।

৮) অধিকাংশ আদিবাসী গোষ্ঠী পাহাড়, জঙ্গল, ঝর্ণা এবং জঙ্গলের ঘেঁসে থাকা নদীর ধারে বাস করতে পছন্দ করে।

৯) ওঝা, গুনিন ও ডাইনি ইত্যাদি প্রথা সম্পর্কিত বিশ্বাস এদের মধ্যে প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়।

বিখ্যাত নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এর মতে, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর মানুষরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এক ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতে আদিবাসী, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীরা সাধারণ মানুষদের তুলনায় আরো খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

আদিবাসীরা কোথা থেকে ভারতে এসেছে অথবা তারা ভারতেরই আদিম অধিবাসী কি না এই নিয়ে পণ্ডিতদের, নৃতত্ত্ববিদদের, ঐতিহাসিক, ও ভাষাতত্ত্ববিদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ

রয়েছে। আদিবাসীরা ভারতবর্ষে আর্যরা আশার বহু বছর পূর্ব থেকেই বসবাস করতেন এবং নিজস্ব একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'বন্দোপাধ্যায়' (২০১২) - এর মতে, আদিবাসীদের 'Homeland' হল বর্তমান আফ্রিকা। সম্ভবত ৩.৫ লক্ষ বছর পূর্বে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা আফ্রিকাতে বসবাস করতেন। এখন থেকে প্রায় ৭০-৭৫ হাজার বছর পূর্বে খাবারের সন্ধানে এক দল আদিম মানুষ আফ্রিকা ছেড়ে বাইরের দিকে এগোতে থাকেন। তখন আফ্রিকা এবং এশিয়া ভূ-ভাগ দুইটি পরস্পর যুক্ত ছিল। তাই আফ্রিকা থেকেই আদিবাসীরা পৌঁছেছেন এশিয়া মহাদেশ তথা ভারতবর্ষে। অন্যান্য নৃতত্ত্ববিদদের মতে ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়রা ভারতবর্ষের আদি-মানুষ ও বাসিন্দা, আফ্রিকার আদিবাসীদের সাথে ভারতের আদিবাসীদের ভাষার কোন মিল পাওয়া যায়নি।

ঋক্‌বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদভাগবতে আদিবাসীদের কথা জানা যায়। অর্থাৎ আর্যরা এই দেশে এসে বসতি স্থাপন করবার বহু বছর আগে থেকেই বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী নিজেদের ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বাভাবিকভাবে আর্যরা এই দেশে প্রবেশ করলে আদিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের সংঘাত শুরু হয়। ঋক্‌বেদে আদিবাসীদের অনার্য, কৃষ্ণ বর্ণের দাস বা দাসায়ু বলে স্বীকার করা হয়েছে। বেদে যে অসুরদের কথা বলা হয়েছে তারা আসলে বর্তমানে 'অসুর' নামক একটি নির্দিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠী। অসুর সম্প্রদায় প্রথমে ছিলেন পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চলে, তারা লোহা গলাতে পারতেন এবং লোহার কাজ জানতেন। আর্যরা ভারতের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করলে অসুরদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় সিন্ধু উপত্যকায় অর্থাৎ সিন্ধু নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এবং দীর্ঘ সময় কাল সংঘর্ষের পর অসুররা আর্যদের বুদ্ধিমত্তা ও ছলনার কাছে পরাজিত হয়ে ক্রমশ ভারতের পূর্ব প্রান্তের দিকে অগ্রসর হন। বর্তমানে তারা মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে পাহাড় ও জঙ্গল এলাকায় রয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর অঞ্চলে এখনো অসুর রাজত্বকালের শেষ নিদর্শন হিসেবে আদিম প্রথায় তৈরি কিছু রাজবাড়ীর ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালের প্রথম দিকে ইংরেজরা উত্তরবঙ্গে বিশেষত বর্তমান দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় জঙ্গল ও চা-বাগান অঞ্চলে অসুরদেরকে নিয়ে আসেন জঙ্গল পরিষ্কার ও চা-বাগান তৈরি করার লক্ষ্যে। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির জঙ্গল ও চা-বাগান অঞ্চলে কিছু কিছু অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। সুতরাং বেদে এবং মহাভারতে যে অসুরদের কথা বলা হয়েছে তারা বাস্তবেই এই বর্তমান কালের অসুর সম্প্রদায়।

মহাভারতে কৌরব সেনাবাহিনীদের মধ্যে 'মুন্ডা' সেনারা যে উপস্থিত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয় এর উক্তিতে। রামায়ণে 'শবরদের' কথা জানা যায়। রামায়ণের রামের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল 'গুহক' এর। রাম কোনদিনই তার বন্ধু গুহকের কথা বিস্মৃত হননি। এছাড়া রামায়ণে যে শবরদের কথা জানা যায় বর্তমানে সেই শবররা আদিবাসী বলেই চিহ্নিত।

বর্তমানে 'কোল' এবং 'ভিল' আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ 'কোল্লা' এবং 'ভিল্লা' দের সম্বন্ধে শ্রীমৎভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে আদিবাসী ভিলদের পরম পাষন্ড বলে দেখানো হয়েছে।

যেমন-

"গৌড়বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশে গিয়া
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝড়িখণ্ড
ভিল্ল প্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড"।

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম সপ্তদশ শতকে একটি বর্ণনায় কিরাত, কোল প্রমুখ আদিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১২)।

নিবাসে কেরাত কোল: হাটেতে বাজায় ঢোল জায়াজীব

বসিল কালিলা

বাইরে বসিল হাড়ি; ঘাস কাটি লয় কড়ি; শুণ্ডির অঙ্গনে যার মেলা।

এখানে আদিবাসীদের শারীরিক শ্রম সাধ্য কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী ঋষি অঙ্গীরার অভিশাপে রাজা বেনা'র বাম হাত থেকে তৈরি হয় মুসাহর, কোল ও ভিলদের পূর্বপুরুষ। মহাভারতে অর্জুনকে পরীক্ষা করবার জন্য স্বয়ং মহাদেব 'কিরাত' রূপ ধারণ করেছিলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কৌরব সেনাবাহিনী সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে বলেন যে, তাদের সেনাবাহিনীতে একটি বড় সংখ্যক মুন্ডা সেনানি রয়েছে।

আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে সমগ্র পৃথিবীতে উন্নত মানব সমাজের নিকট ব্রাত্য এবং অপাংক্তেয়। আধুনিক কালে সকল সমাজে আদিবাসীরা বিভিন্নভাবে শোষিত এবং নির্যাতিত। অ-আদিবাসী সমাজ ছলে বলে কৌশলে সহজ সরল আদিবাসীদের জীবন, যৌবন ও সম্পদকে শোষণ করেছে তাই আদিবাসী সমাজের দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ, বঞ্চনা ও প্রতিজ্ঞার এক দর্শন উঠে এসেছে।

আদিবাসী লেখক ভগবান মাঝি'র কথায়-

"কুভি ভাষায় গান বাঁধেন কাশীপুরের গায়ক কবি ভগবান মাঝি উনি একজন কন্ধ। ভগবান মাঝি হলেন কুভিঙ্গা, কিন্তু 'কুভি' ভাষা বোঝে না এখন আর কেউ-ই। মানুষগুলো আছে কিন্তু ভাষাটা হারিয়ে যাচ্ছে। ভগবান মাঝি বলেন, মানুষ গুলোই হারিয়ে যাচ্ছে। লিপির ভেতরে

যেভাবে থাকে ধ্বনি, সেভাবে একটি ভাষা কি বেঁচে থাকে না একটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য জল জঙ্গল জমির ভেতর? ভগবান মাঝি বলেন তা নয়, ভাষার ভেতরে বাঁচে জল, জঙ্গল, জমিন ও পাহাড়। পাখির ডাক, ঝর্ণার শব্দ, মহুয়ার বনে হাওয়া ধ্বনি সেই ভাষার শব্দবোধ। ভাষাটা হারিয়ে যাচ্ছে, তাই হারিয়ে যাচ্ছে জল, জঙ্গল, জমিন-পাহাড়। উনি তাই গানের ভেতরে বেঁধে রাখেন হারিয়ে যেতে থাকা গাঁ ঘর, দেশ, পাহাড়-পর্বত, ঝর্ণা, নদী, পাথর, লতা ও পাখি"।

[পরিমল ভট্টাচার্য (২০১৯)। সত্যি রূপকথা/ *সভ্যতা : উন্নয়ন ও উড়িষ্যার এক উপজাতির জীবন সংগ্রাম* অবভাস (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃষ্ঠা.৭৯-৮০]

আদিবাসীদের জীবনে পাহাড়, নদী, জঙ্গল, ঝোপ, ঝর্ণা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাই আদিবাসীদের যখন গ্রাম ছাড়তে বলা হয়, যখন তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয় 'অরণ্যের অধিকার', তখন তারা বাধ্য হয় নিজের মাতৃভাষাকে ত্যাগ করে বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে, তখন তাদের অন্তঃকরণ থেকে উঠে আসে যন্ত্রনা মেশানো কান্না।

ওড়িয়া কবি ভগবান মাঝির হিন্দি-ওড়িয়া মেশানো কবিতায় ফুটে উঠে আদিবাসী সমাজের জীবন যন্ত্রণা—

গাঁও ছোড়্ নাহি জঙ্গঁল ছোড়্ নাহি

মায় মাটি ছোড়্ নাহি লড়াই ছোড়্ নাহি।

বাঁধ বানায়ে গাঁও ডুবোয়ে কারখানা বানায়ে

জল জঙ্গঁল জমিন ছোড়ি হামিল কাঁহা কাঁহা যাবে।

গাঁও ছোড়্ নাহি জঙ্গঁল ছোড়্ নাহি

মায় মাটি ছোড়্ নাহি লড়াই ছোড়্ নাহি।

যমুনা শুখি নর্মদা শুখি শুখি সুওনরেখা

গঙ্গা বলে গন্ধি নালী, কৃষ্ণা কালি রোখা।

তুম পিওগে পেপসি কোলা বিসলেরিকা পানি

হাম ক্যায়সে আপনা পিয়াস বুঝায়ে পি কর কাছরা পানি

গাঁও ছোড়্ব্ নাহি জঙ্গঁল ছোড়্ব্ নাহি

মায় মাটি ছোড়্ব্ নাহি লড়াই ছোড়্ব্ নাহি।

পুরখে যে উয়ো মূর্খ যে কেয়া জঙ্গঁল বাঁচায়ে

ধরতি রাখি হরি-ভরি, নদী মধু বাহায়ে

তেরি লালচ মে জ্বল গয়ি ধরতি লুট গয়ি হরিয়ালি

বহুলি মর গয়ি পনছি উড়্ গয়ি কিস দিশায়েঁ জানে কিস দিশায়েঁ।

[পরিমল ভট্টাচার্য (২০১৯)। সত্যি রূপকথা/ *সভ্যতা : উন্নয়ন ও উড়িষ্যার এক উপজাতির জীবন সংগ্রাম*/ অবভাস (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃষ্ঠা.৭৯-৮০]

আদিবাসীদের যন্ত্রণার ভাবনা যেমন উঠে এসেছে ভগবান মাঝির কথায় এবং লেখায় তেমনি বিভিন্ন সাহিত্যে আদিবাসী যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের জীবন জীবিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার যন্ত্রণা কে তুলে ধরেছেন—

"ইলিশের মরশুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণা হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে তার মীন সন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়"। কেবল পদ্মা নদী নয় মানুষের শোষণের ফলে বহু নদ-নদী, জলাভূমি আজ শুকনো।

তার ফলে জেলে সম্প্রদায় বিশেষত বাগদী, দুলে, বাগ, মাল, মাঝি, হালদার, কৈবর্ত পদবী ধারীরা নিজেদের উপার্জন তথা জীবন-জীবিকা হারিয়ে চলে গেছে বিপন্নতার পথে। এই জীবন-জীবিকার সাথে সাথে হারিয়ে গেছে এদের সংস্কৃতি, ভাষা এমনকি ধর্মাচরণও। এরা না পেরেছে উচ্চবর্ণের সাথে মিশে যেতে না পেরেছে পৃথক অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখে পুরনো জায়গায় ফিরি আসতে। তাই এরা আজ হারিয়েছে অধিবাসীর তকমা। বিনিময়ে পেয়েছে তপশীলি জাতি ভুক্ত হওয়া অবাঙ্গমানস-গোচর যন্ত্রণা। তাই 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাসের বুকে জেগে ওঠা 'চর' কে কেন্দ্র করে আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী গোষ্ঠীর লড়াই চিহ্নিত হয়েছে।

"দেখা গেল যারা অনেক জমির মালিক, যাদের জোর বেশি তিতাসের বুকের নয়া-মাটির জমিনের মালিকও হইল তারা।

তাতে জেলেদের কিছু যায় আসে না। কারণ যেদিন থেকে জল গিয়াছে সেই দিন থেকে তারাও গিয়াছে"।

জলের দেশের অধিকার হারিয়ে আদিবাসী জেলে সমাজ হারিয়ে গেছে গ্রাম থেকে, বদল করতে বাধ্য হয়েছে নিজেদের বৃত্তিকে। জীবন-জীবিকা লড়াইয়ে সবকিছু হারিয়ে সর্বহারা আদিবাসী জেলে সমাজ পেটের দায়ে পরিণত হয়েছে দিনমজুরে। 'তিতাস একটি নদীর' নাম উপন্যাসে মালো পরিবারগুলির এই চিত্র বড় করুন, বড় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। "অনেক মালো পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যারা আগেই গিয়াছে তারা ঘর দুয়ার জিনিসপত্র নৌকাতে বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। যারা পরে গেছে তারা ঘর-দুয়ার, জিনিসপত্র ফেলেই গিয়াছে। তারা কোথায় গেল? যারা রহিয়া গেছে তারা জানিতেও পারিল না"।

ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আদিবাসী সমাজ নিজস্ব সংস্কৃতি এবং রীতি-নীতিকে হারিয়ে অন্যের সংস্কৃতিকে বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং বাধ্য করা হচ্ছে। এখানেই তৈরি হচ্ছে বিপত্তি। নিজেদের অজান্তেই নিজেদের মৌলিকত্বকে বিসর্জন দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে এরা গা ভাসিয়ে চলেছে।

'আরণ্যক', 'অরণ্যের অধিকার' প্রভৃতি উপন্যাসে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতাল, লোধা, শবর, মাহালি, ভূমিজ, পান, মালপাহাড়িয়া, কোড়া ইত্যাদির বঞ্চনার কাহিনী। আদিবাসী বলে এদের লেখাপড়ায় কোন অধিকার ছিল না। ব্রিটিশ শাসনকালে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্তের যাঁতাকলে পড়ে মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে এরা পেয়েছিল শিক্ষার সুযোগ। তাই বিরসা মুন্ডা মিশনারিদের কার্যকলাপে বীতস্পৃহ হয়ে হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারি আনন্দ পাঁড়ের কাছে গিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সেখানেও আনন্দ পাঁড়ে তাকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করেনি। এই কাজে বিরসা মুন্ডার সায় ছিলোনা। তাই শেষ পর্যন্ত বিরসা আরো অণুশোচনায় বলেছেন —

"আমরা সিংবোঙ্গার প্রজা।

হরম বরা আমাদের আদিপুরুষ"।

..."অর্থাৎ তাঁরা কি ছিল আর তারা কি হয়ে গেছে।

এই বেদনাদায়ক অনুভূতি অ-আদিবাসী সমাজ অনুভব করতে পারে না"।

ঢোঁরাই চরিত মানস' উপন্যাসে সাঁওতাল পরগনার বসবাসকারী ওঁরাও'রা পশ্চিমবঙ্গে এসে পরিচিতি পান 'ধাঙড়' হিসাবে। তাঁরাও হারালেন নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মাচরণের অধিকার। পেলেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের সাথে মেলবন্ধন করার সুযোগ। ছিলেন আদিবাসী হয়েছেন হিন্দু। ফলে নিজস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে পরিণত হয়েছেন ধর্মের দাসত্বে।

সুবোধ ঘোষ এর কথায়-

"নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে এরা আদিবাসী হলেও সামাজিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে আজও এরা হিন্দু"। [সুবোধ ঘোষ (১৯৪৮), *ভারতের আদিবাসী।* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৩১১)

সুবোধ ঘোষ আরো বলেছেন যে, "ভারতের অন্যান্য অংশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা বংশের দিক দিয়ে উপজাতীয় ও আদিবাসী কিন্তু তাদের মাতৃভাষা প্রাদেশিক ভাষা হয়ে গেছে।..... আদিবাসীরা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত গোষ্ঠীবদ্ধতা নেই"। [সুবোধ ঘোষ (১৯৪৮), *ভারতের আদিবাসী।* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৩১১)

- **আত্তিকরনের অভিমুখ বা সান্নিধ্য (Assimilation Approach):**

যেখানে ভারতের আদিবাসী সমাজকে অ-আদিবাসী সমাজের মধ্যে গ্রহণ করার কথা বলেছে এবং সম্মানিত করার উপরে জোর দিয়েছে ফলে ভেঙ্গে যাচ্ছে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। তাই উচ্চবিত্ত সমাজ দেহে আদিবাসীদের লীন করে দিতে গিয়ে তাদের ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে তা লোক সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষের কথাকে উল্লেখ করতে হবে—-

"আদিবাসী সমাজকে ভারতের জাতিদেহের অঙ্গীকার করতে হবে। তার মানে এই নয় যে আদিবাসী তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সাধারণ বাঙালি, বিহারী, ওড়িয়া, মারাঠির মতন হয়ে যাবে কারণ, এরকম এক রূপ হয়ে যাওয়া ভারতীয় জাতীয়তার ধর্মই নয়। বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত হয়ে থাকা ভারতীয় জাতীয়তার নীতি। এককথায় বলা যায় ভারতের

সামাজিক ঐতিহাসিক নীতি"। [সুবোধ ঘোষ (১৯৪৮), *ভারতের আদিবাসী।* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ২৩৯) ।

নতুন ইহুদি নাটকে ও ধর্মান্তরিত, গোত্রান্তরিত, পরিস্থিতির চাপে নতি স্বীকার এ বাধ্য হওয়া মানুষ বলে ওঠে, "আমাদের পারিবারিক জীবন যে একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। আমাগো নিজের কইতে আর কিছুই নাই। আমাগো শিক্ষা রইল না, সংস্কৃতি গেল নষ্ট হইয়া। পারিবারিক সম্ভ্রম হইয়া উঠলো উপহাসের বস্তু"। [সলিল সেন, (১৯৫৩)। *নতুন ইহুদি।* ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, পৃষ্টা. ৬৫]

প্রায় একইভাবে তারাশঙ্করের 'পঞ্চগ্রাম' এবং 'পালামৌ' প্রভৃতি উপন্যাসে আদিবাসীদের যন্ত্রনা উঠে এসেছে। ভগবান মাঝির কথাই যে উঠে এসেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে সাঁওতাল রাজা দোররু পান্না'র কথায়—

"আমাদের বংশ সূর্যবংশ এই পাহাড় জঙ্গল সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানির সঙ্গে লড়েছি এখন আমার বয়স অনেক, যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছুই নেই"। [বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৯৩৯), 'আরণ্যক'। কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ১৭৫]

সুতরাং যে আদিবাসীরা একদিন ছিল এই দেশের রাজা আজ জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ধর্মান্তরিত ও গোত্রান্তরিত হয়ে ভেঙে পড়েছে তাঁদের উদ্যম, তাদেরকে গ্রাস করেছে অবসন্নতা। তাই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে এরা আজ দুর্বল উপজাতি ও দারিদ্রের সাথে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। আদিবাসীরা নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ করেন। ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, এবং ধর্ম বিশ্বাস হারিয়ে

গেলে একটি নির্দিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্বতা হারিয়ে যায়। আদিবাসীদের ভাষায় ও গানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তাদের নিজস্বতার পূর্ণ প্রকাশ।

যেমন- 'অল চিকি' হরফ (সাঁওতালী ভাষা)–এর স্রষ্টা পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর একটি সচেতনতার উক্তি-

"অল মেনাঃ তামা, রর মেনাঃ তামা,

ধোরম মেনাঃ তামা, আম হো মেনামা

অল এম আদ লে রে, রোর এম আদ লে রে,

ধোরম এম আদ লে রে, আম হোম আদোঃ"।

অর্থাৎ সাঁওতালদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব লিপি, নিজস্ব ধর্ম, নিজস্ব সংস্কৃতি। সাঁওতালরা মনে করে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম হারিয়ে ফেললে নিজেরাও হারিয়ে যাবেন।

আদিবাসী শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Indigenous', এই শব্দটি ইতিবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সারা বিশ্বে আদিবাসীরা ইন্ডিজেনিয়াস পিপল (Indigenous People) নামে পরিচয় লাভ করেছেন। ১৯৯২ সালে ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯৩ সালকে বিশ্বের আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক বছর করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঠিক এক বছর পর ১৯৯৪ সালে ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষণা করা হয়, যা বিশ্বের আদিবাসী জনগণের প্রথম আন্তর্জাতিক দশকের (১৯৯৫-২০০৪) সময় প্রতি বছর উদযাপিত হয়। ২০০৪ সালে, অ্যাসেম্বলি ২০০৫-২০১৫ সাল থেকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দশক ঘোষণা করে, যার থিম ছিল "একটি দশক"। আদিবাসীদের সম্পর্কে জাতিসংঘের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের

জনগণকে দিবসটি পালনে অংশ নিতে উৎসাহিত করা হয়। আদিবাসীদের প্রশংসা এবং আরও ভাল বোঝার জন্য ক্রিয়াকলাপগুলিতে শিক্ষামূলক ফোরাম এবং আদিবাসীদের রক্ষা করার বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বছরই ১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর রেজুলেশন ৪৯/২১৪ এর মাধ্যমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিশ্বের আদিবাসী গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক দশকে প্রতি বছর ৯ আগস্ট 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' পালন করা হবে। তাই ১৯৯৪ সাল থেকে প্রত্যেক বছর সারা বিশ্বব্যাপী সমগ্র দেশে বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করে এবং আনন্দের সাথে আদিবাসী গোষ্ঠীরাও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে ও বিশাল ভারত ভূমিতে নিজেদের ভূমিপুত্র মনে করে উদযাপন করেন।

১.২. আদিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ এবং আদিবাসী বিকাশের পন্থা:(Classification of Tribes and Approaches to Tribal Development):

১.২.১. আদিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Tribes):

প্রতিটি আদিবাসী শ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রথা, সামাজিক গঠন, ধর্ম, এবং ভাষা রয়েছে। তাই কোন দুইটি আদিবাসী শ্রেণি হুবহু এক নয়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাই আদিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এই প্রেক্ষাপটগুলি হল- ভৌগোলিক বিন্যাস, ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতির প্রকারভেদ, অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং সমন্বয়নের স্তর ইত্যাদি।

বি.এস.গুহর মতে, ১৯৪৪ সালে তিনি ছয়টি মূল তপশীলি উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়কে চিহ্নিতকরণ এবং উপস্থাপন করেছেন-

১) নিগ্রিটো (Negritos) :

নিগ্রিটস উপজাতি গোষ্ঠীদের প্রাচীন বসবাস এই ভারতবর্ষে, পাহাড়-পর্বত এবং গভীর জঙ্গল এলাকায় এদের বাসভূমি, এদের বসতি বিশেষভাবে ভারতের অংশ আন্দামান এবং নিকোবর আইল্যান্ডে। এদের শারীরিক গঠন ও গঠন প্রণালী হল-ছোট দৈহিক উচ্চতা, প্রশস্ত সমতল নাক, শস্য কণার মতো চুল, ছোট থুতনি, গায়ের রং কালো, তাদের হাত এবং হাতের বাহু অনেক লম্বা ইত্যাদি।

২) প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (Proto-Australoide):

প্রোটো-অস্ট্রিলীয় আদিবাসী গোষ্ঠী ভারতবর্ষের আদিম এবং মূল গোষ্ঠী ও বসবাসকারী। ভারতে এই গোষ্ঠী পাহাড়-পর্বত, নদীর ধারে এবং গভীর জঙ্গলে প্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসছে এবং প্রাচীন কাল থেকে তারা চাষবাস এর সাথে যুক্ত। এই প্রোটো-অস্ট্রিলীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা শ্যাম বর্ণ বা কৃষ্ণ বর্ণ, এদের দৈহিক গঠন মধ্যম, চওড়া চ্যাপ্টা নাক, নাকের গোড়া বসা, মাথার চুল ঢেউ খেলানো ইত্যাদি। এই জনগোষ্ঠী ভারতের সমগ্র মধ্যামাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে এদের বসবাস। এই প্রোটো-অস্ট্রিলীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীরা রয়েছে সেই গোষ্ঠীগুলি হল- সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, বিরহড়, গণ্ড, কোল, ভিল, লোধা, শবর, খারিয়া, হো, এবং দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুরুম্বা, বাদামা প্রভৃতি। আর্য, হুন, সুলতান, মোঘল, ফরাসি, ব্রিটিশ প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমনের বহু বৎসর আগে থেকেই এই আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রথম প্রাচীন সিন্ধি বা সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল যেটি একটি আধুনিক নগরায়ন সভ্যতা ছিল। এই ভারতবর্ষে আর্যদের আসার বহু পূর্বে এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা চাষবাসে ভারতবর্ষকে শষ্য শ্যামলে ভরিয়ে তুলেছিলেন।

গণ্ড আদিবাসী গোষ্ঠী (Gond Adibasi People)

মুণ্ডা আদিবাসী গোষ্ঠী (Munda Adibasi People)

ভীল আদিবাসী গোষ্ঠী (Bhil Adibasi People)

সাঁওতাল আদিবাসী গোষ্ঠী (Santal Adibasi People)

অসুর আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় (Asur Adibasi People)

৩) মঙ্গলয়েড (Mongoloids):

মঙ্গলীয় উপজাতি গোষ্ঠীর মূল ও আদিম স্বদেশভূমি ছিল তিব্বতী-চীন এবং মঙ্গলীয় স্থান। এই জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের উত্তরে এবং উত্তর-পূর্বের আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর এবং অন্যান্য স্থান যেমন অরুণাচল প্রদেশ এবং ভুটান এই সমস্ত এলাকায় বা রাজ্যে এদের বসবাস। প্রাচীনকালে কোন এক সময় এই মঙ্গলীয় জনগোষ্ঠী শ্রেণীর লোকেরা ভারতবর্ষে বসবাসের প্রচলন করেছিলেন। এই উপজাতি গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মানুষের দৈহিক আকৃতি হল উচ্চতায় মাঝারি, গায়ের রং হলুদ, চ্যাপ্টা মুখমন্ডল, মাথার চুল সোজা, দেহে ও মুখে লোমের অভাব, চোখে মঙ্গলীয় ভাঁজ সুস্পষ্ট। এই জনগোষ্ঠী শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি হল লেপচা, টোটো, রাভা, চাক্‌মা, গারো প্রভৃতি।

ভুটিয়া লেপচা আদিবাসী গোষ্ঠী (Bhutia Lepcha Adibasi People)

গারো আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় (Garo Adibasi People)

৪) দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় (Dravirr):

এই দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় তপশীলি উপজাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, এই জনগোষ্ঠী এশিয়ার পশ্চিম দক্ষিণ থেকে ভারতে এসেছিল এবং তাদের উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা প্রাচীন যুগ থেকে ছিল। আমরা বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণায় এই দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর ইতিহাস খুঁজে পাই। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠী ভারতের মধ্য এবং দক্ষিনে এদের বসতি স্থাপন এবং জীবন যাপন করছে। এই জনগোষ্ঠীগুলি হল ইরুলা, টোডা, ওঁরাও, গোন্ডু, খোন্দ ইত্যাদি সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেদের দৈহিক গঠন হলো মধ্যম, উচ্চতা কম, গায়ের রং কালো, মাথার চুল রুক্ষ এবং সূক্ষ্ম, নাক লম্বা এবং মধ্যম প্রকৃতির।

টোডা আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় (Toda Adibasi People)

খোন্দ আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় (Khond Adibasi People)

৫) ইন্দো আর্য ভাষা গোষ্ঠী (Western Brachycephalo):

ইন্দো আর্য ভাষা গোষ্ঠী শ্রেণী সম্প্রদায় ভারতের গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে। এদের দৈহিক গঠন হলো গায়ের রং ফর্সা, ঠোঁট পাতলা, নাক লম্বা, মুখমণ্ডল লম্বা, কপাল ছোট, উচ্চতায় লম্বা ইত্যাদি। এরা ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করা আর্যদের সাথে মিশে গিয়ে নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি হারিয়ে ফেলে।

৬) নরডিক্স (Nordics):

নরডিক্স জনগোষ্ঠী পাকিস্তান, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এলাকায় এই জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের বসবাসস্থান। এই জনগোষ্ঠী ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। এই জনগোষ্ঠীর দৈহিক গঠন হলো শারীরিকভাবে বেশী দৈহিক উচ্চতা, লম্বা মুখমন্ডল, লম্বা নাক, সোনালী রংয়ের চুল, নীল রংয়ের চোখ ইত্যাদি। এই জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজ্যে এদের বসতি সে সমস্ত রাজ্যগুলি হল হরিয়ানা, পাঞ্জাব, চন্ডিগড, দিল্লি, গোয়া, পন্ডিচেরি ইত্যাদি।

A) **ভৌগোলিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় আদিবাসী সমাজের শ্রেণীবিভাগ-**

বিশিষ্ট সামাজিক নৃতাত্ত্বিক বিদ্যার্থী এবং রায় (১৯৮৫) ভৌগোলিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে আদিবাসী সমাজকে পাঁচটি প্রধান দলে ভাগ করেছেন এইগুলি হলো-

ক) দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল

খ) পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চল

গ) মধ্য ভারত অঞ্চল

ঘ) হিমালয় এবং হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চল

ঙ) দ্বীপ অঞ্চল

১.১ ভৌগোলিক বণ্টনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস নকশা:

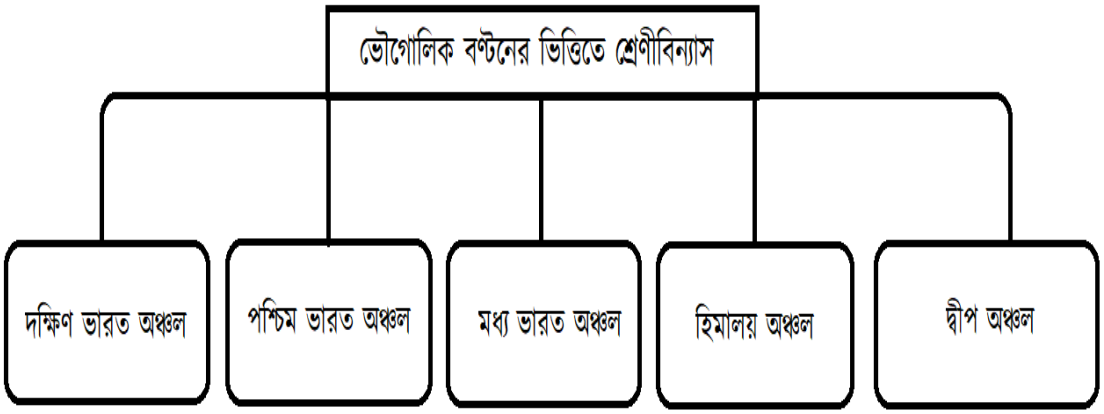

B) ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি ভিত্তিক ভারতীয় আদিবাসীদের শ্রেণীবিন্যাস:

ভারতীয় আদিবাসীদের ভাষাগত অন্তর্ভুক্তির উপর ভিত্তি করে চারটি প্রধান ভাগে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়েছে---

ক) অস্ট্রো-এশিয়াটিক পরিবার (Austro-Asiatic Family)

খ) টিবেটো চাইনিজ পরিবার (Tibeto-Chinese Family)

গ) দ্রাবিড়িয়ান পরিবার (Dravidian Family)

ঘ) ইন্দো-ইউরোপিয়ান পরিবার (Indo-European Family)

১.২ ভাষাগত সংযুক্তির ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসের নকশা:

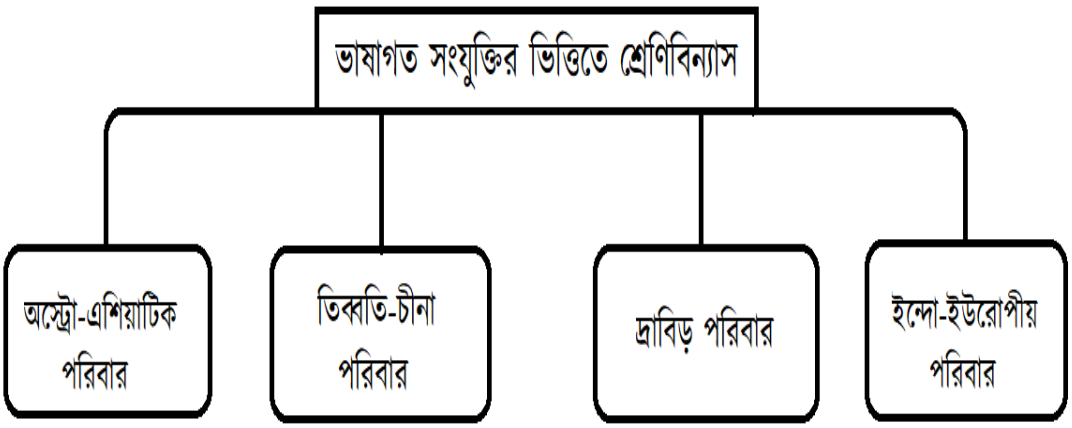

C) জাতিগত বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক ভারতীয় আদিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ:

ক) নিগ্রেটো (Negrito)

খ) প্রোটো-অস্ট্রালয়েট (Proto-Australoid)

গ) মঙ্গলয়েড (Mongloid)

ঘ) মেডিটারেনিয়ান (Mediterrinean)

ঙ) ওয়েস্টার্ন (Western Brachycepals)

চ) নরডিক (Nordic)

১.৩ জাতিগত চারিত্রিকতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসের নকশা:

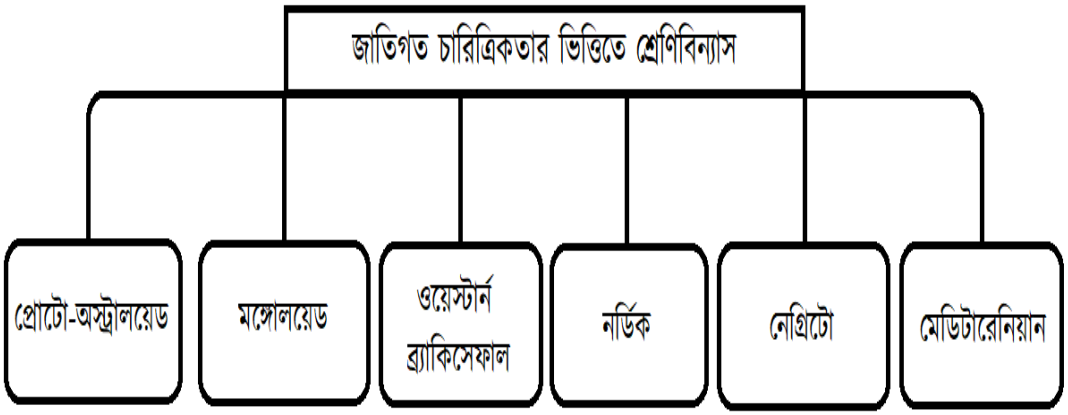

D) সাংস্কৃতিক প্রকার ভেদের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় আদিবাসীদের শ্রেণী বিভাগ:

ক) জঙ্গল ভিত্তিক শিকারি আদিবাসী দল (Forest-Hunting Type)

খ) পার্বত্য অঞ্চলের চাষবাস ভিত্তিক আদিবাসী দল (Hill-Cultivation Type)

গ) সমতল ভিত্তিক চাষবাস এর উপর নির্ভরশীল দল (Plain-Agriculture Type)

ঘ) লোক শিল্পী ভিত্তিক দল (Folk-Artist Type)

ঙ) শিল্প অঞ্চল এবং নগরের কর্মরত দল (Industrial and Urban Workers)

১.৪ সাংস্কৃতিক নকশার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাসের নকশা:

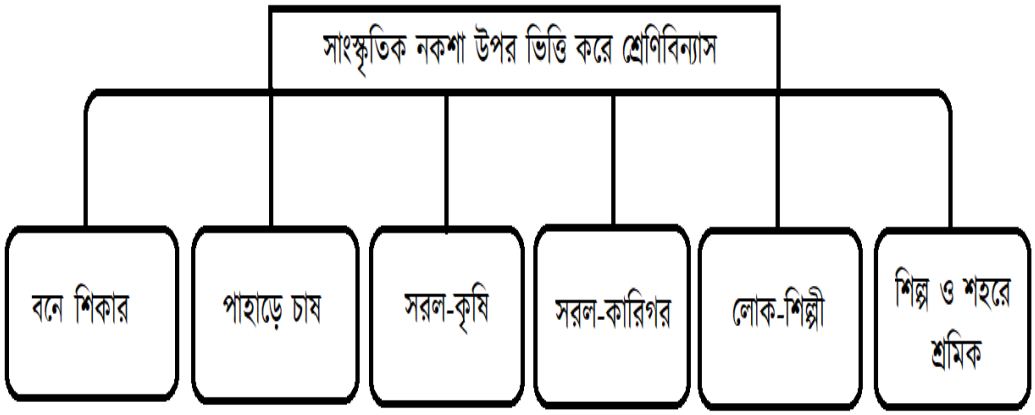

E) সমন্বিত স্তর ভিত্তিক ভারতীয় আদিবাসীদের বিভাগ:

ক) দূরবর্তী আদিবাসী জনগোষ্ঠী (Distant Tribal Communities)

খ) বিভিন্ন সভ্যতা থেকে বিভিন্ন প্রথা গ্রহণ কারি আদিবাসী গোষ্ঠী (Acculturated Tribes)

গ) অপর সভ্যতা থেকে সামান্য প্রথাদি গ্রহণকারী আদিবাসী (Semi-Acculturated Tribes)

ঘ) গ্রামীণ আদিবাসী গোষ্ঠী (Rural Tribes)

ঙ) বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে আত্তিকরন করা আদিবাসী দল (Totally Assimilated Tribes)

১.৫ ইন্টিগ্রেশন স্তরের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসের নকশা:

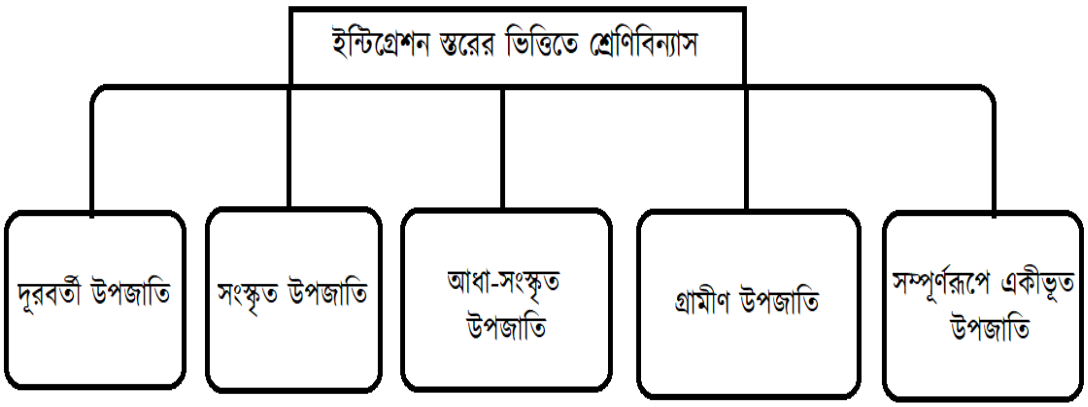

F) অর্থনৈতিক সমন্বয়নের স্তর ভিত্তিক ভারতীয় আদিবাসীদের শ্রেণী বিভাগ:

ক) পার্বত্য অঞ্চলে চাসবাসকারী আদিবাসী দল (Hill- Cultivation Type)

খ) জঙ্গলে শিকার নির্ভর আদিবাসী দল (Forest-Hunting Type)

গ) প্রতিষ্ঠিত চাষবাস ভিত্তিক আদিবাসী দল (Settled-Agriculture Type)

ঘ) গবাদি পশু চারণকারী আদিবাসী দল (Cattled-Herder Type)

ঙ) চাষবাস এবং শিল্পে শ্রমদান ভিত্তিক আদিবাসী দল (Agriculture and Industrial Labour Type)

চ) সাধারণ শিল্পী আদিবাসী দল (Simple-Artisan Type)

ছ) লোক শিল্পে নিয়োজিত আদিবাসী দল (Folk-Artist Type)

জ) অফিসে কর্মরত এবং ব্যবসায়ী আদিবাসী দল (White-Colar Job and Trader Type)

১.৬ অর্থনৈতিক একীকরণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসের নকশা:

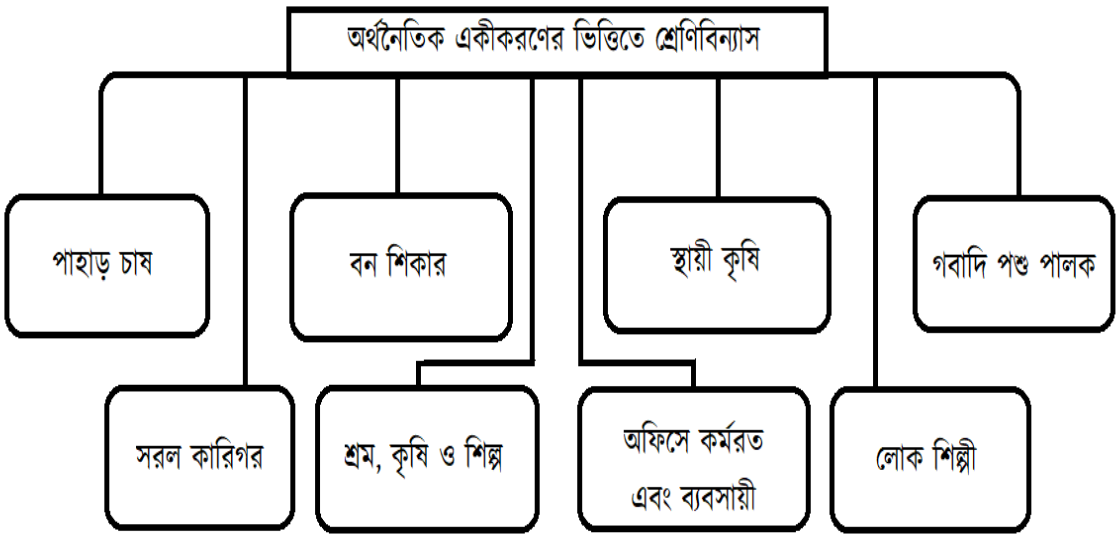

১.২.২ ভারতে আদিবাসী উন্নয়নের পন্থা (Approaches to Tribal Development in India):

১৯৫১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ভারতের মোট জনগণের ৫.৬%। তবে ২০১১ সালে ভারতের আদমশুমারি জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ১১.৩% এবং শহর অঞ্চলে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ২.৮% আদিবাসী। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারতের আদিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৭%, সেখানে অ-আদিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে ১৭.৬৪%। গ্রামীণ এলাকায় ওই সময়কালের মধ্যে আদিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২১% এবং শহর অঞ্চলে বৃদ্ধির সংখ্যা ৩.৪৯%। ২০১১ সালের জনগণনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতে সবথেকে বেশি সংখ্যক আদিবাসী রয়েছেন মধ্যপ্রদেশে। এছাড়া যথাক্রমে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাট, ওড়িষ্যা, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটক, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে আদিবাসীদের সংখ্যা

অধিক। উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চল সমূহের আদিবাসীদের সংখ্যা অধিক। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে লাক্ষা দ্বীপে আদিবাসীদের সংখ্যা অধিক ১.৭%।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 40 টি বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী রয়েছে এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠী হলো অসুর, ভূমিজ, বিরহড়, লোধা, শবর, লেপচা, মাহালি, মাল পাহাড়িয়া, সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ওঁরাও, কোড়া, তামাং, লিম্বু ইত্যাদি।

১.১ পশ্চিমবঙ্গের চল্লিশটি আদিবাসী গোষ্ঠীর তালিকা:

Backward Classes Welfare Department
Government of West Bengal

ℹ List of Scheduled Tribe

1.	ASUR	21.	KORWA
2.	BAIGA	22.	LEPCHA
3.	BEDIA, BEDIYA	23.	LODHA, KHERIA, KHARIA
4.	BHUMIJ	24.	LOHARA, LOHRA
5.	BHUTIA, SHERPA, TOTO, DUKPA, KAGATAY, TIBETAN, YOLMO	25.	MAGH
6.	BIRHOR	26.	MAHALI
7.	BIRJIA	27.	MAHLI
8.	CHAKMA	28.	MAL PAHARIYA
9.	CHERO	29.	MECH
10.	CHIK BARAIK	30.	MRU
11.	GARO	31.	MUNDA
12.	GOND	32.	NAGESIA
13.	GORAIT	33.	ORAON
14.	HAJANG	34.	PARHAIYA
15.	HO	35.	RABHA
16.	KARMALI	36.	SANTAL
17.	KHARWAR	37.	SAURIA PAHARIA
18.	KHOND	38.	SAVAR
19.	KISAN	39.	LIMBU
20.	KORA	40.	TAMANG

স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের উন্নয়ন কিভাবে ঘটানো যাবে এই নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ প্রমুখরা নানান সময়ে ভাবনা-চিন্তা এবং গবেষণা করে চলেছেন। সরকারি ভাবে ও আদিবাসীদের উন্নয়নের একটি সাধারণ রূপ রেখা তৈরির চেষ্টা হয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনাতে উঠে এসেছে যে বাংলার আদিবাসীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট হারে বিকশিত হতে পারছে না তাই অর্থনৈতিকভাবে তারা পশ্চাৎপদ। এর অন্যতম কারণ এখনো বাংলার আদিবাসী সমাজে অধিকাংশ মানুষ প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তাই প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে না পারলে ভারতীয় আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে না।

ভারতে আদিবাসীদের বিকাশকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে —

১) বিচ্ছিন্ন অভিমুখ (Isolation Approach):

যেখানে আদিবাসীদের মূল সমাজ থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত পাহাড়, নদী, জঙ্গল ঘেঁষা স্থানগুলিকে আদিবাসী সমাজের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। Elwin- আদিবাসীদেরকে অ-আদিবাসী সমাজ থেকে পৃথক করে রাখার পক্ষে মতদান করেছেন।

কিন্তু Ghurye (1995) Elwin- এর পৃথকীকরণের তত্ত্বকে নস্যাৎ করেছেন। তাঁর মতে পৃথকীকরণ থাকলে আদিবাসী সমাজ অ-আদিবাসী সমাজের শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। এবং সর্বোপরি পৃথকীকরণ আদিবাসী সমাজের বিকাশকে ব্যাহত করবে। তাই ভারতের আদিবাসী সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়।

২) আত্তীকরণ অভিমুখ (Assimilation Approach):

Ghurye (1995) এর মতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসীরা বিচ্ছিন্নভাবে গভীর জঙ্গল, পাহাড়, ঝর্ণা বা নদীর ধারে বসবাস করতে অভ্যস্ত। তাদের জীবিকা ও চিরাচরিত এবং অত্যন্ত প্রাচীন। এর ফলশ্রুতিতে আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। এখন আদিবাসী সমাজকে ও অ-আদিবাসী সমাজের মূল স্রোতে সমন্বিত করতে পারলে আদিবাসী সমাজের বিকাশ ঘটবে এবং প্রথাগত শিক্ষায় এরা শিক্ষিত হতে পারবে। যেমন সাঁওতাল সমাজ অ-আদিবাসী সাধারণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে থাকার কারণে অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর তুলনায় এগিয়ে এসেছে।

৩) একীকরণের অভিমুখ (Integration Approach):

এই দর্শন অনুযায়ী সমস্ত মানুষের সংস্কৃতি এক হতে পারেনা বরঞ্চ সাংস্কৃতিক ভিন্নতা থাকলে সমাজে বহু বর্ণটিকে যাবে ফলে সমাজ ব্যবস্থা রঙিন হয়ে উঠবে। এর মধ্যে দিয়ে আদিবাসী সমাজে নিজস্ব পরিচিতি, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা এবং ভাষা ইত্যাদিকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরুও Integration Approach এর স্বপক্ষে ছিলেন।

১.৩ আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিক অধিকার এবং বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Constitutional Rights and Five Year Plans for Indigenous People):

১.৩.১ সাংবিধানিক অধিকার (Constitutional Rights):

স্বাধীন ভারতে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিবাসী গোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এরা এখনো দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস

করেন। তাই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নের জন্য ভারতের সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে ১৫ নং, ১৬(৪), ৩২০(৪), ৩৩৫, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ১৯ (৫), ৩৩৮, ৩৩৯ (২), ২৭৫ (১), ১৬৪, ৪৬, ২২৪, ৩৪২ প্রভৃতি ধারায় আইনানুগ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১.৩.২ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five Year Plans):

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন একটি অ-সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রণয়নে দায়বদ্ধ ছিল।

এই কমিশনটি ১৯৪৬ সালে কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে গঠিত, এটি একটি ভারত সরকারের কার্যনির্বাহী স্থিরসঙ্কল্পের দ্বারা (কেন্দ্রিয় মন্ত্রিসভা) এবং ১৯৪৬ সালে সংবিধান অনুযায়ী উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড (Advisory Planning Board) এর সুপারিশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়।

স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি এবং সার্বিক বিকাশের জন্য ১৯৪৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি পরিকল্পনার ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ১৯৫১-২০১৪ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন এবং ২০১৫-২০১৭ সাল পর্যন্ত নীতি আয়োগ দ্বারা এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিকাশ, কার্যকর এবং নিরীক্ষণ হয়েছে।

১) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ইতিহাস (History of Five Year Plans):

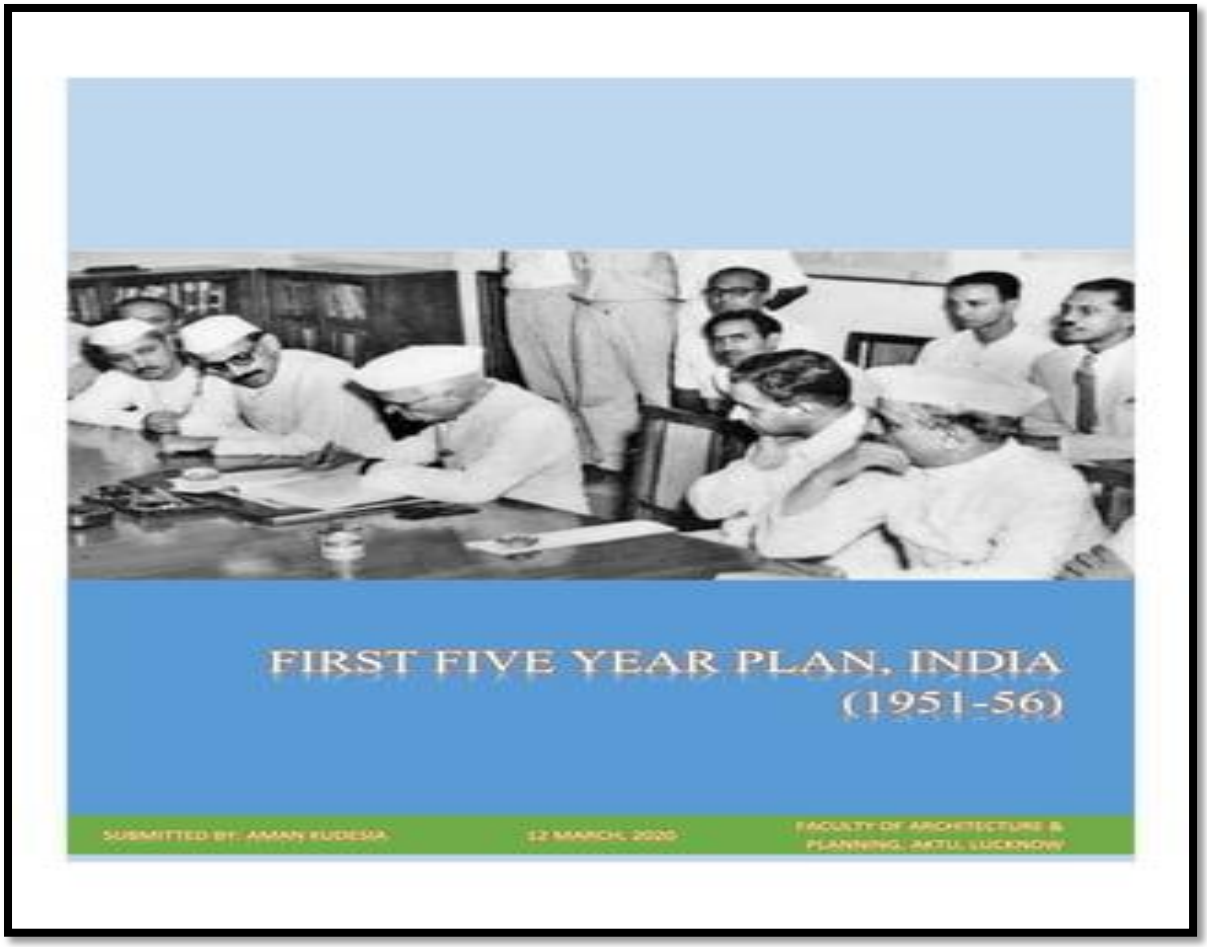

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (FYP) হ'ল কেন্দ্রীভূত এবং সমন্বিত জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচি। জোসেফ স্টালিন ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করেন। বেশিরভাগ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এবং বেশ কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশ পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চীন এফওয়াইপি ব্যবহার করে চলেছে, যদিও চীন ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তার একাদশ এফওয়াইপির নাম পরিবর্তন করেছে, একটি পরিকল্পনা (জিহুয়া) এর পরিবর্তে একটি গাইডলাইন (গুইহুয়া), উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আরও হাতের মুঠোয় ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

জওহরলাল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক প্রভাবে স্বাধীনতার পরপরই ১৯৫১ সালে ভারত তার প্রথম এফওয়াইপি (FYP) চালু করে।

১.১) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five Years Plan, 1951-56):

স্বাধীন ভারতে ১৯৫১ সালে হ্যারড ডোমারের মডেলের উপর ভিত্তি করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি উপস্থাপন করে ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী তথা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সভাপতি জওহরলাল নেহেরু এবং সহ সভাপতি গুরজারিলাল নন্দ। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি চালু করা হয় মুলত প্রাথমিক খাতের উন্নয়নের জন্য, যেটির মূল মন্ত্র ছিল দেশের কৃষি উন্নয়ন এবং শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন। এছাড়া সাশ্রয়ী মুল্যের স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা প্রদান করা। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের অনগ্রসর শ্রেণি অর্থাৎ তপশিলী জাতি এবং তপশিলী আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য স্পষ্ট ভাবে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, সাধারন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যবহার করা উচিৎ।

১.২) দ্বিতীয়পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Second Five Years Plans, 1956-61):

ভারতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি ভারতীয় পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত চন্দ্র মহালানোবিস দ্বারা বিকশিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেল অনুসরণ করে। ১৯৫৩ সালে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পাটি গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সরকারি খাতের উন্নয়ন এবং দ্রুত শিল্পায়নের বিকাশ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বাধিক করার জন্য যে সমস্ত উৎপাদনশীল ক্ষেত্রগুলি রয়েছে সেগুলির মধ্যে বিনিয়োগের সর্বোত্তম অর্থ বরাদ্দ নির্ধারণের চেষ্টা করা। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে মোট অর্থ বরাদ্দের পরিমান ছিল ৪৮

বিলিয়ন রুপি। যেখানে সামাজিক সেবা, বিদ্যুৎ ও সেচ, যোগাযোগ ও পরিবহন এবং বিভিন্ন খাতে এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

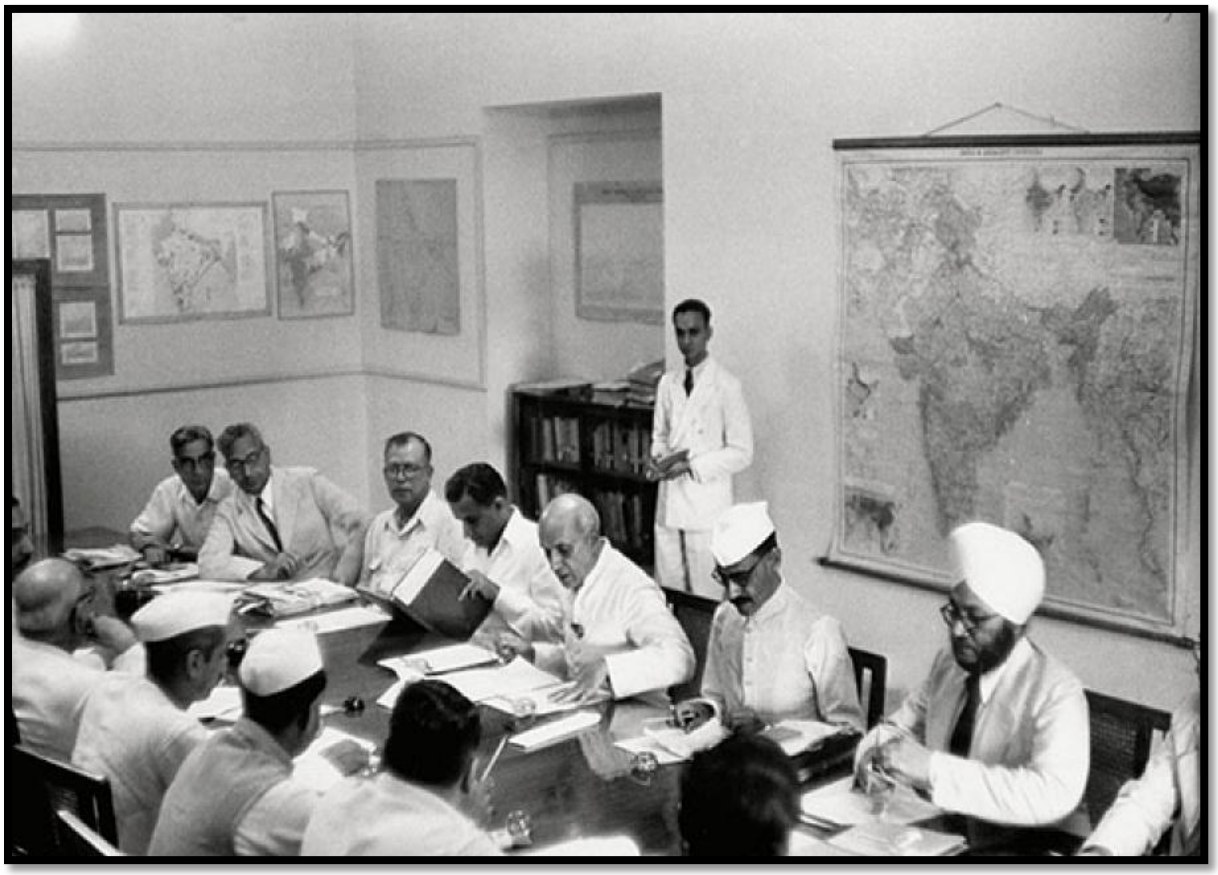

Economic Milestone: Second Five Years Plans, [1956-61]

বিশেষ ভাবে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনগ্রসর শ্রেণী ও তপশিলী আদিবাসীদের জন্য কল্যাণ মুলক কর্মসূচি, ঐতিহ্য সম্মান , এবং তারা যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সাথে মুখোমুখি হয়, তা উপলব্ধি করা ও বৈষম্য হ্রাস করার জন্য অর্থনৈতিক বিকাশকারীর সুবিধাগুলি আরও বেশি করে তারা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা। বিশেষ ভাবে উপজাতি বা আদিবাসী দের বিকাশের জন্য এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ৪৩ টি বিশেষ বহুমুখি উপজাতি ব্লক (SMPTBS) তৈরি করা হয়েছিল, যেটি পরবর্তী সময়ে এই ব্লকগুলিকে আদিবাসী উন্নয়ন ব্লক (TDBs) বলা হয়। এই ব্লকগুলির অধীনে প্রায় ২৫০০০

জনগনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রসরকার আদিবাসীদের বিকাশের জন্য প্রতিটি TDBs ব্লকগুলিকে ১৫ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন।

১.৩) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Third Five Years Plan, 1961-66):

স্বাধীন ভারতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছিল কৃষি ক্ষেত্রে এবং গম উৎপাদনের উন্নতির উপর। ভারতের তৎকালীন সমসাময়িকে ১৯৬২ সালে সংক্ষিপ্ত চীন-ভারত যুদ্ধ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য ভারতে অর্থনৈতিক দুর্বলতাগুলি প্রকাশ পেয়েছিল। তার সাথে সাথে ১৯৬৫ সালে ব্যাপক ভয়াবহ খরা দেখা দেয়। যার ফল স্বরূপ মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল। তবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রাম অঞ্চলে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে। এই সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন শুরু হয়েছিল এবং রাজ্যগুলিকে আরও উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাতে তৃনমূল স্তরে গনতন্ত্রকে আনা এবং বাঁচিয়ে রাখা যায়। বিশেষ ভাবে এই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস, বৃহত্তর সমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমান বণ্টনের নীতির কথা বলা হয়েছিল এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়।

১.৪) ছুটির পরিপল্পনা করণ (Holiday Planning):

ভারতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, ব্যর্থতার কারণ হল ১৯৬২ সালে চিনের সাথে যুদ্ধ এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে পাকিস্থানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ও ১৯৬৬-৬৭ সালে খরার কারণে। তাই ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ বর্ষে সরকার বাধ্য হয় তিনটে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে। এই পরিকল্পনায় কৃষি এবং শিল্পের উপর সমান জোর দেওয়া হয়েছিল।

১.৫) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Fourth Five Years Plan, 1969-74):

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্য ছিল পূর্বের পরিকল্পনার সংশোধন ও সম্পদ এবং অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীয়করণ বৃদ্ধি। এই পরিকল্পনাটি গাডগিল ফর্মুলার উপর ভিত্তি করে স্থিতিশীলতা, স্বনির্ভরতা অগ্রগতির সাথে বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেছিল। এই পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রচারের মাধ্যমে জনগনের জীবন যাত্রার মান দ্রুত বৃদ্ধি ও উপলব্ধি করা। এই পরিকল্পনায় ১৯৭১-৭২ সালে অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশায় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এবং বিভিন্ন সামাজিক মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক ভাবে ছয়টি কেন্দ্রীয় সেক্টর পাইলট প্রকল্প হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি পৃথক উপজাতি বা আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই সংস্থাগুলিকে পরের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদিবাসী উন্নয়নের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল ও একীভূত করা হয়েছিল।

১.৬) পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Fifth Five Year Plan, 1974-78):

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কর্ম সংস্থান, দারিদ্র্য মোচন (দারিদ্র্য হটাও) এবং ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া। এছাড়া এই পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতার দিকেও মনোনিবেশ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালে ভারতে নবনির্বাচিত মোরারজি দেশাই এর সরকার এই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেণ, এবং তার সাথে সাথে ১৯৭৫ সালে বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন সংশোধনের দ্বারা কেন্দ্র সরকারকে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন করার জন্য সম্মতি প্রদান করা হয়েছিল। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা হয়েছিল যে আদিবাসীদের বা উপজাতিদের উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সুবিধার

জন্য বিশেষ মনযোগের প্রয়োজন। তুলনামুলক ভাবে প্রভাবশালী আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির জন্য ক্ষুদ্র পরিকল্পনা এবং উপ-পরিকল্পনা (TSP) প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা চালু করার প্রতিফলন ঘটে ছিল। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে TSP এর একটি দ্বিমুখী কৌশল ছিল আদিবাসী বা উপজাতিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য। উপজাতিদের বা আদিবাসীদের বিকাশের সমস্যা অনুযায়ী দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এক) ৫০ শতাংশেরও বেশি আদিবাসী মানুষের বসবাস ঘনত্বে, এবং দ্বিতীয়) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসী মানুষজনের অঞ্চলগুলি। এছাড়াও আদিবাসী মানুষদের প্রযুক্তি ও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

১.৭) চলতি পরিকল্পনা (Current plan, 1978-80):

চলতি পরিকল্পনায় ভারতের জনতা পার্টি সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং একটি নতুন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের সরকার পুনরায় জনতা পার্টি দ্বারা প্রবর্তিত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। এবং কংগ্রেস সরকার দ্বারা নতুন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করেন। চলতি পরিকল্পনাটিতে প্রস্তাবিত তিন ধরনের পরিকল্পনা ছিল। প্রথম) বর্তমান বার্ষিক বাজেট নিয়ে গঠিত ছিল। দ্বিতীয়) একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বছরের জন্য পরিকল্পনা ছিল, যা ৩, ৪ বা ৫ বছরের হতে পারে। তৃতীয়) এই পরিকল্পনাটি দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ১০, ১৫ বা ২০ বছরের জন্য ছিল।

সুতরাং, চলতি পরিকল্পনাটির সূচনা বা সমাপ্তি বিষয়ে কোন তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। এই পরিকল্পনার সুবিধা ছিল যে, পরিকল্পনার নীতিগুলি নমনীয়তা এবং দেশের

অর্থনৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্য মাত্রা এবং বরাদ্ধ অর্থ সংশোধন করে নির্দিষ্ট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কঠোরতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

১.৮) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Sixth Five Year Plan, 1980-85):

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণের সূচনার সাথে সাথে মূল্য নিয়ন্ত্রন বাতিল করা হয়েছিল এবং রেশন দোকানগুলি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৮২ সালের ১২ জুলাই শিবরামন কমিটির সুপারিশে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৃষি এবং পল্লি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিকল্পনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা রোধে পরিকল্পনা সম্প্রসারন হয়ে ছিল, যেটি চীনের মত কঠোর এবং বাধ্যতামুলক এক সন্তান নীতির বিপরীতে ভারতীয় নীতির দ্বারা ভারতে কম সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি দ্রুত পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। যেখানে জন্ম হার অব্যহিত ছিল। এই পরিকল্পনায় উচ্চতর পরিমানে সরকারি তহবিল হস্তান্তর নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়ে ছিল, যাতে পরবর্তী সময়ে অনগ্রসর শ্রেণি বা আদিবাসী পরিবারকে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা প্রদান করা যায়। সুতরাং এই পরিকল্পনায় পরিবার ভিত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়ে ছিল।

১.৯) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Seventh Five Year Plan, 1985-90):

এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন ভারতে কংগ্রেস পার্টি সরকার এবং প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী। এই পরিকল্পনায় বিশেষ ভাবে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভূত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে শিল্পের উৎপাদন শীলতার স্তর উন্নত করা।

এই পরিকল্পনায় তপশিলি আদিবাসীদের উন্নয়ন তহবিল বৃদ্ধির কারণে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। আদিবাসীদের শিক্ষা গত বিকাশে ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১৯৮৭ সালে রাজ্য উপজাতি উন্নয়ন কর্পোরেশনের শীর্ষ সংস্থা হিসাবে, উপজাতীয় সমবায় বিপনন উন্নয়ন ফেডারেশন নামে দুটি জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে জাতীয় তপশিলি জাতি এবং তপশিলি আদিবাসী অর্থ এবং উন্নয়ন কর্পোরেশন (NSFDC) গঠিত হয়। এই পরিকল্পনায় আদিবাসীদের বন ও কৃষি পণ্যের জন্য লাভজনক মূল্য প্রদান এবং ঋণ সহায়তা প্রদানের কথা বলা হয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে।

১.১০) বার্ষিক পরিকল্পনা (Annual Plan, 1990-92):

এই সময়কালে ভারতে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে কেন্দ্রে দ্রুত পরিবর্তনের কারণে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ১৯৯০ সালে অষ্টম পরিকল্পনাটি কার্যকর হতে পারেনি। তাই এই বার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ সালকে বার্ষিক পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে ১৯৯১ সালে ভারতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংস্কারের ঝুঁকি বেড়েছিল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সংকটের মুখোমুখী হওয়ার জন্য। পরবর্তী সময়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৯৯২ সালে।

১.১১) অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Eighth Five Year Plan, 1992-97):

এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি ১৯৯২ সালে গৃহীত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ভারতে কংগ্রেস পার্টির প্রধান এবং স্বাধীন ভারতে প্রজাতন্ত্রের নবম প্রধান মন্ত্রী ছিলেন পি. ভি. নরসিমা রাও। তিনি ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নিজের

তত্ত্বাবধানে ভারতের অর্থনৈতিক এবং জাতীয় নিরাপত্তাকে একটি বিশেষ স্তরে প্রভাবিত করেছিলেন। এই সময় কালে ডঃ মনমোহন সিং (পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী) ভারতে অর্থনৈতিক বাজার সংস্কার দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ভারতকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন অর্থনৈতিক সক্ষমতায়। এই পরিকল্পনায় বিশেষ ভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর বিকাশের বিষয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যেটি আদিবাসীদের উন্নয়ন এবং সমাজের অন্যান্য অংশের উন্নয়নের মধ্যে যে ব্যবধান বা বৈষম্য রয়েছে সেগুলিকে কমানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা যে কেবলমাত্র শোষণ নির্মূলের উপর জোর দিয়েছিল তা নয়, এই বিষয়টার পাশাপাশি অধিকার, কম মজুরি প্রদান না করা, ভূমি বিছিন্নতা ও ক্ষুদ্র বনজ পণ্য সংগ্রেহের অধিকারের সীমাবদ্ধতা সমস্যাগুলির দিকেও মনোযোগ দিয়েছিল। এছাড়াও এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য আদিবাসীদের মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

১.১২) নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Ninth Five Year Plan, 1997-2002):

ভারতে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। এই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারি বাজপেয়ী, এই পরিকল্পনাটি স্বাধীন ভারতে ৫০ বৎসর পর করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সুপ্ত এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিকাশ যেটি সামাজিক প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এই পরিকল্পনাটি ছিল ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে দরিদ্রতা মোচন করার মাধ্যমে শক্তিশালী সমর্থনের একটি প্রয়াস। এছাড়া এই পরিকল্পনার একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অনগ্রসরশ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবধান কমানোর প্রয়াস নেওয়া। এই পরিকল্পনায় আরও বলা

হয় যে সাক্ষর রাষ্ট্রগুলি আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই এই পরিকল্পনায় অবকাঠামোগত সুবিধার উপর জোর দেওয়া হয় যাতে সমাজের আদিবাসীরা শিক্ষা অর্জন করতে পারে, এইগুলি হল শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, কম্পিউটার, আসবাবপত্রনির্মাণ, ল্যাবরেটরি, বই, বিল্ডিং, ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয়গুলিকে শক্তিশালী করা যাতে সমগ্র শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা হয়।

এই পরিকল্পনায় আরও কিছু বিষয়ে আদিবাসীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। তা ছাড়া লাঙ্গল, ষাঁড়, বিভিন্ন গৃহ পালিত পশু বিতরণ এবং বিনা মুল্যে ঘর নির্মাণ, বাড়ির সাইট এ পাট্টা বিতরণ ইত্যাদি সুবিধা ব্যবস্থা করা ও অগ্রাধিকার দেওয়া। এছাড়া আদিবাসী দের জন্য পানীয় জলের সুবিধা, বিদ্যুতের সুবিধা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমাধান, মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন ইত্যাদি বিষয়গুলি আদিবাসীদের জন্য আয়োজন করা হয়ে ছিল।

১.১৩) দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Tenth Five Year Plan, 2002-2007):

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ২০০৭ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার কমানো এবং শ্রম শক্তিকে বাড়াবার জন্য উচ্চ মানের কর্ম সংস্থান প্রদান করা। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে প্রতি বছর জি.ডি.পি (GDP) ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন। এছাড়া ২০০৭ সালের মধ্যে ভারতে জনগনের সাক্ষরতা ও শ্রম অনুযায়ী ৫০% লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ করা। এই পরিকল্পনায় আরও বলা হয়েছিল যে ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে যে দারিদ্র, ঋণগ্রস্ত অবস্থা, বাস্তুচ্যুতি, ভূমি বিছিন্নতা, চাষাবাদ, আদিবাসীদের অবক্ষয় ইত্যাদির মত বিভিন্ন সমস্যাগুলির জন্য এখনও আদিবাসীরা বিকাশের পথ থেকে দূরে রয়েছে। এদের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় বিশেষ ভাবে আদিবাসীদের

বঞ্চনা ও শোষণ মুক্ত করার দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। যাতে আদিবাসীদের বঞ্চনা ও শোষণ মুক্ত করার মধ্যে দিয়ে সার্বিক বিকাশ সাধন হয় সেই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত নীতি গ্রহণ গ্রহণ করা হয়েছিল। নবম পরিকল্পনায় যে আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন এর কথা বলা হয়েছিল তা এই দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনুসরণ করা হয়।

১.১৪) একাদশ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (Eleventh Five Year Plan, 2007-12):

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি ভারতের প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের থাকা কালীন গৃহিত হয়। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল ২০১১-১২ সালের মধ্যে ভারতের সমস্ত ১৮-২৩ বছর বয়সিদের উচ্চ শিক্ষার অন্তর্ভূত করা যাতে তারা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা অর্জন করতে পারে, সেগুলি হল দূরবর্তী শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, মুক্ত শিক্ষা, আই.টি ইত্যাদি। এছাড়া পরিকল্পনায় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে জীবন যাপন উন্নয়নের এবং ক্ষমতায়ণের সাথে সাথে লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং এই পরিকল্পনায় আদিবাসী জনগনের সামগ্রিক ক্ষমতায়ণে দৃষ্টান্ত মূলক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেটি আদিবাসীদের সার্বিক বিকাশের জন্য কেবল মাত্র সরকারি ডেলিভারি সিস্টেম এর উপর নির্ভর না করে সেখান থেকে সরে আসার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং সামাজিক ভাবেও সেবা দানকরার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১.১৫) দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (12th Five Year Plan, 2012-17):

ভারতে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তৎকালীন সরকার ৯% বৃদ্ধির হার অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভারতের জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (NDC) দ্বাদশ পরিকল্পনার জন্য ৮% বৃদ্ধির হার অনুমোদন করেছিল ২০১২ সালে। এই পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণে ১০% হ্রাস

করার পরিকল্পনা তৎকালীন সরকার গ্রহণ করেন। ভারতে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের বিকাশের জন্য, বিশেষ ভাবে উপজাতি মানুষদের সার্বিক বিকাশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক বিকাশ বা উন্নতি অর্জন করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

এছাড়া দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসীদের শিক্ষার বিকাশের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে, সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া, বিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য মূলক আচরণ দূরীকরণ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, পানীয় জলের সরবরাহ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে আদিবাসীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি অর্জন করানোর কথাও বলা হয়েছে।

১.৩.৩ আদিবাসীদের উপ-পরিকল্পনা (Tribal Sub-Plan):

ভারতে জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনা হল একটি পরিকল্পনার ধারণা যা আদিবাসীদের বিকাশের জন্য এবং আদিবাসীদের সুযোগ সুবিধাগুলি ভারতের কেন্দ্র সরকার দ্বারা রাজ্যগুলিতে চালনা ও আদিবাসী মানুষদের কাছে পোঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল আদিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, আয়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানের জন্য। এছাড়া আদিবাসী ও অন্যান্য জাতির মধ্যে বৈষম্য মূলক আচরণ হ্রাস করা, এবং একে অপরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

এই জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনাটি ভারতের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রবর্তন করা হয়েছিল, এবং এটি বাস্তবায়িত হয় ১৭ টি রাজ্য ও ২ টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে। পরবর্তী সময়ে এই জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনাটিতে (TSP) ভারতের সমগ্র আদিবাসীদের বিকাশের জন্য নবম

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০০২ সালের শেষে ২৩ টি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আর এই জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনাটি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগগুলির দ্বারা পরিচালিত হয় তৃণমূল স্তরে। জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনার কতকগুলি কৌশলগত উপাদান রয়েছে, সেগুলি হল আদিবাসী উন্নয়নকারি সংস্থা (ITDA), আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প (ITDP), পরিবর্তিত অঞ্চল উন্নয়ন পদ্ধতি (MADA), ক্লাস্টার, আদিম জনজাতি গোষ্টি (PTG), এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসী (DTGS). জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনাটিতে প্রায় ১৯৬ টি জনগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্প এবং জনগোষ্ঠী উন্নয়ন সংস্থা, প্রায় ২৫৯ টি পরিবর্তিত অঞ্চল উন্নয়ন পদ্ধতি, ৮২ টি ক্লাস্টার এবং প্রায় ২৩ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাস্তবায়ন চলছে প্রায় ৭৫ টির বেশি আদিবাসী গোষ্ঠীর মাধ্যমে। এই জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনাটিতে যে সমস্ত রাজ্যগুলি সংখ্যা গরিষ্ঠ সেই রাজ্যে এই পরিকল্পনা প্রযোজ্য নয়। সেই রাজ্যগুলি হল অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং আন্দামান নিকোবর ও লাক্ষা দ্বীপের আদিবাসী গোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠী উপ- পরিকল্পনায় আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কতগুলি বিষয়ের উপর বা বিষয় সম্পর্কিত প্রকল্পের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল - স্কুল, আবাসিক বিদ্যালয়, হোস্টেল, বৃত্তিমূলক বিশেষ কোচিং ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাগত উন্নয়ন প্রকল্প। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ সুবিধা, পশুপালন, হাঁসমুরগি, গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সফল করা, বিদ্যুৎ ও সেচের প্রসারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ, আদিবাসী কৃষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও সম্প্রদায় কেন্দ্র, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পল্লী বিদ্যুতায়ন, পানীয় জল এবং অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির মাধ্যমে আদিবাসী অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য মৌলিক অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা।

জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনাটির অধীনে যে সমস্থ কর্মসূচি গৃহিত হয়েছিল এবং এই কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত সম্পদ এবং ভারত সরকারকে রাজ্য জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনার সংযোজক হিসাবে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সহায়তা (SCA) প্রসারিত করে, ও রাজ্য সরকারগুলির প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে ১৯৭৭-৭৮ সালে এস.সি.এ/Special Central Assistance টি.এস.পি/Tribal Sub Plan (SCA TO TSP) নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনাতে এস.সি.এ (SCA) প্রসারিত করার মধ্যে দিয়ে চাহিদা ভিত্তিক আয় উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা।

এই জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনাটির কার্যক্রম চালিত করতে অর্থের যোগান দেওয়া হত কতকগুলি উৎস থেকে, -রাজ্য ও কেন্দ্রিয় মন্ত্রকের বিভাগের থেকে জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনায় তহবিল (State and Central Ministry Department), বিশেষ ভাবে কেন্দ্রসরকার দ্বারা জনজাতীয় উপ-পরিকল্পনায় তহবিল সহায়তা (Special Central Assistance), এবং সংবিধানের ২৭৫(১) অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রের জন্য, কেন্দ্রিয় খাতে প্রকল্পগুলির মাধ্যমে তহবিল (Central Sector Schemes), কেন্দ্রিয় পৃষ্ঠপোষক প্রকল্প (Central Sponsored Schemes) এবং Ministry of Tribal Affairs ইত্যাদি থেকে তহবিল সংগ্রহ করা হত।

১.৩.৪ আদিবাসীদের বিকাশে বিভিন্ন কমিশন, কমিটির সুপারিশ ও শিক্ষা নীতি (The Recommendation of Various Commission, Committee and Education Policy in Tribal Development):

ক) হান্টার কমিশন (Hunter Commission, 1882):

ভারতবর্ষে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৩ ফেব্রুয়ারি ভাইসরয় লর্ড রিপন ভারতে আসাকালীন প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। লর্ড রিপনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়াম হান্টার এই শিক্ষা কমিশনের সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। এই কমিশনে আরো ২০ জন সদস্য নিযুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে কিছু ভারতীয় ও খ্রিস্টান মিশনারীরাও ছিলেন, ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিদ আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি কে টি তেলাং, স্যার সৈয়দ মামুদ, মহারাজ্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষী বৃন্দ। এই শিক্ষা কমিশনটির সভাপতি ছিলেন উইলিয়াম হান্টার। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশনের নাম হান্টার কমিশন হয়। দীর্ঘ কয়েক মাস এই কমিশনটি কঠোর পরিশ্রম করার পরও সারা দেশব্যাপী সফর করে শিক্ষার অবস্থা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে ২২২টি প্রস্তাব সহ ৬০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ রিপোর্ট পেশ করেন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। এই কমিশনের মূল সুপারিশগুলির মধ্যে নিম্নে আদিবাসী সম্পর্কিত বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হলো। এই কমিশনটি ভারতের দেশীয় শিক্ষার (Indigenous Education) উপর আলোকপাত করেছেন। এই কমিশনের মতে,

- An Indigenous school "As one established or conducted by natives of India on native methods" অর্থাৎ ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে তারা দেশজ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করে ছিলেন। এই কমিশন ভারতের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার শিক্ষা পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে সুপারিশ করেছেন বিশেষভাবে ভারতের

সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া দলিত ও আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কমিশন দ্বারা এই শ্রেণীর মানুষদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ করেছেন এবং সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ও অনগ্রসর জেলাগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ পেয়েছে।

খ) রাধাকৃষনান কমিশন (Radhakrisnan Commission, 1948):

প্রাক স্বাধীনতা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা সাধারণ ভারতীয়দের সঠিক শিক্ষা প্রসারের জন্য সদিচ্ছা ছিলই না। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মুষ্টিমেয় একদল কিছু উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়কে শিক্ষা দীক্ষায় ইংরেজ ভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা। যেটি "A class of people Indian in blood and colour but English in tastes moral and intellect" অর্থাৎ মেকলে বলেন ইংরেজি শিক্ষার ফলে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে যারা বর্ণে ও রক্তে ভারতীয় থাকবে। কিন্তু রুচি মতামত নীতি বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। আর এদের দ্বারাই শিক্ষা নিচের দিকে নেমে ছড়িয়ে পড়বে। মেকলের এই নীতিকে 'চুইয়ে পড়া নীতি' বা 'ডাউন ওয়ার্ড ফিল্টরেসন থিওরি বলা হয়, - যেটি ভারতের সাধারণ গণশিক্ষার ক্ষেত্রে অসীম ক্ষতিসাধন করেছে।

পরবর্তী স্বাধীন ভারতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত হয়েছে এবং ভারতকে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতন্ত্র রূপে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে তাই স্বাধীন ভারতে প্রথম এস রাধাকৃষনান-এর নেতৃত্বে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের

সভাপতি ছিলেন ডঃ রাধাকৃষনান এছাড়া এই কমিশনে ছিলেন ডঃ লক্ষণ স্বামী মুদালিয়ার, ডঃ জাকির হোসেন, ডঃ তারাচাঁদ, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ এ.কে সিদ্ধান্ত। এছাড়াও এই কমিশনে তিনজন বিদেশি শিক্ষাবিদকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাঁরা হলেন ডঃ জেমস এফ ডাফ, ডঃ আর্থার ইন মেরগণ, এবং ডঃ টি গার্ড। এই শিক্ষা কমিশন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কর্মপদ্ধতি পরিদর্শন ও দেশের শিক্ষা সমস্যার নানা দিক পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করে ৯৮৯ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করেন। এই কমিশনের দ্বারা লিখিত সুপারিশগুলি হল - এই কমিশন উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষার সমান অধিকারের কথা বলেছেন বিশেষভাবে সাধারণ অর্থাৎ তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের সামাজিক ন্যায় বিচার প্রদানের মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষার সমান অধিকার ও সুযোগ লাভ করতে যাতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং আদিবাসী বা জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়েরা তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বয়ং শাসিত ও স্বাধীন হতে হবে।

গ) মুদালিয়ার কমিশন (Mudaliur Commission, 1952-53):

স্বাধীন ভারতে প্রথম শিক্ষা কমিশন হল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন। এই কমিশন ভারতের শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য গঠিত হয়েছিল কিন্তু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির বিধানের জন্য ১৯৫২ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লক্ষণ স্বামী মুদালিয়ার। তাই এই কমিশনের অপর নাম হয় মুদালিয়ার কমিশন। এই কমিশন ভারতের অনুন্নত বা তপশীল জাতি এবং আদিবাসী শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কিছু সুপারিশ করেননি। এই কমিশন প্রচলিত পুরানো ধারার পরিবর্তে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ধারা চালু করার

কথা বলেছেন। তবে এই শিক্ষা কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং লক্ষ্যের অনুকূল হতে পারেনি।

এই কমিশন তৎকালীন ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করেছেন। কমিশনের সুপারিশ আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক চেতনা, অর্থনৈতিক - সামাজিক চেতনা এবং বৃত্তি শিক্ষার প্রবণতা এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এছাড়াও এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার সুপারিশে বলেছেন যে শারীরিক সুস্বাস্থ্যের জন্য শারীর শিক্ষা শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, নারী শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক এর বিকাশ, শিশুদের বা শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রবর্তন, চরিত্র গঠনের শিক্ষা, নির্দেশনা ও পরামর্শদান, বিদ্যালয় পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে এই কমিশন সুপারিশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষাকে শুধুমাত্র পরবর্তী শিক্ষা স্তরে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে না দেখিয়ে এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলেছেন।

ঘ) কোঠারি কমিশন (Kothari Commission, 1964-66):

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার শিক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পুনর্গঠনের জন্য ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ডঃ ভি এস কোঠারি, তাই এই কমিশনের অপর নাম কোঠারি কমিশন হয়। এই কমিশনের সদস্যরা হলেন-জিপি নায়েক, ডঃ কে জি সাই ইদা, ডঃ টি সে, এ গোপাল স্বামী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এছাড়াও কুড়িজন বিদেশি পরামর্শদাতা ছিলেন। এই কমিশন প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের সুপারিশ করেছেন। এর সাথে সাথে বিশেষভাবে বয়স্ক শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। বয়স্ক শিক্ষা বলতে যারা স্কুল ছুট হয়ে গেছে।

১১ থেকে ১৪ বছরের ছেলে মেয়েরা যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি বা শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে স্কুল ত্যাগ করেছে তাদের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এই বয়স্ক শিক্ষা বলতে ভারতের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী অর্থাৎ যারা সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া তপশিলি জাতি ও তপশিলি আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের বিদ্যালয় ছুট শিশু ও শিক্ষার্থীদের পুনরায় বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির জন্য এবং এই সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। এই কমিশন তপশিলি আদিবাসীদের শিক্ষার উন্নতির জন্য কিছু সুপারিশ করেছেন। সেগুলি হল আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিষয়ে সাংবিধানিক যে সমস্ত অধিকারগুলি রয়েছে সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের চাহিদা অনুসারে সুবিধা আরও বাড়াতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে বিশেষভাবে বনাঞ্চলে আদিবাসী শিশুদের জন্য আশ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ রেসিডেনসিয়াল স্কুল স্থাপন করতে হবে। আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা স্কুল ছুট না হয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পণ করতে পারে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আঙ্গিনায় ধরে রাখার জন্য বিভিন্নভাবে বৃত্তিদান, বিনামূল্যে বই সরবরাহ, স্কুল ড্রেস, এছাড়াও অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা যারা জঙ্গলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে স্থান পরিবর্তন করে তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রথাগতশিক্ষা প্রদান করতে হবে বলা হয়েছে।

ঙ) ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন (National Policy of Education, 1986):

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে যে ভারতীয় শিক্ষানীতি গড়ে উঠেছিল তার নানান ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে সব কটি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি সেই সময়ের ভারতবর্ষের সমস্যাকে মূল্যায়ন করে তাই পরবর্তী সময়ে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে একটি সম্মেলনে দেশের এবং বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষার সার্বিক স্তরের বিকাশের জন্য ভারতীয় শিক্ষানীতি গড়ে তোলার আহবান করেন। তাই ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের একুশে এপ্রিল একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করা হয় এবং মে মাসে সংসদের দ্বারা অনুমোদন লাভ করে। ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতি ১৯৮৬ দ্বারা আদিবাসীদের জন্য যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলি হল- আদিবাসীদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা এবং ভাষা রয়েছে তাই এদের শিক্ষার জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিজস্ব ভাষাতেই পাঠ্যক্রম তৈরি ও পাঠদানের পরিকল্পনা করতে হবে। যে সমস্ত বনজঙ্গল অঞ্চল ও অধ্যুষিত অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষদের বসবাস সেই সমস্ত অঞ্চলে আদিবাসী মানুষদের জন্য ও শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক আশ্রম বিদ্যালয় তৈরি করতে হবে, এবং প্রশিক্ষণ শেষে আদিবাসী যুবক-যুবতীরা যাতে এই সমস্ত আদিবাসী গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে শিক্ষা প্রদান করতে পারে তার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আদিবাসীদের নিজস্ব জীবন যাত্রা ও রীতিনীতি রয়েছে, তাই তাদের চাহিদা অনুযায়ী পেশাগত বৃত্তিমূলক/কারিগরি উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক পরিমাণে উন্নতির প্রয়োজন। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ দানের সহায়তা করতে হবে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অঙ্গনওয়াড়ি, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা

প্রদানের সাথে সাথে আদিবাসীদের আর্ট, সংস্কৃতি এবং সৃজনশীলতা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (National Education Policy, 1992):

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে শ্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রী (জনতা পার্টি সরকার) জাতীয় শিক্ষানীতির পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আচার্য রাম মূর্তি। সভাপতির নাম অনুসারে এই কমিটির নাম হয় আচার্য রামমূর্তি কমিটি। কমিটি ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে ডিসেম্বর মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এর কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি সম্পূর্ণ রিপোর্ট সংসদে পেশ করা হয়। সংশোধিত জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৯২) সুপারিশগুলির মধ্যে অনগ্রসর সম্প্রদায় অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান করতে হবে, গ্রাম অঞ্চলে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। এবং সাথে সাথে ভারতবর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে জাতিগত বৈষম্য রয়েছে তার দূরীকরণ করতে হবে এবং আদিবাসী মহিলাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র বৃত্তি প্রদান করতে হবে এবং দরিদ্র মেধাবী আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP-2020):

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গঠিত হয়েছে ২০২০ সালে ভারতের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে, মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, বৈষম্যহীন সমাজের অগ্রগতির জন্য, উচ্চ গুণমান সম্পন্ন

শিক্ষা প্রদানের জন্য, শিক্ষাদান ও শিক্ষা পদ্ধতির গুণগত দিক বৃদ্ধি এবং সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে। এই জাতীয় শিক্ষানীতি পূর্ববর্তী শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তন করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নতুন শিক্ষা কাঠামোর নীতি গ্রহণ করেছেন।

ভারতের পূর্বতন জাতীয় শিক্ষা নীতিগুলি বিশেষভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও শিক্ষাগতভাবে প্রাচীনকাল থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া SEDG (Socially and Economically Disadvantaged Groups) এবং তপশিলি আদিবাসীদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে যে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা যারা অতীত থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে বা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং বৈষম্য মূলক আচরণ সহ্য করছে আধুনিক সমাজের দ্বারা তাদের শিক্ষার জন্য এবং স্কুল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় এদের সমান সুযোগ সুবিধা দানের কথা বলা হয়েছে।

ইউ ডি আই এস ই (UDISE) ২০১৬-২০১৭ এর তথ্য অনুসারে প্রাথমিক স্তরে ১৯.৬% শিক্ষার্থী তপশিলি জাতির অন্তর্গত তবে এই সংখ্যাটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৭.৩%। তপশিলি আদিবাসীদের সম্প্রদায় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তরে ১০.৬১% এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হার ৬.৮% অর্থাৎ আদিবাসীদের স্কুল ছুট সংখ্যা সব থেকে বেশি। তাছাড়া বিশেষভাবে উচ্চশিক্ষার স্তরে তপশিলি আদিবাসীদের ভর্তির সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। এদের মধ্যে আদিবাসী মহিলাদের ভর্তির হার অনেক কম।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০২০) আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলি হল –

১) বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন।

২) আদিবাসীরা প্রথাগত শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষাকে আজও বিদেশি হিসেবে মনে করে, এবং তাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে তাই এদের উন্নয়নের জন্য একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

৩) সরকারী তরফ থেকে সাংবিধানিক যে সুবিধা বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা আদিবাসীদের কাছে যাতে পৌঁছায় তার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) স্কুল শিক্ষায় যে সামাজিক বৈষম্য রয়েছে তার দূরীকরণ করতে হবে এবং সামাজিকভাবে শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শিশুদের সমান শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৫) আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ আদিবাসী শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশেষভাবে মহিলাদের ছাত্রী আবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ছাত্রী আবাসে থাকাকালীন মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬) অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে বা অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষাগতমান উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত নবোদয় বিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

৭) এস.ই.ডি.জি (SEDG-Socially and Economically Disadvantaged Groups) এর অন্তর্গত বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে ও শিক্ষা বিকাশে বৈষম্য হ্রাস

করতে হবে। যথার্থ মনোযোগ সহকারে এবং SEDG দের মধ্যে থেকে প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে বিশেষ ছাত্রাবাসে ব্রিজ কোর্স এর টাকা মুকুব ও বৃত্তিদানের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করতে হবে মাধ্যমিক স্তরে, যাতে তারা পরবর্তী স্তরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১.৪ পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক রেখাচিত্র (Overall Background of Purulia District):

আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এরাই হলো প্রকৃতি মায়ের প্রকৃত পুত্র/কন্যা সন্তান যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসে যাদের অন্তরে সর্বদাই প্রকৃতি বিরাজ করেন। সমস্ত ধরনের আদিবাসীরাই প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সাথে আবদ্ধ। আদিবাসী ছাড়া সম্ভবত অন্য কোন মানবগোষ্ঠী প্রকৃতির সঙ্গে ওতোপ্রোত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে না। এর অন্যতম কারণ হলো আদিবাসীরা তাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সব ক্ষেত্রে আদিবাসীরা প্রকৃতি নির্ভর। বৈদিক যুগের আগে থেকেই ভারতবর্ষে আদিবাসীরা জঙ্গল, পর্বত-শিরা, নদী, ঝর্ণা ইত্যাদির নিকটে বসবাস করতে অভ্যস্ত। আজকের দিনে যদিও আদিবাসীরা বহুলাংশেই প্রকৃতি নির্ভর নয় কিন্তু তারা তাদের জীবনে প্রকৃতি মায়ের গুরুত্বকে অস্বীকার করে না। আজকের দিনে অনেক আদিবাসী মানুষ কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন ফলে প্রকৃতির থেকে তারা অনেকাংশেই বিচ্ছিন্ন থাকতে বাধ্য হন। বর্তমান গবেষণায় গবেষক পুরুলিয়া জেলায় লুপ্তপ্রায় বিরহড় আদিবাসী সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করেছেন। বিশেষত প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিরহড়রা কি ভাবে তাদের চিরাচরিত জ্ঞান ভান্ডারকে ব্যবহার করেছেন এবং বর্তমানেও করছেন। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী কেবলমাত্র পুরুলিয়া জেলার তিনটি মাত্র ব্লকে (ঝালদা-১,

বাঘমুন্ডি এবং বলরামপুর) জঙ্গল লাগোয়া অঞ্চলে বসবাস করেন তাই গবেষক পুরুলিয়া জেলা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

১.৪.১ পুরুলিয়া জেলা হিসেবে সৃষ্টি হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background of Purulia District's Formation):

১.৭ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে পুরুলিয়া জেলার মানচিত্রের নকশা:

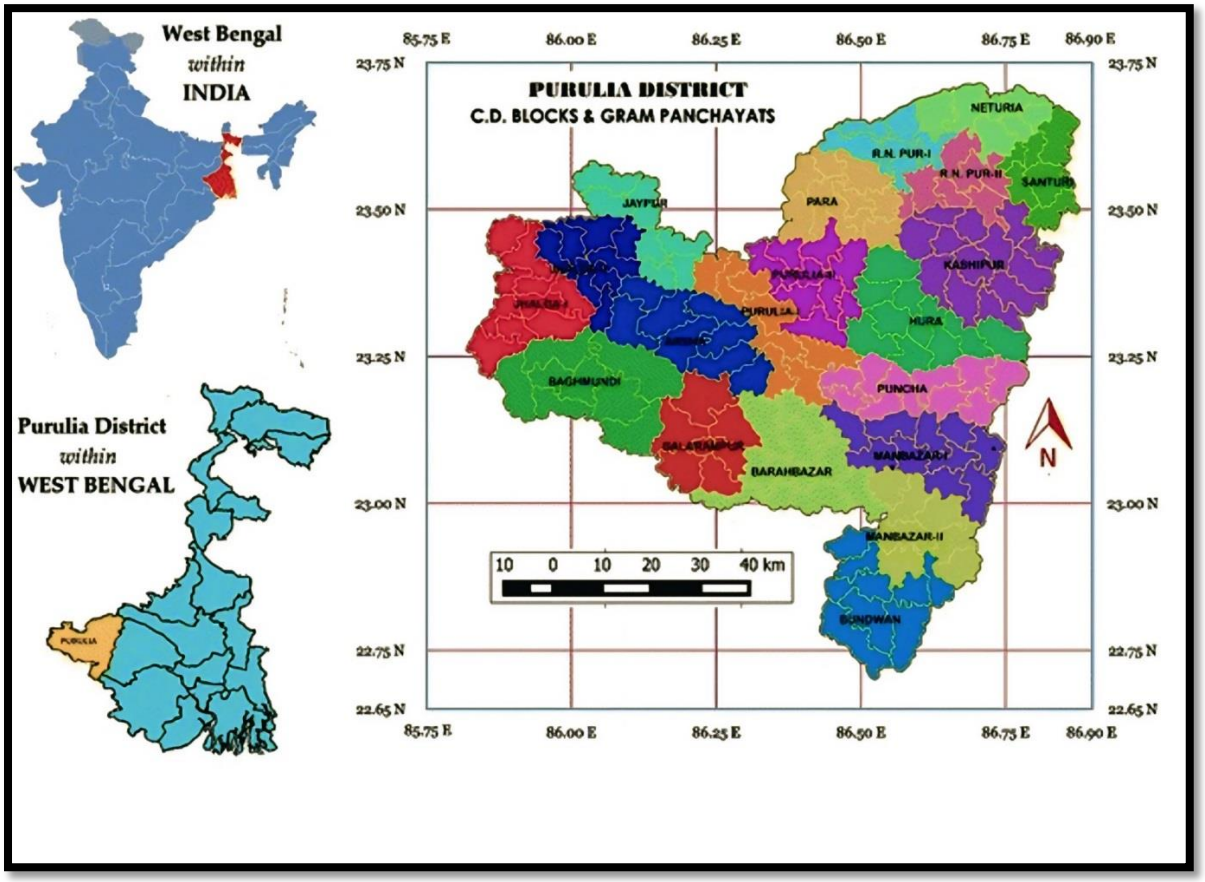

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে পুরুলিয়া জেলার মানচিত্র

ভারতের পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত ২৩ টি জেলার মধ্যে পুরুলিয়া একটি অন্যতম জেলা। পুরুলিয়া শহর পুরুলিয়া জেলার প্রধান প্রাণকেন্দ্র এবং এখানেই রয়েছে জেলার

‘ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের’ অফিস। পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি হল ঝালদা, রঘুনাথপুর, আদ্রা, বলরামপুর প্রভৃতি।

জৈন ভগবতি সুত্র অনুসারে ১৬ টি মহাজনপদের মধ্যে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা প্রাচীন বঙ্গের অধীনে ছিল (History, Tradition, Culture, Heritage, Tourism & Festival of Purulia, 2012)। মধ্যযুগে বর্তমান পুরুলিয়া অঞ্চলটি ঝাড়খন্ড অঞ্চলের মধ্যে ছিল। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানি বাংলা, বিহার, ও ওড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলে বর্তমান পুরুলিয়া অঞ্চলটি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন থেকে মানভূম জেলার নামে ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে এই অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

১৮০৫ সালে রেগুলেশন XVIX অনুসারে জঙ্গলমহল জেলার মধ্যে ২৩ টি পরগনা এবং মহলকে একত্রিত করে যে জেলা তৈরি হয় তার মধ্যে পুরুলিয়া অঞ্চলটি ছিল। ১৮৩৩ সালে রেগুলেশন XIII অনুসারে জঙ্গলমহল জেলাকে ভেঙে দিয়ে মানভূম জেলা তৈরি করা হয় যার প্রধান কেন্দ্র ছিল মানবাজার। মানভূম জেলাটি আয়তনে প্রকাণ্ড ছিল এবং এর মধ্যে ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার কিছু অংশ এবং বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদ, ধলভুম, সরাইখোলা ইত্যাদি অঞ্চল। ১৮৩৮ সালে মানভূম জেলা পরিচালনা অফিসটি মানবাজার শহর থেকে বর্তমান পুরুলিয়া শহরে নিয়ে আসা হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৬ সালে মানভূম জেলাকে ভাগ করে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় রাজ্য স্থাপন করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১ লা নভেম্বর থেকে পুরুলিয়া জেলার জন্ম হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মানভূম জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে তার কিছু অংশ বিহারে এবং কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন করার কারণ ভাষাগত টেনশন থেকে জনপদকে সুরক্ষিত করা। মানভূম জেলার যে অংশে অধিবাসীরা অধিক সংখ্যক

হিন্দী ভাষাভাষি সেই অংশটিকে বিহার রাজ্যে নেওয়া হয়। এবং যে অংশে মানুষজন বাংলা ভাষাভাষী সেই অংশটিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে নেওয়া হয় এবং এর নামকরণ করা হয় পুরুলিয়া। প্রস্তাবিত পুরুলিয়া জেলাতে ১৯ টি পুলিশ স্টেশন ছিল। স্বাধীন ভারতে পুরুলিয়া জেলা গঠনকে কেন্দ্র করে "Bengal, Bihar, Border, Demarcation" বিল লোকসভায় ১৯৫৬ সালে ১৭ই আগস্ট পাস হয়। এবং রাজ্যসভায় ২৮ শে আগস্ট পাশ হয়। ঐ একই বছরে ১ লা সেপ্টেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি "Bengal, Bihar, Border Demarcation" Bill এ সই করেন। ১ লা নভেম্বর ১৯৫৬ থেকে সরকারিভাবে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই সময়ে পুরুলিয়া জেলাতে ১৬ টি পুলিশ স্টেশন ছিল। পুরুলিয়া জেলার আয়তন ২০০৭ বর্গ মাইল (৫২০০km) এবং জেলার জনসংখ্যা ছিল ১,১৬,৯,০৯৭।

বর্তমানে এই জেলায় ২৬ টি থানা, ২০ টি উন্নয়ন ব্লক, ৩ টি পৌরসভা এবং ২৬৬৭ টি গ্রাম রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শহরের সংখ্যা ২৫ টি এবং সংবিধিবদ্ধ শহর ৩ টি। এই জেলায় সদর হিসাবে পুরুলিয়া, ঝালদা, রঘুনাথপুর এবং মানবাজার নামে চারটি মহকুমা রয়েছে। এর মধ্যে পুরুলিয়া মহাকুমাটি - পুরুলিয়া পৌরসভা, পুরুলিয়া-১, পুরুলিয়া-২, হুড়া, পুঞ্চা ও বলরামপুর নামে পাঁচটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক নিয়ে গঠিত। ঝালদা মহকুমাটি ঝালদা পৌরসভা এবং চারটি উন্নয়ন ব্লক নিয়ে গঠিত এগুলি হল- ঝালদা-১, ঝালদা-২, জয়পুর, বাগমুন্ডি। পুরুলিয়া জেলার তৃতীয় মহকুমা হল রঘুনাথপুর, এই মহকুমায় রঘুনাথপুর পৌরসভা এবং ছয়টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক রয়েছে। এগুলি হল রঘুনাথপুর-১, রঘুনাথপুর-২, নেটুরিয়া, সান্তরি এবং কাশিপুর। এছাড়া এই জেলায় রয়েছে, মানবাজার মহকুমা, যেটি পাঁচটি সমষ্টি

উন্নয়ন ব্লক নিয়ে গঠিত এগুলি হল মানবাজার-১, মানবাজার-২, বড়াবাজার, বান্দোয়ান ও পুঞ্চা ব্লক।

ভারতে ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলার মোট জনসংখ্যা হল ২৫৩৬৫১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষদের মোট জনসংখ্যা হল ১২৯৮০৭৮ (৫১.১৮%), এবং মহিলাদের মোট জনসংখ্যা হল ১২৩৮৪৩৮ জন (৪৮.৮২%)। এছাড়া ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পুরুলিয়া জেলার মোট জনসংখ্যা হল ২৯৩০১১৫ জন, যার মধ্যে ৮৭.২৬% গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করে এবং ১২.৭৮% শহর অঞ্চলে বসবাস করে। এই জেলায় পুরুষের জনসংখ্যার শতাংশ হল ৫১.০৯% এবং মহিলাদের জনসংখ্যার শতাংশ হল ৪৮.৯১%। অপরদিকে এই জেলায় তপশিলি জাতির শতাংশ ১৯.৩৮% এবং তপশিলি আদিবাসীদের জনসংখ্যার শতাংশ ১৮.৪৫%।

২০২১ সালে বিজেপি দলের লোকসভার সদস্য সৌমিত্র খান জঙ্গলমহল নামে একটি পৃথক রাজ্য গঠনের কথা বলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল জঙ্গলমহল তৈরি হবে বর্তমান পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলার কিছু অংশ নিয়ে। বর্তমান ঝাড়খন্ডের কিছু অংশকেও তিনি জঙ্গলমহল রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি করণের উপর জোর দিয়েছিলেন। এছাড়া ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলাকেও অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছিলেন। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় রয়েছে শাল, সেগুন, মহুয়া, কেঁদ, সোনাঝুরি, আকাশমনি, হরিতকি, বহেড়া, আমলকি প্রভৃতি গাছের গভীর জঙ্গল। এছাড়াও এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মাটির রং লাল, মাটি প্রকৃতিগতভাবে কাঁকুরে। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ জন বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে বাস করেন। প্রধানত আদিবাসী এবং দলিত শ্রেণীর মানুষ যেমন- সাঁওতাল, ভুমিজ, মুণ্ডা, মুড়া,

বিরহড়, ওঁরাও, মাহালি, বাউরী, কুমহা, জলহা, তেলি, গোয়ালা, যাদব, রাজয়া, কামার, ভূঁইয়া, রাজপুত, হাজাম, নাই, ডোমহারী, ঘাটোয়া, মুচি, কোড়া, কায়স্থ, ধোপা, কাহার, তাঁতি, মালী, বানিয়া, কইরি, চামার, এবং কৈবর্ত এই অঞ্চলে বাস করেন। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রয়েছে যেমন বনজ সম্পদ এবং প্রাণীজ সম্পদ, তেমনি রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আকরিক খনিজ সম্পদের সমাহার। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই এলাকায় উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দান করেননি। শুখা মাটি, রুক্ষ আবহাওয়া, জলের অপ্রতুল ব্যবস্থা, সীমিত চাষযোগ্য জমি এবং চাষের জন্য জল সরবরাহের পর্যাপ্ত অভাব সত্ত্বেও রাজ্য সরকার পুরুলিয়ার উন্নয়নে কোনরূপ চেষ্টা করেননি। অথচ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে নিয়মিত সংগ্রহ করেছেন বনজ সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, পাথর, বালি, লাল কাঁকুরে মাটি। যদিও সৌমিত্র খানের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

সৌমিত্র খানের বহু পূর্বে ১৯৪০ সালে সংবিধান সভার সদস্য জয়পাল সিং মুন্ডা (০৩.১১.১৯০৩- ২০.০৩.১৯৭০) সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করেন এবং আদিবাসীদের জন্য ঝাড়খন্ড নামক একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জানান। সুভাষচন্দ্র বোস তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনে কালে পৃথক রাজ্য গঠনের আন্দোলন করলে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল ও বিপন্ন হবে তাই তিনি সাময়িকভাবে জয়পাল সিং মুন্ডাকে এই আন্দোলন প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বলেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জয়পাল সিং মুন্ডার নেতৃত্বে আদিবাসী মহাসভা, ঝাড়খন্ড পার্টি তৈরি করেন যার মধ্যে আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী মানুষ ছিলেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে ঝাড়খন্ড পার্টি অংশগ্রহণ করে এবং বিহার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে (Bihar Legislative Assamble) ৩২ টি আসন লাভ করে। এই বছর থেকে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সমর্থনে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়।

সুতরাং সৌমিত্র খানের ভাবনার পশ্চাতে রয়েছে আদিবাসীদের বহুদিনের সযত্নে লালিত এক আকাঙ্ক্ষা তাদের নিজেদের জন্য একটি পৃথক রাজ্য।

Joipal Sing Munda (03.11.1903-20.03.1970)

১১.১২.১৯৪৬ তারিখে ভারতের লোকসভাতে দাঁড়িয়ে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের উপস্থিতিতে বিশিষ্ট বক্তা মারাং গমকে 'জয়পাল সিং মুন্ডা' যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার কেন্দ্রীয় ভাবটি এখানে তুলে ধরা হলো—

“As an Adivasi, I am not expected to understand the legal intricacies of the resolution. But my common sense tells me that every one of us should march in that road to freedom and fight together. Sir if there is any group of Indian people that has been shabbily treated it is my people. They have been disgracefully treated, neglected for the last 6000 years. The history of the Indus Valley Civilization, a child of which I am, shows quiteclearly that it is the newcomers- most of you here are intruders as far as I am concerned- it is the new comers who have driven away my people from the Indus Valley to the Jungle fastness… the whole history of my people is one of continuous exploitation and dispossession by the Non-Aboriginals of India punctuated by rebellions and disorder, and yet I take Pandit Jawahar Lal Nehru at his word. I take you all at your word that now we are going to start a new chapter, a new chapter of Independent India where there is equality of opportunity, where no one would be neglected.”

জয়পাল সিং মুন্ডা প্রথম আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেছিলেন এবং বিশিষ্ট সংবিধান প্রণেতা ড. বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর - এর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। নাগাদের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়েও জয়পাল সিং মুন্ডা তাদের পাশে ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নাগা নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছেন।

সৌমিত্র খানের প্রস্তাব গৃহীত না হলেও জনমানসে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি বনাঞ্চল ভিত্তিক এলাকার সরকারী উন্নয়ন এখনো সেই অর্থে নজরে পড়েনি। তাই জঙ্গলমহলে কিছু মানুষ উন্নয়নের কথা বলে সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ

মানুষকে উত্তেজিত এবং প্ররোচিত করেন। এর ফলে এই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে বহু মানুষের যেমন মৃত্যু হয়েছে তেমনি সম্পদ ধ্বংস হয়েছে এবং উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলায় যেহেতু বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন রয়েছেন তাই এখানে রয়েছে চিত্রশিল্প, সংস্কৃতি, এবং ধর্ম বিশ্বাসের বিভিন্নতা। পুরুলিয়া জেলায় অ-আদিবাসী মানুষদের সংস্কৃতি এবং উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী উপাদান। সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের দিক থেকে পুরুলিয়া জেলা যথেষ্ট উর্বর। এখানে ঝাড়খণ্ড, ওড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে, সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন সংস্কৃতি। আর এই নতুন সংস্কৃতি প্রভাবিত করেছে পুরুলিয়া বাসীর জীবন এবং উৎসব অনুষ্ঠানকে। পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন এবং গ্রামীণ এলাকার অধিবাসী, তাই পুরুলিয়ায় আদিবাসীরা যথেষ্ট শান্তিপ্রিয় এবং অন্যরা সভ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এখানে সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ছৌনাচ —

ছৌ নাচ/ নৃত্য তিন প্রকারের হয় –

১) পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য (পশ্চিমবঙ্গ)

২) সরাইকেল্লার ছৌ নৃত্য (বিহার)

৩) ময়ূরভঞ্জ -এর ছৌ নৃত্য (ওড়িষ্যা)

পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য (Purulia Chou Dance)

সরাইকেল্লার ছৌ নৃত্য (Bihar Chou Dance)

ময়ূরভঞ্জের ছৌ নৃত্য (Mayurbhanj Chou Dance)

স্থানীয় ভাষায় 'ছৌ' শব্দের অর্থ 'সেনা শিবির' (আর্মি ক্যাম্প)। পুরুলিয়ায় ছৌ-নাচে পুরুষালী ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই নৃত্যের সাথে বাজতে থাকে ড্রাম, বাঁশি এবং ধামসা, মাদল। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে দর্শক এবং নর্ত্তক উভয়ের মধ্যে জেগে ওঠে শক্তির আগুন। মুখে রঙিন মুখোশ পরে, রঙিন রাজকীয় বস্ত্রে নিজেকে আচ্ছাদিত করে ছৌ শিল্পীরা নৃত্য করে। পুরুলিয়ার সমস্ত ছৌ শিল্পী পুরুষ এবং এই নৃত্যের জন্য যথেষ্ট শারীরিক সামর্থ্য এবং শক্তির প্রয়োজন। এই নৃত্য মূলত হিন্দুদের পৌরাণিক দেবদেবী এবং অসুরদের কাহিনী নিয়ে নির্মিত হয়। যেখানে ছৌ শিল্পীরা প্রত্যেকে নিজেকে সর্বশক্তির আধার বলে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

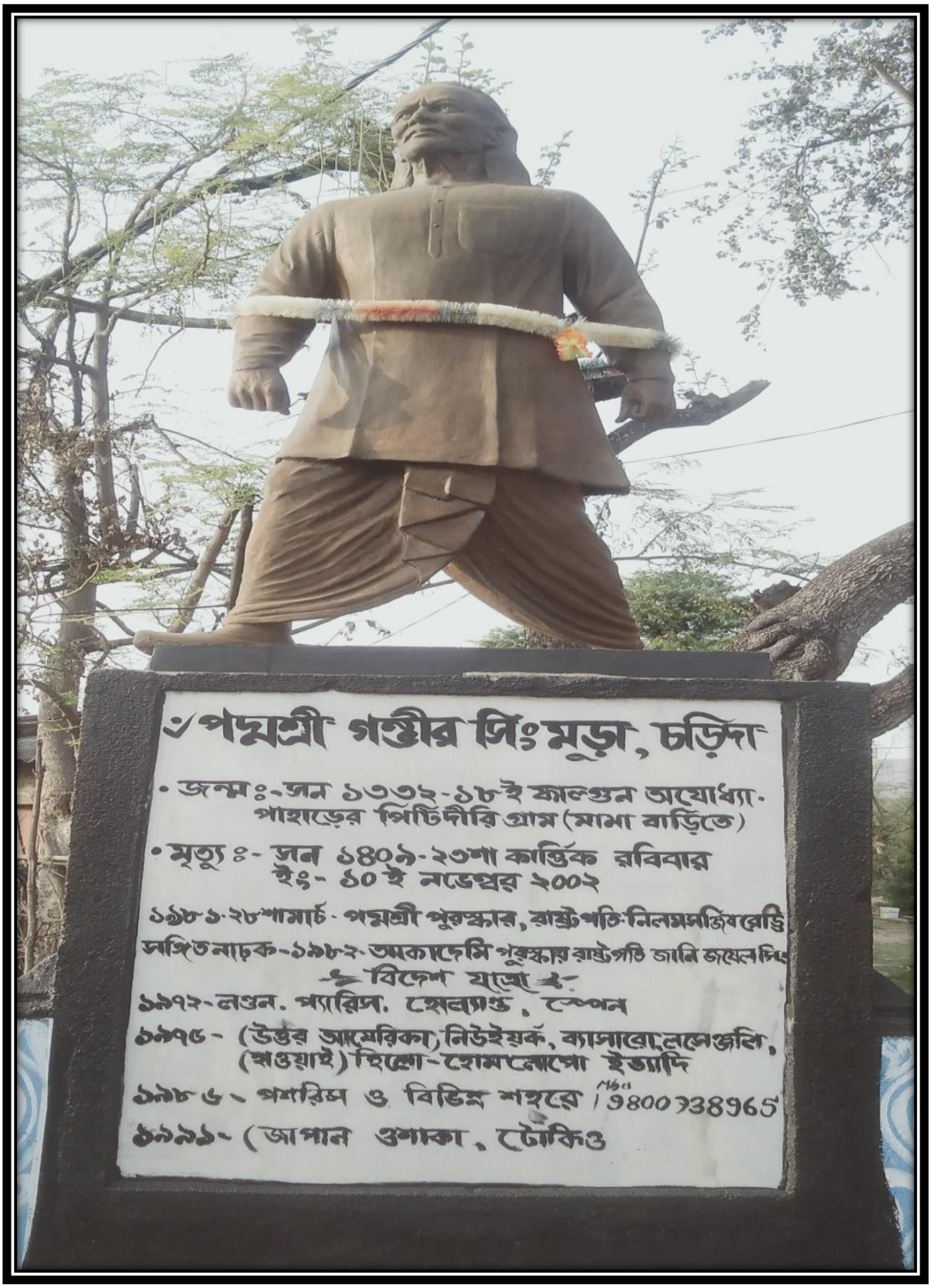

গম্ভীর সিং মুড়া (Gombhir Sing Mura,14.03.2024)

পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট ছৌ-নৃত্য শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া যিনি ঐতিহ্যপূর্ণ ছৌ-নৃত্য কলাকে দেশ তথা সারা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে পিতিকিরি বামনি গ্রামে একটি আদিবাসী 'মুড়া' পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন গম্ভীর সিং মুড়া। তাঁর পিতা জিপা মুড়া। গম্ভীর সিং মুড়া এই ছৌ-নৃত্য সমগ্র দেশে পোঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহি ছৌ-নৃত্য মূলত বাংলার নববর্ষ সময় নতুন ফসল যখন ওঠে তখন এই নৃত্য পরিবেশিত হত নববর্ষ উৎযাপনের জন্য। এই নৃত্য মুখোশ ও রঙ্গীন শিরস্ত্রান পড়ে দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করা হয়। গম্ভীর সিং মুড়া এই ঐতিহ্য নৃত্যকে বিশ্বদরবারে প্রদর্শন ও ভারতের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য ভারত সরকার ১৯৮১ সালে গম্ভীর সিং মুড়াকে "পদ্মশ্রী" পুরস্কারে ভূষিত করেন। গম্ভীর সিং মুড়া ভারতের সাথে সাথে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ-বিদেশে ভারতীয় ছৌ-নৃত্য কলার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেক প্রশংসা পেয়েছিলেন। গম্ভীর সিং মুড়া ভারতের নৃত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আদিবাসী সমাজের সাথে সাথে সারা ভারতবর্ষে তাঁর অবদান চিরকাল চারুকলার জগতে স্মরনীয় হয়ে থাকবেন।

গম্ভীর সিং মুড়ার পুরানো মাটির বাড়ি, চরিদা (আজও আছে বিবর্ণ অবস্থায়, ১৪.০৩.২০২৪)

১.৪.২ পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট(Geographical Background of Purulia District):

১.৪.২.১ ভৌগোলিক সীমারেখা (Geographical Border):

১.৮ পুরুলিয়া জেলার মানচিত্র:

পুরুলিয়া জেলার মানচিত্র (Map of Purulia District)

পুরুলিয়া জেলা হলো পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এবং জঙ্গলমহল জেলাগুলির মধ্যে একটি। পুরুলিয়া জেলার ২২.৬০ ডিগ্রী এবং ২৩.৫০ ডিগ্রী নর্থ ল্যাটিটিউ এবং ৮৫.৭৫ ডিগ্রি ও ৮৬.৬৫ ডিগ্রি ইস্ট লঙ্গিটিউড এর মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং পুরুলিয়া জেলা উত্তর থেকে পূর্ব ভাগে বিস্তৃত একটি জেলা। এটি মেদিনীপুর ডিভিশনের অন্তর্গত। পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক সীমানা ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার (2417 Sq KM)। পুরুলিয়া জেলার পূর্বদিকে রয়েছে বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, উত্তরে রয়েছে বর্ধমান জেলা এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদ জেলা। পশ্চিমে রয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের বোকারো ও রাঁচি জেলা এবং দক্ষিণ ভাগে রয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পশ্চিম সিংভূম এবং পূর্ব সিংভূম জেলা। সুতরাং পুরুলিয়া জেলার পূর্বদিকে এবং উত্তর দিকে কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সাথে সীমানা ভাগ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম ভাগে শেষ জেলা পুরুলিয়া এবং এর অবস্থান ট্রপিক্যাল। এটি অনেকটাই যেন ফানেল আকৃতির। বঙ্গোপসাগর থেকে মৌসুমী বায়ুকে পুরুলিয়া জেলার উপর দিয়ে বয়ে যেতে হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের মধ্যে প্রবেশদ্বার হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

১.৪.২.২. পুরুলিয়া জেলার আবহাওয়া (Weather of Purulia District):

১.২ পুরুলিয়া জেলার আবহাওয়ার ছক:

Climate data for Purulia (1981–2010, Extremes 1901–2001)													
Month	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YEAR
Record high °C (°F)	33.4 (92.1)	37.3 (99.1)	41.7 (107.1)	46.0 (114.8)	46.3 (115.3)	46.2 (115.2)	40.7 (105.3)	37.8 (100.0)	39.0 (102.2)	39.4 (102.9)	35.1 (95.2)	33.3 (91.9)	46.3 (115.3)
Mean daily maximum °C (°F)	**24.6 (76.3)**	**76.9 (82.2)**	33.1 (91.6)	37.5 (99.5)	38.0 (100.4)	35.1 (95.2)	32.1 (89.8)	31.6 (88.9)	31.7 (89.1)	31.3 (88.3)	28.7 (83.7)	25.3 (77.5)	31.4 (88.5)
Mean daily minimum °C (°F)	11.2 (52.2)	14.1 (57.4)	18.7 (65.7)	23.1 (73.6)	24.8 (76.6)	25.0 (77.0)	24.5 (76.1)	24.4 (75.9)	23.7 (74.7)	20.9 (69.6)	16.3 (61.3)	12.2 (54.0)	19.9 (67.8)
Record low °C (°F)	3.8 (38.8)	6.3 (43.3)	10.7 (51.3)	13.5 (56.3)	15.6 (60.1)	18.3 (64.9)	17.8 (64.0)	17.2 (63.0)	17.0 (62.6)	13.2 (55.8)	7.7 (45.9)	5.7 (42.3)	3.8 (38.8)
Average rainfall mm (inches)	15.4 (0.61)	22.9 (0.90)	30.4 (1.20)	39.1 (1.54)	78.6 (3.09)	282.6 (11.1)	326.1 (12.84)	295.9 (11.65)	244.8 (9.64)	93.3 (3.67)	21.4 (0.84)	15.2 (0.60)	1,465.9 (57.71)
Average rainy days	1.5	2.0	2.3	2.9	5.6	13.0	16.4	16.0	11.6	4.1	1.1	1.0	77.5
Average relative humidity (%) (at 17:30 IST)	**55**	**46**	**39**	**38**	**48**	**67**	**79**	**80**	**77**	**67**	**60**	**59**	**59**
Source: India Meteorological Department													

পুরুলিয়া জেলার আবহাওয়া 'ট্রপিক্যাল সাভানা ক্লাইমেট'। মূলত বর্ষাকালে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে এই জেলায় তাপমাত্রা গড়ে ৪০-৪৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং শীতকালে এখানকার গড় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সুতরাং তাপমাত্রার নিরিখে সমগ্র পুরুলিয়া জেলা চরম আবহাওয়া সম্পন্ন। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পুরুলিয়া জেলায় প্রধানত বৃষ্টিপাত হয়। এবং বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১১০০-১৫০০ মিলিমিটার (43-59 Inch)।

বর্ষাকালে এখানে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অধিক গড়ে ৭৫- ৮৫% কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই পরিমাণ ২০-৩৫%

১.৪.২.৩ পুরুলিয়া জেলার নদ নদী (Rivers of Purulia District):

১.৯ পুরুলিয়া জেলার নদনদীর মানচিত্র:

পুরুলিয়া জেলার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলি নদী বয়ে গেছে এই জেলায় প্রধান নদীগুলি হল- কংসাবতী, দামোদর, সুবর্ণরেখা, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতি (শিলাই) ইত্যাদি। যদিও এই জেলার

মধ্যে দিয়ে এতগুলি নদী প্রভাবিত হয়ে গেছে তবু প্রায় ৫০% জল বর্ষাকালেই নদীগুলি দিয়ে নিচে নেমে যায়, কারণ সমগ্র পুরুলিয়া জেলা উচ্চভূমির উপর অবস্থিত।

ক) কংসাবতী নদী (Kangsabati River):

কংসাবতী নদীটি পুরুলিয়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর, এবং ঝাড়গ্রাম জেলার অববাহিকায় বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে - কপিশা, কাঁসবাস, কাঁসাই, কংসাবতী। 'কপিশ' অর্থ মেটেরল অর্থাৎ নীল এবং পীত রং মিশ্রিত বর্ণ। 'কপিশের' স্ত্রীলিঙ্গ 'কপিশা' তাই কপিশা নদ নয় নদী। কপিশা একটি আদিবাসী 'মুন্ডারী' শব্দ। কপিশা নদীই যে কংসাবতী বা কাঁসাই তার উল্লেখ পাওয়া যায় মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশম' মহাকাব্যে। 'রঘুবংশম' মহাকাব্যের চতুর্থ স্বর্গের 'রঘুদিগ্বিজয়' অংশে দেখা গেছে যে রঘু রাজা হওয়ার পর নিজের রাজধানী থেকে বেরিয়ে দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে তাম্রলিপ্ত বা তমলুক (সম্বদেশ) প্রভৃতির পূর্ব দিকের রাজাদের উৎখাত করে গঙ্গার স্রোতের মধ্যবর্তী দ্বীপে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। তার পর হাতির সেতুর উপর দিয়ে রাজা রঘু কপিশা (কংসাবতি) নদী পেরিয়ে যান এবং কলিঙ্গ (বর্তমান উৎকল বা ওড়িষা) অভিমুখে গমন করেন। সুতরাং এই নদীটি যে অত্যন্ত প্রাচীন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'রঘুবংশম' মহাকাব্যের চতুর্থ স্বর্গের ৩৮ সংখ্যক এবং ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে।

'যা তীর্তা কপিশং মৈণ্যৈবদ্ধদ্বিরদ সেতুভিঃ
উৎকল দর্শিত পথ কলিঙ্গামুখো যযৌ' ।। (৪।৩৮)

'স প্রতাপং মহেন্দ্রস্য মূর্দ্ধি তীক্ষ্ণং ন্যবেসয়ৎ।
অঙ্কুশ দ্বিরদশ্যোর যন্তা গম্ভীর বেদিনং'।। (৪।৩৯)

সুপণ্ডিত এফ. জি. পার্জিস্টার সাহেবের মতে উৎকল দেশ ছিল মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ অংশ এবং বর্তমান ওড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা নিয়ে। উৎকলের মাদলা পঞ্জিকাতে উল্লেখ রয়েছে যে, অনঙ্গ ভীমদেব তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন বরদনায় নদী থেকে কাঁসবাস (কংসাবতী) নদী পর্যন্ত। তবে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দি খাঁর সময়ে ওড়িষার এবং বাংলার মধ্যে সীমা নির্ধারিত হয়েছিল সুবর্ণরেখা নদীকে ভিত্তি করে।

কংসাবতি নদী গ্রীষ্ম প্রধান দেশের যেন একটি মেয়ে যার প্রবল জল স্রোত হারিয়ে গেছে উতপ্ত জ্বলে ওঠা ধু ধু করা বালীর রাজ্যে। তার বালী যেন তামার খাদ মেশানো কাঁসা রং, যেন কাঁসার মত চকচক করছে। তাই লোক মুখে কংসাবতী হয়েছে কাঁসাই।

পুরুলিয়ায় কংসাবতি নদী

পৌরাণিক যুগে কাঁসাই এর উল্লেখ দেখা যায়। যেখানে 'কপিশা' আশ্রয় লাভ করেছে (মিশেগেছে) তাম্রলিপ্ত (তমলুক) পরিমণ্ডলের সমুদ্রে। চালকোলিথিক যুগে কাঁসাই নদীকে চিনত নব্য-প্রস্তর যুগের বহু জনগোষ্ঠী। আর্যরা কাঁসাই নদীকে চেনে যিশুখ্রিস্টের জন্মের 900 বছর পূর্বে পরীক্ষিতের ভারত শাসনকালে পৌরাণিক যুগ থেকে।

মঙ্গলকাব্যে ও কাঁসাই নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিজমাধবে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় যে দেবী চণ্ডী বিশ্বকর্মার হাতে পান, সুপারি দিয়ে তাঁর পূজার জন্য একটি সুন্দর মন্দির বা (মঠ) তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেন।

"কংসা নদীর তট

গঠহ সুন্দর মঠ

অনুবল দিলা হনুমনা

.....

দেবি বলে বিশ্বকর্মা লওগুয়াপান

কংসানদী তটে মঠ করহ নির্মাণ"

তাই কালকেতুর উপাখ্যানে চন্ডীমঙ্গলে বারবার এসেছে কংসানদীর অর্থাৎ কাঁসাই নদীর কথা। কালকেতু একজন ব্যাধ অর্থাৎ শিকারি এবং শবর, খেরিয়াদের গোষ্ঠীপতি। তাই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া কাঁসাই নদীর উৎস তীরে খেড়িয়া, শবর গোষ্ঠীর সংখ্যা আজও চোখে পড়ে। কাঁসাই নদীর অববাহিকার বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের চণ্ডীর মন্দির রয়েছে। তিনি বর্তমানে হিন্দু দেবী হিসাবে পূজা পাচ্ছেন। দেবী চণ্ডী প্রকৃতপক্ষে দেবী দুর্গার এক রূপ। কাঁসাই বিধৌত অঞ্চলে দেবী চণ্ডী বিভিন্ন নামে পরিচিত

যেমন- কলাইচণ্ডী, মঙ্গলচন্ডী, ওলাইচন্ডী, বড়ামচন্ডী, এর পূজা হয় একখণ্ড পাথরের উপরে। কাঁসাই বিধৌত অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে যে চন্ডী মন্দির রয়েছেন তার পুরোহিত শবর, খেরিয়া গোষ্ঠী ভক্ত 'পাহান' বা পুরোহিত। এই সকল 'পাহান'রা নিজেদের রাজ খেড়িয়া ও বন্য বলে দাবি করেন। ঝাড়গ্রাম জেলার গুপ্তমনি এবং বাঁকুড়া জেলার জয়চন্ডী পাহাড় এর উপর অবস্থিত চন্ডী মন্দিরগুলির পুরোহিত 'পাহান'রা।

কাঁসাই নদীর উৎপত্তি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ব্লকের জাবর পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে এরপর উচ্চভূমিতে ঝালদা, গরজয়পুর, পুরুলিয়ার পুঞ্চা, মানবাজার হয়ে বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করেছে। বাঁকুড়া জেলায় খাতরা ব্লকে লাল মাটিতে প্রবেশনাথ এবং সারাং গড়ে কুমারী নদীকে সঙ্গে নিয়ে পাক দিয়ে প্রবেশ করেছে মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামে। মেদিনীপুর জেলার ডোকারপুরে কংসাবতী দ্রুত বেগে একে বেঁকে এগিয়ে গেছে এবং নিম্ন প্রবাহে বহু কিলোমিটারের পর বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে রূপনারায়ণে মিশেছে। যদিও এই ধারাটি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। অন্য একটি ধারা যেটি রানীহাটি হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে নেমে এসে হলদি কেলেঘাই সংযোগস্থানে টেংরাখালীতে হলদি নদীর সাথে মিশেছে যেটি বর্তমান কংসাবতী বা কাটাখাল। যদিও এই অংশে সারা বছর জোয়ার ভাটা থাকে তাহলেও এটি আসলে নদী নয়, নকল নদী মানুষের তৈরি কাটাখাল। পাঁশকুড়ার কাছ থেকে ১৬৫৩ সালে মহিষাদলের তৎকালীন রাজা কল্যাণ রায় চৌধুরী খাল কেটে দক্ষিণমুখী কাশি পরগনার মধ্যে দিয়ে বয়ে এনে হলদি নদীতে ফেলেছিলেন মহিষাদল অঞ্চলে চাষাবাদে জলের চাহিদা মেটাতে। রাজা কল্যাণের কাটা বলে এই নদী এই অংশে কাটা খাল বা রায় খালি নামে পরিচিত। এর প্রমাণ মিলে কে. সি. আইয়ার এর লেখা "History and Account of Mahishadal Raj Estate" গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন 'Raja Kalyan Rai descent of his line was than Raja of

Mahisadal living his place at Garh gumai, the channel ‘Raykhali’ connecting the Cossye and Haldi through Moyna excavated by him keep his memory fresh to these days’.

কাশি জোড়ার রাজা প্রতাপ নারায়ণ রায় এই খাল কাটায় কোন বাধা দেননি কারণ কাটা খালটি গিয়েছিল কাশি জোড়া রাজবাড়ীর কাছ দিয়ে। কাঁসাই নদী নিম্ন প্রবাহে তমলুক অঞ্চলে কোথাও কোথাও বেহুলা নদী নামে পরিচিতি পেয়েছিল। সুতরাং ‘কাটাখাল’ বা ‘রাইখালী’, ‘রেয়াখালি’ বা ‘কংসাবতী’ এই অংশটি পাঁশকুড়া রানিহাটি থেকে দক্ষিণ মুখে সোজা হলদি নদী পর্যন্ত প্রবাহিত যেখানে নিত্যদিন জোয়ার ভাটার প্রাণমন সতেজতা আজও রয়েছে। কেশপুরের পশ্চিম-মেদিনীপুর জেলা কাপাসটিকরি থেকে ময়নার নারকেলদা পর্যন্ত এই দীর্ঘ নদী পথের নাম কংসাবতী (নতুন)। পলাশপাই খাল কাঁসাই এর একটি শাখা কাপাস টিকরির কাছে মূল কাঁসাই থেকে বের হয়ে প্রথমে উত্তরমুখী, পরে পূর্বমুখী, তারপর দক্ষিণ মুখী, শেষে পুনরায় পূর্বমুখী হয়ে ঘাটাল মহকুমার দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত শ্রীবড়া গ্রামের পাশ দিয়ে রূপনারায়ণ নদীতে মিশেছে।

খ) দামোদর (Damodar River):

১.১০ দামোদর নদীর মানচিত্র:

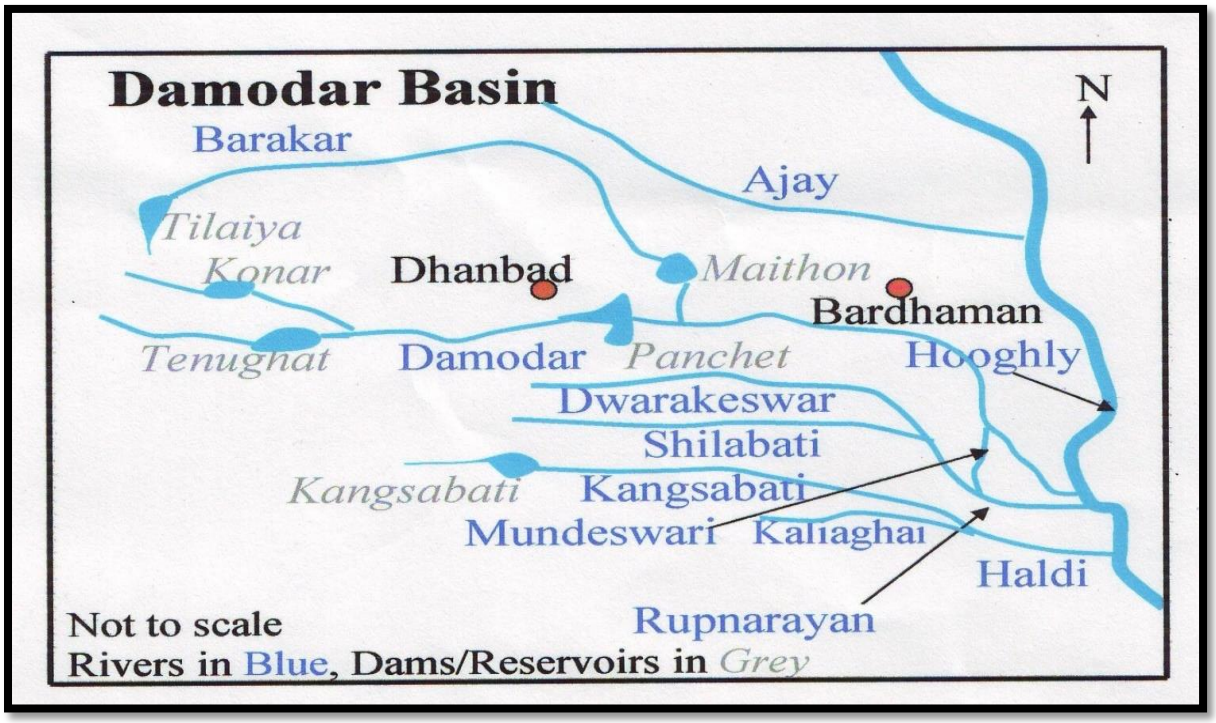

দামোদর নদী ভারতের ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। দামোদর নদীর উপত্যকা খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ এবং এই উপত্যকায় রয়েছে বহু সংখ্যক খনি, বিশেষত কয়লা খনি। দামোদর নদী বাংলার দুঃখ নামে পরিচিত কারণ বর্ষাকালে পার্বত্য ভূমি থেকে বর্ষার সময়ে হঠাৎ করে যে প্রচুর পরিমাণে জল উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমিতে নেমে আসে তাকে ধারণ এবং বহন করার ক্ষমতা নিম্নগতিতে দামোদরের নেই। তাই এই বিস্তীর্ণ জলরাশি নদীর, দু-কূল ভাসিয়ে সর্ববিধ্বংসী বন্যার রূপ নেয়। পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই বন্যায় প্লাবিত হয়। ফলে মানুষ সবকিছু হারিয়ে ভিখারীর ন্যায়, সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে তাই দামোদরকে বাংলার দুঃখ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।। দামোদর নদী এবং শাখা নদী সমূহের উপর বাঁধ

তৈরি করে বড় বড় জলাধার তৈরি করা হয়েছে, ফলে আংশিকভাবে হলেও দামোদর নদীর দ্বারা বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত।

দামোদর নদীর উৎসস্থল

দামোদর শব্দটি দুইটি শব্দকে যোগ করে তৈরি করা হয়েছে। সংস্কৃত 'দাম' শব্দটির অর্থ হলো 'দড়ি' এবং 'উদর' বলতে 'পেট' কে বোঝানো হয়েছে। শ্রীমদভাগবতে দেখা যায়, মা যশোদা তাঁর নয়নমনি বাসুদেব কৃষ্ণকে দামোদর বলে ডাকতেন। যশোদা একটি বড় দড়ি দিয়ে কৃষ্ণের পেটের কাছে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন যাতে কানাই তাঁর হাতের লাগামের বাইরে চলে যেতে না পারে।

ঝাড়খন্ড রাজ্যের ছোটনাগপুর মালভূমির 'খামার পাঠ' পাহাড় থেকে দামোদর নদীর সৃষ্টি (Sen Sing, 2018, p.259)। উচ্চমুখ থেকে হুগলি নদীতে মিশে যাওয়া পর্যন্ত এই গতিপথে ৫৯২ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩৬৮ মাইল দামোদর নদী পথে রয়েছে অনেকগুলি উপনদী এবং

শাখা নদী। যেমন-বরাকর, কোনার, বোকারো, হাহারো, জামুনিয়া, ঘাড়ি, গুয়ারিয়া, খাদিয়া, বহেরা ইত্যাদি (চট্টোপাধ্যায়, সাভার ওয়ার্ল্ড, ১৯৪৩)। দামোদর এবং বরাকর নদী দুইটি মিলে ছোট নাগপুর মালভূমিকে তিনটে ভাগে ভাগ করেছে. উৎস স্থল থেকে দামোদর ও শাখা নদী, উপশাখা নদীগুলি প্রচন্ড শক্তিতে নিচের দিকে এগিয়ে গেছে এবং ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যা কিছু তার গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটনাগপুর মালভূমিতে গড়ে বৃষ্টিপাত হয় ১৪০০ মিটার জুন থেকে আগস্ট এর মধ্যে। দামোদর ভ্যালি এই প্রচুর পরিমাণে জল ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে দামোদর নদী এবং তার শাখা নদীগুলি থেকে বর্ষাকালে প্রচন্ড গতিতে নেমে আসে ফলে নিম্নভূমিতে বন্যার সৃষ্টি করে। তাই বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মানুষের কাছে দামোদর দুঃখের নদ। নিম্নভূমিতে গানে দামোদর নদীর উচ্ছ্বাস ও জলস্মৃতি কিভাবে মানুষের দুঃখের কারণ হয় তা নীচের ভাদুগান থেকেই বোঝা যায়----

“We have sown the crops in Asar
We will bring Bhadu in Bhadra.
Floods have swollen the Damodar
The sailing boats cannot sail.
O Damodar! We fall at your feet
Reduce the floods a little.
Bhadu will come a year later
Let the boats sail on your surface”.

দামোদর নদীর উপত্যকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া জেলা এবং হাওড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যা প্রায় ২৪ হাজার ২৩৫ বর্গ কিলোমিটার। দামোদর উপত্যকা প্রায় ২৮৮৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ কয়লা খনি অঞ্চল। দামোদর

উপত্যকায় নির্মিত রয়েছে বহু ভারী শিল্প, কল কারখানা। দামোদর নদীর উভয় দিকে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় রয়েছে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী। চাষাবাদ, নদীতে মাছ ধরা এবং নৌকা চালানো, বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প, কলকারখানার শ্রমিক, জঙ্গল থেকে বনজ এবং বাণিজ্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ। দামোদর উপত্যকায় বিভিন্ন উচ্চভূমি এবং নিম্নভূমি বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীরা দামোদর নদীকে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলে বিশ্বাস করে এবং মৃত ব্যক্তির অস্থিকে দামোদর নদের জলে বিসর্জন দেয়। দামোদর উপত্যকায় আদিবাসীদের সংস্কৃতি অনেকটাই নদী ভিত্তিক, আদিবাসী সমাজের নিজস্ব গানে দামোদর নদীর প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে আসে।

গ) দ্বারকেশ্বর নদ (Dwarakeswar River):

পুরুলিয়া জেলার কাশিপুর থানার অন্তর্গত হুড়া গ্রামে একটি ঝর্ণা থেকে দ্বারকেশ্বর নদের সৃষ্টি হয়েছে। নদী বিশেষজ্ঞরা বেঙ্গল বেসিনকে বিভিন্ন নদী অববাহিকায় বিভক্ত করেন যার মধ্যে ভাগীরথী অববাহিকা অন্যতম। এর মধ্যে যে ১২টি নদী অববাহিকা রয়েছে তার মধ্যে দ্বারকেশ্বর অববাহিকা অন্যতম। দ্বারকেশ্বর অববাহিকার মূল নদী দ্বারকেশ্বর। দ্বারকেশ্বর নামটি পুংলিঙ্গ বাচক এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম অনুকরণে হওয়ায় নদী না বলে নদ বলে।

Bengal District Gazetteers: Bankura (১৯০৮)

এ লেখা হয়েছে যে,“The most important is the Dhalkishore or Dwarakeswar River in the district Bankura and Purulia. This river takes its rise near the Tilabani hill in Manbhum district, and flowing south east…. In the lower portion of its course, after its confluence with the silai on the border of Midnapore”.

পুরুলিয়া জেলাতে দারকেশ্বর নদীর সঙ্গে মিশেছে দুটি উপনদী ‘রোক’ ও ‘দুধ ভরিয়া’। উচ্চভূমিতে দ্বারকেশ্বর নামে এটি প্রবাহিত হয়ে ক্রমশ বাঁকুড়া জেলা এবং হুগলি জেলা হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে এটি মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদে মিশেছে। উচ্চভূমিতে পুরুলিয়া জেলায় এবং পরবর্তী বাঁকুড়া জেলায় নদীর দুই দিকের অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। দ্বারকেশ্বর বর্ষায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলি জেলার আরামবাগ এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রচুর পরিমাণে জলরাশি রূপনারায়ণ নদে বহন করে। তাই দ্বারকেশ্বর অববাহিকায় পলিমাটি পড়ার

কারণে প্রচুর চাষাবাস হয় বিশেষত সবজির চাষ তবে দ্বারকেশ্বর পুংলিঙ্গবাচক নদ হওয়ার কারণে তার অববাহিকায় একে ঘিরে কোন মানুষদের মধ্যে কোন ধর্মীয় প্রভাব তৈরি হয়নি। তাই দেখা যায় দ্বারকেশ্বর অববাহিকায় মানুষরা মাঙ্গলিক কর্মের জন্য দ্বারকেশ্বর নদ পেরিয়ে শিলাবতী থেকে জল সংগ্রহ করেন। তবে পুরুলিয়া জেলায় দারকেশ্বর অববাহিকায় বসবাসকারী আদিবাসীরা এই নদীকে পবিত্র জ্ঞান করেন। পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী সমাজ এই নদীর জলকে পবিত্র জ্ঞান করলেও পরবর্তী হুগলি এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অধিবাসীরা এই নদের জলকে পবিত্র বলে স্বীকার করতে পারেননি। যদিও শাস্ত্রীয় বিধানে দ্বারকেশ্বরের জল ব্যবহারের কোন বাধা নেই কারণ দ্বারকেশ্বরের জল রূপনারায়ণের নদী হয়ে গঙ্গায় মিশেছে।

পুরুলিয়া জেলায় হুড়া গ্রামের যে ঝোরা থেকে উৎপত্তি সেই হুড়া গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু সংখ্যক বিরহড় আদিবাসী মানুষ রয়েছেন। হুড়া গ্রামটি পর্বত শঙ্কুল হওয়ার কারণে এখানকার বিরহড় এবং অন্যান্য আদিবাসী সমাজ এই নদী থেকে পানীয় জল এবং চাষবাসের জল সংগ্রহ করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে কোন মঙ্গল কাজে এই নদীর জল ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং বিরহড় আদিবাসীর সংস্কৃতির সামান্য অংশ দ্বারকেশ্বর নদকে ঘিরে তৈরি হয়েছে।

ঘ)শিলাবতী নদী (Silaboti River):

শিলাবতী নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় একাধিক লোক কাহিনী রয়েছে। পুরুলিয়া জেলায় লোককাহিনীটি বোড় গ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত। সিমলিপাল অঞ্চলে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা অঞ্চলেও শিলাবতী নদীর উৎপত্তি নিয়ে একাধিক লোককথা রয়েছে। তবে বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লোককথা পুরুলিয়া জেলার শিলাবতীর নদীর সৃষ্টির লোককথার রূপান্তর মাত্র। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হান্টার

সাহেবের বিবরণে প্রথম শিলাবতী নদীর নাম পাওয়া যায় [Hunter, W. W. (1997). A Statistical Account of Bengal. West Bengal District Gazetters. W.B Government, pp. 9,133,134]।

শিলাবতী নদী

বর্তমান পুরুলিয়া জেলা পূর্বতম মানভূম জেলার হুড়া থানা মাগুরিয়া লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন (বড়োগ্রাম এর মৌজা নং ৬৮ ও চক-গোপালপুর মৌজা নাম্বার ৬৯) সীমায় অবস্থিত একটি পুকুর থেকে শিলাবতী নদীর জন্ম হয়েছে। পাহাড় ঝর্ণা বা ঝোরা থেকে শিলাবতী নদীর সৃষ্টি হয়নি। শিলাবতী নদীর উৎস মুখে পুকুরের ধারে শিলাবতী দেবীর মন্দির রয়েছে। এই নদীকে অনেকেই শিলাই নদী নামে ডাকেন। বাঁকুড়া জেলায় শিলাবতী নদীর গতিপথ প্রায় ১০৪ কিলোমিটার, এরপর নদীটি পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে গোয়ালতোড় থানা গড়বেতা-টু পঞ্চায়েত সমিতির আমলাশুলি গ্রামে কেঞ্জা মৌজায় প্রবেশ করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থেকে শিলাবতী হুগলি নদীর খানাকুল গ্রাম পঞ্চায়েতের ধান্যঘেরী মৌজায়

দ্বারকেশ্বর নদের সাথে মিশে রূপনারায়ণ নাম ধারণ করেছে এবং শেষে এটি গঙ্গার সাথে মিশেছে। পুরুলিয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিলাবতী নদীর অববাহিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু বিরহড় আদিবাসী সম্প্রদায়। শিলাবতী নদীর অববাহিকায় পলিমাটি থাকার কারণে চাষবাস বিশেষত সবজি চাষের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। বর্ষার জলে পুষ্ট এই নদীটি তার অববাহিকা অঞ্চলে বন্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

শিলাবতি নদী উপত্যকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আকর ভূমি এবং সমৃদ্ধ ভান্ডার। শিলাবতী নদী উপত্যকায় আর্কিওনি যুগের 'নিস' (Gnesis) নামের এক ধরণের রূপান্তরিত শিলা পাওয়া যায়। এই শিলা দানাগুলিতে গ্রানাইট পাথর ও কোয়ার্টজ পাথর রয়েছে। শিলাবতির অববাহিকায় গ্রানাইট পাথর ফাটলে এবং মাকড়া পাথর আড়ালে 'নিস' নামের শিলা পাথরগুলি অনাবৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিস পাথরের কৌণিকপ্রান্তগুলি ধারালো হওয়ায় এবং গঠনগতভাবে মজবুত হওয়ায় এগুলি আদিম প্রস্তর যুগে অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হত। সম্ভবত এই প্রাচুর্যে এই সহজ লভ্যতার কারণে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক আদিবাসী মানুষরা শিলাবতী নদীর উৎস মুখ থেকে বিস্তীর্ণ অববাহিকা জুড়ে বসবাস করত। এছাড়াও শিলাবতীর অববাহিকায় তাম্র প্রস্তর যুগের আদিম নর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। শিলাবতী নদীর অববাহিকায় বহু সংখ্যক মূল্যবান প্রত্নবস্তু আবিষ্কার হয়েছে তার কতকগুলি পাল ও গুপ্ত যুগের হিসাবে স্বীকৃত।

মেদিনীপুর জেলায় যেমন কাঁসাই বা কংসাবতীকে কেন্দ্র করে টুসুর ভাসান দেওয়ার রীতি প্রচলিত তেমনি পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসীরা পৌষ সংক্রান্তির দিন সকালবেলায় চোখের

জলে টুসুকে বিসর্জন দেয় শিলাবতী নদীতেই। আবার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী আদিবাসীরা সুবর্ণরেখা নদী তে টুসুর ভাসান দিয়ে থাকেন। শিলাবতী নদীতে টুসুর ভাসানের গানটি হল –

"মকর পরব আইলে চলে

কররে টুসু গান

তাগাত করে চলরে সবাই

করতে মকর চান।

পিঠা মুড়ি বেঁধে লেড়ে

যেতে হবে কাঁসাই নদীর চরে"।

এখানে শিলাবতী নদী ব্রতিনীদের কাছে কাঁসাই তুল্য হয়। সুতরাং শিলাবতী নদীকে ঘিরে আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি বিশেষভাবে আবর্তিত

ঞ) সুবর্ণরেখা নদী (Subornarekha River):

সুবর্ণরেখা নদী

ছোটনাগপুর মালভূমির নাগরী ও পিসকা গ্রামের কাছে ‘লোহার ডঙ্গা’ পাহাড় থেকে, সমুদ্র তল থেকে প্রায় ৬১০ মিটার উচ্চতায় সুবর্ণরেখা নদীর উৎপত্তিস্থল। এটি বর্ষার জলধারায় পুষ্ট নদী। সুবর্ণরেখা নদীর স্থানাঙ্ক ২৩ ডিগ্রী ১৮ মিন উত্তর ল্যাটিটিউড এবং ৮৫ ডিগ্রি ১১ মি পূর্ব ল্যাটিটিউট। ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে নেমে এসে নদীটি ঝাড়খণ্ডের চাণ্ডীল, জামশেদপুর, ঘাটশিলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ব্লক এবং বাগমুন্ডি ব্লকের বিস্তৃত অঞ্চল এই নদীর অববাহিকা হিসাবে রয়েছে। পুরুলিয়া জেলাকে স্পর্শ করে সুবর্ণরেখা নদী ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর জেলায় হাতিবাড়িতে প্রবেশ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় তালসারির কাছে কীর্তনিয়া বন্দরে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। সুবর্ণরেখায় গতিপথে বালুর তটে এখনো খুঁজলে পাওয়া যায় স্বর্ণরেণু।

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা এবং বাগমুন্ডি ব্লকের আদিবাসী সমাজ এখনো মকর পরবে তাদের আদরের টুসুকে বিসর্জন দেয় সুবর্ণরেখার জলে। সুবর্ণরেখা নদীকে ঘিরে শক্তিশালী হয়েছে লোককথা এবং লোকসাহিত্য। প্রাচীন সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকায় যেমন অনেক মিথ বা গল্প উপস্থিত তেমনি উভয় তীরে রয়েছে প্রচুর মন্দির। এছাড়া সুবর্ণরেখাকে ঘিরে সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছিল তাকে বলা হয়েছে সুবর্ণরেখার সভ্যতা বা সুবর্ণরৈখিক সভ্যতা। সুবর্ণরেখার ঠাকুরবাড়ির গঙ্গা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দামোদর এবং বৈষ্ণবদের যমুনা। আদিবাসীরা নির্দিষ্ট একদিনে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে এখনো পিন্ডদান করে। যদিও সুবর্ণরেখা প্রতিবছর বন্যায় তার উপত্যকার মানুষদের ক্ষতি করে তবু সুবর্ণরেখা অববাহিকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই নদীর সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্কের পরম্পরায় বাঁধা পড়েছে। তাই কেউ এখান থেকে চলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে না, লোকগানে ধরা পড়ে তারই প্রতিফলন —

“বাঁকা নদী বড়ই দাগা দ্যাল ব
বরই দাগা দ্যাল।
চলিতে চলিতে মোদের জ্যাং ধরি গ্যাল ব
জ্যাং ধরি গ্যাল”।

১.৪.৩ পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক চিত্র (Economic Scenario of Purulia District):

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক উৎস রয়েছে। তাই এই জেলার অর্থনীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে শিল্প, কৃষি, বনজ সম্পদ এবং পর্যটনের উপর। অরণ্যকন্যা পুরুলিয়া জেলার উপর বিভিন্ন ধরণের গবেষণার বিষয় রয়েছে যেমন, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভাষা ইত্যাদি। এই জেলায় রয়েছে বন, টিলা, নদী, ঝর্ণা, বন্যপ্রাণী, গাছপালা,

পাহাড়, জলপ্রপাত, মৌসুমি আবহাওয়া ইত্যাদি। পুরুলিয়া জেলার কতগুলি অর্থনৈতিক উৎস সম্পর্কে নিম্নে তুলেধরা হল।

১.৪.৩.১ পুরুলিয়া জেলার শিল্প ও কলকারখানা (Industries and Factories of Purulia District):

অর্থনৈতিকভাবে পুরুলিয়া জেলার শিল্পকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) পুরুলিয়া জেলার ভারী শিল্পসমূহ (Heavy Industries of Purulia District):

২০০৬ সালে ভারত সরকারের পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রক ভারতে ৬৪০ টি জেলার মধ্যে ২৫০ টি জেলাকে সর্বাধিক পশ্চাৎপদ জেলা বলে চিহ্নিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ১১ টি জেলা এই পশ্চাদপদ জেলার মধ্যে রয়েছে। পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের একটি অন্যতম পশ্চাৎপদ জেলা। তাই এটি Backward Reginous Grand Fund (BRGF) এর অন্তর্ভুক্ত।

পুরুলিয়া জেলায় কিছু শিল্প ও কলকারখানা হয়েছে যেটি এই জেলার বিভিন্ন অর্থনৈতিক উৎসগুলির মধ্যে অন্যতম এবং পুরুলিয়া জেলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড, যেমন- সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বাঘমুন্ডিতে পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্ট (প্রতিটি ইউনিট-এ রয়েছে ২২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতা এবং এখান থেকে ৯০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়), মোটুকুন্ডাতে এসিসি দামোদর সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, এছাড়া DVC তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র রঘুনাথপুর ব্লকে এবং স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাক্টরি।

খ) পুরুলিয়া জেলায় কিছু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (Small and Cottage Industries in Purulia District):

এই জেলায় কিছু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে যেমন লাক্ষা শিল্প, সিল্ক শিল্প, মুখোশ তৈরি শিল্প ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে মোট যত লাক্ষা উৎপাদন হয় তার ৯০% আসে পুরুলিয়া জেলা থেকে। পুরুলিয়া জেলার সমস্ত ব্লকেই লাক্ষা উৎপাদন হয় এবং এই কাজে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ নিযুক্ত রয়েছেন।

১.৪.৩.২ কৃষি (Agriculture):

পুরুলিয়া জেলার মাটি ও আবহাওয়া অত্যন্ত রুক্ষ প্রকৃতির। বৃষ্টিপাতও এখানে তুলনামূলকভাবে কম। নদী উচ্চ গতিতে থাকায় এখানে সমস্ত জেলা জুড়ে সেচের ব্যবস্থা করা যায়নি। নদীগুলি বৃষ্টিজলে পরিপুষ্ট হয় তাই বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই নদীতে অল্প জল থাকে। এতৎ সত্ত্বেও পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল যদিও বেশিরভাগ ব্লকে কেবলমাত্র বর্ষাকালে ধান, বিভিন্ন সবজি ইত্যাদি চাষ হয়। অন্যান্য মরশুমে সামান্য ক্ষেত্রে গম, সরিষা, চিনা বাদাম, আলু, ছোলা এবং ডাল জাতীয় শস্য ইত্যাদি চাষ হয়ে থাকে। গরমের দিনে পানীয় জলের অভাব দেখা যায়। কৃষি বা সম্পদের মধ্যে লাক্ষা শিল্প অন্যতম।

১.৪.৩.৩ বনজ সম্পদ (Forest Resources):

পুরুলিয়া জেলায় খুব উন্নত মানের বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। সমগ্র জেলা জুড়ে পলাশ গাছের জঙ্গল রয়েছে। পলাশ কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ি ও মালভূম এলাকায় শাল, সেগুন, মহুয়া, বেল, কাজুবাদাম, আকাশমনি, কুল, বাঁশ, হরিতকি, খেজুর, মেহগিনি, নিম, ইত্যাদি গাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে শাল, সেগুন, আকাশমনি কাঠ যথেষ্ট দামে বিক্রি হয়।

অযোধ্যা পাহাড়

জঙ্গল এলাকার কাছাকাছি বসবাসকারী দরিদ্র শ্রেণীর মানুষরা জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে। শাল গাছ থেকে ধুনো পাওয়া যায় এছাড়া শাল পাতা সংগ্রহ করে দরিদ্র আদিবাসীরা অর্থ উপার্জন করেন। জঙ্গল থেকে কোন কোন আদিবাসী বর্ষাকালে সারা বছর মাশরুম এবং ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন। জঙ্গলের মধ্যে অনেক বড় বড় মৌচাক হয় এবং দরিদ্র মানুষরা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেন। বিশেষত আদিবাসীরা গভীর জঙ্গলে বড় বড় গাছ থেকে লাল পিঁপড়ে ও ডিম সংগ্রহ করে। অযোধ্যা পাহাড়ের অন্যান্য বনজ সম্পদের মধ্যে কিছু কিছু শিকার যোগ্য পশু এখানে পাওয়া যায় যেমন- হরিণ, খরগোশ, সজারু, বন্য শুকর, কাঠবিড়ালি, ভাম ইত্যাদি। আদিবাসীরা এই সকল প্রাণীর মাংস তৃপ্তি ভরে খেয়ে থাকেন। গভীর জঙ্গলে ময়ূর

পাওয়া যায় ময়ূরের পেখম সংগ্রহ করে অনেকে বিক্রি করেন এবং এটাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

১.৪.৩.৪ পর্যটন শিল্প (Tourism Industry):

পুরুলিয়া জেলার অর্থনীতি অনেক অংশে পর্যটন শিল্পভিত্তিক। প্রায় সারা বছর দেশ-বিদেশ থেকে পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন ব্লকে দর্শনার্থী ও পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে। বিশেষত গ্রীষ্মকালে পলাশ ফুল দেখার জন্য দলে দলে পলাশ প্রেমী পর্যটক পুরুলিয়াতে হাজির হন। এছাড়াও অযোধ্যা পাহাড়ের প্রতি বিশেষ বাঙ্গালীদের একটি আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গল, ঝর্ণা, বিভিন্ন ধরনের গাছ, পশুপাখি, প্রজাপতি ইত্যাদির টানে প্রতিবছর অযোধ্যাতে পর্যটকদের ঢল নামে। এই জেলায় রয়েছে বিশেষ ভাবে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় পর্যটনের স্থান। যেমন- অযোধ্যা পাহাড়, মাথা পাহাড়, কুইলা পাল জঙ্গল, মুরগা ড্যাম, জয়চন্ডী পাহাড়, পঞ্চকোট পাহাড়, দোয়ার সিনি পাহাড়, ময়ুর পাহাড়, মার্বেল লেক, বাগমুন্ডিতে চরিদার মুখোশ ও ছৌ নৃত্যের টানে বহু মানুষ পুরুলিয়াতে আসেন। সার্বিকভাবেই পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পুরুলিয়ার অর্থনীতি অনেকটাই উন্নত।

উচ্চ ড্যাম (Upper Dam)

নিম্ন ড্যাম (Lower Dam in Ajodha, Tourism Place)

১.৪.৩.৫ গৃহপালিত পশু (Domestic Animals):

পুরুলিয়া জেলার গ্রাম অঞ্চলে মানুষরা গরু, মোষ, ছাগল, শুকর, মুরগি ইত্যাদি চাষ করেন। আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূলত ছাগল, শুকর, মুরগির চাষ করে থাকেন এবং এখানে জলের অভাবের কারণে পাহাড়ে এবং মালভূমি এলাকায় মানুষরা গরু এবং মোষ চাষ করতে পারেন না। পুরুলিয়াবাসীর কাছে দুধ, ডিম এবং মাংস অপেক্ষাকৃতভাবে সহজলভ্য। দুর্বলতা, রুক্ষতা ও শুস্ক আবহাওয়ায় যথেষ্ট শাকসবজি চাষ না হওয়ায় মানুষ ডিম, মাংস এবং দুধের উপর অধিক নির্ভরশীল।

১.৪.৪ পুরুলিয়া জেলার উৎসব সমূহ (Festivals of Purulia District):

বাইরে থেকে দেখলে পুরুলিয়া জেলা রুক্ষ, শুস্ক, পাথুরে লাল মাটি হলেও এখানকার মানুষজনের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এর সংস্কৃতি এবং উৎসব সমূহ বহমান রয়েছে। প্রায় সারা বছর ধরে পুরুলিয়া জেলাতে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তথা উৎসব চলতে থাকে। যেহেতু পুরুলিয়া জেলা প্রকৃতির কোলে অবস্থিত এবং তার চারিদিকে রয়েছে পাহাড় ও সবুজ অরণ্য তাই জঙ্গল এবং জঙ্গলে পশু পাখিদের সঙ্গে পুরুলিয়াবাসির রয়েছে এক আন্তরিক সম্পর্ক। তাই প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জেলা ব্যাপী সাংস্কৃতিক নিত্য নতুন উৎসব শুরু হয়। প্রতিটি ঋতুতে এবং প্রত্যেক ঋতুভিত্তিক উৎসবে এখানে চলে নাচ, গান এবং আনন্দের উৎসব। পুরুলিয়া জেলাতে বিভিন্ন ধরনের উৎসব রয়েছে যেমন –

১) শিবের গাজন, ২) দিসম সেন্দ্রাঃ, ৩) ধর্ম ঠাকুরের পূজাও মেলা, ৪) রোহিণী উৎসব, ৫) ইরোকসিম বা বাতুয়ালি, ৬) মনসা পূজা ৭) কারাম পরব, ৮) ছাতা পরব, ৯) ভাদু, ১০) জিতা অষ্টম, ১১) বাঁদনা পরব, ১২) জাথেল উৎসব, ১৩) রাস মেলা, ১৪) টুস, ১৫) বানসিং পূজা ও

পরব, ১৬) আখ্যান যাত্রা বা পূজা, ১৭) চন্ডী পূজা বা খেলাই চণ্ডী, ১৮) মাঘসিম, ১৯) বাহা পরব বা উৎসব, ২০) ভেজা বেন্দা ইত্যাদি।

নিম্নে পুরুলিয়ার বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো —

১) বাহা পরব (Baha Parab):

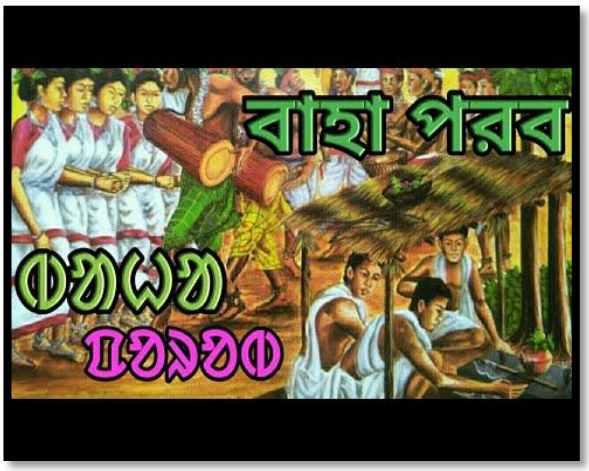

বাহা পরব (Baha Festival)

সাঁওতালদের ঈশ্বর ‘মারাংবুরু’ এবং মাতৃদেবী জাহের ‘আয়োঃ’ পুজোই বাহা পরব নামে পরিচিত। সাধারণত বসন্তকালে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, বিরহড় এবং অন্যান্য আদিবাসীরা বাহা পরব পালন করেন। ‘বাহা’ শব্দের অর্থ হলো ফুল এবং ‘পরব’ শব্দের অর্থ হল উৎসব। তাই বাহা পরব বলতে ফুলের উৎসবকে বোঝায় অর্থাৎ প্রকৃতিকে পুজা ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসার উৎসব। এই পুজোর মাধ্যমে আদিবাসীরা তাদের দেব-দেবী মারাং বুরু এবং জাহের আয়োঃ নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। যে স্থানে আদিবাসীরা দেব-দেবীর পূজা করে, সেই পবিত্র স্থানকে বলা হয় জাহের স্থান। ওই দিনে ‘ন্যায়কে’ বাবা কে আদিবাসীদের পুরোহিত ‘শাল ফুল’ অর্থাৎ ‘সার্জম বাহা’ এবং শাল পাতা জাহের থানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং উপস্থিত আদিবাসী পুরুষ এবং রমণীর হাতে শাল ফুলদেন। এরপর তিনি আদিবাসীদের দ্বারে দ্বারে যান এবং পরিবারকে আশীর্বাদ করেন এবং পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। মহিলারা তেল এবং জল দিয়ে ভালোভাবে পা ধুয়ে এবং মুছে দেন। এরপর আদিবাসী মেয়েরা মাথার চুলের খোঁপাতে শাল ফুল গুঁজে নেয়। পুরুষরাও কচি শালপাতা এবং পাখির পালক মাথার পাগড়ীতে গুঁজেনেন এবং রঙিন পানচি ধুতি পরে সেজে ওঠেন। মহিলারাও সকলেই রঙিন পানছি শাড়ি পরেন। এরপরে শুরু হয় সারারাত ধরে নাচ গান। বসন্তকালে আদিবাসীরা বাহা পরব করে তবে কোন কোন গ্রামে কবে বাহা পরব হবে সেটা আদিবাসী গ্রামগুলি ঠিক করে। সারাদিন ধরে পুজো চলে, ভোগ হিসেবে নিরামিষ খিচুড়ি রান্না হয়। ‘ন্যায়কে’ বাবা পুজোর শেষে সবার মাথায় শান্তির জল ছিটিয়ে দেন। এরপরে ন্যায়কে প্রত্যেক বাড়িতে যান। বাড়ির কোনো এক মহিলা তেল জল দিয়ে ন্যায়কের পা ধুয়ে দেন। ন্যায়কে ঐ মহিলার মাথায় শান্তি জল দেন, মহিলা ও শান্তি জল ন্যায়কের মাথায় দেন। এরপর মহিলা পুকুর বা নদী থেকে ঘটি ভর্তি করে যে জল তুলে এনেছিলেন ন্যায়কের কলসিতে ঢেলে দেন। এভাবেই দ্বার হতে দ্বারে

শান্তির জল দিলেও কখনোই ন্যায়কের কলসিতে শান্তি জল ফুরায় না। জাহের থানে মেয়েরা গোল করে গাইতে এবং নাচতে থাকে। আর পুরুষরা ধামসা-মাদল এবং বাঁশি বাজিয়ে বাহা পরব পালন করেন। মেয়েরা এবং ছেলেরা আলাদা আলাদা করে নাচতে নাচতে গ্রামের ঘরে ঘরে নেচে যায়।

২) কারাম পূজা উৎসব (Festival of Karam Puja):

বিভিন্ন রাজ্যে কারাম পূজা উৎসব

কারাম বা করম উৎসবটি ফসল তোলার উৎসব। হিন্দুরা যেমন নতুন ধান উঠলে নবান্ন উৎসব করে তেমনি ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, আসাম, উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশে আদিবাসীরা কারাম উৎসবে মেতে ওঠে। এই উৎসবে দেবতার নাম করম দেবতা অর্থাৎ প্রকৃতি। তিনি শক্তির দেবতা বলেই আদিবাসী সমাজে পূজিত হন। কারাম দেবতা সন্তুষ্ট হলে আদিবাসীরা মনে করে যে তাদের চাষবাস ভালো হবে এবং সকলেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। হিন্দুরাও ভালো বৃষ্টির জন্য বরুন দেবতা এবং শষ্যের জন্য লক্ষীর আরাধনা করে। ভাদ্র মাসে পূর্ণিমা তিথিতে কারাম পূজা শুরু হয়। এই পূজার জন্য অবিবাহিতা মেয়েরা নতুন ধান ৭ থেকে ৯ দিন ধরে সংগ্রহ করেন। পরের দিন পুরুষরা জঙ্গল থেকে কাঠ, ফুল, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনেন। যেগুলি কারাম দেবতার পূজাতে ব্যবহৃত হয়। এই সময়ে নারী পুরুষ সকলে নাচেন ধামসা মাদলের তালে তালে। সমগ্র পুরুলিয়া জেলা তখন ধামসা ও মাদলের ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠী যেমন মুন্ডা, হো, ওঁরাও, বাইগা, ভূমিজ, খরিয়া, কুইমি, লোহরা, সাঁওতাল প্রমুখরা রাত্রি উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। করম উৎসবে ঢেঁকি দিয়ে চালকে গুঁড়ো করে তার থেকে তৈরি করা হয় মিষ্টি এবং নোনতা মেশানো বিশেষ ধরনের সুস্বাদু খাবার। কারাম পূজার দিন সকালে মহিলারা এই সুস্বাদু খাবারটি তৈরি করে এবং সারাদিন ধরে প্রতিবেশীদের ঘরে এই খাবার পৌঁছে দেন। এই অনুষ্ঠানে করম গাছের ডাল অর্থাৎ অশ্বত্থ গাছের ডাল সংগ্রহ করা হয় এবং ওই ডালকে দুধ ও হাঁড়িয়া দিয়ে ধোয়া হয় এবং যে স্থানে নাচ হবে সেই স্থানে গাছের ডালটি পোঁতা হয়। এরপর উপস্থিত পুরুষ এবং মহিলারা সকলে ঘরে তৈরি হাঁড়িয়া খান এবং সারা দিন ও রাত ধরে কারাম নাচ-গানে তাঁরা মেতে ওঠেন। সাধারণত ধামসা মাদলের তালে তালে মহিলারা নাচতে থাকেন। সারারাত ধরে খাওয়া, নাচ এবং গানের পর কারাম গাছে দই ঢেলে দেয়া হয় এবং

নদী বা পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়। পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে যাতে আগাম বছরে ভালো শষ্য পায়। মেয়েরা সকলেই মঙ্গল কামনায়, বন্ধুত্বের কামনায় ও সৌভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে সবাইকে বাঁধবার জন্য এই উৎসবে অংশ নেন।

৩) সহরায় উৎসব বা বাঁধনা পরব (Festival of Sohoray):

প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এটি উৎসব হিসেবে উঠে এসেছে। ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, মালদা এবং ঝাড়গ্রাম জেলার আদিবাসীদের মধ্যে এই উৎসবকে বিশেষভাবে সংঘটিত হতে দেখা যায়। তবে বহু ক্ষেত্রেই অ-আদিবাসী সমাজে ভিন্ন নামে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে। সাধারণত সহরায় পরব কোথাও হয় কার্তিক মাসের (অক্টোবর-নভেম্বর) অমাবস্যা তিথিতে, কোথাও বা পৌষ সংক্রান্তির সময়ে। মারাংবুরু দেবতা আদিবাসীদের জন্য যে শষ্য দিয়েছেন গরু, মোষ, লাঙ্গল দিয়েছেন, পাহাড় ও জঙ্গল দিয়েছেন তার জন্য আদিবাসীরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। আদিবাসীরা এই উৎসবে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যেও। অমাবস্যার দিন সারারাত পরিবারগুলি বাড়ির চারিদিকে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। এবং ওই দিন গরু মোষের ব্যবস্থায় বাগান, রান্নাঘর ইত্যাদিকে পরিষ্কার করে। প্রকৃত উৎসবের দিনে গরু-মোষ ইত্যাদিকে স্নান করানো হয়। পোষ্যগুলির গলায় পরানো হয় ফুলের মালা। ধুপ এবং দ্বীপ জ্বেলে গ্রামের মহিলারা এই সকল পোষ্যগুলিকে আরতি করেন। এরপর পুরুষ এবং মহিলারা পোষ্যগুলিকে কাঁচা হলুদ নিমপাতা থেঁতো করে খাইয়ে দেন যাতে পোষ্যগুলি সারা বছর রোগ মুক্ত থাকতে পারে। এর পর পোষ্যগুলিকে পেট ভরে চাল গম খাওয়ানো হয়। কারণ এই পোষ্যগুলি পরিবারগুলিকে দেয়

দুধ, চাষের জন্য গোবর এবং এরা লাঙ্গল দেওয়া এবং মই টানা, জমি থেকে শস্য বয়ে আনা এবং সর্ষে মাড়ানোর কাজে সহায়তা করে। কোন কোন অঞ্চলে সহরায়কে বাঁধনা পরব ও বলে। বাঁধনা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ বন্ধন থেকে যার অর্থ পূজা। ময়ূরভঞ্জ জেলায় আদিবাসীরা বিশ্বাস করেন যে ভগবান নিরাকার শিব অর্থাৎ বড় পাহাড় প্রথমে মানুষ তৈরি করে তাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। মানুষের জন্য গরু সৃষ্টি করেন এবং মানুষকে ওই পোষ্যগুলির যথোচিত ভাবে দেখবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রতিবছর কার্তিক অমাবস্যা তিথিতে ভগবান নিরাকার শিব প্রতিটি গোয়ালে এসে গরু এবং মোষের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তাই কার্ত্তিক অমাবস্যার সকালে গোশালাগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। গোশালা দেওয়ালে ছবি আঁকা হয় ও গরু-মোষগুলি ওই শিল্প কর্ম দেখে আনন্দিত হয়। এই সময়ে গরু-মোষগুলিকে স্নান করানো এবং পায়ের খুর ও শিং-এ তেল মাখানো হয়। পরের দিন সকালে নিরাকার শিব লক্ষ্য করেন যে গৃহস্থরা তাদের গরু-মোষগুলিকে ভালো খাবার দিচ্ছে, ধুপ দ্বীপ জ্বালিয়ে আরতির মাধ্যমে সম্মান জানাচ্ছে। সেই আনন্দে গরু-মোষগুলি তাদের পালকদের সাথে নাচছে এবং গো-পালকরা চারণভূমিতে গরু-মোষগুলির সঙ্গে আনন্দে সময় কাটাচ্ছে। সুতরাং বাঁধনা পরব হল পোষ্য গরু, মোষ ও মানুষের মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক তৈরীর উৎসব

সহরায় পরব বা বাঁধনা পরব (**Sohoray Festival**)

বাঁধনা পরবের তৃতীয় দিনে গ্রামের এক স্থানে সকলেই সম্মিলিত হয়ে মহান ভোজের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক পরিবার থেকে চাল, গম, সবজি সংগ্রহ করে আনা হয় এবং রান্না করা হয়। সবার পাতে তখন রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। তখন ধামসা-মাদলের তালে তালে পুরুষ ও মহিলারা গান গাইতে থাকে এবং কেউ কেউ নাচতে থাকে। কোন কোন জায়গাতে ওই দিনে হাঁড়িয়া খেতে দেওয়া হয়। তাই সহরায় বা বাঁধনা পরব এক আনন্দের উৎসব। সহরায় উৎসব উপলক্ষে আদিবাসী পরিবারগুলি তাদের মেয়ে জামাইদেরকে নিমন্ত্রণ করে তাদেরকে নতুন

জামা কাপড় দেয়। সুতরাং বাঁধনা পরবের মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রকৃতি ঈশ্বরকে পূজা উৎসর্গ করে তেমনি অপরদিকে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান হয়। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে বাড়ির গোশালাগুলি পরিষ্কার করা হয় রঙিন করে তোলা হয়, দেওয়াল এবং পোষ্যগুলির শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করা হয়। সহরায় উৎসব এর মধ্যে দিয়ে আদিবাসী সমাজ তাদের সৃজনশীল সত্তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। শুধু আলপনা রচনা বা চিত্রাংকন নয় একইসঙ্গে তারা তাদের সংগীতের, নৃত্যের, সৃজনশীল দক্ষতা সমূহেরও প্রকাশের সুযোগ পায়। এই সময় 'চুরকা' (Chhurka) বা 'ঝুমুর' (Jhumur) নাচ হয়। রাগদি, ক্ষেত মাটি, লাল মাটি, দুধে মাটি ইত্যাদি সংগ্রহ করে গৃহস্থরা নিজেদের ঘর, বারান্দা এবং গোশালাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে ধরেন চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে। অন্যদিকে সহরায় উৎসব আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ককে সুনিশ্চিত করে। আদিবাসী গ্রামগুলি এই অনুষ্ঠানে পরস্পরকে সুসম্পর্কের বন্ধনে দৃঢ়তর করে। কারণ এই উৎসবে বয়স্কদের নেতৃত্বে কম বয়সী ছেলে ও মেয়েরা নাচ, গান, রান্না পরিবেশন ইত্যাদির প্রশিক্ষণ পায়। অন্যদিকে সহরায় অনুষ্ঠান আদিবাসীদের মধ্যে প্রাচীন সাংস্কৃতিক প্রথা ইত্যাদি কে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে বোঝায়। আদিবাসীরা যে তাদের অতীতকে ভুলে যায়নি তারা যে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে একভাবে আজও ধরে রেখেছে তার প্রকৃত প্রমাণ এই 'সহরায়' উৎসব বা 'বাঁধনা' পরবে দেখতে পাওয়া যায়। এই বাঁধনা উৎসবের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার ও নিজেদের উৎপাদনকে সর্ব সমক্ষে তুলে ধরতে পারেন। শহরের বহু মানুষ এমনকি আশেপাশের মানুষজনও বাঁধনা পরবে আদিবাসী এলাকায় যান এবং তাদের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। এই প্রসঙ্গে দরিদ্র আদিবাসী পরিবারগুলি ক্রমশ অর্থনৈতিক

সামর্থকে আরো উন্নত করতে সচেষ্ট হয়। তাই বাঁধনা পরব মানুষ এবং শষ্যের মধ্যেকার সুসম্পর্কের উৎসকে সুনিশ্চিত করে।

৪) টুসু উৎসব (Festival of Tusu):

টুসু পরবটিও শষ্যকে বাড়িতে তোলার সময় কালের উৎসব। অগ্রহায়ন মাসের শেষ দিনে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে 'টুসু' পরব শুরু হয় এবং এটি শেষ হয় পৌষ মাসের শেষে মকর সংক্রান্তিতে। মকর সংক্রান্তি শস্যকে বাড়িতে আনার শেষ দিন এবং মরশুমের চাষের সমাপ্তি ঘটায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেই বিভিন্নভাবে টুসু উৎসব হয়। গোলাকার টেরাকোটা পাত্রে টুসুর পুজো হয় এবং চারিদিকে থাকে প্রদীপ। পুরুলিয়া, বিহার, ঝাড়খণ্ডের বাঁশ এবং রঙিন কাগজ দিয়ে চৌকোনা গঠন তৈরি করা হয় একে বলে চৌডাল। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলার একটি ছোট মাটির কন্যা মূর্তিকে টুসু হিসাবে পূজা করা হয়। সুন্দরবন এলাকায় টুসু হলেন দেবী লক্ষী এবং টুসুর সময়কালে সমগ্র দেশ শষ্যে পরিপূর্ণ। কোথাও দারিদ্র্যের চিহ্ন মাত্র থাকে না, মানুষজন তাদের দারিদ্র্যের দুঃখ ভুলে রঙিন জামা কাপড়ে নিজেদের সুসজ্জিত করে পরস্পরকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানান। মেয়েরা কাছাকাছি কোন নদী, বড় জলাশয় বা পুকুরে টুসুকে নিয়ে আসে গান বাজনা ইত্যাদির মাধ্যমে।

মকর সংক্রান্তি, কাঁসাই নদী, পুরুলিয়া

টুসু পরবে টুসু নৃত্য, পুরুলিয়া

টুসু পরবে শিশুদের মনে আনন্দ, পুরুলিয়া

টুসু পরবে, পুরুলিয়া

প্রতিটি মেয়ে এবং মহিলার কাছে টুসু অত্যন্ত আদরের এক কন্যা বা মাতা বা বন্ধু। গ্রামের মেয়ে, মহিলারা তাদের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দেয় টুসুকে এবং বিভিন্ন রকমের লোক সংগীত গেয়ে টুসুর প্রতি তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাকে নিবেদন করে। মকর সংক্রান্তির সন্ধ্যায় তারা সারারাত ধরে টুসুকে নিয়ে নাচ গান করে যাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, এবং ভালো শষ্য উৎপাদন হয়। টুসুর পুরানো দিনের গানগুলিতে ধরা পড়ে ভারতীয়দের শষ্য উৎপাদনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ টুসু পরব প্রকৃত অর্থে প্রাচীণ ভান্ডারকে ব্যবহার করে সমাজের

বিকাশকে ত্বরান্বিত করা। মাথায় টুসুকে নিয়ে মেয়ে বা মহিলা এগিয়ে চলে এবং পেছনে অন্য মেয়ে বা মহিলারা গান করতে করতে চলে। সঙ্গে থাকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। জলাশয় বা নদীতে এসে মেয়েরা টুসুকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বসায়, তারপর মেয়েরা চান করে কাপড় পরে এবং টুসুকে নদী বা জলাশয়ে বিসর্জন দেয়। এই সময় বহু মেয়ে ও মহিলা কন্যা হারানোর যন্ত্রণাকে বুকে ধরে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গানের সুরে টুসুকে বিসর্জন দেয়। কারো কারো মতে 'টুসু মনি' নামে একটি মেয়ে নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল আর সেইখান থেকেই টুসু নাম এসেছে। আবার অন্যান্যদের মতে টুসু নামটি এসেছে 'টোশালী' নামক দেবীর নাম থেকে। টুসু প্রথম কোথায় শুরু হয় সেই নিয়ে দ্বিমত রয়েছে, কারো কারো মতে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রথম টুসু পরব শুরু হয়। কিন্তু অন্যান্য মতে ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসীরা প্রথম টুসু পরব শুরু করেন।

৫) গাজন বা শিবের গাজন (Shiva's Gajan):

এটি চড়ক পূজার সমাপ্তিকে ঘোষণা করে। চড়ক বা শিবের গাজন মূলত হরিজন বাগদী সমাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম চড়ক পূজায় অনেক স্থানে পূজক ও ব্রাহ্মণ হন কোন হরিজন। গাজনের সঙ্গে জড়িত তিনজন দেবতা হলেন শিব, নীল এবং ধর্ম ঠাকুর, দেবি হলেন পার্বতী। গাজন প্রকৃত অর্থে শিব ও দুর্গার বিবাহের অনুষ্ঠান। ২৬ শে চৈত্র গাজনের সন্ন্যাসীরা গঙ্গা বা কোন নদী বা কোন জলাশয়ে স্নান করে শিব দুর্গা নামে একটি পবিত্র সূত্র পরিধান করে এবং মন্ত্র পাঠ করে যে এই মুহূর্তে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত গোত্র পরিচয়কে ত্যাগ করছি এবং শিবের গোত্রে অনুপ্রবেশ করছি (আত্ম গোত্র পরিত্যাজ্য, শিব গোত্রে প্রকাশিত)। এরপর তারা ফুল এবং বেল পাতা নিয়ে শিবলিঙ্গ- এর উপর অর্পণ করে

এবং অপেক্ষা করে যে শিব তার মাথা থেকে ফুল এবং পাতাকে ফেলে দিয়ে তাদেরকে জানাবেন যে তিনি তাদেরকে সন্ন্যাসী রূপে এক মাসের জন্য গ্রহণ করলেন। এই প্রথাকে বলে ফুলকরণ। যদি ফুলপাতা শিবের মাথা থেকে না পড়ে সমস্ত ভাবি সন্ন্যাসী মাথা নুয়ে প্রণাম করে যতক্ষণ না শিবের মাথা থেকে ফুল, বেলপাতা পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করেন একে বলে মাথাচালা, ফুল পাতা পড়ে যাওয়ার পর শুরু হয় আগুনঝাঁপ। আগুন ঝাঁপের শেষে শুরু হয় কাটাঝাঁপ এবং বঁটি ঝাঁপ। আগুনঝাঁপে একটি লম্বা গর্তে জ্বলন্ত কাঠ কয়লা ভরে দেওয়া হয়। সন্ন্যাসীরা খালি পায়ে হর হর মহাদেব বলতে বলতে ওই জ্বলন্ত কাঠ-কয়লার উপর দিয়ে হেঁটে যায়। কাঁটা ঝাঁপে সন্ন্যাসীদের সামনে থাকে ধারালো বৈঁচিকাটার ডাল। শিব নাম করতে করতে সন্ন্যাসীরা এই বৈঁচিকাটার ডালের মধ্যে দিয়ে নির্ভয়ে হেঁটে যায়। এরপর দাঁড় করানো থাকে ধারালো বঁটি। সেই বঁটিগুলির উপর দিয়েও সন্ন্যাসীরা ঝাঁপ দেয়। কোন কোন এলাকায় এরপর সন্ন্যাসীরা ‘বান ফোড়াতে’ অংশ নেয়, এই পদ্ধতিতে দুই বাহুর উপর মাংস পেশীর ভেতর দিয়ে লোহা দিয়ে ফোড়া হয় এবং দড়ি ঢুকিয়ে সন্ন্যাসীরা নাচতে থাকেন। বাঙালি মায়েরা ওই দিন নীল পূজা করেন এবং সন্তানদের জন্য শিবের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

গাজন উৎসবে উপাসকমণ্ডলী

বেদনার আরএক রীতিনীতি

গাজনে শিব ও দুর্গা

গাজন, পুরুলিয়া

সংক্রান্তির দিন গাজন সন্ন্যাসীরা এলাকার বিভিন্ন শিব মন্দিরে দলে দলে শিব দর্শনে যান। অভিনব সজ্জায় সন্ন্যাসীরা শিব দর্শনের যাত্রাকে বলে 'মারো- ভীটো'। প্রধান সন্ন্যাসী বা 'কোটাল ভক্ত' একটি লাঠি মাথায় পতাকা নেয় ও লাল গামছা বেঁধে নেন এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরা হিন্দু দেব-দেবী, যেমন শিব, দুর্গা, কালী এবং নন্দী, ভৃঙ্গির ন্যায় সাজসজ্জা করেন। ঢাক এবং ঢোলের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গাজনের সন্ন্যাসীরা শোভাযাত্রা সহকারে এলাকা প্রদক্ষিণ করেন এবং শিব মন্দিরে বিনম্র শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপণ করেন। সন্ধ্যায় হয় চড়ক পূজা। তপশিলি

জাতি বিশেষত দলিত শ্রেণীর মানুষরা যেমন- বাউরি, বাগদী, হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত ইত্যাদিরা এই গাজনে 'ধর্ম ঠাকুরের' পূজা করেন। ধর্ম ঠাকুর আসলে বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মরাজ থেকে সৃষ্টি। তার কোন রূপ নেই, একটি পাথরের উপর ধর্ম ঠাকুরের পূজা করা হয়। ধর্ম ঠাকুরের বাহন হলেন টেরাকোটা ঘোড়া। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং সমালোচক সুনীতি কুমার চ্যাটার্জির মতে, ধর্ম ঠাকুর হলেন ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর থেকেও বড় এবং শক্তিশালী। তবে কখনো কখনো ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর এর সাথে ধর্ম ঠাকুরকে এক আসনে বসানো হয়। সুতরাং ধর্ম ঠাকুরের কোন আকৃতি নেই তাই মনে করা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্ম ঠাকুরের উৎপত্তি। গাজনের সন্ন্যাসীরা যে সকল নাচ গান করেন তাতে আরো স্পষ্ট যে শিবের গাজন অনার্য সংস্কৃতি থেকে সৃষ্ট একটি দ্রাবিড় ও তিব্বতীয় বা চায়না গোষ্ঠীর সংস্কৃতি থেকে উৎপন্ন। কোথাও কোথাও গাজনের সন্ন্যাসীরা মানুষের মাথার খুলি দিয়ে মালা তৈরি করে গলায় পরেন এবং হাতে মাথার খুলি নিয়ে নাচ করেন। এটি মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতির অঙ্গ হলেও কলকাতা শহরে শিবের গাজন হতে দেখা যায়, কারণ কলকাতা শহরের জন্ম লগ্ন থেকে এই গাজন ছিল। বাংলা সাহিত্যে শিবের সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতিকে একত্রে দেখা হয়েছে এবং শিবকে অনার্য তথা সূর্য সম্প্রদায়ের দেবতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীর মতে গাজন উৎসবটি চাষাবাদ ভিত্তিক উৎসব। এই উৎসবের উৎস হল প্রকৃতিতে সূর্যের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা ঈশ্বরের শক্তির সহায়তা করা যাতে করে চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, গাজন উৎসব আদিম সমাজে বর্ষার বৃষ্টি উৎসব যেহেতু আদিম সমাজ ছিল চাষবাস ভিত্তিক তাই চাষাবাদ এবং মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতাকে গাজন উৎসবের মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখা এবং আশীর্বাদ লাভ করা ছিল গাজন উৎসবের মূল লক্ষ্য।

৭) দিসম সেন্দ্রা (Disam Sendra):

'দিসম সেন্দ্রা' শিকার পরব নামেও পরিচিত, সাধারণত অযোধ্যা পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসীরা বছরে একটি নির্দিষ্ট দিনে সকলে একত্রিত হয়ে পাহাড় জঙ্গলে শিকার করতে বের হয়। অবিবাহিত যুবকের পক্ষে এই শিকার উৎসবে তীর, ধনুক, বল্লভ, টাঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে শিকার করতে যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সকল অবিবাহিত যুবক শিকারে যেতে ভয় পায় সাধারণত কোন আদিবাসী মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চায় না। সাঁওতাল, বিরহড়, মুন্ডা, মুড়া, খারিয়া, হো ইত্যাদি আদিবাসীদের মধ্যে শিকার উৎসবে যোগ দেওয়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক।

৮) রোহিনী উৎসব (Rohini Festival):

এটি পুরুলিয়া জেলার একটি অত্যন্ত সুন্দর উৎসব যেখানে পুরুলিয়ায় বসবাসকারী সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায় যোগদান করেন। প্রতিবছর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শষ্যের দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং ভালো চাষের জন্য ওই দিন আশীর্বাদ করেন। তাই সমস্ত কৃষক চাষিরা ওই দিন একত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বীজ বপন করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাচ, গান চলতে থাকে। এরই অন্য একটি রূপ হল কারাম পরব। চাষের কাজে প্রচুর পরিশ্রমের পর শস্য তোলার আগে কৃষক এবং চাষিরা মনের আনন্দে ধুনী বা ধুনো জ্বালিয়ে এবং ড্রাম বাজিয়ে ধান কাটার আগে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান করে। সমস্ত কৃষক এবং চাষীরা এই উপলক্ষে আনন্দে নাচতে থাকে।

৯) ভাদু পরব (Bhadu Parab):

অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে ভাদু পরব হয়। পুরুলিয়া বাসীরা রাধা কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমলীলাকে আস্বাদন করবার লক্ষ্যে ভাদু পরব এর ব্যবস্থা করে। সারা বছর সমস্ত পুরুলিয়াবাসী এই ভাদু পরবের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকটা দুর্গাপূজার প্রতি বাঙ্গালীদের আকর্ষণের ন্যায়। সন্ধ্যা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুবক-যুবতী শিশুরা সকলেই রঙিন জামা কাপড় পরে রাস্তায় বের হয়। চারিদিকে চলতে থাকে আলোর রোশনাই। রাধা কৃষ্ণের মূর্তিকে সাজিয়ে নিয়ে দলে দলে মানুষ রাস মেলার দিকে অগ্রসর হয়। রাস মেলাতে রাধা কৃষ্ণকে বসিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ নাচ-গানে মেতে ওঠে। ভাদু পরব উপলক্ষ্যে সারারাত ধরে

নাচ গান চলতে থাকে, চারিদিকে মেলা বসে যায়। এই রাসমেলা তথা ভাদুপরব এক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। সুন্দর সুন্দর রথে রাধা কৃষ্ণকে নিয়ে পুরুলিয়ার অধিবাসি লোকেরা সংগীত, লোক নৃত্য ও নাটক করতে করতে মানুষ এগোয় রাস মেলার দিকে। এই আনন্দক্ষন অনবদ্য সুন্দর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সারা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে মানুষ পুরুলিয়াতে উপস্থিত হয়। পুরুলিয়া ছাড়া বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভাদু পরবে জৌলুস চোখে পড়ে।

১০) ভেজা বিধাঁ বা তীর নিক্ষেপ (Wet Vindhya):

ভেজা বিধাঁ আদিবাসীদের একটি বিশেষ প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান বা পরব। পৌষ সংক্রান্তি এবং মাঘ মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ নববর্ষের আগমনের শুরুতে 'খেরওয়াল' গোষ্ঠীর আদিবাসীরা আনন্দের সাথে এই পরব বা উৎসব পালন করে। এই 'ভেজা বিধাঁ' খেরওয়াল গোষ্ঠী (মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, বিরহড়, মাহালি, কোড়া প্রভৃতি) আদিবাসীদের কাছে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। বছরের শেষদিন হিসাবে পৌষ বা মকর সংক্রান্তি দিনটাকে ধরে নেওয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন আদিবাসীরা ১লা মাঘ বছরের নতুন দিন হিসাবে 'আখ্যান যাত্রা' অনুষ্ঠান পালন করেন। নববর্ষের আগমনে ছোট শিশু থেকে শুরু করে কিশোর- কিশোরীরা, পরিবারের বড়রা সবাই সকালে পুকুর, নদীতে স্নান করে এবং পূর্ব দিকে 'সিংবোঙ্গা' বা সূর্য ভগবান কে নমস্কার করে। এরই মাঝে বাড়ির বড় ছেলে লাঙ্গল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে জমিতে অল্প চাষ দেওয়ার জন্য কারণ বছরের প্রথম দিন আদিবাসীদের অর্থাৎ খেরওয়াল গোষ্ঠীর কাছে এটি একটি পবিত্র দিন। বড় ছেলে বাড়িতে ফিরে এলে তার ছোট বোন বা স্ত্রী পা ধুইয়ে দেয়। ভাল ফসল যাতে হয় তার জন্য মাটির তৈরি ঘোড়া, হাতি পূর্ব দিকে মুখ করে বসিয়ে 'সিংবোঙ্গা' অর্থাৎ প্রকৃতির উদ্দেশ্যে পরিবার পূজা করে এবং সমস্ত প্রাণী, জীবজন্তুর জন্য শুভ কামনা করে। পূজা হয়ে যাওয়ার পর পিঠে পুলি খেয়ে সকলে অর্থাৎ কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রস্তুতি চলে 'ভেজা বিধাঁ' বা 'লক্ষ্য বস্তুকে তীরবিদ্ধ' করার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। গ্রামে গ্রামে শুরু হয় বাঁশি, ধামসা-মাদল, ঢোল প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের তালে তালে নাচ, গান ও বাজনা বাজানোর রীতি। এই সময় পুরুলিয়া জেলার পাড়া থানার তেঁতুলহিটি গ্রামে ভেড়া উড়া, মরগ ওড়ানর দৃশ্য এবং মোরগ ধরার প্রতিযোগিতার যে অনুষ্ঠান তা দেখার মত

যেটি ‘আখ্যান যাত্রার’ গুরুত্বকে বাড়িয়ে তোলে। অযোধ্যা পাহাড়ে মোরগকে উড়িয়ে তিরবিদ্ধ করার প্রাচীন রীতি এখনও কিছুটা দেখতে পাওয়া যায়। আরশা, বাঘমুণ্ডি, বেগুনকদর, বলরামপুর, ঝালদা প্রভৃতি গ্রাম থেকে মেয়েরা নতুন কাপড় পরে পিঠে-পুলি খেয়ে দলবদ্ধ ভাবে বেরিয়ে পড়ে তির-ধুনুক নিয়ে। ‘ভেজা বিধাঁ’ অনুষ্ঠানে তারাও অংশগ্রহণ করে।

গ্রামের ‘ন্যায়কে’ পূজা দিয়ে ‘ভেজা বিধাঁ’ আরম্ভ করেন। ‘ভেজা বিধাঁ’ বা লক্ষ্য ভেদ করার জন্য গ্রামের সকল যুবক-যুবতী, তরুন-তরুণীরা তীর-ধনুক নিয়ে মাঠে উপস্থিত হন। ‘ভেজা বিধাঁ’ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁরা তীর ছোড়ার সামর্থকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ছেলে এবং মেয়েরা আলাদা করে ‘ভেজা বিধাঁ’ স্থান নির্বাচন করে। ঐ মাঠে লক্ষ্য বস্তু হিসাবে একটি চারা কলা গাছকে বা জোরা গাছকে বেশ দূরে মাটিতে পোতা হয়। ঐ কলাগাছকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ‘ভেজা বিধাঁ’ অনুষ্ঠান। সকলে তিরধনুক নিয়ে লক্ষ্যে তীর ছোঁড়ে। এই অনুষ্ঠান বা রীতিটি বহু প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। আদিবাসী অর্থাৎ খেরওয়াল গোষ্ঠীর যে ‘ভেজা বিধাঁ’ অনুষ্ঠান বা পরব এটা কে কেন্দ্র করে বর্তমান ‘তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা’ জাতীয় স্তরের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক স্তরে আমরা দেখতে পাই। তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা আদিবাসীরাই প্রথম শুরু করে ছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম ঐ কলাগাছকে লক্ষ্য ভেদ করতে পারবেন তাকে কাঁধে তুলে আনন্দের সাথে সবাই গ্রামে নিয়ে আসেন এবং প্রত্যেক বাড়ির লোকজন তাঁর পা ধুইয়ে দেন ও প্রণাম জানিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। এরপর তাঁকে ন্যায়কে বাড়িতে আনা হয় এবং বিজয় সম্মান জানাবার জন্য ঐ যুবক বা পুরুষকে ধুতি দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং মেয়ে বা যুবতী যদি ‘ভেজা বিধাঁতে’ তীর নিক্ষেপ করতে পারে তাকেও সসম্মানে ন্যায়কের বাড়িতে ন্যায়কের স্ত্রীর দ্বারা ঐ বিজয়ী যুবতিকে শাড়ী দিয়ে

সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যারা বিজয়ী হন তাঁদেরকে অশুভ শক্তির বিনাশকারী হিসাবে মনে করা হয়।

একই দিনে অপর প্রান্তে ঝাড়খণ্ডের সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বিশাল বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয় এই পরব বা উৎসব পালন করার জন্য। এই মেলায় ধামসা, মাদল, কেঁদরি, তিরীয়, বানাম, টাঙ্গি, তরোয়াল, তির-ধনুক এছাড়াও শাড়ী, পাঞ্চি ধুতি, ইত্যাদি বিক্রি হয়। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি, ঝালদা ও পুরুলিয়ার পাঞ্জে পাহাড় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম ইত্যাদির বহু আদিবাসী মানুষরা দামোদর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজা করে। ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ, বারিপাদা, সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং সমগ্র ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেই চলে নববর্ষের অনুষ্ঠান। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি পাহাড়ের 'মাঠা বুরুতে' যাত্রাবুড়হির কাছে দলবদ্ধ ভাবে কামনা করে সকলের উদ্দেশ্যে যাতে সারা বছর সকলের মঙ্গল হয় এবং শুভ কামনা করে।

এই উৎসবে মুরগি লড়াই পুরুলিয়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য আদিবাসী এলাকায় চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে মোরগকে লড়াইয়ের জন্য বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। লড়াইতে অংশ নেওয়া মোরগের পায়ে বিশেষ ধরনের বাঁকানো ধারালো ছুরি বেঁধে দেওয়া হয়। লড়াই কালে অন্য মোরগটিকে রক্তাক্ত করতে পারলে তাকে পরাজিত বলে স্বীকার করা হয়। জয়ী মোরগের মালিক পরাজিত মোরগটিকে জয়ের নিদর্শন রূপে লাভ করে। মোরগ লড়াই দেখার জন্য আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মানুষ সকলেই জড়ো হয়। এবং আনন্দের সাথে তারা এই লড়াই

উৎসব পালন করে। লড়াইতে অংশ নেওয়া মোরগ দুইটিকে সকলে উৎসাহিত করে। এখনো আদিবাসী এলাকাগুলিতে গ্রামের দিকে বড় বড় হাটে মোরগ লড়াই বসতে দেখা যায়।

১১) ছাতা পরব (Chata Festival):

ছাতা পরব কেবলমাত্র পুরুলিয়া জেলার বড়াবাজার থানা, চাকলটল থানা এবং বঙ্গাবাড়ি থানাতেই দেখা যায়। এই ছাতা পরবের অর্থ হল একটি ছত্রছায়ার মধ্যে সকল আদিবাসী মানুষকে একত্রিত করা এবং তাঁদের যে কৃষ্টি-কলা, কুটির শিল্প রয়েছে তা সকলের কাছে পরিবেশন করা। এই দিন এই অনুষ্ঠানে এলাকার আদিবাসীরা তাদের মাটি এবং পরিবেশকে অফুরন্ত আনন্দ সহকারে তুলে ধরে। আজও পুরুলিয়া জেলার উল্লিখিত গ্রামগুলিতে যথেষ্ট সমারোহ সহকারে এবং চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান চালু রয়েছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সারা দিনব্যাপী নাচ-গান চলতে থাকে এবং যে কোন মানুষ এই নাচ-গান অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। সারা দিনব্যাপী ধরে চলে নাচ, গান এবং আদিবাসী ঘরানার বিশেষভাবে তৈরি কিছু খাবারের স্টল থেকে সুস্বাদু খাবার নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আদিবাসী পুরুষ এবং মহিলারা নিজেরাই রান্না করেন এবং বিক্রি করেন। এই খাবার এতটাই সুস্বাদু হয় যে এর স্বাদ কখনোই ভোলা যায় না। এছাড়া আদিবাসীদের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ও জাতীয় অস্ত্র যথাক্রমে ধামসা, মাদল, বাঁশি, বানাম, লেগ্রা, তির-ধনুক, বল্লম ইত্যাদি বিক্রি হয়।

ছাতা পরব (Chata Festival)

১.৪.৫ পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার (Education & Literacy Rates of Purulia District):

পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির মধ্যে পুরুলিয়া জেলা হল একটি। এই জেলার গড় সাক্ষরতার হার ৫৬.১৪%, যেখানে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৭৪.১৫% এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ৩৭.১৫%। এই জেলায় গ্রামীণ সাক্ষরতার হার হল ৫৩.৮২% এবং শহরের সাক্ষরতার হার ৭৫.৯৬%। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই জেলায় পুরুষ এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৬২.১৭% থেকে বেড়ে ৭৪.১৮% হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী-

১) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র

ক. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ২৫১২

খ. আই. সি. ডি. এস. এর অধীনে প্রাক বিদ্যালয় -২৩৯২

গ. প্রাইভেট ম্যানেজড ও প্রি-স্কুল- ১৭

ঘ. শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-১৯২

২) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

ক. অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২৯৯৮

খ. পিএস কার্যকারিতা ২৯৭১

গ. শিক্ষক সংখ্যা-৬০৪২ (পুরুষ-৪৮২২ ও মহিলা- ১২২০)

ঘ. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা-৩৬১৬ (পুরুষ-৩১৪০ ও মহিলা ৪৭৬)

ঙ. শিক্ষার্থী ভর্তি- ২৫৮৫৯৬ (বালক- ৪৪০০৬০ ও বালিকা- ১১১৫৩৬)

চ. বিদ্যালয় ভবনের সংখ্যা-৮০

ছ. ছাদ বিল্ডিং স্কুল-৩৩৬

এছাড়া এই পুরুলিয়া জেলায় মোট ১১ টি ডিগ্রী কলেজ, একটি বি.এড কলেজ, একটি শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়।

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলায় সাক্ষরতার হার ছিল ৬৪.৪৮%, যেখানে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ছিল ৬৬.৯৪% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৩.৪৬%। বিশেষ ভাবে তপসিলি জাতি এবং আদিবাসী দের সাক্ষরতার হার ছিল ১৯.৩৭% এবং ১৮.৪৫%। এই জেলায় নিরক্ষর শ্রেণীর মানুষদের সংখ্যা ছিল ১৩০৫২১০ জন। যেখানে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৪৯৪৯৩৮ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৮১০২৭২ জন।

১.১১ পুরুলিয়া জেলার সাক্ষরতার হার সম্পর্কিত তথ্যের নকশা:

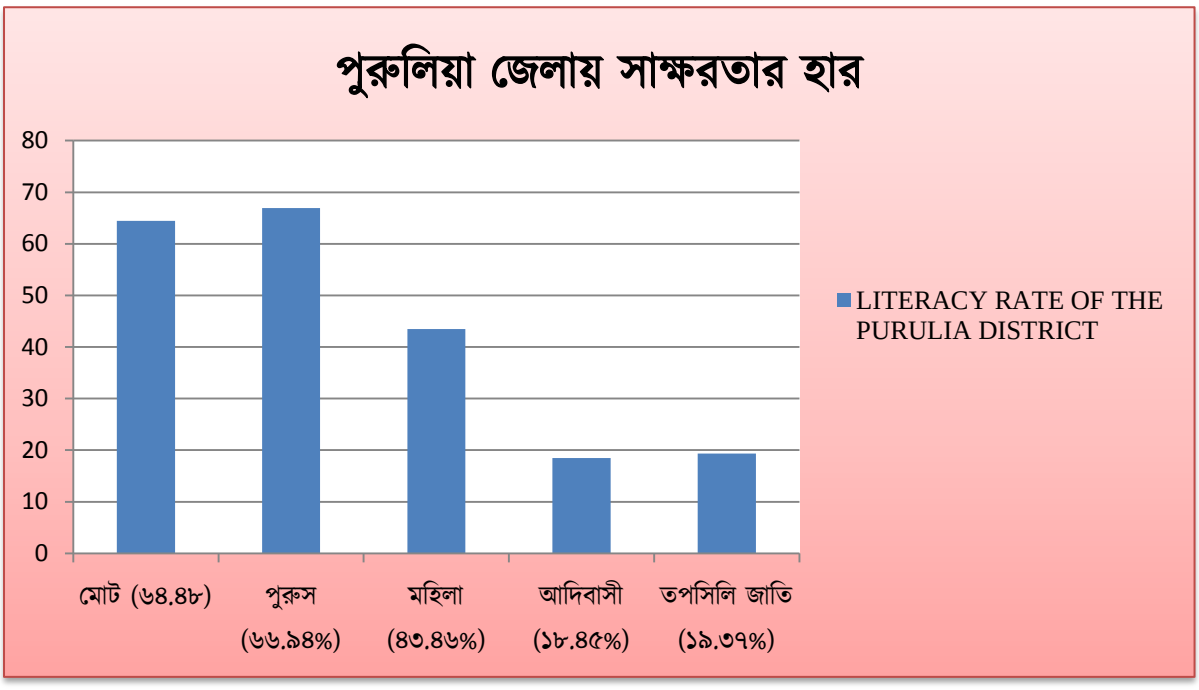

১.৪.৬ পুরুলিয়া জেলার ভাষা এবং ধর্ম (Language & Religion of Purulia District):

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলায় ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলা ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ৮০.৫৬%, ও সাঁওতালি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ১১.১৭%, কুরমালি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ৫.০৪% এবং হিন্দি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ১.৯৩%।

পুরুলিয়া জেলা একটি আদিবাসী সংস্কৃতি জেলা। এই জেলায় আদিবাসীরা প্রাকৃতিক সাস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই জেলাতে হিন্দু ধর্মের মোট জনসংখ্যা হল ৮০.৯৯%, ও তপশীলি জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীদের জনসংখ্যা ১০.৫৫%, ইসলামের ধর্মাবলম্বি মোট জনসংখ্যা ৭.৭৬% এবং অন্যান্য ধর্মের মোট জনসংখ্যা ০.৭০%।

১.১২ পুরুলিয়া জেলার ভাষা সম্পর্কিত তথ্যের নকশা:

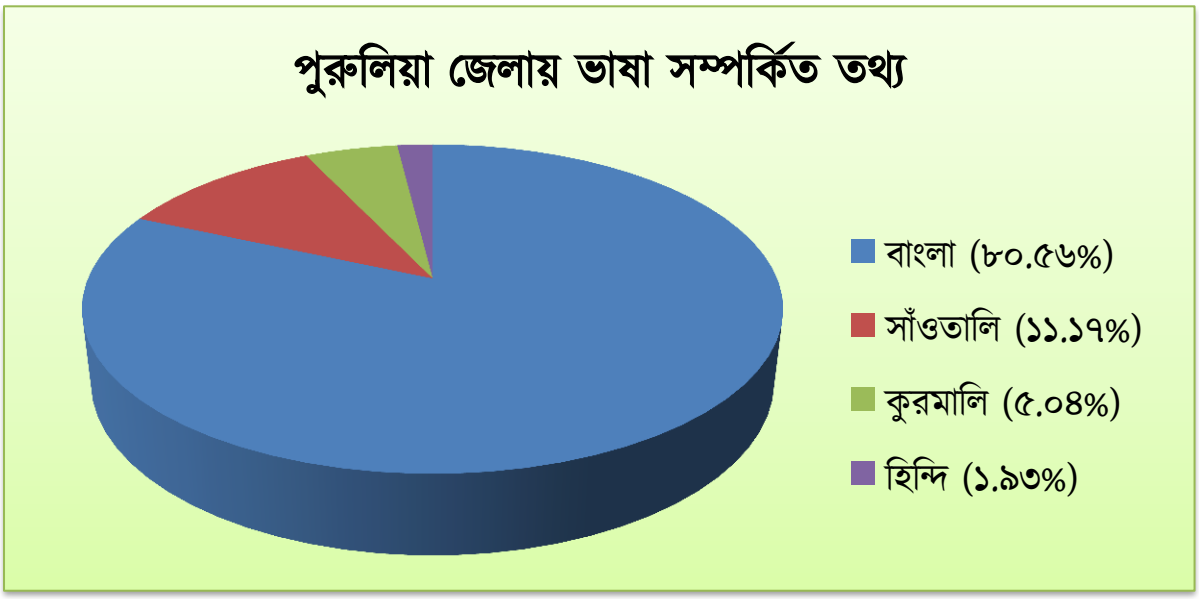

১.১৩ পুরুলিয়া জেলার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত তথ্যের নকশা:

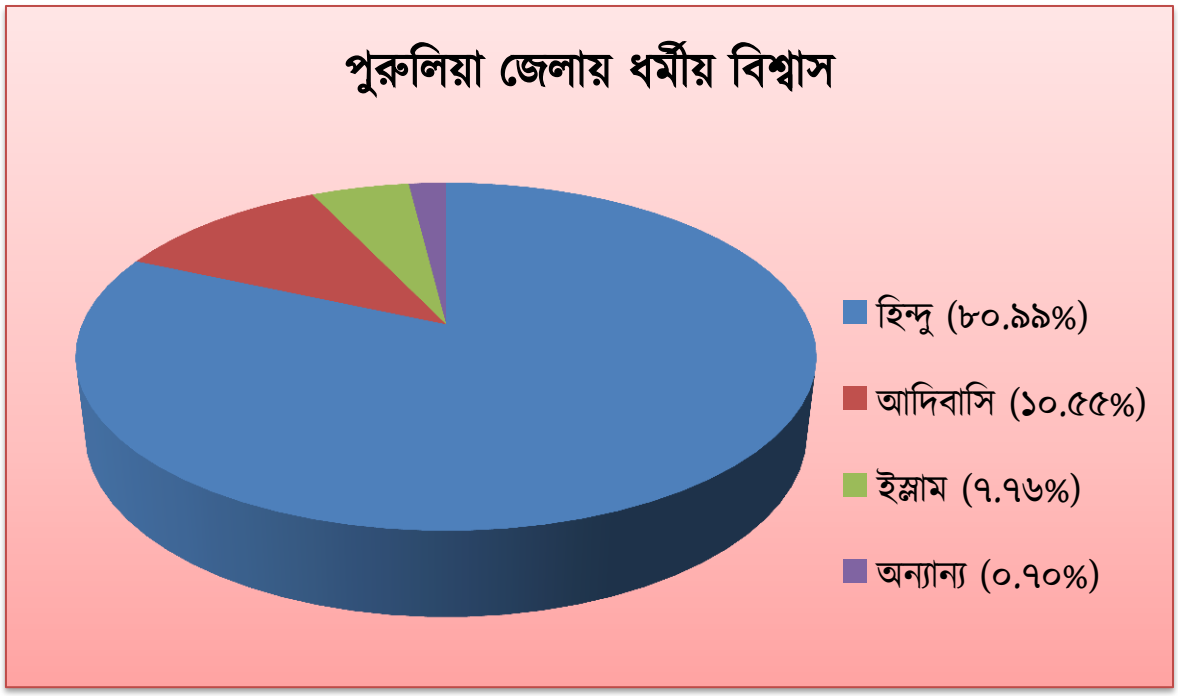

১.৫ পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা (A Brief Account of Tribal Communities in Purulia District):

পুরুলিয়া জেলাটি হল আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা। এখানে ২০১১ সালের জনগণনা আনুসারে মোট জনসংখ্যা হল ২৯৩০১১৫ জন, একটি বড় অংশ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ এখানে রয়েছেন। পুরুলিয়া জেলার সাথে ঝাড়খণ্ডের মানভূম জেলার সীমানা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলটি একদিকে যেমন খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ তেমনি ওই অঞ্চলটিতে যথেষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে খাদ্য এবং বাসস্থানের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় উপস্থিত হন এবং এখানেই তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তবে কিছু কিছু নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং আদিবাসীদের মতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া হল ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ, তাই পূর্ব-পুরুষ থেকে বংশ পরম্পরায় এই

অঞ্চলগুলিতেই গভীর জঙ্গলে এবং পাহাড়ের উপর আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই বসতি স্থাপন করছেন। পুরুলিয়া জেলায় আয়ো:দা বুরু অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড় এবং তার সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিতে বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ গভীর জঙ্গল রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলটি আদিবাসীদের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত। পুরুলিয়া জেলায় ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় রয়েছে। নিম্নে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন আদিম আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে মুণ্ডা ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১.১৪ আদিবাসীদের মুণ্ডা শাখার ভাষার তালিকা:

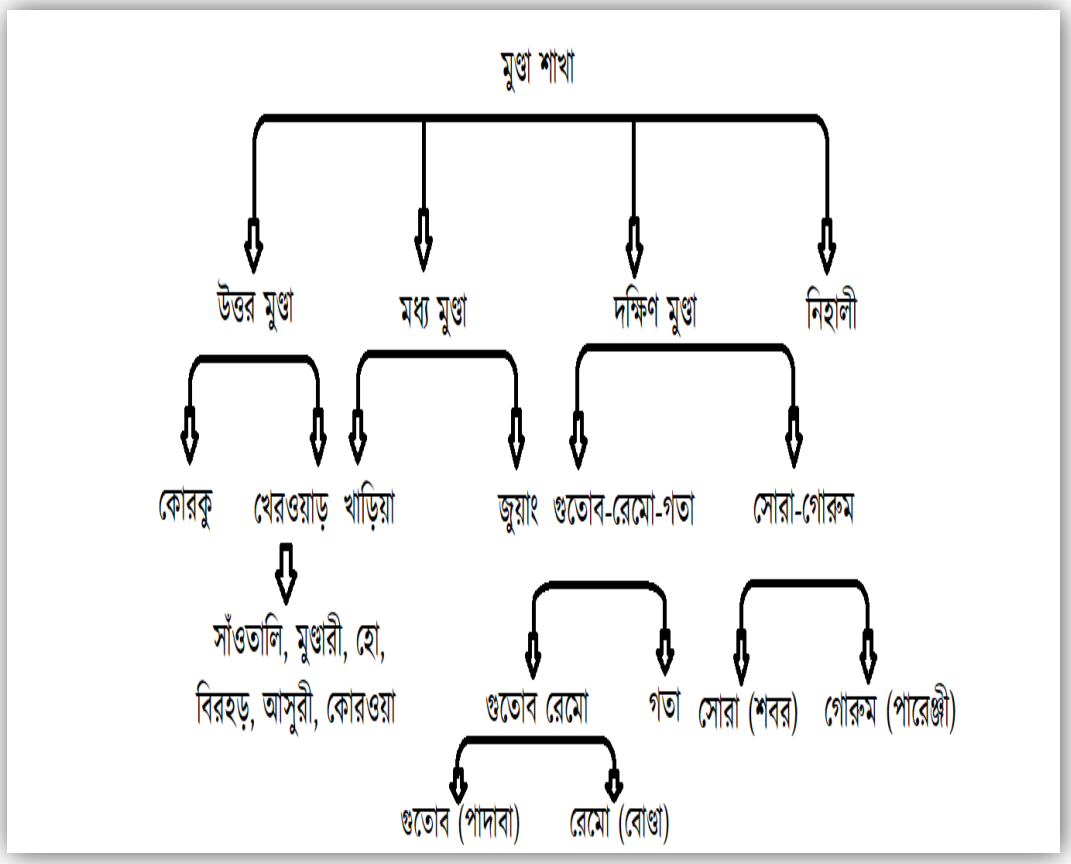

উৎস: পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে (১৯৮৭)

১.৫.১ সাঁওতাল (Santal):

সাঁওতাল আদিবাসীরা হলেন মুণ্ডা শাখা ভাষা গোষ্ঠীর একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। সাঁওতালরা নিজেদেরকে 'হড়' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। সাঁওতালি ভাষায় 'হড়' শব্দের অর্থ 'মানুষ'।

তারা নিজেদের মাঝি (Manjhi) বা 'Headman' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন (Fuchs, 1973, p.172)। সাঁওতাল এই নামটির দ্বারা আদিবাসীদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই সাঁওতালরা বিহার, ছত্রিসগড়, ঝাড়খণ্ডের ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা, হাজারীবাগ, অবিভক্ত সিংভূম, ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর, রায় রংপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর ইত্যাদি জেলাতে বসবাস করছেন। এছাড়াও নেপাল, বাংলাদেশেও সাঁওতালরা ছিল। প্রথম দিকে সাঁওতাল-পরগনা জঙ্গলমহল অঞ্চলের মধ্যে ছিল। পরবর্তী সময়ে এটি বিহারের মধ্যে থাকলেও বর্তমানে ঝাড়খন্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে সাঁওতালরা সবথেকে বেশি ছিলেন মানভূম বা জঙ্গলমহল অঞ্চলে যেটি বর্তমানে বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, ছত্রিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে অবস্থান করছেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালরা ৪০ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবথেকে বেশি সংখ্যায় বসবাস করেন, প্রায় ৫০%। ছোটনাগপুর মালভূমিতে সাঁওতাল ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় উপস্থিত। ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক গঠন, প্রথা ইত্যাদি-নিরিখে সাঁওতালরা বিরহড়, মুন্ডা, ওঁরাও, হো প্রমুখ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি। পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালরা দামোদর নদীর দুই দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করেন। ব্রিটিশ রাজত্ব কালের অনেক আগে থেকেই জমিদার এবং সুদখোরেরা আদিবাসীদের বিভিন্ন ভাবে তাদের উপর অত্যাচার করতেন এবং জমি, হাঁস-মুরগি, ছাগল,

শুকর, গরু ইত্যাদি গৃহ পালিত পশু কেড়ে নিতেন। ব্রিটিশ শাসনের সময় এই শোষণ নিপীড়নের পরিমান অনেক বেড়ে গিয়েছিল। নিজস্ব জমিতে খাজনা দিতে না পারায় ব্রিটিশ চালিত জমিদারদের দ্বারা বিভিন্নভাবে অত্যাচার নিপীড়ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যুবতী সাঁওতাল রমণীদের শরীরকে যথেষ্ট ভাবে ভোগ করতেন এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কম বয়সী সাঁওতাল মেয়েদেরকে জমিদার এবং ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ পুরুষরা জোরপূর্বক তুলে এনে তাদের শরীরকে নির্মমভাবে ভোগ করতেন। প্রতি রাতে মদ্যপান, নাচ-গান এবং অন্যান্য আদিবাসী যুবতী নারীদের বিশেষত সাঁওতাল মেয়েদের ভোগ করবার ব্যবস্থা তারা দীর্ঘদিন চালিয়ে গেছেন। যার ফল স্বরূপ ১৮৫৫-৫৬ সালে সিধু-কানহুর নেতৃত্বে স্থানীয় জমিদার, মহাজন, ইংরেজদের রাজস্ব, এবং কৃষি নীতির বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি সাঁওতালরা একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ ছিল তৎকালীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বৃহত্তম বিদ্রোহ। বিদ্রোহে ১৫-২০ হাজার বিদ্রোহী নিহত হয়েছিলেন এবং এই সাঁওতাল বিদ্রোহকে ভারতবর্ষের বৃহত্তম কৃষক আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন বিশেষজ্ঞ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ কার্ল মার্কস।

সিধু-কানহু মুর্মু (Sidhu-Kanhu Murmu)

Sengupto (1965, p.69) বলেছেন যে দামোদর এবং কংসাবতী নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাঁওতালরা অনেক প্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসছেন। তাই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই Dalton (1872, p.208) এর লেখায়। ভাষাগত দিক থেকে সাঁওতালরা কোলারিয়ান আদিবাসী গোষ্ঠীর (Risley, 1892)। কোন কোন নৃতাত্ত্বিকের মতে সাঁওতালরা অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত এবং এদের নিকটবর্তী ভাষার মানুষ হলেন মুন্ডা, হো, বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী (Khubchandani,1992,p.350)। মুন্ডা ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরা আবেগের সঙ্গে এবং শুদ্ধ ভাবে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এখন সাঁওতালি ভাষায় অলচিকি বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে তাই তাঁরা এই সাঁওতালি ভাষাতেই লেখাপড়া করেন (Troisi, 1979,pp.27-28)। অলচিকি বর্ণমালার প্রবর্তক ওড়িষ্যার পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু (5^{th} May, 1905 – 1^{st} Febuary, 1982)।

পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু (Pandit Raghunath Murmu)

কথিত আছে যে পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ১৯২৫ সালে কাপি-বুরু (Kapi-Buru) তে অলচিকি হরফ তৈরি করেন। তাঁর প্রথম বই অলচিকি বর্ণমালায় সাঁওতালী ভাষাতে 'হড় সেরেং' নামে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৪২ সালে 'বিদু-চান্দঃ' নামে প্রথম নাটক প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ সালে স্বদেশী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু যখন তাঁর উদ্ভাবিত অলচিকি লিপির জন্য প্রচারনা চালাচ্ছিলেন তখন তিনি বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত হন।

ধর্মের দিক থেকে সাঁওতালরা হিন্দুদের থেকে পৃথক। তাঁদের ঈশ্বরের নাম বা ভগবানের নাম 'মারাং বুরু'। সাঁওতালরা প্রকৃতির পূজারী অর্থাৎ প্রকৃতিকে তাঁরা পূজা করেন, প্রকৃতির মধ্যে থাকেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। সাঁওতালরা 'সিং বোঙ্গা'র পূজা করেন, সাঁওতাল ছাড়াও অন্যান্য মুন্ডারি গোষ্ঠীর আদিবাসীরা 'সিং বোঙ্গা'র পূজা

করেন। এছাড়া সাঁওতালরা 'জাহের আয়ঃ' অর্থাৎ মাতৃভূমিকে পূজা করেন এবং 'মরে ক তুরয় ক' অর্থাৎ পূর্বের মাঝি, পারানিক, গড়েৎ, ন্যায়কে এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজা করেন। সাঁওতাল পরিবারগুলিতে ছেলে মেয়েদের অন্য জাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করার রীতি নেই। অন্যান্য কিছু হিন্দু গোষ্ঠীর ন্যায় সাঁওতালরা নিজেদের গোত্রের মধ্যে বিবাহ করতে পারেন না।

সাঁওতাল নারী এবং পুরুষ বিবাহিত জীবনেও পরস্পর থেকে স্বাধীন এবং সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা নিজেরাই পছন্দ করে জীবনসঙ্গীকে নির্বাচন করে। সাঁওতালদের বিবাহে বরপক্ষকে কন্যা পক্ষের হাতে বা অভিভাবকের হাতে কন্যা পণ হিসাবে সাড়ে ১১ টাকা বা ১৩ টাকা দিতে হয়। তবে এই কন্যা পণ আসলে কন্যা পণ নয় কারণ বিবাহের দুই দিন পর বরপক্ষকে কন্যা পক্ষের পিতা-মাতাকে বা অভিভাবককে একটি গরু (বখনা বাছুর) দিতে হয় এবং এই গরু (বখনা বাছুর) টিকে লালন পালন করার জন্য এই কন্যা পণ দেওয়া হয়। কারণ একজন পিতা তাঁর সর্বস্ব দিয়ে তাঁর কন্যা সন্তানকে লালন পালন করেন এবং মানুষ করে তোলেন, সন্তান বড়ো হওয়ার পর বিয়ে দিতে হয়। এর ফলে পিতা-মাতার মনে যে শূন্যতা তৈরি হয় তার সাময়িক পূর্ণতার জন্য এই গরু (বখনা বাছুর) টিকে দেওয়া হয়। পিতা-মাতা খুব আদরের সাথে এই গরু (বখনা বাছুর) টিকে সন্তানের মত লালন পালন করেন। সাঁওতালদের বিবাহতে স্ত্রী বেঁচে থাকতে সাঁওতাল পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন না। সাঁওতাল পুরুষ বা রমণীরা বহুগামী নন তবে প্রাক বিবাহ যৌন সম্পর্ক বিষয়ে সাঁওতাল সমাজে কোন উন্নাসিকতা নেই। স্ত্রী যদি সন্তান ধারণে অসমর্থ হন বা স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে বিবাহ করেন তাহলে বাক্তি বিশেষে পুরুষটি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। তবে স্ত্রী থাকাকালিন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বে স্বামীকে প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে সম্মতি নিতে হয়। দ্বিতীয় বার বিবাহ

করলেও পরিবারের তথা স্বামীর কাছে প্রথম স্ত্রীর সম্মান এবং দাবি কোন অংশে কম হয় না, বরঞ্চ দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রথম স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। বহু কাল থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীতে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু রয়েছে। সাঁওতালদের সমাজে বিধবা বিবাহ দেখে অনুপ্রাণিত হন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি হিন্দু সমাজে বহুদিন থেকে চলে আশা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে ইংরেজ শাসনকালে ১৮৫৬ সালে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহর জন্য আইন পাশ করান। বিদ্যাসাগর বলেন 'আমি বিধবা বিবাহ চিন্তা ভাবনা পাইয়াছি সাঁওতাল সমাজ থেকে'।

সাঁওতালরা ভাত বেশি পছন্দ করে এছাড়াও গম, ডাল, তৈল বীজ, ফল, শাকসবজি, মাছ, মাংস এদের অন্যতম পছন্দের খাদ্য। প্রায় ৭০% এর বেশিরভাগ সাঁওতালরা এখনও চাষবাসের সাথে যুক্ত। সাঁওতাল পরিবারের ছেলেরা বাবার সম্পত্তির অধিকারী তবে ছেলে সন্তান না থাকলে মেয়েরাও বাবার সম্পত্তি পেয়ে থাকেন। ছেলে বা মেয়ে সন্তান যদি না থাকে তবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী সম্পতির অধিকারি হন। এছাড়া ভাইয়ের ছেলেরা পরিবারের সম্পতির অধিকার ভোগ করেন যদি বাবা-মাকে দেখাশোনা করেন।

সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পালাপার্বণ ও উৎসব রয়েছে, যা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসব তাঁরা পালন করেন যেমন বীজ বপনের সময় এলে তাঁরা 'এরোঃ সিম' উৎসব পালন করে, বীজ বপন হয়ে গেলে তাঁরা পালন করে 'হারিয়াড় সিম' উৎসব। শস্য তোলার সময় এলে তাঁরা 'জানথাড়' উৎসব পালন করেন।

এরপর শস্য সংগ্রহ হয়ে গেলে তাঁরা 'সহরায়' উৎসব আনন্দের সাথে উদযাপন করেন। প্রকৃতির কোলে তাঁরা মানুষ তাই তাঁদের বিভিন্ন উৎসর, পুজো, পার্বণ, ধর্মীয় বিশ্বাস সব কিছু প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া বসন্তের আগমনে যখন সমস্ত পৃথিবী ফুলে ফলে ভরে উঠে

তখন তাঁরা আনন্দের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ 'বাহা পরব' পালন করেন। 'বাহাপরব' মূলত শাল গাছকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন করা হয়, শালগাছে নতুন কচি পাতায় রং লাগে, ডালে ডালে রং বেরঙয়ের ফুল ফোটে। এই সময় প্রকৃতি দেবী নতুন সাজে সজ্জিত হন, সাঁওতালরা সেই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেন এবং প্রকৃতির কাছে নিজেদের কল্যান কামনা করেন।

১.৫.২ মুণ্ডা (Munda):

মুন্ডা শব্দটির অর্থ হল 'মাথা' বা 'মূল'। মুন্ডা শব্দটি অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাভাষী একটি আদিম আদিবাসী গোষ্ঠী এবং ভারতবর্ষে প্রথম বসবাসকারী ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠাকারী গোষ্ঠী সম্প্রদায়, যারা ভারত এবং ভারতীয় উপমহাদেশ সমূহে বসবাস করে থাকেন। তাদেরকে বোঝায় অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষাগুলির মধ্যে মুন্ডারি ভাষায় মুন্ডারা কথা বলেন। ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমি, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মুন্ডারা বসবাস করেন। তাদের মধ্যে একজন আদিম জনগোষ্ঠীর মাথা বা প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করতেন তাকে বলা হতো মুন্ডা বা মাথা। ক্রমশঃ ঐ গোষ্ঠীর সকলে মুন্ডা নামে পরিচিতি লাভ করেন। ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মুণ্ডারা অধিক সংখ্যক আদিবাসী গোষ্ঠী। ত্রিপুরা এবং অন্যান্য রাজ্যে মুন্ডারা 'মুড়া' নামে পরিচিত।

মুন্ডা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষরা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেন। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল থেকে মুন্ডারা ক্রমশ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। মুন্ডা গোষ্ঠীর মানুষরা দৈর্ঘ্যে বেটে, ঘন কালো, চ্যাপ্টা নাক, ঠোঁট এবং শক্ত পোক্ত চেহারা (Bahadur, 1977, pp. 13-14)। এদের মাতৃভাষা 'মুন্ডারী' বা 'মুন্ডা।' কোথাও কোথাও এরা সাদ্রী, ওড়িশা, বাংলা এবং হিন্দি ভাষায় কথা বলেন।

মুণ্ডারা ঈশ্বরের কোন প্রতীকে বিশ্বাসী নয়, তারা মনে করেন ভগবান বা ঈশ্বর প্রকৃতির কোনো উচ্চপর্বতে বা গভীর পর্বত খাঁজে রয়েছেন। তাদের প্রধান ঈশ্বর হলেন 'সিং বোঙ্গা' বা 'সূর্য,' যিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। তবে মুণ্ডারাও সাঁওতালদের মতনই প্রকৃতির পূজারী এবং প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর হিসেবে তাঁরা মনে করেন। আর যে সমস্ত দেবতা মুণ্ডাদেরকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা করেন তারা সেই ঈশ্বরের পূজা করেন।

মুণ্ডাদের নিকটবর্তী আদিবাসী শ্রেণি হলো ওঁরাও, মাহালি, সাঁওতাল, হো, বীরহড়, কোড়া, ইত্যাদি। মুণ্ডারা দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত খানগার মুন্ডা (Khangar Munda) আর কম্পার্ট মুন্ডা (Compart Munda)। খানগার মুন্ডারা মাহালি নামে পরিচিত মুন্ডা। মুণ্ডা ভাষার সৃষ্টি প্রথম উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে (Sidweeld, 2018)। মুণ্ডারা যে অতি প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠী তার প্রমাণ মিলে বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদদের, ঐতিহাসিকদের, গবেষণাপত্রে ও বৈদিক গ্রন্থে। বহু মুন্ডা শব্দের উপস্থিতি ১৫০০ থেকে ৫২০ BCE তে পাওয়া যায় অর্থাৎ ওই প্রাচীনকালেও মুন্ডা ভাষায় কথা বলার লোক ছিল (Sharma, 2005, pp2, 118-119)।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ব্রিটিশ রাজত্বে মুন্ডারা স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কারণ জমিদাররা তাদের খাটিয়ে নিয়ে কম পয়সা দিত, অনেক ক্ষেত্রে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করতো।

বিরসা মুণ্ডা (Birsha Munda)

উনবিংশ শতাব্দীতে মুণ্ডারা স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 'উলগুলান' যুদ্ধকালে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাদের হাতে তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা বন্দী হন এবং জেলেই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। আজও ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডা কে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিরসা মুণ্ডার জন্ম দিনে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

প্রথম দিকে মুণ্ডারা শিকারী ছিলেন পরবর্তী সময়ে চাষবাসে অভ্যস্থ হন। এদের প্রধান অনুষ্ঠানগুলি হল মাঘ পরব, ফাগুপরব, কারাম বা করম, বাহা পরব, সারহুল, সহরায় পরব ইত্যাদি। এরা লোকগান, লোকনৃত্য, এবং চিরাচরিত ধামসা, মাদল, ঘণ্টা, বাঁশি, দোতারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন। যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অনুষ্ঠানে মুণ্ডা পুরুষ এবং নারী একত্রে অংশগ্রহণ করেন। মুণ্ডা ভাষায় নাচ কে বলে 'দুরাঙ্গ' (Durango) এবং গানকে

বলে ‘সুসুঙ্গ’ (Susung)। এদের কয়েকটি লোকনৃত্য হলো জাদুর (Jadur), কারাম সুসুন (Karam Susun), মাঘেঃ সুসুন (Maghe Susun)।

মুন্ডারা জন্ম-মৃত্যু এবং বিবাহ উপলক্ষে নাচ-গান এবং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা মেনে চলে তারা বহুগামিতার বিরুদ্ধে। কনেকে পণ দিয়ে বিবাহ করেন। ‘সাগাই’ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবাহ শুরু হয় এবং বিদায় উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিবাহ শেষ হয়। বিবাহতে বিভিন্ন রীতিনীতির সাথে সাথে মুণ্ডারা নাচ গান এবং খাওয়া দাওয়া করেন। এদের মধ্যে বিবাহতে সিঁদুর দেওয়া প্রথা রয়েছে। এই প্রথা বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

দারিদ্র্যের কারনে এবং ব্রিটিশ সমসাময়িকে জমিদারদের দ্বারা তাঁদের জমি লুণ্ঠন করার ফলে তাঁরা বাস্তুচ্যুত ও জমিহারা হয়ে পরেছেন। জঙ্গল ও পাহাড়ে যারা বসবাস করেন তাঁরা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল আর যাঁরা সমতল ভুমিতে বসবাস করেন তাঁরা চাষবাস কাজের সাথে যুক্ত। এছাড়া অনেকে অর্থের কারনে বিভিন্ন কাজের সাথে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন। ব্যবসা করেন অনেকে কাজের সন্ধানে গ্রাম এমনকি রাজ্যর বাইরেও পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে এঁরা কাজ করেন।

১.৫.৩ ভূমিজ (Bhumij):

আদিমতম আদিবাসী গোষ্ঠী মুন্ডাদের মধ্যে ভূমিজ একটি আদিবাসী সম্প্রদায়। ভূমিজ মূলত বাস করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, আসাম, ঝাড়খন্ড, ছত্রিসগড়, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যে। দক্ষিণ বিহারেও ভূমিজরা বসবাস করেন। এছাড়া বাংলাদেশ ও ভুটানেও বসবাস করেন। ভূমিজরা অস্ট্রোও-এশিয়াটিক ভাষাভুক্ত ভূমিজ ভাষায় কথা বলেন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে সমগ্র ভারতে ভূমিজদের জন সংখ্যা হল প্রায় ১ মিলিয়ন থেকেও বেশি, পশ্চিমবঙ্গে ৩

লক্ষ ৩৬ হাজার ২৯৬ জন ভূমিজ বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গে বেশি সংখ্যায় ভূমিজরা বসবাস করে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলাতে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ভূমিজ সম্প্রদায় রয়েছেন।

ভূমিজ শব্দটির অর্থ হল 'মাটি' অর্থাৎ মাটি থেকে যাদের জন্ম ("One Who Born Form The Soil")। 'ভূমি' অর্থাৎ 'জমি' বা 'মাটি' শব্দ থেকে ভূমিজ শব্দের উৎপত্তি। বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক এন রামস্বামী (N. Ramaswami) এর মতে ভূমিজ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে Bhum-jo থেকে যার অর্থ হল ভূমি এলাকায় যাদের জন্ম যেমন সিংভূম, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম ইত্যাদি।

ডালটনের মতে পুরুলিয়া জেলার বাগমুন্ডি অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভূমিজ সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা বসবাস করছেন। যদিও মুন্ডা সম্প্রদায় থেকে পৃথকীকৃত হয়ে ভূমিজ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, তবে বহু বৎসর ধরে হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে নিজস্ব আদিবাসী ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রথা ভুলে গিয়ে তাঁরা বর্তমানে হিন্দু সংস্কৃতি বহন করে চলেছেন। তবে ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা তে এখনও ভূমিজরা তাঁদের নিজস্ব আদিবাসী সংস্কৃতি প্রথা মেনে চলেন। হিন্দুদের ন্যায় ভূমিজরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে স্বীকার করেন। ভূমিজরা একক পরিবার তত্ত্বে বিশ্বাসী। পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে বহুগামীতা চালু রয়েছে, ভূমিজদের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থান এবং পেশা অনুসারে বিভিন্ন পৃথক শ্রেণী রয়েছে যেমন- ভামালিয়া, না-গাদি, আস্থা, ছোট আস্থা (ঝাড়খন্ড রাজ্যে) ; বড় ভূঁইয়া, দেশুয়া, হুলদি পুকরিয়া, তামাদিয়া, স্বীকারিয়া, থারুয়া (ওড়িষ্যা রাজ্যে) ; বড় ভূঁই, মুড়া, মুরোব ভূমিজ, চাইবাসামূড়া, খানগামুড়া, কুমপাট মূড়া, মানকি ভূমিজ (আসামে বসবাসকারী): বড়, বুগোল, ভূঁইয়া, কাদাকাটা, মানকি,

নাগ, পাট কুমিয়া, সিং (ত্রিপুরা রাজ্যে): তামারিয়া ভূমিজ, শিকার ভূমিজ, (পুরুলিয়া জেলাতে) (The Asiatic Quarterly Review, 1986,p.89)। এছাড়াও হলদি পুকুরিয়া ভূমিজ, তেলি ভূমিজ, বড় ভূঁইয়া ভূমিজ, কোল ভূমিজ প্রমুখ উপ শ্রেণীর কথা জানা যায়। বিভিন্ন উপভুক্ত শ্রেণি ভুমিজরা নিজেদের উপ শ্রেণীর বাইরে গিয়ে বিবাহ করেনা। প্রতিটি উপশ্রেণীর আরও কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ রয়েছে যাদের 'কিলি' বলে। শারীরিক চেহারা, কোন অঞ্চলে বসবাস করে এবং কি ধরনের উদ্ভিদ প্রাণীগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল তা দ্বারা কিলি বা কিল্লি স্থির হয়।

ব্রিটিশদের শাসন কালে জমিদার, সুদখের, ব্রিটিশ সেনাদের হাতে ভূমিজ আদিবাসী গোষ্ঠীদের কেও শোষিত ও অত্যাচারিত হতে হয়েছিল।

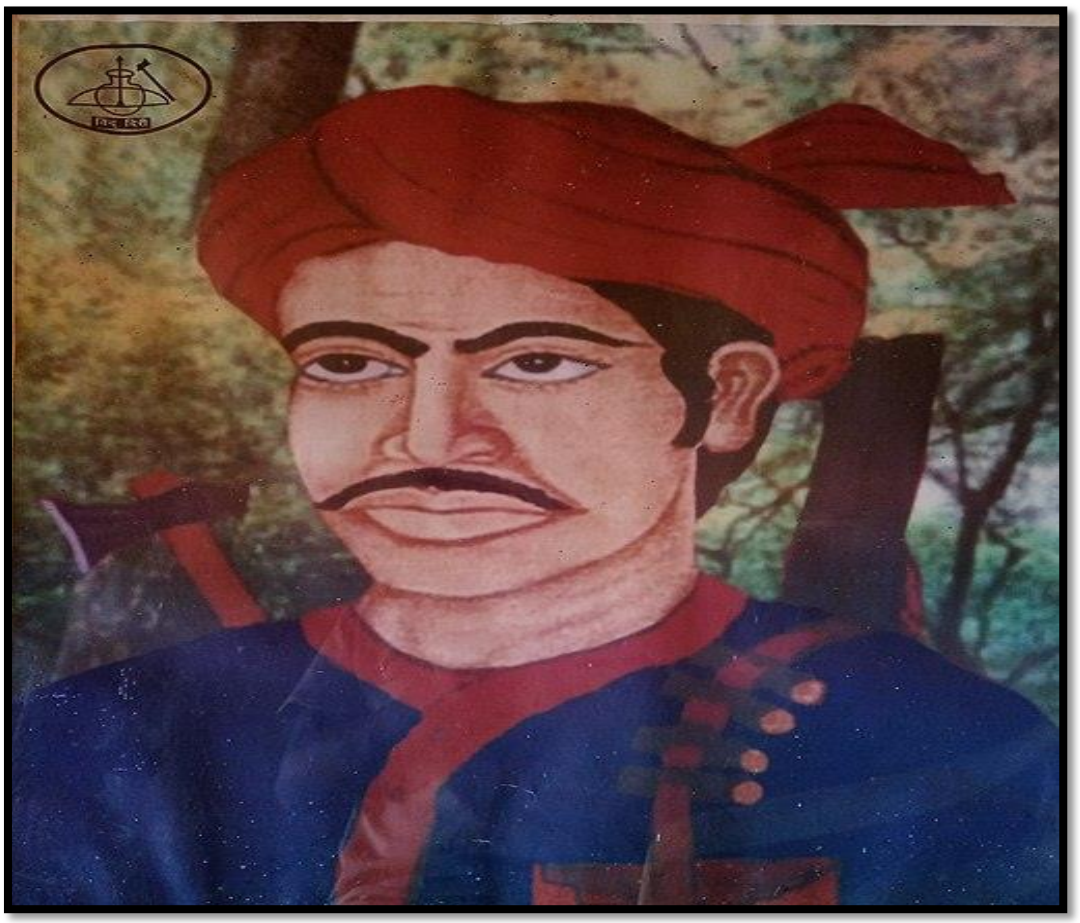

বীর গঙ্গা নারায়ণ সিং (Veer Ganga Narayan Sing)

তাই ভূমিজ আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গঙ্গা নারায়ণ সিং এর নেতৃত্ব ১৮৩২ সালে গরিলা বিদ্রোহ শুরু করেন। এই বিদ্রোহ 'চুঁয়ার বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহে গঙ্গা নারায়ণ সিং প্রথম নেতৃত্ব দেন যিনি ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন ও শোষণ নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, এছাড়া প্রথম 'সর্দার গরিলা' বাহিনী গঠন করেছিলেন। সকল বর্ণের জনগণ গঙ্গা নারায়ন সিং কে জনসমর্থন করেছিল। ধলভূম, পাটকুম, শিখরভূম, সিংভূম, পাঞ্চেত, ঝালদা, বামনি, বাঘমুন্ডি, মানভূম, অম্বিকা নগর, অমিয়াপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, রায়পুরের জনগণ এবং কাশীপুরের রাজা-মহারাজারা গঙ্গা নারায়ণ সিংহকে সমর্থন করেছিলেন।

মানভূম অঞ্চলে ভূমিজরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে। এছাড়াও অন্যরা চাষবাস নির্ভর, কেউ কেউ ছোট ব্যবসা করে, আবার অনেকে আসাম, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা এবং উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। ঝাড়খন্ড, বিহার, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমিজরা প্রধানত চাষবাস, মাছ ধরা, শিকার, ফাঁত পেতে পাখি শিকার এবং অন্যান্য পশুকে ধরা, জঙ্গল থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং অন্যের জমিতে শারীরিক শ্রম দেওয়ার কাজে যুক্ত। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল সন্নিহিত অঞ্চলে যে সকল ভূমিজ বাস করে তারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বনজ সম্পদ আহরণের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন এলাকায় ভূমিজরা গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি চাষ এবং চাষবাসের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল।

ভূমিজদের প্রধান খাদ্য ভাত এরা আদিবাসী কিন্তু শূকর বা গরুর মাংস খায় না। জঙ্গল এলাকার বসবাসকারীরা বিভিন্ন ধরনের পোকা ও পিঁপড়ে এবং পিঁপড়ের ডিম খেয়ে থাকে।

হাঁড়িয়া এবং দেশি মদ ও মহুয়ার মত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপলক্ষ্যে দল বদ্ধ ভোজণের সময়ে এঁরা খেয়ে থাকেন।

পূর্বে ৪ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত ভূমিজ ছেলে মেয়েরা কোন বস্ত্র বা জামা প্যান্ট পরতোনা, তবে বর্তমানে পড়ে থাকে গামছা ও জামা, প্যান্ট। মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ ও ছেলেরা ধুতি, লুঙ্গি প্যান্ট এবং জামা পরে। পিতল, এবং রুপোর বিভিন্ন ধরনের গয়না পড়তে মেয়েরা পছন্দ করে (Rislay, 2022)।

ভুমিজদের মধ্যে বাল্যবিবাহ কোন কালেই ছিল না। বিয়েতে বড় পক্ষকে কন্যা পক্ষের হাতে বিয়ের স্থানে কন্যা পণ দিতে হয়। প্রাগ বিবাহ যৌনতা বিষয়ে ভূমিজ সমাজ অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীল। যৌন সম্পর্কের ফলে কোন মেয়ে গর্ভবতী হলে তার সঙ্গে পুরুষকে বিবাহ করতে বাধ্য করা হয়। বিধবা বিবাহ এদের মধ্যে চালু রয়েছে। বিধবাকে বিবাহের প্রথা সাধারন বিবাহের প্রথা থেকে পৃথক। যেকোনো বিধবাকে স্ত্রী হারানো পুরুষ এমনকি পূর্বে বিবাহ না করা পুরুষও বিয়ে করতে পারে। ভূমিজদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা চালু রয়েছে। বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলা পুনরায় বিবাহ করবার অধিকারী। এদের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথাটি হল মহিলা পরপুরুষের হাত ধরে দৌড়ে পরিবার ত্যাগ করে চলে যাবে। ভূমিজরা বিশেষ ধরনের মার্শাল আর্টে দক্ষ, একে বলে ‘Firkal’।

ভূমিজদের দেবতা হলেন ‘সিং-বোঙ্গা’ এবং ‘ধরম’। বৈশাখ এবং ফাল্গুন মাসে ‘সারহুল’ উৎসব কালে ভূমিজরা তাদের পবিত্র গ্রামের নিকটবর্তী পবিত্র জঙ্গলে ‘জাহুবুরু’ পূজা করে। এছাড়া হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দুদের ন্যায় ভূমিজদের মধ্যেও অন্যান্য দেবতারা পূজা পান যেমন- মনসা পূজা, কালি পুজা, পাউরি, বাদনা পরব কার্তিক মাসে ইত্যাদি

ভূমিজদের অন্যতম অনুষ্ঠান। এছাড়া ভূমিজরা সমগ্র আদিবাসীদের মত কারাম পরব, বাদনা পরব, বাহা, সহরায় ইত্যাদি উৎসবের জন্য তারা নাচ-গান করে ও ধামসা, মাদলের তালে তালে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও প্রেমের গান গাইতে থাকে। ভূমিজরা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত একতা বদ্ধ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে। হিন্দু ধর্মের প্রভাবে এদের অনেক নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা ইত্যাদি হারিয়ে যেতে চলেছে এই পশ্চিমবঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যে সরকারিভাবে তপশিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, বিহার রাজ্যে ভূমিজরা তপশিলি জাতিভুক্ত, এবং ত্রিপুরা ও আসামে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত।

১.৫.৪ ওঁরাও (Orao):

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন আসাম, ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে এমন কি পৃথিবীর অন্যান্য কিছু রাষ্ট্র যেমন বাংলাদেশ, ফিজি, ত্রিনীদাদ, টোবাগো, মরিশাস প্রভৃতি রাষ্ট্রে ওঁরাও বা ধাঙ্গর আদিবাসী র বসবাস। অনেক স্থানে ওঁরাওদের 'কুরুক' আদিবাসী গোষ্ঠী বলেও সম্বোধন করা হয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে ৩৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮৯৯ জন ওঁরাও গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫১০ জন। ওঁরাওদের ধাঙ্গর বলা হয় কারণ 'Dhang' বা 'ধান' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'Hill' বা 'পাহাড়'। যেহেতু এঁরা উচ্চ পাহাড় অঞ্চলে বসবাস করতে অভ্যস্ত তাই এদের ধাঙ্গর বলে অভিহিত করা হয়। আবার এদের কুরুক বলা হয় কারণ 'Kurukh' শব্দটি 'Konkon' বা 'কঙ্কন' শব্দ থেকে এসেছে। ওঁরাওদের আদিবাসস্থান কঙ্কন উপকূল বলে 'Indian Anthropological Society' জানিয়েছেন। ১০০ CE নাগাদ ওঁরাওরা কোন কারণে

ছোটনাগপুর মালভূমিতে এসে উপস্থিত হয়। সেই থেকে তারা ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এবং অবিভক্ত ভারতে বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েন। বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায় বলেছেন যে কুরুক বা ওঁরাওরা দক্ষিণ ভারতের 'Coorg' থেকে ছোট নাগপুর মালভূমিতে ছড়িয়েছেন। আলিশা, বন্দনা, লাকড়া, মোহাম্মদ, মুজিবর রহমান (২০১৭) -এর মতে কুরুক বা ওঁরাওরা প্রথমে সিন্ধু উপত্যকায় বসবাস করতেন। প্রচন্ড বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষের কারণে সিন্ধু উপত্যকায় সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ওঁরাওরা দক্ষিণ এবং মধ্য ভারতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েন [২৫০০-BCE]। Elefenbein (1987)- এর প্রস্তাব অনুসারে ওঁরাওরা বালুচিস্তান থেকে সিন্ধু প্রদেশে আসেন এবং সেখান থেকেই যথাক্রমে রোহতাসগড় এবং রাজমহল পর্বতে সরে আসেন রোহতাসগড়ে আসা এই আদিবাসী গোষ্ঠীকে বলা হয়েছে 'কুরুক' এবং রাজমহল পাহাড়ে আসা আদিবাসীদের বলা হয়েছে 'মোলটো' বা 'ওঁরাও'।

Kornel Edward Dalton -এর মতে ওঁরাওরা প্রথমে গুজরাট অঞ্চলে অর্থাৎ সিন্ধু ঘাটি (মহেঞ্জদার সভ্যতা) তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতেন। সেইখান থেকে বিতাড়িত হয়ে কালিঞ্জার (Kalinjer) -এ আসেন। কিন্তু সেখান থেকেও বিতারিত হয়ে রোহতাসগাড়ে পৌঁছান রোহতাসগাড় থেকেও তারা পরিযায়ী হতে বাধ্য হন এবং পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমিতে বসবাস শুরু করেন। সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে ওঁরাওরা শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য এবং বাসস্থানের খোঁজে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। এর পেছনে একটি যুক্তি ওঁরাওদের ভাষার সাথে তামিল ভাষার অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে, এছাড়া সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত বহু শব্দ ওঁরাওদের ভাষাতে পাওয়া যায়। ওঁরাও ভাষাটি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাই তামিল ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। অধিকাংশ ওঁরাও নিজস্ব ভাষায় কথা বললেও অনেকে সাদরি ও

ওড়িষ্যা এমনকি বাংলা ভাষাতেও কথা বলেন। চা বাগানে ওঁরাও কর্মীরা সাদরি ভাষা ব্যবহার করেন। সাদরি একটি মিশ্র ভাষা যা প্রধানত চা বাগান অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। ওঁরাও ছাড়াও 'অসুর' সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাদরি ভাষায় কথা বলেন, সাদরি ভাষার সঙ্গে হিন্দি এবং ওড়িয়া ভাষার অনেকখানি মিল পাওয়া যায়।

বীর বুধুভগত (Bir Budhu Bhogot)

ব্রিটিশ শাসনকালে কুরুক বা ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষরা স্থানীয় জমিদার এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান কারণ দরিদ্র ওঁরাও এর উপর অতিরিক্ত খাজনা আদায় করার ঐ কালে চেষ্টা হয়েছিল। ১৮৩২ সালে 'বুধুভগত' স্থানীয় জমিদার এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে

প্রবল প্রতিবাদ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তা ইতিহাসে ‘লাকরা রিভিলিয়ন বা কাল আপ্রিসিং’ (Lakra Rebellion Or Kal Uprising) নামে পরিচিত। ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বুধুভগত সমস্ত ওঁরাও আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলেছিলেন যা ইতিহাসে ‘টানাভগত মুভমেন্ট’ (‘Tana Bhagat Movement’, 1914-1920) নামে খ্যাত। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারত সরকারের সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ লাভের কারণে ওঁরাওরা আদিবাসী বা জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি পান।

ওঁরাওরা দৈর্ঘ্যে খাটো, গায়ের রং কালো, মাথা সরু, চোয়ালটি সামনের দিকে এগিয়ে থাকে, চ্যাপ্টা নাক, মোটা ঠোঁট অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় এদের মাথায় অধিক চুল থাকে। এদের মাতৃভাষা কুরুক বা ওঁরাও যা দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর উত্তর দ্রাবিডিয় পরিবার ভুক্ত। ছোটনাগপুর মালভূমির প্রায় সকল ধরনের গতানুগতিক উৎসবগুলি ওঁরাও সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষরা মেনে চলেন। যেমন- সারহুল, করম বা কারাম, ধানবনী, হাড়িহাড়ি, নোয়াখানী, খারিয়ানি ইত্যাদি।

বহু প্রাচীন কাল থেকে ওঁরাও গোষ্ঠীর মানুষরা লোকনৃত্য, লোকগীতি, লোকগাথা, চিরাচরিত সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম এবং উৎসব কালে পুরুষ এবং মহিলারা বিশেষভাবে সাজগোজ করে দলবদ্ধ ভাবে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। তাদের চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্রগুলি হল মন্দর বা মাদল, নাগরা, করতলী ইত্যাদি। ওঁরাওরা তাদের গানকে বলে ‘ডান্ডি’ (Dandi)। এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নাচের প্রচলন রয়েছে যেমন যুদ্ধের নাচ, করম ডান্ডি, খাদি বা সারহুল নাচ, ফাগু নাচ, জাদুর নাচ, জাগরণ নাচ, মাথা নাচ, বিবাহতে ব্যেঞ্জলি নাচ এবং উঠানে চারি নৃত্য ইত্যাদি।

কুরুক বা ওঁরাওদের যুবক-যুবতীদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন মা-বাবারা, বিয়ের দিন পাত্র তার বন্ধু এবং আত্মীয়দের নিয়ে পাত্রীদের বাড়িতে উপস্থিত হন এবং একত্রে নাচ গান করে বিয়ে করেন নাচ গানের জন্য পাত্রীর বাবার বাড়ির সামনে সুসজ্জিত প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। প্যান্ডেলের মণ্ডপে বা ছামডার নিচে কিছু শষ্য দানার ওপর একটি পাথর খণ্ড রেখে পাত্র এবং পাত্রীকে দাঁড় করানো হয়। এরপর পাত্র এবং পাত্রীর মাথার উপর একটি কাপোড় টেনে দেওয়া হয়। এবং পাত্রের বন্ধুরা চারদিক থেকে কাপড়ের পর্দা তৈরি করে, এরপর হয় সিঁদুর দান। পাত্র পাত্রীর কপালে সিঁদুরদেয়। কখনো কখনো পাত্রী ও পাত্রের কপালের সিঁদুর দেয়। এরপর নব দম্পত্তির উপর জল ঢালা হয়। নব দম্পতি পৃথক জায়গায় গিয়ে কাপড় ছাড়ে এবং নতুন জামা কাপড় পরে। এরপর এদেরকে স্বামী-স্ত্রী বলে স্বীকার করা হয়। এই সময় অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুরা বিবাহ অনুষ্ঠানে ভজন করে এবং সারা দিন নিজস্ব আদিবাসী নাচ-গান করে থাকে চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্রের বাজানোর তালে তালে।

ওঁরাও পুরুষরা ছোট ধুতি এবং মেয়েরা হাঁটুর নিচে শাড়ি পরে, পুরুষ এবং মহিলারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ট্যাটু করে যা তাঁদের নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতির তথ্য বহন করে। পুরুষ এবং মহিলাদের ধুতি এবং শাড়ি মোটা করে তৈরি হয় লাল রংয়ের এবং হালকা বেগুনি রং -এর।

ওঁরাওরা জঙ্গলে বসবাস করতে পছন্দ করে এবং জঙ্গল থেকেই বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করে। ঝাড়খণ্ডের ওঁড়াও পূর্বে ঝুমপ্রথায় চাষ করত তবে এখন তারা নিজেরাই চাষী বা চাষে মজুর হিসাবে কাজ করেণ, কেউ কেউ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবেও কাজ করেন। ওঁরাও আদিবাসী গোষ্ঠীর গ্রামের প্রধান হলেন একজন ‘পাহান’ (Pahan) বা গ্রামীণ

পুরোহিত। গ্রামীন সামাজিক সংগঠনে অন্যান্য পদাধিকারীরা হলেন পানিভারয়া বা পাহানের জন বাহক, পূজার (Pujar) বা পাহানের সহায়ক, 'ভান্ডারী' এবং 'চৌকিদার'। যেকোনো ধর্মীয় অনুস্টানে, উৎসবে, গ্রামীণ সমস্যার সমাধানে এই সকল পদাধিকারীরা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। এদের চিরাচরিত এবং অপ্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় 'ধুমকুরিয়া' (Dhumkuria)। এদের গ্রামের কোন আলাপ আলোচনা বা সমস্যার সমাধানের আলোচনার নির্দিষ্ট স্থানটি হল আখড়া (Akhara), প্রতিটি ওঁরাও গ্রামে নিজস্ব গ্রাম ও পর্ষৎ রয়েছে।

ওঁরাওরা বা কুরুকরা তাঁদের নিজেদের ধর্ম 'সারনা ধরম' পালন করে। প্রকৃত অর্থ হল 'প্রকৃতির' পূজা করা। কোন কোন ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষ অন্যান্য ধর্মের প্রভাবে হিন্দুদের ন্যায় পূজা করেন। দেখা গেছে ২০১১ সালের জনগণনায় ওঁরাওদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম নিয়েছেন ৩৬.৩৭%, খ্রিস্টান ধর্ম ৩০.২৪%, সারণা ধরম ২৯.২% (আদিবাসীদের), আদি ধরম ১.৯৫% (আদিবাসীদের), আদিবাসী ধরম ০.৯৮% (আদিবাসীদের), বাকি 0.৭৮% কোন সঠিক উত্তর দেয়নি। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোষ্টেটান এই উভয় ধর্মাবলম্বী রয়েছেন।

ওঁরাওরা ভাত খেতে পছন্দ করেণ। এছাড়া ডাল, রুটি, সবজি, মিসষ্টি আলু, মাছ, মাংস খেয়ে থাকেন। পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে ওঁরাও মেয়ে বা বিধবা মহিলারা পান না কেবলমাত্র ছেলেরা এই সম্পত্তির অধিকারী।

১.৫.৫ হো (Ho):

ভারতে মুন্ডা আদিবাসী ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে হো একটি আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত। হো গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষরা ঝাড়খন্ড রাজ্যের কোলহান অঞ্চলের এবং উড়িষ্যাতে বসবাস করেন। ঝাড়খণ্ডের মোট

আদিবাসী সংখ্যার ১০.৯% এবং উড়িষ্যার মোট আদিবাসী সংখ্যার ৭.৩% হো তপসিলি উপজাতি ভুক্ত (Census of India: Jharkhand, 2001)। ঝাড়খন্ডে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীদের মধ্যে হো গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীরা জনসংখ্যায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে সাঁওতাল, ওঁরাও এবং মুন্ডারা। বাংলাদেশ, নেপাল, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গেও হো গোষ্ঠী ভুক্ত আদিবাসীরা বসবাস করেন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে হো গোষ্ঠীভুক্তদের সংখ্যা ২৩ হাজার ৪৮৩ জন। হো গোষ্ঠীদের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি হল মুন্ডারী, খড়িয়া, সাঁওতাল, বিরহড় এবং ভূমিজ।

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ হো ভাষায় কথা বলেন। হো গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীরা অনেকে হিন্দি এবং ইংরেজিতেও কথা বলেন। ভাষাটি অস্টো-এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতীয় মুন্ডারি ভাষার একটি অংশ। হো ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'মন', 'খামার' (Mon, Khamar) ভাষার সম্পর্ক রয়েছে।

South East Asia র উল্লেখিত ভাষা থেকে হো ভাষা পৃথক হওয়ার কারণ হল হো গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষরা ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠীর এবং দ্রাবিড়িও ভাষা জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে। হো ভাষাযর তিনটি কথ্যরূপ হল- লোহারা, চাইবাসা, এবং ঠাকুর মুন্ডা। হো ভাষার তিনটি রূপের মধ্যে ৯২% ক্ষেত্রে হো ভাষাভাষীরা তিনটি কথ্য ভাষা কে বিশেষত 'চাইভাষা' এবং 'ঠাকুর মুন্ডা' কথ্যরূপকে বুঝতে পারেন। হো ভাষার বর্ণমালাগুলি দেব নাগরিক সংস্কৃত এবং ল্যাটিন বর্ণমালার অনুরূপ। এছাড়াও 'লাকো বোধরা' নামে একজন হো সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিংশ শতাব্দীতে 'ওয়াশাং সিটি' (Wasang City) নামক বর্ণমালা তৈরি করেছেন যা কোন কোন অঞ্চলে চালু রয়েছে।

গ্রামীণ এলাকার হো পরিবারগুলির উৎসবের মধ্যে বিশেষ পাঁচটি পরব বা উৎসব আছে সেগুলি হল 'মাঘি পরব' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এটি শীতকালের শেষ দিকে যখন মূল চাষটি শেষ হয় তখন এই উৎসবে হো গ্রামের মানুষেরা মেতে ওঠেন। এই উৎসবে প্রধান দেবতা হলেন 'সিং বোঙ্গা'। ১ সপ্তাহ ধরে এই উৎসব চলতে থাকে। সিংবোঙ্গা ছাড়াও অপরাপর বোঙ্গা দের এই সময় পূজা করা হয়। বসন্তের মাঝামাঝি সময়ে শালগাছ নতুন কচি পাতা ও ফুলে সুসজ্জিত হলে 'বাহা পরব' বা বাহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সহরায় চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি উৎসব যা গ্রামবাসীরা নিজেরাই উৎসবের সময় ঠিক করেন। এই উৎসবে বোঙ্গার উদ্দেশ্যে একটি কালো মুরগিকে উৎসর্গ করা হয়। গরুগুলিকে রং ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। শষ্য ওঠার পর নতুন শষ্য খাওয়ার পূর্বে 'জন্মানা পরব' অনুষ্ঠিত হয়। এই পরবের উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে নিরুপদ্রবে চাষ ওঠে আসার কারণে কৃতজ্ঞতা জানানো।

সমস্ত আদিবাসী সংস্কৃতিতে নাচ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের নিজস্ব নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। হো সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল তাদের নিজস্ব নাচ-গান। একটি গ্রামের নাচ-গানে অন্য গ্রামের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে নাচ-গান কালে এরা চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে যেমন-বাঁশি, ধামসা, মাদল, ঢোলক, কাঁসর ইত্যাদি।

যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হো আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্তরা হাঁড়িয়া পান করে, এই হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া হল প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা আদিবাসীদের খাদ্য তালিকার একটি বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ পানীয় খাবার যেটি হো আদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে সাথে অন্যান্য সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা পান করে থাকেন।

২০০১ সালে জাতীয় জনগণনা অনুসারে অধিকাংশ হো গোষ্ঠীভুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষরা সারনা ধর্মা বলম্বী। হো আদিবাসী গোষ্ঠীর 'সারণা ধরমের' সঙ্গে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, বিরহড়, ভূমিজ প্রমুখদের সমধর্মী। হো আদিবাসী গোষ্ঠীর পুরোহিতদের দেউরি (Deuri) বলা হয়।

হো আদিবাসী গোষ্ঠীর বিবাহে পাত্রপক্ষ পাত্রী পক্ষকে কন্যা পণ দেয়। এর পরিমাণ ১০১ থেকে ১০০১ টাকা। সবাই টাকা দিতে পারে না বলে অনেক হো যুবক বিবাহ করতে পারে না তাই বহু হো যুবতী বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে যায়। হো আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের প্রধান অর্থনীতি চাষবাসের উপর নির্ভরশীল যদিও নিজস্ব জমি জমা না থাকার কারণে এবং এক তৃতীয়াংশ হো গোষ্ঠীর মানুষ অন্যের চাষের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে। সাঁওতাল, ওঁরাও এবং মুন্ডাদের তুলনায় হো আদিবাসী গোষ্ঠী অনেক বেশি প্রগতিশীল।

হো গোষ্ঠীর মানুষদের বসবাসের স্থানগুলিতে প্রধানত শাল গাছের আধিক্য ছাড়াও তারা নিজস্ব এলাকাতে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, মহুয়া, কুসুম ইত্যাদি গাছের চাষ করেন। অসাধু কাঠ ব্যবসায়ীরা শাল গাছের জঙ্গল কেটে অন্য গাছের চারা বসাতে চেষ্টা করলে হো আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা চিরকাল বাধা দিয়ে এসেছেন প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ৪৪.৭% হো গোষ্ঠীর মানুষ সাক্ষর। এদের মধ্যে মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৩৩.১%। সাক্ষরতার হার আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে হো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হিন্দি এবং গণিত অধিক মাত্রায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার ই-লাইব্রেরী (E-Library) প্লাটফর্মে ২০১৭ সাল থেকে হো ছাত্রছাত্রীদের জন্য হিন্দি এবং আদুনিক বিষয়ে সমূহের পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন।

১.৫.৬ কোড়া (Kora):

কোড়া আদিবাসীরা ভারতের সমাজে বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন কুডা (Kuda), কুড়া (Kura), কাওড়া (Kaora), ধাঙ্গার (Dhangar), ধান (Dhan) ইত্যাদি (Mehta, 2004, p.340)। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে কোড়া আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪০৪ জন এবং সমগ্র ভারতে এই সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৭৮ জন, ভারত সরকার কোড়া গোষ্ঠীকে আদিবাসী গোষ্ঠীভূক্ত বলে স্বীকার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে কোড়া গোষ্ঠীর মানুষেরা রয়েছেন। কোড়া শব্দটি মুন্ডারী শব্দ 'কোডা' (Koda) থেকে নেওয়া হয়েছে যার অর্থ হল 'মাটির কাজ যারা করেন'। কোড়া গোষ্ঠীর মানুষেরা মাটিকাটার কাজে দক্ষ তাই কোথাও পুকুর কাটতে, পুকুর সংস্কার করতে বা খাল কাটতে গেলে কোড়া উপজাতি মানুষদেরকে এখনো কাজে লাগানো হয়। তাই গ্রামের দিকে চালু কথা হল 'পুকুর কাটতে' কোড়াকে ডাক।

মনে করা হয় যে কোড়া আদিবাসী আসলে মুন্ডা আদিবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা একটি পৃথক আদিবাসী গোষ্ঠী (Ming, Hansda, 2010, p.141)। Ligly ১৮৯৪ সালে কোড়া আদিবাসীদেরকে হিন্দু বলে স্বীকার করেছেন। এখনো কোড়া অধ্যুষিত জঙ্গলমহলের গ্রামগুলিতে গেলে দেখা যায় কোড়া আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা হিন্দুদের ন্যায় লৌকিক দেব-দেবীর পূজা করেন যেমন- মনসা, শীতলা, চন্ডী প্রমুখ। কোন কোন কোড়া অন্যান্য ধর্ম বিশেষত খ্রিস্টধর্মও পালন করেন।

যদিও কোড়ারা মূলত মাটি কাটার কাজে দক্ষ কিন্তু মাটি কাটার জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি গ্রাম অঞ্চলে ব্যাপক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে তাদের চিরাচরিত দক্ষতার কাজগুলি হারাচ্ছেন

তাই বর্তমানে কোড়ারা চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং দৈনিক মজুরিতে কাজ করছেন। জঙ্গল মহলে কোড়া পুরুষ ও মহিলারা শালপাতা সংগ্রহ এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহের কাজে নিজেদেরকে যুক্ত করেছেন।

কোড়াদের নিজস্ব 'কোড়া' ভাষা রয়েছে যা মুন্ডারী ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তবু পশ্চিমবঙ্গে কোড়ারা মূলত বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন, যদিও কোন কোন কোড়া গ্রামে নিজেদের মধ্যে কোড়া ভাষাতে কথা বলার চর্চা রয়েছে। তবে বহু গ্রামে কোড়া ভাষার ব্যবহার একেবারেই নেই বললে চলে।

কোড়া আদিবাসী মানুষদের পারিবারিক গঠন মূলত একক পরিবার। একই গোত্রভুক্ত কোড়ারা পরস্পর বিবাহ করেন না। যদিও কোড়াদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা চালু রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি পুরুষ একটি মাত্র মহিলাকে বিবাহ করেন। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কোড়াদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা চালু ছিল তবে ওই সময়ে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে মেয়েরা ১৮ বছর বয়স পূর্ণ না করলে বিবাহে বসতে পারত না। প্রাক বিবাহ যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গে কোড়ারা যথেষ্ট সংবেদনশীল, কিন্তু ঝাড়খন্ড, ছোটনাগপুর মালভূমিতে বসবাসকারী কোড়াদের মধ্যে প্রাক বিবাহ যৌনতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় সংবেদনশীলতা অনুপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া জেলায় বসবাসকারী কোড়াদের মধ্যে যদিও ১৮ বছর পেরনো মেয়েদের বিবাহ করার রীতিটি চালু কিন্তু একইসঙ্গে প্রাক-বিবাহ যৌনতা বিষয়ে গুরুতর সামাজিক বাধা রয়েছে। বিবাহ প্রথা যদিও মূলত উভয় পক্ষের মধ্যে দেখাশোনা করেই হয়। তবে প্রেম করে বিবাহ বা জোরপূর্বক তুলে এনে বিবাহ করার রীতিও চালু রয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবা মহিলাদের বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছিন্ন বা বিবাহ বিচ্ছিন্না, পুনর্বিবাহ ইত্যাদি প্রথাও

কোড়াদের মধ্যে চালু রয়েছে। বিবাহের সময় পাত্র পক্ষকে কন্যা পণ দিতে হয় এবং এই পণের পরিমাণ এগারো বা তেরো টাকা। পশ্চিমবঙ্গে কোড়াদের বিয়েতে হিন্দু প্রথা ব্যবহার হয়ে আসছে, কারণ কোড়ারা নিজস্ব আদিবাসী প্রথা ভুলে গেছে কিন্তু ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে কোড়ারা বিবাহতে মুণ্ডাদের প্রথা বা আদিবাসী প্রথা চালু রেখেছে।

স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোড়ারা শব দেহকে দাহ করেন কিন্তু অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোড়ারা শব দেহকে সমাধিস্থ করেন (Minz, & Hansda, 2010, p.144)। কোড়াদের গ্রামীণ শাসনব্যবস্থায় পঞ্চায়েত রয়েছে, যার মাথার উপরে রয়েছে একজন 'মাঝি'। মাঝিকে সহায়তা করেন 'পারামানিক'। মাঝি এবং পারামানিক সম্মিলিতভাবে কোড়া গ্রামের সামাজিক রীতিনীতিগুলিকে মেনে চলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেন।

১.৫.৭ বেদীয়া (Bedia):

বেদীয়া গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীদের মূলত ভারতে দেখা যায়। বেদীয়ারা মনে করেন যে তারা প্রধানত হাজারীবাগ জেলার বাসিন্দা ছিলেন। বেদীয়াদের বিশ্বাস বেদ বংশী রাজকুমারের সঙ্গে মুন্ডা মেয়ের বিবাহে বেদীয়াদের জন্ম। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে তাদের নিজস্ব বেদ থাকার কারণে বেদীয়া বলে মনে করা হয়েছে। যদিও বেদীয়াদের বেদ এবং আর্যদের বেদের মধ্যে কোন মিল পাওয়া যায় না। এছাড়াও সাঁওতালরা মনে করেন যে বেদীয়া গোষ্ঠীর মানুষরা সাঁওতালদের মধ্যে মুর্মু, সরেন, কিস্কু, বাস্কে, টুডু প্রভৃতির মত একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাঁরা আলাদা হয়ে নিজেদের মত থাকতে শুরু করেন এবং একটা সময় সাঁওতালদের মধ্যে বেদীয়াদের আর দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বেদীয়ারা বাস করেন। বেদীয়ারা মূলত তাঁদের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি

ভুলে গিয়ে অন্যান্য ধর্মের প্রভাবে বর্তমানে এরা হিন্দু এবং ইসলাম এই উভয় ধর্মের মধ্যে অবস্থান করছেন। বেদীয়ারা ভবিষ্যৎ বক্তা। ধামসা-মাদল, ড্রাম বাজিয়ে, রঙিন পাথর বিক্রি করে, গৃহপালিত পশুর খেলা দেখিয়ে এরা অর্থ উপার্জন করেন। প্রাচীন কালথেকে বেদীয়াদের জড়িবটির অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঔষধ তৈরির কাজে তাঁদের পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে খাদ্যের সন্ধান এবং অ-আদিবাসী দের দ্বারা আক্রমণ ও বিতাড়িত হওয়ার ফলে বংশ পরম্পরায় সংরক্ষিত আদিবাসী জ্ঞান (Indigenous Knowledge System) হারিয়ে যায়। পেটের খিদে মেটানোর জন্য তাঁরা বাধ্য হয়েছে যাযাবর শ্রেণীর মত জীবন চালানর। সুযোগ পেলে বেদীয়ারা চুরি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বেদীয়ারা নাগপুরী ভাষায় কথা বলেন। নাগপুরী ভাষাটি ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষা গোষ্ঠী। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এরা বাংলাতেও কথা বলেন। লেখার জন্য এরা বাংলা এবং সংস্কৃত বর্ণমালা ব্যবহার করেন। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমী জেলাগুলিতে বেদীয়ারা কুরমালি ভাষাতেও কথা বলেন। কোন কোন বেদীয়া মানভূঁইয়া ভাষাতেও কথা বলেন।

কোন কোন নৃতাত্ত্বিকদের মতে বেদীয়ারা কুড়মালিদের অংশ। বেদীয়াদের নিজস্ব চিরাচরিত ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। তাঁদের দেবতা মি, মুদকাটি, কুন্দরি, বাসন্সা, দারহা গ্রাম দেবতা-চন্ডী, দুর্গা, মহাদানিয়া, ঝের-বুড়ি, গাওডেটি'র পূজা করেন। বেদীয়াদের পুরোহিতদের কে বলে 'ওঝা', 'ভগৎ', এবং 'পাহান'।

বেদীয়াদের মধ্যে অল্প বয়সে বিয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, ১৪-১৫ বছরে মেয়েদের বিয়ে এবং ১৬-১৭ বছর বয়সে ছেলেদের বিবাহ হয়। দেখাশোনা বিবাহ ক্ষেত্রে পাত্র এবং পাত্রী উভয়ের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। বহুবিবাহ কিংবা একটিমাত্র বিবাহের যেকোনো একটি ছেলেরা

মেনে চলে। অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় বেদীয়ারা পাত্রপক্ষপাত্রীপক্ষকে কন্যা পণ দিয়ে থাকেন। স্বামী মারা গেলে কখন কখন বেদীয়া মহিলারা অবিবাহিত দেবরকে বিবাহ করেন। অর্থাৎ বেদীয়াদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু রয়েছে।

বেদীয়া গোষ্ঠীর আদিবাসীরা বর্তমানে চাষবাসে অভ্যস্ত এবং জঙ্গল থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করেন। বেদীয়া পরিবারে সম্পদ-এর অধিকার কেবলমাত্র ছেলেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমস্ত ছেলেরা সম্পত্তির সমান অধিকার পেলেও পিতার অবর্তমানে পিতার সম্মান পেয়ে থাকেন কেবলমাত্র বড় ছেলে, মেয়েরা কোনভাবেই সম্পত্তির অধিকারী নন। বেদীয়াদের মধ্যে জিটিয়া, সহরায়, ফাগুন, সারহুল ইত্যাদি উৎসব প্রতিপালিত হয়ে থাকে।

১.৫.৮ মালপাহাড়িয়া (Malpaharia):

মালপাহাড়িয়াদেরকে 'Hill Man' বা 'পাহাড়ের মানুষ' বলা হয়। 'মাল' বা 'Mal' কথাটির অর্থ 'মানুষ' এবং পাহাড়িয়া শব্দটির অর্থ 'পাহাড়' বা 'পর্বত'। প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যে মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসীদের দেখা যায়। পূর্বে তারা রাজমহল পাহাড়ে বসবাস করতেন, পরবর্তীতে এঁরা ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। পূর্বে রাজমহল পর্বত অঞ্চল ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পারগনা নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড রাজ্যে সরকার মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীদেরকে আদিবাসী বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন (Scheduled Tribe List of West Bengal State, 29.08.2009; Bihar Scheduled Tribe list; Scheduled Tribe List of Jharkhand)।

প্রকৃতপক্ষে তিনটি ভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সম্মলিত রূপ হল মালপাহাড়িয়া। এরা হলো যথাক্রমে সৌরিয়া পাহাড়িয়া (Souriya), মালপাহাড়িয়া (Malpaharia), কুমারভাগ (Kumarbhag Paharia)। এই তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতি পরস্পর থেকে

অনেকাংশেই পৃথক। হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীর আদিবাসীরা হিন্দুদের রীতিনীতি এবং প্রথা মেনে চলে। যদিও কোন কোন মাল পাহাড়িয়া আদিবাসীদের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব পুরানো বা চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথাকে মেনে চলতে দেখা যায়। মালপাহাড়িয়া আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগ রয়েছে যেমন-'Ahriti' রা শিকারী হয়, 'Dehritis' রা পুরোহিত গোষ্ঠীর হয়, 'Grihis' রা গৃহকর্মে নিপুণ হয়, 'Pujhons' রা পুরোহিত হয় এবং 'Manjhis' রা মালপাহাড়িদের গ্রামের প্রধানের ভূমিকা পালন করে (Risley,1892, pp.68-69)।

বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বকালে মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীরা সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল এবং নিজেরা স্বাধীন থাকতে পেরেছিল যদিও স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে মালপাহাড়িয়ারা একটি সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিল। স্থানীয় জমিদার থেকে বিশেষ চুক্তির কারণে মাল পাহাড়িয়াদের জমি কে বিভিন্ন 'ট্যাপাতে' (Tappa) ভাগ করা হয়েছিল, প্রতিটি ট্যাপার প্রধান হতেন একজন সর্দার। সর্দার আবার প্রতিটি মালপাহাড়িয়া গ্রামের প্রধান মাঝিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। সর্দার মালপাহাড়িয়া গ্রামগুলির আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার গুরুত্ব দায়িত্ব পালন করতেন, বিনিময়ে সমতলের মানুষেরা সর্দারদের কিছু জমি উপঢৌকোন দিতেন। পাহাড়গুলিকে বহিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিতেন মালপাহাড়িয়ারা এবং একটি সমতলের উপর জমিদার বা স্থানীয় রাজারা যে সকল দুর্গ তৈরি করেছিলেন তার রক্ষণাবেক্ষণার দায়িত্ব ছিল মালপাহাড়িয়া যোদ্ধাদের উপর। এর ফলে পাহাড় এবং সমতলে মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী মানুষদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকতো। প্রতিবছর এই সুসম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন করে চুক্তি হতো। ওই চুক্তির দিন সমতলের জমিদার এবং মালপাহাড়িয়া সর্দাররা ভোজ সভায় একত্রিত হতেন। মালপাহাড়িয়ারা

পুনরায় স্বাধীনতার জন্য উঠে পড়ে লাগলে স্থানীয় জমিদার এবং রাজারা মালপাহাড়িয়াদের গ্রাম প্রধানদের হত্যা করেন। সেই থেকে মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীর মানুষরা সমতলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সমতলের বহু অঞ্চলকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসে।

১৭৭০ সালে বঙ্গ দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় তাতে সমগ্র বঙ্গভূমি খাদ্যের অভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু মালপাহাড়িয়ারা এই দুর্ভিক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি কারণ তাঁরা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিলন। তাই খুব সহজে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই সমতলের বহু অঞ্চল কে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হন। ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত গঙ্গার দক্ষিনে রাজমহল পাহাড়ের কাছাকাছি অঞ্চলে সাধারণত মানুষ বা ব্রিটিশ সেনাদের পৌঁছানো ছিল অসম্ভব। এমনকি ব্রিটিশদের গুপ্ত চরদেরকেও অত্যাচারের বীরুধে মালপাহাড়িয়ারা সর্বস্বান্ত করে হত্যা করতেন। জঙ্গলের অধিকার পুনরায় ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে মালপাহাড়িয়া যোদ্ধারা তীরের ডগায় বিষ ব্যবহার করে ব্রিটিশ রাইফেলকে স্তব্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। অথচ ১৭৭৮ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে মালপাহাড়িয়াদের একটি চুক্তি হয়, ঐ চুক্তিতে ব্রিটিশরা মালপাহাড়িয়া সর্দারদের হাতে অর্থ এবং জমি তুলে দিতে বাধ্য হয়। এছাড়াও ঐ সময় বহু মালপাহাড়িয়ারা ব্রিটিশ সৈন্য হিসাবে নিযুক্ত হয়। যারা প্রথম দিকে তাদের চিরাচরিত অস্ত্র তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করলেও পরবর্তীতে ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যবহার্য বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্রের প্রশিক্ষণ পায়। মালপাহাড়িয়াদের একটি রেজিমেন্ট তৈরি করে ব্রিটিশ সরকার। এই রেজিমেন্ট ভাগলপুর জেলার হিল রেঞ্জের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত মালপাহাড়িয়া সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যের অন্তরভূক্ত ছিল (Huwitte, 1893, pp.237-300)।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য অঞ্চল থেকে মালপাহাড়িয়া আদিবাসী গোষ্ঠীদেরকে সমতলে নামিয়ে আনেন এবং তাদেরকে চাষবাসের কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই নীতি কার্যকারী না হওয়ায় ছোটনাগপুর মালভূমির দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল থেকে সাঁওতালদের সমতলে নামিয়ে আনা হয়। এরপরে মালপাহাড়িয়া এবং সাঁওতালদের মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত মালপাহাড়িয়া এবং সাঁওতালদের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল। এর কারণ সাঁওতালরা সমতল ভূমিতে নেমে এসে চাষাবাদ শুরু করলে সমতলে অ-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাঁওতালদের সম্পর্ক যত মজবুত হতে থাকে তত মালপাহাড়িরা সমতল ভূমির স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে বিচুত হতে থাকেন।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীদের মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০৭ জন। এর মধ্যে ঝাড়খন্ডে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৯৭ জন, পশ্চিমবঙ্গে ৪৪ হাজার ৫৩৮ জন এবং বিহারে ২ হাজার ২২৫ জন মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। মালপাহাড়িয়া আদিবাসীদের মধ্যে সম্পর্কিত কয়েকটি বলিষ্ঠ আদিবাসী গোষ্ঠী হল সৌরিয়া, পাহাড়িয়া, কুরুক এবং দ্রাবিড়িয় আদিবাসী গোষ্ঠী।

মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়দের মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং যুবা কালীন বিবাহ চালু রয়েছে। প্রাক-বিবাহ যৌন সম্পর্কের কারণে কোন মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীর মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়লে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে বিবাহ করতে হয় ওই ছেলেটিকে। মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীদের বিয়েতে কন্যা পণের রীতি রয়েছে। অর্থাৎ বিবাহতে পাত্রপক্ষ কন্যা পক্ষকে কন্যা পণ দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে পাত্র এবং পাত্রী হলুদ দিয়ে কষানো হলুদ রঙের কাপড় পড়ে। এই রীতি দেখা যায় বিশেষ আদিবাসী সম্প্রদায় সাঁওতালদের মধ্যেও। সিঁদুর দানের মধ্যে দিয়ে

মালপাহাড়িয়াদের বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রথমে পাত্র-পাত্রী কপালে সিঁদুর দেয় এবং পরে পাত্রী পাত্রের কপালে সাতটি সিঁদুরের ছাপ দেয়। মালপাহাড়িয়াদের মধ্যে বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ এই উভয় প্রথা চালু রয়েছে, স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে গ্রামের সভাতে মালপাহাড়িয়াদের বিবাহ বিচ্ছেদ কার্য করা হয় (Risley, 1892, pp.69-70)। মালপাহাড়িদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা চালু রয়েছে যেহেতু অধিকাংশ মালপাহাড়িয়া পরিবার যথেষ্ট দরিদ্র তাই ইচ্ছা থাকলেও একাধিক বিবাহ করতে পারে না। একাধিক স্ত্রীলাভ মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীদের পক্ষে বিলাসের সমতুল্য। তাই একটিমাত্র স্ত্রীতেই মালপাহাড়িয়া পুরুষদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

মাল পাহাড়িয়াদের প্রাচীন পেশা ছিল বন্যপ্রাণী শিকার এবং চাষবাস। জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা তিন বছর অব্দি জমি চাষ করতেন এবং এরপর তারা নতুন জায়গায় গিয়ে আবার বসবাস করে চাষবাস শুরু করতেন। তারা লাঙ্গল ব্যবহার করতেন না জমিতে গম, বাজরা, এবং ডালকে ছড়িয়ে দিয়ে চাষ করতেন।

বর্তমানে মালপাহাড়িয়ারা নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস ও চাষবাসের আধুনিক পদ্ধতিকে আয়ত্ত করেছেন। বর্তমানে মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীরা চাষবাস এবং বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাদের প্রধান খাদ্য ভাত, ডাল এবং শিকার করে আনা বন্য প্রাণী। এরা গোমাংস খাননা, হাঁড়িয়া, মহুল ফুলের মদ এবং দেশী মদ প্রায় সমস্ত পুরুষ এবং মহিলা খেয়ে থাকেন। তামাক চেবানো, পান খাওয়া, খৈনি খাওয়া, এবং জঙ্গলে বিভিন্ন ভেষজ শিকড় দিয়ে তৈরি বিড়ি খেতে এরা পছন্দ করেন (Houlton, 1949, p.81)।

মালপাহাড়িয়ারা নিজেদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে স্বীকার করেন। তাদের দেবতা হলেন ‘ধর্মের গোঁসাই’ নামে সূর্য দেবতা। ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে বেশ কিছু মালপাহাড়িয়া পরিবার

খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তিরিত হয়েছেন। মালপাহাড়িয়ারা কথ্য ভাষা হিসাবে চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কে ব্যবহার করেন, যেমন- মল্টো, মালপাহাড়িয়া, বাংলা এবং হিন্দি।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার কেবলমাত্র সন্তানদের মধ্যে বর্তায় (Sing, 2012, pp.714-716), বড় ছেলে পিতার সম্পত্তির অতিরিক্ত অংশ পান। মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তির সামান্য কিছু অংশ মাত্র পেয়ে থাকেন। সুতরাং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নীতিতে মালপাহাড়িয়া গোষ্ঠীরা হিন্দুদের ন্যায় নীতি অনুসরণ করে চলেন।

১.৫.৯ বিরহড় (Birhor):

বিরহড় এই নামটি থেকে বোঝা যায় যে জঙ্গলে বসবাসকারীদের বোঝান হচ্ছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৪-১৯৭৮) বিরহড়দের প্রথম আদিবাসী গোষ্ঠী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও পরবর্তী কালে বিরহড়দের Particular Vulrable Tribe বলে সরকারি ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে বিরহড় শব্দটির অর্থ হল জঙ্গলের আদিবাসী (Dweller of Jungle)। এই আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম মুণ্ডারি ভাষায় দুইটি ভিন্ন ভাষা থেকে এসেছে। বীর (Bir) শব্দের অর্থ হল 'জঙ্গল' বা 'Jungle' এবং হড় (Hor) শব্দের অর্থ হল 'মানুষ' বা 'Human', অর্থাৎ বিরহড় শব্দের অর্থ হল 'জঙ্গলের মানুষ' বা 'জঙ্গলের রাজা'। মধ্যভারত এবং পূর্ব ভারতের বিশেষত মধ্য প্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের বসবাস। তাঁরা এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে জীবন নির্বাহ করে আসছেন (Ray, 1981, p.159)। মধ্যপ্রদেশ ও বিহার ভেঙে গিয়ে উভয়ের কিছু অংশ নিয়ে ছত্রিশগড় নামক একটি ভিন্ন রাজ্য গঠিত হয়। অন্যদিকে বিহার থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি হয় ঝাড়খন্ড।

ভাষার দিক থেকে বিরহড়রা মুণ্ডা ভাষা গোষ্ঠী থেকে সৃষ্ট। বিরহড়রা বিশ্বাস করেন যে সূর্য থেকে তাঁদের সৃষ্টি তাই বিরহড়রা সূর্যকে 'সিংবোঙ্গা' বলে প্রাচীনকাল থেকে অভিহিত করেন এবং পূজার মধ্যমে আরাধনা করেন। খেরওয়ালদেরকে এরা ভাই বলে মনে করেন, কারণ খেরওয়ালরা বিশ্বাস করে যে তাঁদের এবং এই প্রাণী জগতের জন্ম সূর্য থেকে। বিরহড়রা অত্যন্ত প্রাচীন একটি আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়। সংখ্যার দিক থেকে ভারত ভূমিতে এরা তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে এরা কিছুটা পৃথক। এদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা যথেষ্ট কঠিন যেহেতু এঁরা উঁচু পাহাড়ে, গভীর জঙ্গলে, খুব শান্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত (Chakraborty,1981, p.159)। বিরহড়রা প্রথমে মধ্য ভারত এবং পূর্ব ভারতে বসবাস করত। কিন্তু আর্য সভ্যতার প্রভাবের সাথে সাথে এঁরা ক্রমশ পিছতে থাকেন। এবং শেষ পর্যন্ত বর্তমান ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমিতে সুস্থিতি লাভের সুযোগ পান। ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে কিছু বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষ বিভিন্ন বহিঃ শত্রুর চাপের কারণে পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চলে আসেন। সরকারের সহায়তায় বিরহড়রা অযোধ্যা পাহাড় থেকে নিচে অর্থাৎ পাহাড় সংলগ্ন উচ্চভূমিতে নেমে আসেন। পুরুলিয়া জেলায় বর্তমান বসবাসকারী বিরহড়দের পূর্বপুরুষরা যথাক্রমে রাঁচি, হাজারীবাগ, ধানবাদ এবং চাণ্ডিল থেকে বর্তমান পুরুলিয়ায় আসেন (Chakraborty,1981, p.159)। কিছু নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন বিরহড়রা অতি প্রাচীন কাল থেকেই পুরুলিয়ার পাহাড় ও গভীর জঙ্গলে বসবাস করতেন, কারণ পুরুলিয়া হল ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ তাই এই অঞ্চলে বহু কাল থেকে তাঁরা তাঁদের প্রাচীন রীতিনীতি ও প্রথাকে অনুসরণ করে বংশপরম্পরায় বসবাস করে আসছেন।

পুরুলিয়া জেলার বিরহড়রা নিজস্ব চাষাবাদ করেন না কারণ তাঁদের চাষযোগ্য জমি নেই। সরকারিভাবে ভূপতিপল্লী গ্রামে বিরহড় আদিবাসীদের কিছু জমি দেওয়া হয়েছে যদিও ঐ জমিগুলি চাষাবাদ যোগ্য নয়। বিরহড় পুরুষ এবং মহিলারা তাই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন এলাকার অন্যের জমিতে চাষ করতে যান। অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন উচ্চভূমিতে বসবাসকারী বিরহড়রা জঙ্গলে 'চিহরলতা' থেকে দড়ি তৈরি করে বিক্রি করতেন, এখন সিমেন্টের বস্তা থেকে দড়ি তৈরি করেন, এছাড়া শাল পাতা তুলে শালপাতার প্লেট তৈরি এবং বিক্রি করেন, জঙ্গলে শুকনো কাঠ এবং আকাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন স্থানীয় দোকানে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৭ সালে ভূপতিপল্লী গ্রামে প্রতিটি বিরহড় পরিবারকে ১৮০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল মুরগি পোল্ট্রি ফার্ম করার জন্য। রাজ্য সরকার বিরহড়দের বসবাসের জন্য প্রতিটি বিরহড় পরিবারকে একটি করে ইঁটের দেওয়াল ও ছাদে এ্যাজবেস্টর যুক্ত ১০ ফিট ১০ ফিটের বাড়ি তৈরি করেছেন। পুরুলিয়া জেলায় সমগ্র আদিবাসীদের জনসংখ্যার মধ্যে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১% এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে বিরহড়দের সংখ্যা ০.০১%।

References:

Ministry of Tribal Affairs, Government of India, 2014.

Ministry of Tribal Affairs, Government of India, 2014.

Vidyarthi, L.P., & Rai, B. K. (1985). *The Tribal Culture of India.* New Delhi: Concept Publishing Company.

Vidyarthi, L.P., & Rai, B. K. (1985). *The Tribal Culture of India.* New Delhi: Concept Publishing Company.

Vidyarthi, L.P., & Rai, B. K. (1985). *The Tribal Culture of India.* New Delhi: Concept Publishing Company.

Census report 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, British Government of India.

Vidyarthi, L.P., & Rai, B. K. (1985). *The Tribal Culture of India.* New Delhi: Concept Publishing Company.

Xaxa, V. (2008). *State, Society and Tribes-Issues in Post Colonial India-Pearson.* Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd. Pearson Education in South Asia.

Lokur Committee (1965). Department of Social Security, Government of India, p7.

Das Basu, D., Roy, S. R., Nandi, A.K., & Sen Gupta, S. P. (2007). *Case Book on India Constitutional Law.* Kamal Law House, Kolkata. P. 961.

Fuchs, S. (1973). *The Aboriginal Tribes of India.* The Macmillian Company Of India Ltd, New Delhi, p.172

Concise Oxford English Dictionary, (2007).

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান. (২০১২). *প্রসঙ্গ আদিবাসী.* Concept Publishing Company Private Limited, New Delhi.

পরিমল ভট্টাচার্য (২০১৯)। সত্যি রূপকথা/*সভ্যতা: উন্নয়ন ও উড়িষ্যার এক উপজাতির জীবন সংগ্রাম।* অবভাস (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃষ্ঠা.৭৯-৮০।

পরিমল ভট্টাচার্য (২০১৯)। সত্যি রূপকথা/*সভ্যতা: উন্নয়ন ও উড়িষ্যার এক উপজাতির জীবন সংগ্রাম।* অবভাস (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃষ্ঠা.৭৯-৮০।

সুবোধ ঘোষ (১৯৪৮)।*ভারতের আদিবাসী।* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৩১১।

সুবোধ ঘোষ (১৯৪৮)। *ভারতের আদিবাসী।* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৩১১।

সুবোধ ঘোষ (১৯৪৮)। *ভারতের আদিবাসী।* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৩১১।

সলিল সেন (১৯৫৩)। *নতুন ইহুদি।* ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৬৫।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৯), *'আরণ্যক'।* কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা, পৃষ্ঠা.১৭৫।

Vidyarthi, L.P., & Rai, B. K. (1985). *The Tribal Culture of India.* New Delhi: Concept Publishing Company.

Census of 1951, Government of India.

Census of 2011, Government of India.

Hunter W.W. (1997). A statistical account of Bengal. West Bengal District Gazetters. W.B. Government, pp.9,133,134.

Chattopadhyay, A. (date not found) Bardhaman Jelar Itihas O Loke Snaskriti (History and Folk Lore of Bardhaman District.) (In Bengali), pp. 21-26, ISBN 81-85459-36-3.

Sen Singh, D. (2018). The Indian Rivers: Scientific and Socio-Economic Aspects. *Singapore: Springer Hydrogeology. P.259.*

History of Purulia, Bharatonline.com. Retrived 17Th January 2013 (http://www.bharatonline.com/west-bengal/travel/purulia/history.html).

District Census Handbook: Purulia. General and Census Commissioner of India. 2011.

(https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/1354/download/4430/dh_2011_1914_part_a_dchb_puruliya.pdf).censusindia.gov.in.registrar "Tribal Zone" (http://www.tribalzone.net/people/jaipalsingh.htm).

Archived from the original on 7 January 2013, Retrieved 2 April 2012 (https://web.archive.org/web/20130107202215/http://www.tribalzone.net/people/jaipalsingh.htm).

Sabharwal, L. R., I. F.S., Conservator of Forests, Bihar, notes as part of appendix IV to report of the Damodar flood enquiry committee (1943). Republished in Rivers of Bengal, a compilation, 2002, p. 236, West Bengal District Gazeteers, Government of West Bengal.

Guha, R. (2008). India after Gandhi: the History of the World's Largest Democracy. ISBN 978-006095858-9.

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুশ্রী. *ভারতবর্ষের আত্ম পরিচয় (পূর্ব).* ভারত চিন্তাঃ ভারতের স্বরূপ সন্ধান। পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ. (১৯৮৭). *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড).* প্রকাশনায় শ্রীমতী রিঙ্কি বাস্কে, শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা.

Dalton, E. T. (1872). *Descriptive Ethnology of Bengal.* Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta. p.208

Mukhopadhyay, L. (2002). *Tribal Women in Development.* Publication Divisions, Ministry of Informative and Broadcasting, Government of India, New Delhi. p.133

Bahadur, K. P. (1977). *Bengal, Bihar and Orisha: Caste, Tribes, and Culture of India.* Vol-III. Ess Ess Publications, Delhi. pp. 13-14.

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-Ii. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. p. 232.

Troisi, J. (1979). *Tribal Religion, Religious Beliefs and Practices among the Santals.* Monohar Publications, New Delhi. p.26

Troisi, J. (1979). *Tribal Religion, Religious Beliefs and Practices among the Santals.* Monohar Publications, New Delhi. p.26

Sengupta. J. C. (1965). *West Bengal District Gazetteer, West Dinajpur.* Sree Swaraswaty Press Ltd., Calcutta, p.69

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-II. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. pp. 224-225

Khubchandani, L. M. (1992). *Tribal Identity-A Language and Communications Perspective.* Indian Institude of Advance Study, Shimla. p.350

Troisi, J. (1979). *Tribal Religion, Religious Beliefs and Practices among the Santals.* Monohar Publications, New Delhi.

Mukhopadhyay, L. (2002). *Tribal Women Development.* Publication divisions, ministry of informative and broadcasting government of India, New Delhi. P.133

Bahadur, K. P. (1977). *Bengal, Bihar and Orisha: Casete, Tribes, and Culture of India.* Vol-III. Ess ess publication, Delhi. pp.13-14

Hunter, W.W. (1876). *A Statistical Account of Bengal*. Vol-VII. District Of Maldah, Rangpur and Dinajpur, trubner & co, London, Pp381-382.

Sing, K.S. (2012). *The Scheduled Tribes.* Oxford university press, New Delhi, Pp.104-106.

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-II. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. pp.68-70

Sing, K.S. (2012). *The Scheduled Tribes.* Oxford University Press, *New Delhi*, pp.714-716

Damoder Valley (https://web.archive.org/web/20070927182506).

About the Region-Damodar Basin, Ministry of Environments and Forests. (http://envfor.nic.in/divisions/cltech/damodar/1.1.htm). 2007-09-27. Retrieved 2008-05-25.

History, Tradition, Culture, Heritage, Tourism & Festivals of Purulia (https://web.archive.org/web/20121104150746/).

Archived from the original. (http://www.cityofmine.in/history-tradition-culture-heritage-tourism-festivals-of-purulia). On 4rth November 2012. Retrived 17 January 2013.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পর্কিত সাহিত্যের পর্যালোচনা

(Review of Related Literature)

২.১ ভূমিকা (INTRODUCTION):

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার আদিবাসীদের উপর গবেষণা শুরু করেন, কারণ এই সময় থেকে আদিবাসী সম্পর্কিত আলোচনাকে ভারত সরকার গভীরভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতি স্বাধীন ভারতে বহু সংখ্যক গবেষক আদিবাসীদের বিষয়ে নিরন্তর গবেষণা কার্য চালিয়ে আসছেন। ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় জনগণনা অনুসারে সমগ্র ভারতে প্রায় ৭০০ প্রকারেরও বেশি আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছেন। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ৪০ প্রকারের আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গের মূলত পশ্চিম প্রান্তে এবং উত্তর প্রান্তে আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস। প্রতিটি আদিবাসী সমাজের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত প্রেক্ষাপট ভিন্ন। প্রথাগত শিক্ষার দিক থেকে সমস্ত প্রকারের আদিবাসীরা অ-আদিবাসীদের থেকে বহু অংশে পিছিয়ে রয়েছে। এছাড়াও যুগ যুগ ধরে আদিবাসীরা প্রাচীন ধারার নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছেন এবং এর মধ্যে দিয়ে তারা তাদের পরিবেশকে সুরক্ষিত রেখেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নে বিভিন্ন কমিশন বসিয়েছেন এবং কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে ভারত সরকার সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে আদিবাসী সমাজের পশ্চাৎপদতার

পেছনে সম্ভাব্য কারণ সমূহ এবং এর থেকে আদিবাসী সমাজকে মুক্ত করার সম্ভাব্য পথ। এতদসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সমস্ত ধরনের আদিবাসী সমাজ আজও পিছিয়ে রয়েছে।

প্রতিটি সমাজে বিশেষত আদিবাসী সমাজে নিজস্ব একটি চিরাচরিত/পরম্পরাগত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তাদের এই চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থায় এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের শিক্ষায় এই ব্যবস্থাকে আনা সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময়ে যেসব নতুন শিক্ষা পদ্ধতি সমগ্র দেশব্যাপী চালু হয়েছে তাতে আদিবাসী সমাজের শিক্ষা এবং সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, ভাষাগত প্রেক্ষাপট ব্যাহত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই বিভিন্ন স্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার পরিকাঠামোতে আদিবাসীদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। এই পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, অপ্রথাগত এবং ধারাবাহিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন যাতে করে আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর কারণ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা ব্যতিত কোন সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং আদিবাসীদের শিক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাওয়া অবশ্য প্রয়োজন। যদিও রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তবু এককভাবে সরকারের পক্ষে এত বড় রাষ্ট্রের সকলকে শিক্ষিত করে তোলা একেবারে সম্ভব নয়। তবে আদিবাসীরা মূলত মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর জঙ্গলে বা জঙ্গলের কাছে পর্বতে বসবাস করতে পছন্দ করে যেখানে সর্বসাধারণ সহজে পৌঁছাতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত মানুষরা বহু দূরে গিয়ে আদিবাসীদের শিক্ষাদানে আগ্রহ দেখায় না। তবে শিক্ষিত আদিবাসীদের দ্বারা আদিবাসী এলাকায় আদিবাসীদের শিক্ষা দেওয়া যেতে

পারে, এতে আদিবাসীরা সহজে নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। তাই স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ভারতীয় বিভিন্ন সমাজ সেবী, স্বেচ্ছাসেবী, সমস্ত আদিবাসীদেরকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাদের প্রচেষ্টা প্রায় বিচ্ছিন্ন আদিবাসী সমাজ যেন সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে। এই বিষয়ে সব থেকে বেশি ভূমিকা পালন করছেন বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারীরা। এছাড়াও বর্তমানে সর্বভারতীয় স্তরে আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনগুলি নিজস্ব প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আদিবাসীদের শিক্ষিত করে তুলতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছেন। এছাড়া অনেক ছোট ছোট সংস্থা আদিবাসীদের শিক্ষা এবং উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণ করছেন।

২.২ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা এবং সাহিত্য (Review of Related Literature):

ঘোষ এবং চ্যাটার্জি (২০২৪) বিরহড়দের সমাজ এবং সংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেন। তাঁরা গবেষণার জন্য ঝাড়খণ্ডের বিরহড় আদিবাসীদের নির্বাচন করেছিলেন। ঝাড়খণ্ডের রাঁচি জেলার বাসু কোঁচা (Basu kocha), পাহাড় সিং (Pahar sing), চিপিবাঁধি নামক তিনটি এলাকা থেকে বিরহড় আদিবাসীদের নির্বাচন করে তাঁদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বাসুকোঁচা এবং চিপিবাঁধি এলাকা দুইটি রাঁচি জেলার তামার ব্লকের মধ্যে পড়ে। পাহাড় সিং এলাকাটি রাঁচি জেলার আঙ্গারা ব্লকের অধীন। এই তিনটি এলাকায় কেবল মাত্র বিরহড় মানুষরাই রয়েছেন। উল্লিখিত প্রতিটি এলাকাই পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং ভিন্ন ভিন্ন দিকে রাঁচি শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার। বিরহড়দের বসবাসের উল্লিখিত এলাকাই চারিদিক থেকে গভীর অরণ্যের মধ্যে রয়েছে, যা বিরহড়দের জীবনযাপনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনটি এলাকাতে মোট ৮০ টি

বিরহড় পরিবার বসবাস করে। রামকৃষ্ণ মিশন, রাঁচি ১২ টি পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে প্রায় ১৫-২০ বছর আগে, যাতে করে বিরহড় আদিবাসীদের পুনর্বাসন দেওয়া যায়। এই গভীর জঙ্গলে থাকা বিরহড় আদিবাসীদের বসবাসের স্থানগুলিতে অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রাঁচি বিরহড়দের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ কর্ম গ্রহণ করেছেন। NABARD পাহাড় সিং এলাকার জন্য ৭ কিলোমিটার কংক্রিট ঢালাই রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন, ফলে পাহাড় সিং এলাকার সঙ্গে শহরের ভালো যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। Jharkhand Tribal Development Society (JTDS) বিরহড় পরিবারদের জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনায় স্থায়ী পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। MECON এবং Jharkhand Renewable Energy Development Agency (JREDA) যৌথ ভাবে দুইটি সৌর চালিত গভীর নলকূপ এর ব্যবস্থা করেছেন। ফলে বাসুকোঁচা এবং চিপিবাঁধি এলাকাগুলিতে সারা বছর পরিস্রুত পানীয় জলের যোগান অব্যাহত রয়েছে এবং রাস্তা তৈরি হওয়ায় নিকটবর্তী শহরের সঙ্গে বিরহড়রা সারা বছর যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছেন। কয়েকটি পুকুর খনন করে দিয়েছে যাতে বিরহড় আদিবাসীরা চাষের জন্য জল এবং সারা বছর দৈনন্দিন কাজকর্ম করার জন্য জল ব্যবহার করতে পারেন। বিরহড়রা তাঁদের জীবন এবং জীবিকার জন্য মূলত জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল থাকতে বেশি পছন্দ করেন। জঙ্গল থেকে শাল পাতা, জ্বালানি কাঠ, ওষধি গাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করে দূরের এলাকায় বা শহরে বিক্রি করে সংসারের ব্যয়ভার বহন করেন। অধিকাংশ বিরহড় মানুষদের কোন চাষযোগ্য জমি নেই। যাদের হাতে অল্প জমি রয়েছে তা খণ্ডিত। জমি চাষের জন্য গরু বা বলদকে ব্যবহার করে, যদিও অনেকেই লাঙলের জন্য ট্রাক্টর ব্যবহার করেন। বিরহড়রা সাধারণত বছরের দুই থেকে পাঁচ মাস দূরের এলাকায় মজুর খাটতে যান। অধিকাংশ জন ইট ভাটাতে এবং পাকাবাড়ি

তৈরির জন্য মজুর হিসাবে কাজ করেন। এরা অধিকাংশই নিরক্ষর। যদিও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম রাঁচি এঁদের স্বাক্ষর করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ঝাড়খণ্ডের বিরহড়রা এখন পর্যন্ত নিরন্তর জীবন সংগ্রামে রত রয়েছেন।

এই গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার, জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে হেঁটে ওষধি গাছ সংগ্রহ। সেন্সাস রিপোর্ট এবং পর্যবেক্ষণের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। বাস্তব মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরুর পূর্বের বিরহড়দের গ্রাম খুঁজে বার করবার জন্য ব্লক স্তরের কিছু মানুষের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে মুক্ত প্রশ্নমালার ব্যবহার হয়েছে। গবেষকরা বিরহড় পুরুষ মহিলা যুবক যুবতী প্রত্যেকেরই পৃথকভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে - সহপাঠী দলের মিটিং এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের তথ্য নেওয়া হয়েছে। বিরহড় সমাজ এখনও আদিম সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত হয়। বিরহড়দের বিবাহ প্রথা অনুসারে একটি পুরুষ একটি মাত্র নারীকে বিয়ে করতে পারে। অর্থনৈতিক ভাবে এঁরা জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ, শালপাতা সংগ্রহ, শালপাতার থালা তৈরি, জঙ্গলের লতা থেকে দড়ি তৈরি এবং দড়ির দ্রব্য তৈরি করে। ধর্মের দিক থেকে এঁরা সিং বোঙ্গা অর্থাৎ সূর্য দেবতা এবং চাঁদ বোঙ্গা অর্থাৎ চন্দ্র দেবতার পূজা করেন। এঁদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান হল- মকর পরব (January), ফাগুন পরব বা শিকার উৎসব (February), সারহুল উৎসব (March), করম এবং জিটিয়া উৎসব (September), দাসায় এবং সহরায় (October) ইত্যাদি। এঁরা বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকে।

এঁদের জন্ম এবং মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত অনুষ্ঠানগুলি আদিম প্রকৃতির। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বয়স্করা মারা গেলে তাঁদের আত্মা এলাকাতে ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া জঙ্গল থেকে নিজেদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষধি ব্যবহার করেন।

সাক্ষী ওঁরাও (২০২৪) ছত্তিশগড়ের বিরহড় উপজাতিদের সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন- **"A study of Cultural Practice of Birhor Tribal, with Special Reference to Chhatisgarh".** ভারতে যে সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিরহড় উপজাতি অন্যতম। ভারতের পূর্ব অঞ্চলে বিরহড় উপজাতিদের বসবাস। এই আদিম উপজাতিদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, জীবন চর্চা, প্রথা এবং বিশ্বাস সমূহ তাঁদের জীবনের এক বিশেষ দিককে নির্দেশ করে। সংস্কৃতির দিক থেকে তাঁরা অনেক বেশি পুরাতনপন্থী। এদের সামাজিক সংগঠন, ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস, খাদ্যভাস, পোশাক পরিচ্ছদ, শিল্পকলা, এবং সঙ্গীতের মধ্যেও চিরাচরিত ভাবনার বীজ রয়েছে। বহুযুগের প্রথার ভিত্তিতে বিরহড় উপজাতির সামাজিক গঠনটি তৈরি হয়েছে। বিরহড়রা ছোট ছোট দলে পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে থাকে। বিরহড়দের সমাজ ব্যবস্থায় যে কোন ধরনের জটিলতা সহযোগিতা এবং পরস্পরিক সহায়তার ক্ষেত্রে তাঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়। বিরহড়দের ভাষার মধ্যেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক দিক ধরা পড়ে। বিরহড়রা যেহেতু বর্তমানে অন্যান্য আদিবাসী এবং মূলস্রোতের সাধারণ মানুষদের স্পর্শে এসে পৌঁছেছে তাই এখন এরা বিরহড় ভাষা ছাড়াও বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি ভাষাকে রপ্ত করেছে। এছাড়াও কোন কোন অঞ্চলে বিরহড়রা নিজেদের ভাষা জানে না। অর্থনৈতিক ভাবে এরা পাঁচরকম পদ্ধতিতে জীবিকা নির্বাহ করে-

ক) জঙ্গল ভিত্তিক কাজকর্ম অর্থাৎ বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা। এরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জঙ্গল থেকে বিভিন্ন প্রকারের ওষধি গাছ সংগ্রহ করে। জঙ্গলের জীব বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র এদের নখদর্পণে।

খ) বিরহড়রা ঝুম প্রথায় চাষবাস করে। এই পদ্ধতিতে তারা ভুট্টা এবং বিভিন্ন ধরনের ডালের চাষ করে। একটি অঞ্চলে কিছুদিন ঝুম প্রথায় চাষ করবার পর তাঁরা ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে এবং নতুন এলাকায় একই ভাবে চাষবাসের কাজ শুরু করে।

গ) এরা জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু গৃহপালিত পশু পালন করে যেমন গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদি। এই সমস্ত গৃহপালিত পশু থেকে তাঁরা দুধ, মাংস ইত্যাদি লাভ করে। এবং চামড়া বিক্রি করে। তাৎক্ষণিক অর্থের প্রয়োজন হলে বিরহড়রা গবাদি পশু বিক্রি করে অর্থের সংস্থান করে।

ঘ) ঝুড়ি বোনা, মাদুর বোনা, বাঁশ, ঘাস দিয়ে আসবাবপত্র, মাটির আসবাবপত্র, পুঁতির এবং শঙ্খের মালা, চিত্র কর্ম, কাঠের কাজ, বাঁশের কাজ, এবং পুরুষ মহিলাদের অঙ্গ সজ্জার জন্য এরা বিভিন্ন রকমের অলঙ্কার তৈরি করেন।

ঙ) বর্তমান বহু ক্ষেত্রে বিরহড়রা নিকটবর্তী সাধারণ গ্রামে প্রাত্যহিক মজুরিতে চাষের জমি, ঘরবাড়ি তৈরি এবং অন্যান্য শ্রম সাধ্য কাজে অংশ গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করে।

এস. বানসাল, টি. সরকার, এ. যাদব, আই. গারগ, এম. গুপ্ত এবং এইচ. সার্ভিয়া (২০২৩) প্রমুখ গবেষকরা দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং স্থিতিশীল বিকাশ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা পত্রপত্রিকার মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে ভবিষ্যৎ গবেষণায় আলোচ্যক্ষেত্রগুলি হবে প্রধানত ছয়টি শিরোনামে –

১) Economy: এর অধীনে যে গবেষণাগুলির কথা ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য তাঁরা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলি হল SDG1 অর্থাৎ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, SDG8 অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সুস্থভাবে কাজের অধিকার, SDG9 অর্থাৎ শিল্প ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

২) Ecology: এর অধীনে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে ভাবি কালের গবেষকেরা কাজ করবেন বলে বর্তমান গবেষকরা প্রত্যাশা রেখেছেন- SDG6 অর্থাৎ বিশুদ্ধ জল এবং পরিচ্ছন্ন প্রয়োগ প্রণালী, SDG7 অর্থাৎ ক্রয়যোগ্য শক্তি, SDG13 অর্থাৎ পরিবেশ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ, SDG14 অর্থাৎ জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ বিষয়ে গবেষণা, SDG15 অর্থাৎ মাটির উপরে জীব সম্বন্ধে গবেষণা এদের সুরক্ষার জন্য কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩) Socio-Demography Feature: SDG4 অর্থাৎ উন্নত গুণমানের শিক্ষা, SDG5 অর্থাৎ লিঙ্গভিত্তিক সমতা, SDG10 অর্থাৎ বৈষম্যের হ্রাস করন।

৪) Livelihood: SDG2 অর্থাৎ কোন মানুষ এবং জীব যেন না ক্ষুধার্ত থাকে, SDG3 অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা।

৫) Sustainable Development Conservation: SDG11 অর্থাৎ স্থিতিশীল শহর এবং জনগোষ্ঠী, SDG12 অর্থাৎ দায়িত্ব সহকারে সম্পদের ভোগ এবং উৎপাদন।

৬) Politics Policy And Partnership:

SDG16 অর্থাৎ শান্তি, ন্যায়বিচার, দক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহ, SDG17 অর্থাৎ লক্ষ্যমুখী অংশী দারিত্ব।

পার্থ গরাই, অভিজিৎ দে এবং বিপ্লব কুমার মোদক (২০২২) পুরুলিয়ার বিরহড়রা মূল সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এই সম্পর্কে গবেষণাধর্মী একটি পত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের গবেষণার শিরোনামটি হল **"Birhors of Purulia: Marching Toward Mainstream of the Society".**

উদ্দেশ্য এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল পুরুলিয়া জেলার বিরহড় গোষ্ঠীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার অধ্যয়ন ও জানার চেষ্টা করা।

ফলাফল: এই গবেষণায় গবেষক পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকে মোট ১১৩ টি বিরহড় পরিবারের উপর গবেষণা করেন। গবেষকের এই গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা মূলধারার সমাজের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছেন এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে ধীরে ধীরে তাঁরা অংশ নিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তবে বিরহড় শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা পেলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা থেকে তাঁরা বঞ্চিত এবং তাঁদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতে বা টিকিয়ে রাখতে অসমর্থ হচ্ছে বা হিমশিম খাচ্ছে।

পাত্র, দত্ত এবং উপাধ্যায় (২০২১) ঝাড়গ্রাম জেলায় আদিবাসীদের শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা করেন এবং প্রকাশিত এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"An Analysis on the Educational Awareness of Marginalized Communities on Nayagram Block, Jhargram District, West Bengal".** ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের বেশিরভাগ আদিবাসী গোষ্ঠী এখনও সমাজের মূলস্রোত থেকে অনেকটাই বিছিন্ন। পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্যে অবস্থিত নয়াগ্রাম ব্লকটি অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পশ্চাৎপদ এবং একসময়ে এটি মাও সে তুং (নকশাল) ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিল এবং এখানে নক্সালদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। ভারতসরকারের (২০১৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মতে ভারতের ৮৭ টি শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ব্লকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নয়াগ্রাম ব্লক অন্যতম। এখানে বহুসংখ্যক তপশীলি জাতি, তপশীলি আদিবাসী এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতির মানুষদের বসবাস। বর্তমান গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত নয়াগ্রাম Community Development ব্লকে পিছিয়ে পড়া তপশীলি জাতি এবং তপশীলি আদিবাসী এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে শিক্ষাগত সচেতনতা বিষয়ে গবেষণা। গবেষকরা চলরাশি হিসাবে উত্তরদাতাদের লিঙ্গ, বিষয় এবং সাক্ষরতার মানকে গ্রহণ করেছেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকরা Simple Random Sampling Technique ব্যবহার করে ২০০ জন নমুনাকে চিহ্নিত করেছেন। নমুনা দলের মধ্যে ১০৮ জন পুরুষ এবং ৯২ জন মহিলা। নমুনাদের মধ্যে ৪৪ জন তপশীলি জাতি গোষ্ঠীভুক্ত, ৫৪ জন তপশীলি আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত এবং ১০২ জন নমুনা পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীভুক্ত। একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা ব্যবহার করে গবেষকরা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করেছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে যানা যায় যে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা গত সচেতনতা বিষয়ে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই। এছাড়াও অল্পবয়সেই যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধার মধ্যে শিক্ষাগত সচেতনতার বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য অনুপস্থিত। শিক্ষিত মানুষদের তুলনায় অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিতরা শিক্ষাগত সচেতনতায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। গবেষকরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সচেতনতা ব্যাতীত প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতাকে দূরীভূত করা সম্ভব নয়। এবং এর জন্য অর্থ, সম্পদ এবং শিক্ষা গত দিক থেকে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীভুক্তদের নিয়মিত

সচেতনতা কর্মশালা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্ম ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা এবং ভবিষ্যৎ কাজে সুযোগ বিষয়ে নির্দেশদান জরুরী।

এস. সামন্ত (২০২১) পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মনোভাব এবং আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিষয়ে একটি গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"Attitude towards Girls Education and Socio-Economic Status of a Tribal Village in West Bengal".** এই গবেষণা পত্রের মূল উদ্দেশ্য হল পিতা মাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মনোভাব বিষয়ে গবেষণা করা। সমীক্ষা পদ্ধতিতে গবেষক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ফলাফল থেকে দেখা যায় ১৫ জন আদিবাসী মা বাবার মধ্যে ১৩ জন মা, বাবা তাঁদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন। অন্য দিকে ১৫ জন আদিবাসী মা বাবার মধ্যে ১৪ জন মা বাবা তাঁদের পুত্র সন্তানকে উচ্চশিক্ষার লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ১৫ জন মা বাবা জানিয়েছেন যে তাঁদের মেয়েরা বিদ্যালয়ে যায়। ১৪ জন আদিবাসী মা বাবা জানিয়েছেন যে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁরা মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অধিক গুরুত্ব দেন। আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে প্রতিবেশী আদিবাসী বাবামাদেরও মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে প্রায় একই মতামত। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা তাঁদের মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে কখনই কিছু বলেন না। গবেষকরা সিদ্ধান্তে আসেন যে আদিবাসী বাবা মা এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাবামারা তাঁদের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন।

জয়িতা সিনহা এবং সুরেশ চন্দ্র মুর্মু (২০২০) বিরহড় আদিবাসীদের ধর্মীয় রূপান্তর একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি গবেষণাধর্মী পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম

হল "**Religious Transformation of the Birhor Tribe: An Anthropological Analysis".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিরহড় আদিবাসীর ধর্মীয় রূপান্তর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং আদিবাসীদের জীবনে ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব।

পদ্ধতি: গবেষকগণ তাঁদের গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য বিরহড় জনবসতির সিমলিপাল হিল, ময়ুরভঞ্জ, ওড়িশার তিনটি স্থান অর্থাৎ দুরদুরা, কেন্দুমুণ্ডী এবং চাতানি নির্বাচন করেছিলেন এবং পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার ও ভয়েস রেকর্ডার পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। প্রধান তথ্যদাতা হিসাবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে আদিবাসীদের পুরোহিত, বয়স্কদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তরুন বা যুবক যুবতী প্রজন্মের থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়ে ছিল। তিনটি এলাকা থেকে ধর্মীয় সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার পর ঐ এলাকায় খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কেও তথ্য নেওয়া হয়েছিল।

ফলাফল: গবেষণার ফলাফল থেকে গবেষকগণ জানতে পারেন যে ৮৫% বিরহড় আদিবাসীরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং বাকি ১৫% বিরহড় আদিবাসী মানুষরা তাঁদের প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাসী। কারণ হিসাবে গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে বিরহড় আদিবাসীদেরকে পুনর্বাসনের নামে একটি স্থানে অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের পাশে এনে বসানো হয়েছে। সরকার ছোট ছোট প্রোজেক্ট প্রয়োগ করেছেন বিরহড়দের আর্থ সামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য। কিন্তু সঠিক ভাবে থাকার জন্য ও চাষের জন্য বাড়তি কোন জমি দেওয়া হয়নি। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় শিকার করা থেকে তাঁদের যে অর্থনীতি সেইখান থেকে তাঁরা চাষের কাজে পরিবর্তিত হবে অনুপ্রাণিত হবে কি ভাবে। এছাড়া বনদপ্তর থেকে বন আইন সিমলিপাল ন্যাশনাল টাইগার রিজার্ভেশন এর জন্য বিরহড় আদিবাসীদের সাথে সাথে অন্যান্য আদিবাসী মানুষদের জঙ্গল

থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রহণের অধিকারকে বাধা নিষেধ দেওয়া হয়েছে। একদিকে আদিবাসীরা তাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক উপাদান অবলম্বন করে সামাজিক মর্যাদা উন্নত করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে জঙ্গলের উপর নির্ভর করে জীবন টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করছে। তবে একদিকে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন বিকল্পপথ গ্রহণ করতে। তাঁদের সামাজিক অর্থনৈতিক, সুস্বাস্থ্য এবং আধুনিক শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা আর্থ সামাজিক, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষাগত অবস্থার উন্নতির কারণে তাঁদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। তাই তাঁরা খ্রিস্টান ধর্মকে আপন করে নিয়েছেন। সুতরাং গবেষকগণ বলেছেন যে বিরহড় আদিবাসীদের নিজস্ব সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আদিবাসীয় জ্ঞান ব্যবস্থা পরিবর্তন সরাসরি দায়ি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে।

মাল এবং পাত্র (২০২০) পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতাল আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং প্রকাশিত পত্রের শিরোনাম হল- **"A Study on Educational Status on Santal (Tribal) Communities: A Theoretical Study on Gourangdihi Gram Panchayet of Purulia (1978-2011)".** তাঁরা গবেষণার জন্য পুরুলিয়া জেলার গৌরাঙ্গ ডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঁওতালদের শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত তথ্য সমূহের সময় কাল ছিল ১৯৭৮-২০১১ সাল পর্যন্ত। যে কোন রাষ্ট্রে গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। আদিবাসী সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণে তাঁরা তাঁদের মানবাধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং সক্রিয় নন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিটি আদিবাসী শিশুর শিক্ষা অধিকার বিষয়েও তাঁদের কোন জ্ঞান নেই। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বজনীন এবং

বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। শিক্ষায় এবং উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী মানুষদের মধ্যেকার ফারাককে দূরকরবার লক্ষ্যে ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন। গবেষকরা তাঁদের গুণগত মান ভিত্তিক গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে প্রতি বছর গৌরাঙ্গ ডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাঁওতাল ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। এর ফলশ্রুতিতে মূলস্রোতের বিভিন্ন শিক্ষার প্রতি পঠনে আদিবাসী তথা সাঁওতাল ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে।

সঞ্জিতা কুমারী দেবী এবং নিবেদিতা ঢাল (২০২০) সরকারের উদ্যোগে আদিবাসী মহিলাদের উপর আর্থ সামাজিক কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল "**Socio-Economic Initiatives of the Government and its Efficacy on Tribal Women".**

উদ্দেশ্য: গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল আদিবাসীদের উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য সরকারের দ্বারা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ সম্পর্কে জানা। আদিবাসী মহিলাদের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত উপাদানগুলি দায়ী সেগুলিকে খুঁজে বেরকরা। এবং যে সমস্ত উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি রয়েছে তা দিয়ে অতিরিক্ত আয় এবং কর্মসংস্থান কিভাবে হবে তার কার্যকারিতা নিরপন করা।

পদ্ধতি: এই গবেষণায় প্রাথমিক এবং গৌণ তথ্য কে ভিত্তি করে অধ্যয়ন করা হয়েছে। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে আদিবাসীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বিভিন্ন সূত্র থেকে। এবং প্রাথমিক তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে আদিবাসী পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাঠামোগত প্রশ্নমালার বিশ্লেষণ ব্যবহার করে।

ফলাফল: গবেষকদের গবেষণায় উঠে এসেছে যে কয়েক দশকের পরিকল্পনার পরেও দেখা যায় আদিবাসীরা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে এখনও অনেকটা বঞ্চিত। তাঁদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁদের মূল্যবান সম্পদ জমিকে বিক্রি বা বন্দকী দিতে হয়। এখনও পর্যন্ত অসচেতনতা, পদ্ধতিগত বিলম্ব এবং আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে এবং নিজের জমিতে ঋণ নেওয়ার কারণে শোষিত হতে হয়। এছাড়াও তাঁরা তাঁদের জমি থেকে বঞ্চিত হন। আদিবাসীদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে দারিদ্র্য এবং ঋণগ্রস্থতায়, ফলে তাঁরা দুর্বল ভাবে জীবন যাপন করছেন। সরকারীভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প কাগজ কলমে থাকলেও সঠিক ভাবে প্রয়োগ না হওয়ার কারণে সামগ্রিক ভাবে দেখলে আদিবাসীরা এখনও শোষিত হচ্ছেন।

ববিতা বাইন এবং জিতেন্দ্র কুমার প্রেমী (২০১৯) ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যের বিরহড় উপজাতির নৃতাত্ত্বিক ওষধি জ্ঞানের উপর একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল "**An Investigation on the Ethno-Gynecological Medicinal Knowledge of the Birhor Tribe of Chhattisgarh, India**"।

উদ্দেশ্য: ছত্তিশগড় রাজ্যের বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত অসুস্থতা সম্পর্কিত ওষুধ এবং নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ করা।

পদ্ধতি: এই গবেষণা পত্রে গবেষকগণ তথ্য সংগ্রহে দুই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেন, একটি হল প্রাথমিক তথ্য এবং দ্বিতীয় হল গৌণ তথ্য। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকগণ ছত্তিশগড় রাজ্যের রায়গড়, কোরবা জেলার যথাক্রমে ধর্ম জয়গড় এবং করবা উন্নয়ন ব্লকের ছয়টি গ্রামে বসবাসকারী বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহি বিশেষজ্ঞদের কাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষকগণ তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। এই তথ্য

গবেষকগণ সুয়েন-মাইয়েন নামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাজ থেকে গভীরতর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন।

ফলাফল: ফলাফল হিসাবে গবেষকগণ দীর্ঘ গবেষণার পর পেয়েছেন যে ভারতে ছত্তিশগড় রাজ্যের বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীদের যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান তা প্রশংসনীয়। কারণ তাঁরা তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন মোট ২৫ ধরনের ওষুধের বর্ণনা এবং বিরহড় আদিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত ৩২ টি ওষধি গাছের বিভিন্ন অংশের ফাইটোকেমিক্যাল এবং ফার্মাকোলজিকাল বৈশিষ্ট্যগুলি, যেটি এই গবেষণা পত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। এই গবেষণা পত্র থেকে জানা যায় যে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীদের যে উচ্চতর ওষধি জ্ঞান তা প্রচুর প্রশংসনীয়।

বাসু এবং চ্যাটার্জি (২০১৮) আদিবাসী ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের অবস্থান সমন্ধে গবেষণা করেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকরা মেদনীপুর জেলার বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত বিদ্যালয়গুলিকে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের গবেষণার উদ্দেশ্যেগুলি ছিল

১) আদিবাসী বিদ্যালয়গুলির ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাগত অবস্থান।

২) বিভিন্ন প্রকারের আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়ন ধারার কারণ খুঁজে বের করা।

৩) আদিবাসী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের অসময়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করার সম্ভাব্য কারণগুলি খুঁজে বের করা।

৪) বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর ছাত্র ছাত্রীদের স্কুল ছুট হওয়ার মধ্যে পার্থক্য নিরপণ করা।

৫) আদিবাসী বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের সম্ভাব্য রেখা চিত্র তৈরি করা। গবেষকরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৮ টি আদিবাসী এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ টি আদিবাসী স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

এই সমস্ত স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রী ৩০ % ও তারও অধিক আদিবাসী গোষ্ঠী। প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ অঞ্চল শিক্ষার দিক থেকে পশ্চাৎপদ। ঐ সমস্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা নেই। ফলে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদার পূর্ণতা ঘটে না। আদিবাসী এলাকাগুলিতে খুব কম সংখ্যায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাই আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষত আদিবাসী মেয়েরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দূরের বিদ্যালয়ে যেতে পারে না বলে তারা স্কুল ছুট হয়ে যায় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই। এই সকল আদিবাসী বিদ্যালয়গুলিতে স্কুল ছুট হওয়ার প্রবণতা বেশি এবং আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসার হার কম। আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীদের সাফল্যের হার খুবই কম। অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার দারিদ্র্যের কারণে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়মিত শিক্ষা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগগুলি করে দিতে পারে না।

নির্মল চন্দ্র মুদী (২০১৮) সীমান্তবর্তী বাংলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রটির শিরোনাম হল-**"Transformation of Socio-Cultural Condition of Tribal Community in Frontier Bengal Identity Crisis and Present Scenario".**

উদ্দেশ্য: বাংলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূপান্তর অধ্যয়ন করা।

পদ্ধতি: গবেষক এই গবেষণায় গুনগত পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

উপসংহার: গবেষণা পত্রের উপসংহার এ প্রকাশ পেয়েছে, এই ভারতে ১৮ লক্ষ আদিম আদিবাসী গোষ্ঠী (PTG) অন্তর্ভুক্ত। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশে ঝাড়খণ্ড অধ্যুষিত অঞ্চলের পার্বত্য অঞ্চলের দিকে উপস্থিত রয়েছে। এই ভৌগোলিক অঞ্চলগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ পশ্চাৎপদ এবং আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণি বাস করেন। সাধারনত সাঁওতাল এবং বিরহড় সম্প্রদায় ভুক্ত আদিবাসীরা সরকারি তরফ থেকে সরকারি প্রকল্পে বিভিন্ন সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিলনা। বাংলায় অ-আদিবাসী সমাজের জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সঠিক ভাবে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহনে উদাসীনতা দেখা যায়। যার ফলস্বরূপ পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বিকাশ হয়নি এবং এই জন্য তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন।

জিতেন্দ্র কুমার প্রেমি এবং অরুন কুমার (২০১৮) ছত্রিশগড় রাজ্যের বিপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বিরহড় আদিবাসীদের উন্নয়ন এবং সামাজিক অসমতা সম্পর্কিত একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল "**Development and Social Inequality Among Birhor: A Particularly Vulnerable Tribal Groups of Chhattisgarh, India".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ছত্রিশগড় রাজ্যের বিরহড় আদিবাসীর বিভিন্ন উন্নয়নের দিক অধ্যয়ন করা। এই রাজ্যের বিরহড় আদিবাসীদের সামাজিক বৈষম্যের প্রাদুর্ভাব চিহ্নিতকরণ। তৎকালীন উপলব্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের সম্ভবনাগুলি কল্পনা করা।

পদ্ধতি: গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য আধা অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, ফোকাস গোষ্ঠী আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

ফলাফল: ছত্রিশগড় রাজ্যে বিরহড় আদিবাসীরা এখনও উন্নয়নের আলো থেকে অনেক দূরে রয়েছে। গবেষণার ফলাফল থেকে উঠে এসেছে যে বিরহড়দের যে মৌলিক অধিকার যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাপড়, ঘর, যোগাযোগ পরিষেবা, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় নগণ্য। এছাড়া মৌলিক অবকাঠামোগত সুবিধা যেমন রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদি অনুপস্থিত। বর্ষার সময়ে নদীগুলির মধ্যে দিয়ে জলের স্রোতের প্রভাবে সেতু না থাকার কারণে বিরহড় শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা নদী পার হয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা তাই শিক্ষাগত সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বর্ষার সময়ে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। সরকারী যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে যেমন ইন্দিরা আবাস যোজনা বিরহড় পরিবারগুলিতে সঠিক ভাবে পৌঁছাছে না। এই গবেষণায় উঠে এসেছে যে বিরহড় নারীরাও সামাজিক অবহেলার দ্বিগুণ শিকার হন বিশেষ করে তাঁদের ঋতুস্রাব এবং প্রসবের সময়। এই ভাবে বিরহড় আদিবাসীরা সাধারণ সমাজ থেকে বিভিন্ন ভাবে অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার।

শ্যামল কুমার দারিপা (২০১৮) পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিষয়ে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"Socio Economic Status of the Tribals of Purulia District in The Post-Colonial Period".**

উদ্দেশ্য: গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল ১) পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যা অধ্যয়ন। ২) এই জেলায় আদিবাসীদের সাক্ষরতার হার জানা। ৩) এই জেলায় আদিবাসীদের লিঙ্গ বৈষম্য অধ্যয়ন। ৪) পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা জানা। ৫) আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন। এবং পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসীদের মাতৃভাষা সম্পর্কে অধ্যয়ন।

পদ্ধতি: গবেষক এখানে গৌণ তথ্যকে ভিত্তি করে গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন আদমশুমারি রিপোর্ট, গবেষণা পত্র ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।

ফলাফল: পুরুলিয়া জেলা হল ভারতের অন্যতম পিছিয়েপড়া জেলাগুলির মধ্যে একটি জেলা। উন্নয়ন এবং বিশ্বায়নের যুগেও তাঁরা এখনও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যেমন নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, দারিদ্র্য পূর্ণ জীবনযাপন এবং খুবই কম উপার্জনের কারণে প্রাচীন অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন। পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা, রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ, জীবন ধারা, ভাষা ইত্যাদি আলাদা হলেও দেশের দরিদ্রতম গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এই জেলায় আদিবাসীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা জঙ্গলের উপর নির্ভর করেন। এই জঙ্গল থেকে তাঁরা তাঁদের অর্থনৈতিক সম্পদ সংগ্রহ করছেন। পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসীরা উত্তর-ঔপনিবেশিক সমসাময়িকেও সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপে আদিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী এলাকাগুলিতে উন্নয়ন, নগরায়ন, শিল্পায়নের নামে পুঁজিপতিদের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা বিপন্ন হচ্ছে এবং জমি চ্যুত হয়ে দরিদ্রতার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে। পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী সংস্কৃতির উপর আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপক দেখা যাচ্ছে। এর ফলে আদিবাসী সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, রীতিনীতি, ভাষা, অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

নায়ক এবং নায়ক (২০১৭) সাঁওতাল আদিবাসীদের দেশীয় এবং চিরাচরিত জ্ঞান এবং স্বাস্থ্য চর্চা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁদের গবেষণার শিরোনাম হল, '**Indigenous Knowledge and Health Care Practice among the Santal Communities: A Case Study of**

Mayurbhanj District of Odisha'. ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান ধারায় পুষ্ট যা তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত। এই চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান একেবারে নিজস্ব এবং স্থানীয় অঞ্চল ভিত্তিক। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় পুরুষ ও নারী আদিবাসীদের মধ্যে এই জ্ঞানের বিকাশ এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তার সঞ্চালন লক্ষ্য করা যায়। মৌখিক ভাবে এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে এই জ্ঞানের সঞ্চালন ঘটে। এই জ্ঞান কে ব্যবহার করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সুসাস্থ্যের অধিকারি হয়েছে। তবে এই কথাও ঠিক যে বহু সময়ে আদিবাসী সমাজের মানুষেরা উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সহায়তা না নেওয়ার কারণে চূড়ান্ত রকমের স্বাস্থ্য জনিত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। যে সকল এলাকায় দলিত এবং আদিবাসীরা বসবাস করে সেখানে অজ্ঞতা এবং শিক্ষার অভাবের কারণে দারিদ্র্য এবং অসুস্থতা তাঁদের নিত্য সঙ্গী হয়েছে। ওড়িশা রাজ্যটিতে ৬০ রকমের আদিবাসীগোষ্ঠী থাকার কারণে এবং ওড়িশার কোন কোন জেলা আদিবাসী অধ্যুসিত হওয়ায় ঐ সকল অঞ্চলে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং অস্বাস্থ্য একটি সাধারণ সমস্যা। বর্তমান গবেষকরা গবেষণায় লক্ষ্য করেছেন ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য চর্চা বিষয়ে চিরাচরিত জ্ঞানকে। গবেষণায় উঠে এসেছে যে ওড়িশার ময়ুরভঞ্জ জেলার সাঁওতাল আদিবাসীরা রোগ নিরুপনে এবং চিকিৎসায় চিরাচরিত জ্ঞান ভাণ্ডারকে প্রয়োগ করেন। এছাড়াও নির্দিষ্ট রোগের জন্য নির্দিষ্ট ওষধি গাছের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখেন। সমগ্র গবেষণা পত্রটি গুণগত মান ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়েছে।

এস. দাস (২০১৭) বীরভূম জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে একটি গবেষণা করেন এবং পত্র প্রকাশ করেন। গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"Economic Growth and Women Empowered through Education: A Study on Santal at**

Birbhum, West Bengal". পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সাঁওতাল আদিবাসীদের শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং নারীর ক্ষমতায়ণ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। সাঁওতাল আদিবাসীরা শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে অন্যান্য মূলস্রোতের সাধারণ মানুষদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন, স্বাভাবিক ভাবেই সাঁওতাল মহিলারাও উপরোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুল স্রোতের সাধারণ মহিলাদের তুলনায় পিছিয়ে। তাই সাঁওতাল মহিলাদের শিক্ষাগত মান উন্নয়ন ব্যাতিত সাঁওতাল মহিলাদের অর্থ উপার্জনে সামর্থ্যের বিকাশ ঘটবে না। নারী শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার ক্ষমতায়নের পথকে সম্মুখে পানে অগ্রগতিতে প্রশস্ত করে তোলে। এই গবেষণা পত্রটির মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার মাধ্যমে আদিবাসী সাঁওতাল রমণীদের অর্থনৈতিক বিকাশ এবং ক্ষমতায়ন বিষয়ে চর্চা। গবেষণা পদ্ধতি হিসাবে গবেষক গুণগত মান ভিত্তিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি কেস স্টাডি এবং অপ্রথাগত আংশিক সুসংগঠিত প্রশ্নমালা ব্যবহার করেছেন। ফলাফলে লক্ষ্য করা গেছে যে শিক্ষিত সাঁওতাল রমণীদের পারিবারিক এবং সামাজিক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ণ ঘটেছে যদিও তাদের সিধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য যথেষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে। ৭৩.৩৩ শতাংশ স্বাক্ষর মহিলা ও ৬৬.৬৭ শতাংশ নিরক্ষর মহিলা অর্থের যোগান দেন। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত এবং শিক্ষিতা সাঁওতাল রমণীদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য নিরক্ষর সাঁওতাল মহিলাদের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কম। তাই স্বাক্ষর এবং অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত সাঁওতাল রমণীদের অর্থনৈতিক উন্নতির লেখ চিত্র ঊর্ধ্বগামী এবং তাঁরা তাঁদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যকে পরিবার এবং জন গোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যবহার করেন। অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত সাঁওতাল রমণীরা নিজেদের বাক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্য পূরণে অন্যের সহায়তার উপর নির্ভরশীল নন। তাই তাঁদের ক্ষমতায়ণ হয়েছে একথা বলা যায়।

বীরেন্দ্র কুমার কুরে, শর্মা লোকেশ, নাহারেল রাকেশ এবং ফুলঝেলে শারজা (২০১৭) ছত্রিশগড়ের একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর ৫-১৮ বছরের বিরহড় শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং অসুস্থতার প্যাটার্ন অধ্যয়ন করেছিলেন। গবেষকগণের গবেষণা পত্রের শিরোনাম ছিল "**Study of Health Status and Morbidity Pattern in 5-18 Years Birhor Children: A Primitive Tribe of Chhattisgarh".**

উদ্দেশ্য: গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল ছত্রিশগড় রাজ্যের রায়গড়ের ধরমজয়গড় ব্লকের বসবাসকারী বিরহড় শিশুদের (৫-১৮) বছরের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও অসুস্থতা প্যাটার্ন অধ্যয়ন করা।

পদ্ধতি: গবেষকগণ বিরহড়দের তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫০ জন ৫-১৮ বয়সের বিরহড় ছেলে এবং মেয়েদের নির্বাচন করেছিলেন এবং ক্রস সেক্সনাল স্টাডি ব্যবহার করে ছিলেন। এছাড়া স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং রূপগুলি নির্ধারণের জন্য আনথ্রোপোমেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ছিলেন। আর্থ সামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং পারিবারিক সাক্ষরতার অধ্যয়ন করা হয়েছিল। তা ছাড়া ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা এবং অতীতের অসুস্থতার ইতিহাস দ্বারা বর্তমান অসুস্থতার মূল্যায়ন করার জন্য এই সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল।

ফলাফল: গবেষণার ফলাফল থেকে গবেষকগণ জানতে পারেন যে বিরহড় আদিবাসী শিশুদের মধ্যে পাওয়া গেছে কম ওজনের প্রার্দুভাব ছিল ৩২.৫% এর, যেখানে খর্বাকৃতি ২২% এবং রোগ হওয়ার হার পাওয়া গেছে ২৪%। সাধারণ অসুস্থতার মধ্যে নিম্নরূপ কিছু পাওয়া গেছে, সেগুলো হল ফ্যাকাসে ৬৬%, কনজাংটিভাল জেরসিস ৩৮%, ক্যারিজ দাঁত ৩২%, ত্বকের সংক্রমণ ২৪%, এবং লিফডেনোপ্যাথি ২২%। এছাড়া তীব্র জড়র ইতিহাস ছিল ৪৬%, ম্যালেরিয়া ১৬%, জন্ডিস ১৬%, ১৬% ছিল বিষ/নেশা/পশুর কামড় এবং হাসপাতালে ভর্তির

হার ছিল ১২%। অতীতে ট্রমা এবং দুর্ঘটনা ছিল ১২%। সুতরাং গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় জানতে পারেন যে বিরহড় আদিবাসীদের মধ্যে অসুস্থতার উচ্চ প্রাদুর্ভাব রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের তুলনায় বিরহড় শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সংকটজনক নয়।

এম. ম্যাগনি (২০১৭) দেশীয় পরম্পরাগত জ্ঞান ও স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে একটি গবেষণা**ধর্মী** পত্র প্রকাশ করেন। **এই** গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"Grassroots Conservation Practices: Revitalizing the Tradition".** তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে দেশীয় পরম্পরাগত জ্ঞান আমাদের স্থিতিশীল বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০৩০ সালের জন্য যে Agenda for Sustainable Development নেওয়া হয়েছে তাকে পূর্ণতা দিতে হলে সমগ্র পৃথিবীকেই কতকগুলি সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। Sustainable Development Goal গুলি যে সমস্ত বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে তাদের অনেকগুলি দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে যথেষ্ট সম্পর্কিত। দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে যে বিষয়গুলি সব থেকে বেশি সম্পর্কিত সেগুলো হল শিক্ষা, দারিদ্র্য, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ এবং আবহাওয়া পরিবর্তন। দেশীয় আদিবাসী জনগণ কোন ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় নন। যুগ যুগ ধরে পরিবেশ সুরক্ষার প্রয়োজনে যে জ্ঞান তারা অর্জন করেছেন তারা তাদেরকে বাস্তুতন্ত্র এবং জনগোষ্ঠীর বিকাশে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাফল্য লাভ করেছেন। চিরাচরিত পরম্পরাগত জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে স্থিতিশীল বিকাশেরই সহায়ক। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে চিরাচরিত ও পরম্পরাগত জ্ঞানকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং চিরন্তন চর্চার মাধ্যমে পরিবর্তিত প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে হবে। এরই ফলে দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্থিতিশীল বিকাশের চর্চা, মৃত্তিকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালনা পরিবেশনে আবহাওয়া পরিবর্তন ইত্যাদির মধ্যে

একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাবে। এছাড়া জমি এবং ন্যায় বিচারের অধিকার যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের সুনিশ্চিত হতে হবে।

শুভাশিস ভট্টাচার্য ও গিয়াসউদ্দিন সিদ্দিকী (২০১৬) পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল অঞ্চলের আদিবাসী আবাস বনভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে একটি গবেষণা সম্পর্কিত পত্র প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম হল-**"Significance of forested in the tribal Habitation of Jungle Mahal area in West Bengal".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণায় গবেষক আদিবাসী এলাকায় বনভূমির কোর অঞ্চল চিহ্নিত করতে, উপজাতি ঘনত্ব অঞ্চল পরিমাপ করতে এবং বন ও উপজাতিদের বসতি উভয় ধীরে ধীরে পাতলা হওয়ার মাত্রা পরিমাপ করতে এই গবেষণাটি করেছিলেন।

পদ্ধতি: গবেষকবৃন্দ তাঁদের গবেষণা পত্রে পদ্ধতি হিসাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সাহিত্য, বই, আদমশুমারি, রাজ্য বন প্রতিবেদন এবং জেলা গেজেটিয়ার, ঐতিহাসিক কাঠামো ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের তাত্ত্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

উপসংহার: গবেষকবৃন্দ তাঁদের গবেষণা পত্র থেকে যে বিষয়টির উদ্ভাবন হয়েছে সেটি হল পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠী অরণ্যের উপর নির্ভরশীল যেটি আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সংস্কৃতি, জীবন ধারা, জীবিকার উপর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাব ফেলে যেটি আদিবাসীদের জীবনযাপনে বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ বিষয়।

আরতারি সরকার (২০১৬) বিপন্ন আদিবাসী বিরহড় গোষ্ঠীদের নিয়ে একটি গবেষণাধর্মী পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণার পত্রটির শিরোনাম হল "**Vulnerable Tribal Groups - Birhor".**

উদ্দেশ্য: গবেষকের গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা।

পদ্ধতি: গবেষক তাঁর গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য সাহিত্য পর্যালোচনা এবং ক্ষেত্র অধ্যয়ন উভয়ের উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

ফলাফল: গবেষক তাঁর গবেষণা থেকে জানতে পারেন যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা করেন। বিরহড় পরিবারদেরকে ৫ একর জমি দেওয়া হয়, ১০ ডেসিমেল জমিতে বাড়ি এবং চাষের উপযোগী করে তোলার জন্য ও প্রয়োগ করার জন্য বলা হয়। ঐ এলাকায় বিদ্যালয় খুলে দেওয়া হয় এবং দড়ি তৈরি কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। মধু সংগ্রহের প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে পুনর্বাসন ব্যবস্থা বিরহড়দের সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য উপযুক্ত ছিল না। তাঁরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যেমন পানীয় জল, স্বাস্থ্যজনিত, পুষ্টি এবং স্যানিটেশন ইত্যাদি। তাঁদেরকে এখনও সেই স্থানে আনা হয়নি যে তাঁরা আধুনিক মানুষের সাথে একাত্ম হতে পারবেন। তবে গবেষক জানতে পেরেছেন যে বিরহড়দের আর যাযাবর জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা কম। মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন যে সিসিডি প্রিমিটিভ ট্রাইবাল গ্রুপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কল্যাণ করার দিকে মনো নিবেশ করবে। এছাড়া আদিবাসীদের সংস্কৃতির দ্বারা স্থিতিশীল উন্নয়ন ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশকে অর্থাৎ জল জঙ্গলকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেবল মাত্র বিরহড় আদিবাসীদের নয়। সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানভাণ্ডার দ্বারা কি ভাবে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় এই লক্ষ্যে। বিভিন্ন ভাবে বিরহড়দের জনসংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে

এবং বিরহড় গোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে। দুই রাজ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে বিরহড়দের উন্নয়নের জন্য বিশেষত ক্ষেত্র কাঠামো, ডেমোগ্রাফিক চ্যালাঞ্জ, আদিবাসী সংস্কৃতির পরিচয়, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ তৈরির মনোভাব ও উদ্যোগ নিতে হবে। গবেষক তাঁর গবেষণায় উপলব্ধি করেছেন যে বিরহড় আদিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সেগুলি হল- গবেষক হিসাবে প্রাচীন বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষদের বোঝার জন্য ও উন্নয়নের জন্য একটি ধারণাগত কাঠামো, ডেমোগ্রাফিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, পাশাপাশি মানব পরিবেশগত সম্পর্কের বিকাশ করা উচিত। এছাড়া প্রস্তাব হিসাবে বিরহড়দের জনসংখ্যা, বসতি স্থাপন, অর্থনৈতিক আদিবাসী সামাজিক সাংস্কৃতিক, জীবিকার সুযোগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। বিরহড়দের উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রয়োগ করা এবং বিরহড়দের চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশগত স্থায়িত্বকে সুনির্দিষ্ট করা। প্রাচীন আদিবাসী জ্ঞানভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করা এবং স্থিতিশীল উন্নয়নে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের সহযোগিতা করা।

সাগর চৌধুরি, হাবিবুর রহমান চৌধুরি এবং হরিশ সিং (২০১৬) ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষের নৃতাত্ত্বিক ব্যবহার সম্পর্কে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণার শিরোনাম হল "**Some Ethno Zoological uses of Birhor Tribe of West Bengal, India".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা ২৯ টি গৃহ পালিত এবং বন্য প্রাণীর উপর তাঁদের নিজস্ব যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান রয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা।

পদ্ধতি: এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকগণ ক্ষেত্র সমীক্ষা, কাঠামোগত প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার এবং ডকুমেন্টশন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন।

ফলাফল: গবেষকগণ তাঁদের গবেষণায় পেয়েছেন যে, বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা সাধারণত প্রাত্যহিক জীবন যাপনের জন্য তাঁদের প্রাথমিক কাজ ছিল শিকার ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা। এবং সেইগুলিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের সাথে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে প্রকৃতির সাথে দৈনন্দিন জীবনযাপনে আবদ্ধ থাকা। এখানে গবেষকগণ খুঁজে পেয়েছেন বিরহড়রা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী লোকজ চর্চায় উদ্ভিদ জীব এবং প্রাণীর সামগ্রিক অংশ ব্যবহার করতেন বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী। যেমন প্রাণীর শরীরের অংশ বা পণ্য যেমন শিং, মাংস, ত্বক, বিষ, খোলস, ডিম, কলিজা, দাঁত, ভ্রূণ, পালক, ভোকাল কর্ড, মাথার খুলি, ত্বক, চর্বি, তেল, মোম এবং মধু ব্যবহার করতেন বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকারে। বিরহড় আদিবাসীদের যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান তাঁরা তাঁদের মেধার মাধ্যমে অধিকার রক্ষার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন।

সমিতা মান্না এবং রিমি সরকার, (২০১৫) একবিংশ শতাব্দীতে বিরহড়দের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় কয়েকটি গ্রামে একটি মাইক্রো স্টাডি করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম টি হল- **"The Birhor Ways of Life in 21st Century: A Micro Study in a Few Villages of Hazaribag District, Jharkhand".**

উদ্দেশ্য: ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় একবিংশ শতাব্দীতে বিরহড়দের জীবনযাত্রা অধ্যয়ন ও কয়েকটি গ্রামে একটি মাইক্রো স্টাডি।

পদ্ধতি: গবেষকরা তাঁদের গবেষণার পদ্ধতি হিসাবে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের হাজারিবাগ জেলাকে বেছে নিয়েছেন এবং এই জেলায় পাঁচটি ব্লক থেকে ১৫০ টি বিরহড় পরিবারকে অধ্যয়নের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানে একটি উদ্দেশ্য মূলক সমীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলাফল: বিরহড় আদিবাসী মানুষ চরিত্রে আধা-যাযাবর হলেও বাস্তুতন্ত্রের উপর তাঁরা নির্ভরশীল। তাদের জীবিকা নিকটবর্তী বন-জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রাথমিক উৎস যেমন-পাখি ধরা, মধু সংগ্রহ, শিকড়, কন্দ, ফল এবং অন্যান্য বনজ পণ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে তাদের ঐতিহ্যবাহী অর্থনীতিটি একটি বিশেষ আকার নিয়েছে। আদিম আদিবাসী হিসেবে বিরহড়রা এখনও শিক্ষার আলো থেকে বহুদূরে। বিরহড়দের মধ্যে কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত, যেখানে মেয়েদের ১১-১৪ বছর বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স কম হওয়ার কারণে সন্তান জন্মের সময় মেয়েরা মারা যায় বা অপুষ্টির কারণে তাদের সন্তান মারা যায়। বর্তমানে সরকার বিরহড়দের পরিবার পিছু মাসে ৩৫ কেজি চাল এবং ৪০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের ঐতিহ্যবাহী উপায়ের পাশাপাশি তাদের গোপনীয়তা, পারিবারিক জীবন এবং অনুশীলন বজায় রাখার জন্য অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিজেরাই পরিচালনা করে।

প্রসেনজিৎ দেববর্মণ (২০১৫) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি সার্বিক বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"Birhor of West Bengal: an Overview on A Tribe in Transition".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণায় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, জেলায় বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা এবং বিরহড়দের সম্পর্কে পণ্ডিতদের লেখা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যয়ন করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

পদ্ধতি: এই গবেষণা ক্ষেত্রে গবেষক বিরহড় আদিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রেহের জন্য পর্যবেক্ষণ কৌশল ব্যবহার করেন।

ফলাফল: এই গবেষণায় গবেষক তথ্য থেকে পেয়েছেন, বিরহড়রা প্রাক- কৃষি পর্যায় থেকে স্থায়ী কৃষিতে রূপান্তরিত অবস্থায় রয়েছেন কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। এই অঞ্চলে বিরহড়রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাতার গাছের পাতা দিয়ে প্রস্তুত একটি সবজি দিয়ে দিনে একবার বা দু'বার ভাত খান। সুতরাং বিরহড়দের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অতিরিক্ত কৃষিজমি প্রয়োজন। তবে সরকার তাঁদের কে জমি প্রদান করেছে কিন্তু অনুর্বর জমি। তা ছাড়া সরকারের উৎসাহে তাঁরা গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছেন। বিরহড়দের স্থায়ী বন্দোবস্ত এবং অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বৃক্ষ, জমি, ষাঁড়, দুধের গাভী, ছাগল, শূকর, কৃষি সরঞ্জাম, বীজ, স্কুল, দড়ি তৈরি কেন্দ্র, মধু সংগ্রহ, হল স্থাপন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সুতরাং, পুরুলিয়া জেলায় বিরহড় জনবসতিগুলিতে আদিবাসী গোষ্ঠী সমূহ উন্নয়নের জন্য অনেকটা সরকারের উপর নির্ভরশীল, এবং তাঁদের মধ্যে এই গ্রহণের মানসিকতা গড়ে উঠেছে।

সোমনাথ মুখার্জি (২০১৪) পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতাল, খেরিয়া শবর ও বিরহড় মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল-"**Status of Female Education among Santal, Kheria Sabar and Birhor Tribal Communities of Purulia District, West Bengal, India".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণায় বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার দশটি অ-জাতিগত এবং দশটি বহুজাতিক গ্রামে বসবাসকারী তিনটি প্রধান উপজাতি সম্প্রদায় যথা সাঁওতাল, খেরিয়া-শবর এবং বিরহড় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষার স্তর বিশ্লেষণ করেছেন।

পদ্ধতি: এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক ডেটা সেটগুলির উপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই তথ্য সেট এবং পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে আদিবাসী মহিলাদের গ্রাম স্তর এবং শিক্ষার আন্তঃসম্প্রদায় অবস্থা তদন্ত করার জন্য।

ফলাফল: গবেষক তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষভাবে আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে, জীবিকা নির্বাহের জন্য ও দৈনন্দিন কাজ কর্মের উপায়গুলি বজায় রাখার অত্যধিক চাপের কারণে আদিবাসী মহিলারা শিক্ষাকে সর্বদা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করে। বিরহড় আদিবাসীদের জন্য, সুবিধাগত সরকারী নীতি থাকা সত্তেও, মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সচেতনতার অভাব রয়েছে এবং কম বয়সে মেয়েদের বিবাহ হওয়ার জন্য, বিরহড় সম্প্রদায়ের মহিলাদের একটি বড় অংশ উচ্চ শিক্ষা স্তরে পোঁছাতে না পারায়, তাদেরকে নিরক্ষরতার মাঝে বসবাস করতে হয়।

সুতরাং, এই গবেষণার ফলস্বরূপ পুরুলিয়া জেলার গোটা আদিবাসী সমাজের অর্থনীতি ও শিক্ষার সমান্তরাল বিকাশ এবং সার্বিক বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত আদিবাসী মহিলাদের দুঃখ-দুর্দশার সমাধান এত সহজে সমাপ্ত হবে না। তাই আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সমৃদ্ধি আনার জন্য ও প্রতিকূলতা হ্রাস করার জন্য একটি ইতিবাচক এবং প্রাথমিক দিকনির্দেশনা, এবং সচেতনতা প্রয়োজন।

সমিতা মান্না, রিমি সরকার এবং অরিত্র ঘোষ (২০১৩) বিরহড় আদিবাসীদের শিক্ষা এবং বিবাহের রীতি সম্পর্কে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। তাদের গবেষণা পত্রের

শিরোনাম হল-**"Education and patterns of Marriage System: A micro study on the Birhors in Hazaribag District, Jharkhand".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল ঝাড়খণ্ডের বিরহড় আদিবাসীদের কমবয়সী বিবাহ এবং কম শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা।

পদ্ধতি: এই গবেষণায় গবেষক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের হাজারীবাগ জেলার পাঁচটি ব্লককে নির্বাচন করেছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য। এই পাঁচটি ব্লক থেকে সাতটি গ্রামকে নির্বাচন করেছেন নমুনা নির্বাচনের জন্য এবং মোট ১৫০ জন নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকগণ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

ফলাফল: গবেষক গবেষণা করে পেয়েছেন যে, হাজারীবাগ জেলার বিরহড় আদিবাসীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে সমাজে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। বিরহড় মেয়েরা অনেক কম বয়সেই তাদের বিবাহ হয়ে যায়। এছাড়া অ-আদিবাসী সমাজ থেকে তারা আলাদা ভাবে থাকতে পছন্দ করে। তাদের শিক্ষাগত অবস্থা খুবই খারাপ এবং প্রায় বেশির ভাগ বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষরা নিরক্ষর। তবে কিছু বিরহড় আদিবাসী মানুষদের সাক্ষরতা দেখতে পাওয়া গেছে কিন্তু প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। স্বাধীনতার পর বিরহড়দের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তবে তা যথেষ্ট ছিল না। বর্তমানে বিরহড় আদিবাসীদের অবস্থা খুবই খারাপ কারণ নিরক্ষরতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন। প্রায় ৬৪.৬৭% বিরহড় শিশুরা ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সে, ৩২% বিরহড় শিশুরা ১৯-২৩ বছর বয়সে এবং ২.০০% বিরহড় শিশুরা ২৯-৩৩ বছর বয়সে বিবাহ করে। সুতরাং বিরহড়দের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সচলতা এবং সাক্ষরতার প্রয়োজন।

সুচিতা ত্রিপাঠী (২০১২) ছত্রিশগড় রাজ্যে বিরহড় আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিষয়ে একটি গবেষণা ধর্মী পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল "**Birhor and their culture: an ethnographic account of particular vulnerable tribal group of Chhattisgarh".**

উদ্দেশ্য: গবেষকের গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল ছত্রিশগড়ের আদিবাসী বিরহড়দের সমাজ-সংস্কৃতির অবস্থা সম্পর্কে জানা।

পদ্ধতি: গবেষক তাঁর গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য সাহিত্য পর্যালোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন জার্নাল, বই, গবেষণা ধর্মী পত্র ব্যবহার করেন।

ফলাফল: গবেষকের গবেষণা পত্রে উঠে এসেছে যে ছত্রিশগড় রাজ্যে আদিবাসী বিরহড়রা প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠী এবং বিপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত। এই রাজ্যে বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষরা অতি দরিদ্র। তাঁরা সামাজিক অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। তাঁদের কোন নিজস্ব জমি নেই। তাঁরা জঙ্গলের কোন জায়গায় বসবাস করে, তাঁদের নামে কোন পাট্টা দেওয়া হয়নি। তাঁদের আর্থিক অবস্থা জঙ্গলের শুকনো কাঠ বিক্রি এবং বাঁশের তৈরি জিনিস এর উপর নির্ভর। তাঁদের সন্তানদের নেই কোন পোশাক আসাক তবে সরকারের দ্বারা দেওয়া বিদ্যালয়ের পোশাক পরিধান করে। তারা কেবল মাত্র ভাত খায় তাই তাদের মধ্যে অপুষ্টির প্রবণতা রয়েছে। বিরহড়দের সাথে এই রাজ্যে ঠাকুর, ইয়াদাভ ইত্যাদি জাতিগত বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায় এছাড়া উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও তা রয়েছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের জন্য বিরহড় আদিবাসীরা তাঁদের সংস্কৃতি, আদিবাসী জ্ঞান, রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশীলন, সমৃদ্ধ মৌখিক ঐতিহ্য এবং তাঁদের নিজস্ব ভাষা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। সংরক্ষণের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা ব্যর্থ হচ্ছে। অপরদিকে সাধারণ সমাজের মানুষ দ্রুততার

সাথে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে বিরহড় আদিবাসীদের প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডার, সংস্কৃতি, ভাষা, প্রাচীন ঐতিহ্য সমাজ সংস্কৃতি এবং বিরহড় জন সংখ্যা ক্রমে বিলুপ্তির পথে চলেছে। যদি সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিলুপ্ত হয় তাহলে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি বিলুপ্ত ও ধ্বংস হবে। এছাড়া আমাদের সংস্কৃতিও বিপিন্ন হয়ে পড়বে। আর সংস্কৃতি এবং ভাষা বিপন্ন হলে গোটা জাতির মৃত্যু হবে। তাই আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং তাঁদের প্রাচীন ভাষাকে সংরক্ষণ করতে হবে, মূল্য দিতে হবে।

মারি লোলেন (2012) অরুণাচল প্রদেশের মাউন্টেন হ্যাবিট্যাটে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থা ও মেম্বাদের জীবিকা নির্বাহের ধরণ সম্পর্কিত একটি গবেষণা করেছিলেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"Utilization and Conservation of Natural Resources in Mountain Habitat: A Study on Livelihood Pattern and Indigenous Knowledge System of The Memba of Arunachal Pradesh".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মেম্বা জনগোষ্ঠীদের লোকেরা কীভাবে তাদের দেশীয় আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করে তা বোঝা এবং নথিভুক্ত করা। এছাড়া এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মেম্বারা তাঁদের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু, ঐতিহ্যবাহী পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা যা সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রথাগত আইনকে যুগযুগ ধরে রেখেছে তাকে জানা, এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম কাউন্সিলের ভূমিকা খুঁজে বের করা।

পদ্ধতি: গবেষক বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা পরিচালনা করেন এবং এই গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এছাড়া পাইলট সার্ভেতে

সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি এবং ওপেন ও ক্লোজড শিডিউল প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হয়েছিল।

ফলাফল: গবেষক এর গবেষণা পত্রে যে বিষয়টি উঠে এসেছে সেটি হল- অরুণাচল প্রদেশের মেম্বা আদিবাসীরা চাষাবাদ, কৃষি এবং পেশাগত ক্রিয়াকলাপ এবং কাপড়ের দোকান, চুক্তিভিত্তিক কাজ এবং রেস্তোঁরা ইত্যাদি মালিকানার উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও কিছু মেম্বারা শিকার, মাছ ধরা এবং হরিণ, শুয়োর এবং ভালুকের মতো বন্য প্রাণী শিকার করার অনুশীলন তাঁদের মধ্যে আছে। এই রাজ্যে মেম্বা আদিবাসী গোষ্ঠীরা গরু, শূকর, ছাগল, মুরগি, ঘোড়া, ভেড়া, গোদা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রাণী পালন করে, তবে এই সমস্ত প্রানিদের মধ্যে 'গোদা' সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হিসাবে পরিচিত। এই আদিবাসীরা এখন পর্যন্ত তাঁদের জ্ঞান ব্যবস্থার দ্বারা তাঁদের চাহিদা এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রাকৃতিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের প্রচলিত আইন দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার খুব বেশি সমাধান করা যায় না। তবে তাঁদের বিশ্বাস যে তাঁদের যে জমিগুলি আছে সেগুলি তাঁদের পরিবারের বড় সম্পদ। মেম্বা আদিবাসীরা মনে করে বর্তমান সময়ে তাঁদের মানব জীবনে অর্থ অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই তাঁরা বহিরাগতদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থের মূল্য সম্পর্কে তাঁরা সচেতন।

সুতরাং, তাঁরা গতানুগতিক জীবিকা ধারা থেকে সরে এসে আধুনিক দিকে ধাবিত হচ্ছেন। তাই তাঁদের পার্বত্য অঞ্চলের সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের পাশাপাশি আধুনিক জীবিকা নির্বাহে প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সুস্মিতা সেনগুপ্ত ও শোভন ঘোষ (২০১২) ভারতের তফসিলি উপজাতিদের শিক্ষার সমস্যা নিয়ে একটা গবেষণা পত্র লেখেন। তাঁর গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"Problems of Education among the Scheduled Tribes in India; Finding a Balance".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল তফসিলি উপজাতিভুক্ত শিশুদের স্কুল শিক্ষায় প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত সুবিধা ও বঞ্চিত অবস্থা নথিভুক্ত করা। এছাড়া মূলত অমীমাংসিত বিষয় এবং স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাধার কারণ খোঁজা।

পদ্ধতি: এই গবেষণায় গবেষক তথ্য সংগ্রেহের জন্য গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

ফলাফল: আদিবাসী শিশুরা সকলেই যে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, তাদের পুরো প্রজন্মের মধ্যে প্রথম যে স্কুলে যায় এবং শিক্ষা গ্রহণ করে তা খুঁজে বের করার জন্য এই গবেষণাপত্র। তাদের বাড়ির পরিবেশ শিক্ষার জন্য নিরুৎসাহিত এবং অসুবিধা জনক এবং তাদের পিতামাতারা তাদের সন্তানদের কোনও শিক্ষাগত দিক নির্দেশনা দিতে পারেন না। পিতামাতারা নিরক্ষর হওয়ায় এবং সঠিক নির্দেশনা দানের অভাবে এই সকল পরিবারে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ছুট বা স্কুল ড্রপ আউট হয়। তাই আদিবাসী শিশুরা দুটি সংস্কৃতির প্রান্তে নিজেকে খুঁজে পায় স্কুলে এবং বাড়িতে, এই দুই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এমন ভাবে যাতে স্কুল এবং পরিবারে শিশুরা সঠিক শিক্ষা পায়। ফলে তারা ড্রপ আউট এর বেশি ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থী হয়ে না উঠতে হয়। তাই ড্রপ আউট কমাতে হলে স্কুলে শিক্ষকদের দ্বারা সঠিক শিক্ষা এবং সাথে সাথে পরিবারে পিতামাতাদের সহযোগিতা ও নির্দেশনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

গিবগি নিমাচো, আরশি জোশী এবং ঐ দাই (২০১১) ভারতে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যে জঙ্গলের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ বিষয়ে একটি গবেষণা করেন ও গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন।

এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল "**Role of Indigenous Knowledge System in Conservation of Forests Resources-A Case Study of the Aka Tribe of Arunachal Pradesh**"

উদ্দেশ্য: বনজ সম্পদ সংরক্ষণে 'এক্কা' উপজাতিদের প্রাচীন আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থা দ্বারা বিশ্বাস এবং পবিত্র থানের ভূমিকা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা।

পদ্ধতি: এই গবেষণায় গবেষকগণ সমীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩৭ টি গ্রাম থেকে তথ্য গ্রহণ করেন। গবেষকগণ এই গবেষণায় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করেন আদিবাসী জ্ঞান পদ্ধতি ও পবিত্র থান সম্পর্কে জানার জন্য এবং জঙ্গলের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে আদিবাসীদের ভূমিকা জানার জন্য। এছাড়া গবেষকগণ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে।

ফলাফল: এক্কা আদিবাসীরা তাঁদের দৈনন্দিন চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য জঙ্গলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল, তাঁরা প্রাচীন পদ্ধতির দ্বারা শিকার, মাছ ধরা, খাদ্য সংগ্রহ, বাড়ি নির্মাণের জন্য উপকরণ সব কিছু জঙ্গল থেকে পেয়ে থাকেন এবং সম্পদ নিষ্কাসনের জন্য তাঁরা ঐতিহ্যবাহী উপায়ে রক্ষণশীলতার সাথে জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁরা তাঁদের প্রাচীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নির্মিত পদ্ধতি বা রীতির দ্বারা বন জঙ্গল রক্ষায় অবদান রেখেছেন। কিন্তু জঙ্গল লুণ্ঠন কারীরা, ঠিকাদাররা বেশি উপার্জন ও জঙ্গলের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনুসরণ করে না। এরপর ব্যাপক ভাবে জঙ্গলে অবৈধ ভাবে কাঠ কাটা চলছে। এক্কা আদিবাসী সমাজ এই বিষয়ে আগে থেকেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাই তাঁরা জঙ্গল রক্ষার জন্য আদিবাসী জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে, পবিত্র থান, বিশ্বাস, প্রকৃতি পূজা ইত্যাদি জঙ্গলকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করছে যাতে আগামী প্রজন্ম তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে

ব্যবহার করতে পারে, এছাড়া জঙ্গল থেকে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সম্পদ আহরণ করে। জঙ্গল নীতি বা জঙ্গল শাসন প্রণালি মেনে নিয়েছেন জঙ্গল সংরক্ষণে প্রাচীন আদিবাসী জ্ঞান পদ্ধতি ও ঐতিহ্য এক্কা আদিবাসীদের ব্যবস্থা অতুলনীয়।

এম. লোলেন এবং বি. এ. লশকর (২০১১) মাটির উর্বরতা রক্ষায় মেম্বা আদিবাসীদের ভুমিকা সমন্ধে গবেষণা করেছেন। প্রকাশিত গবেষণার শিরোনামটি হল-**"Soil Fertility Management by Memba Tribes of Mechukha Valley, Arunachal Pradesh".** তাঁদের মধ্যে মাটির উর্বরতা রক্ষায় এবং প্রাকৃতিক বাবস্থাপনায় চাষবাসকে সুরক্ষিত **রাখার** জন্য গাছের পাতা এবং গোবরকে সার হিসাবে ব্যবহারের প্রচলন দীর্ঘ কাল ধরে চলেছে। তাঁদের গবেষণায় প্রমাণিত যে মেম্বা আদিবাসীর চিরাচরিত লোকজ্ঞান তাঁদের কৃষি এবং পরিবেশের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরা স্বাস্থ্যকর খাবার সংগ্রহ করতে সচেষ্ট।

উত্তম কুমার প্রধান (২০০৮) আদিবাসীদের উৎপাদন সিস্টেমের প্রকৃতির পরিবর্তন সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ গবেষণা করেন। তাঁর এই গবেষণার শিরোনাম হল "**Nature of Changes in Tribal Production System: A Case Study of Koraput District".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ১) আদিবাসীদের কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থা, বন উৎপাদন এবং পেশাগত কাঠামো উন্নয়নের প্রকৃতি খুঁজে বের করা। ২) আদিবাসীদের উৎপাদনে বাণিজ্যিকীকরণ ও বাজারের সাথে এর একীকরণ।

পদ্ধতি: এই গবেষণা পত্রে গবেষক গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোগত সময়সূচী এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। গবেষণা ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রামবাসীদের পরিচিতি ব্যক্তি বা সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন,

স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গ্রামের কৃষি শ্রমিক প্রভৃতির সহযোগিতার মাধ্যমে এলাকা খুঁজে গবেষক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

গবেষক গৌণ তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করেন সেগুলি হল জেলার গেজেটার, আদমশুমারি প্রতিবেদন, জেলা পরিসংখ্যান হ্যান্ড বুক, প্রতিবেদন, ওড়িশার পরিসংখ্যানগত সারাংশ, অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সাহিত্য। এই গৌণ জাতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন করেছেন সেগুলি হল- এন আই আর ডি, হায়দ্রাবাদ, কোরাপুট, এসসি এবং এসটি গবেষণা গ্রন্থাগার এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ভুবনেশ্বর, প্রোফেসর বেহেরা গ্রন্থাগার, সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালায়, আদমশুমারি অফিস, ভুবনেশ্বর রাজ্য গ্রন্থাগার ইত্যাদি।

ফলাফল: এই গবেষণায় প্রাথমিক ফলাফল যেটি আদিবাসীদের উৎপাদনের আলোচনা হিসাবে যে বিষয়গুলি বেরিয়ে এসেছে সেগুলি হল- ভূমি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেমন স্থানান্তর চাষে উৎপাদন, গবাদি পশুর অবস্থান, বিশ্লেষণ কৃষি উৎপাদন, বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের উপকরণ, কর্মসংস্থানের অবস্থান, সম্পত্তি কাঠামো, আয় ও ব্যয়ের উৎস ইত্যাদি।

এস. কে. চৌধুরী (২০০৮) অরুণাচল প্রদেশের আদিবাসীদের মধ্যে চিরাচরিত লোকবিশ্বাস এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"Folk Belief and Resource Conservation: Reflection from Arunachal Pradesh".** সমগ্র পৃথিবীতেই ধীরে ধীরে একটি ধারণা মূর্ত হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ বিশেষত আদিবাসী মানুষজন যারা প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিদ্ধ্যে বাস করেন তাঁদের কাছ থেকে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের গুরুত্ব রয়েছে। তাঁদের মতে

লোকায়ত বিশ্বাস ধর্ম নিরপেক্ষ এবং পবিত্র বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিষয়ে আমাদের যে লোকায়ত বিশ্বাসতা আমাদের সংরক্ষণে সহায়তা করে।

ফজলুর রহমান (২০০৭)। ছত্তিশগড় রাজ্যে উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক বিকাশে জঙ্গল অর্থনীতির প্রভাব সম্পর্কে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রটির শিরোনাম হল- **"Impact of forest economy on the socio-economic development of tribes-a case study of Chhattisgarh state".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন সেগুলি হল-উপজাতিদের অর্থনীতির প্রকৃতি এবং এর পরিবর্তনগুলি বোঝা, বনের উপর উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নির্ভরতার মাত্রা জানা, জীবিকার জন্য অন্যান্য উৎসগুলির ভূমিকা অ্যাক্সেস এবং পরীক্ষা করা, বন সম্পর্কিত আদিবাসী উন্নয়নের জন্য সরকারী নীতি এবং পরিকল্পনা জানা ইত্যাদি।

পদ্ধতি: এই গবেষণায় গবেষক বিশ্লেষণ, এবং তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত নথি এবং ভৌগোলিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

ফলাফল: গবেষণায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে যে আদিম উপজাতি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বনভুমিতে বসবাস করা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৩২.৩২ শতাংশ এবং অ-বনভূমিতে বসবাসকৃত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৬৬.৬৭ শতাংশ। এই গবেষণায় উঠে এসেছে যে পাহাড়ে, পর্বতে, বন, জঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের শিশুর মৃত্যুর হার উচ্চ, যেটি এই এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা না থাকা সম্পর্কে নির্দেশ করে। এই এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায় এর মানুষরা সরকারি প্রকল্প বা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত পানীয়জলের উপর নির্ভরশীল। গবেষক দেখেছেন যে ৫০ শতাংশ বনভূমিতে বসবাসকারী আদিবাসী পরিবার খোলা জায়গায় মলত্যাগ করেন। এবং তাঁদের স্থায়ী কোন শৌচাগার নেই।

৫০ শতাংশ অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী পরিবারের কাছে শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে।

ফারুক, ডোলোক এবং কাল্লা (২০০৭) উত্তর পূর্ব ভারতের আপাতানি জনগোষ্ঠীর দ্বারা প্রকৃতির সম্পদের পরিচালনা সমন্ধে চিরাচরিত জ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করেন। প্রকাশিত এই গবেষণার শিরোনাম হল-**"Traditional Wisdom of Apatani Community in the Management and Sharing of Natural Resources in North East India. Ink K. Misra (Ed). Traditional Knowledge in Contempory Societies: Challenges and Opportunities".** গবেষণায় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে আপাতানি জনগোষ্ঠী ধারাবাহিক ভাবে তাঁদের সেচ এবং সম্পদের বণ্টনের ক্ষেত্রে যেমন (জল, মাটি, মানব সম্পদ) চিরাচরিত ভাবে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার বিষয়ে বিশ্বাসী। সারা বছর ধরে যে জল পাওয়া যায় তাকে সেচ কার্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা চিরাচরিত কিছু নীতি মেনে চলেন যা প্রকৃত পক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণকে সুচিত করে।

Lertzman, D. A, & Vredenburg, H. (2005) দেশীয় আদিবাসী মানুষজনের প্রাকৃতিক সম্পদের নিষ্কাশন এবং স্থিতিশীল উন্নয়নে (Sustainable Development) নৈতিক দিক সমূহ নিয়ে গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"Indigenous Peoples, Resource Extrusion and Sustainable Development: And Ethical Approach".** তাঁদের এই গবেষণা পত্রে তাঁরা দেখিয়েছেন যে প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাশনকারী বহুজাতিক সংস্থাগুলি কিভাবে আদিবাসী সম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাঁরা Crawly and Sinclar (2003) -এর গবেষণার উপর বিষদ আলোচনা করেছেন। এই গবেষণাতে আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে স্থিতিশীল বিকাশ বা Sustainable Development এর ধারণা বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায়

গবেষণা সমূহের প্রবেশ করেছে এবং ঐ সকল পত্রিকায় এই বিষয়ে বহু গবেষক গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। দেশীয় আদিবাসী মানুষজনের সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পর্ক এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাশনের অজুহাতে কিভাবে প্রকৃতিকে লুণ্ঠন এবং প্রকৃতির উপর অত্যাচার করেছে সেই চিত্রও এদের গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণা পত্রে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে দেশীয় আদিবাসী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, প্রথা ইত্যাদি কিভাবে বহুজাতিক সংস্থার কবলে পড়ে আজ ধ্বংসের মুখে এবং এইগুলির সুরক্ষার জন্য কোন কোন নৈতিকতার দিকে সমগ্র বিশ্বকে এগোতে হবে।

এস. পি. সিং (২০০৫) অরুণাচল প্রদেশের ওষধি গাছ এবং সুগন্ধি গাছ সংগ্রহ এবং ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল-**"Collection and Utilization of Medicinal and Aromatic Plants in Arunachol Pradesh",** বিভিন্ন ওষধি গাছের কোন কোন অংশকে এবং কি ভাবে ব্যবহার মানুষের কোন কোন রোগের চিকিৎসায় করা হয় এবং কি ভাবে তাঁরা সুস্থ হন সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এর জন্য তিনি অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে আদিবাসীদের চিকিৎসা বিজ্ঞান সমন্ধে চিরাচরিত লোকজ্ঞান কি ভাবে পরিবেশের সুরক্ষার সাথে সাথে স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারাকে সুরক্ষিত রাখে।

ডেবরাহ এম. সি. গ্রেগর (২০০৪) - দেশীয় পরম্পরাগত জ্ঞান পরিবেশ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বর্তমান অবস্থা বিষয়ে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"Indigenous Knowledge, Environment and our Future".** গবেষণার বিষয় হলো দেশীয় পরম্পরাগত জ্ঞান পরিবেশ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বর্তমান গবেষণায় দেখানো হয়েছে

যে আজকের ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশীয় মানুষদের কাছ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং চাহিদা ভিত্তিক ব্যবহার কিভাবে ভবিষ্যৎ কালে স্থিতিশীল বিকাশে সহায়তা করবে, যা মানুষ জাতির ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করবে। গত প্রায় ৪ দশক ধরে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং ব্যবহার বিষয়ে দেশীয় জ্ঞানের ভিত্তিকে বিশ্লেষণ করা এবং দেশীয় মানুষদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট অবগত এবং কার্যকারী ভাবে তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে চলেছেন সেগুলির সহায়তায় বর্তমান এবং ভবিষ্যতে বিশ্বের প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে, এই বিষয়ে গবেষণা পত্রে আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্র পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং কোন ভাবে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না। এই গবেষণা পত্রে দেশীয় বাস্তুতন্ত্রের জ্ঞান বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও দেশীয় বাস্তুতন্ত্র ভিত্তিক জ্ঞান আজকে কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন সেই বিষয়েও গবেষক আলোচনা করেছেন।

ডাবলু. এ. উইলসন (২০০৪) দেশীয় আদিবাসী মানুষদের জ্ঞানকে নিয়ে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল **"Indigenous Knowledge Recovery is Indigenous Empowerment".** তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে দেশীয় আদিবাসী মানুষদের জ্ঞানকে নিয়ে আমরা যদি আরো গভীর চর্চা করতে পারি তাহলে দেশীয় আদিবাসী মানুষদেরকে শক্তিশালী করে তোলা হয়, যে কোন রাষ্ট্রের আদিম অধিবাসীদের সুরক্ষিত রাখতে না পারলে তাদের দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ভান্ডারকে নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে আরো উন্নত এবং ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে না পারলে তা বৃহত্তর সমাজের পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে।

এম. গ্যাডগীল (১৯৯৮) তৃণমূল স্তরে পরিবেশ সংরক্ষণ চর্চা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণার শিরোনাম হল-**"Grassroots Conservation Practices: Revitalizing the Tradition".** তাঁর গবেষণার ভিত্তি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে সুসামাজিক ক্ষেত্রটিকে আবিষ্কার করা যাতে করে আদিবাসীদের চিরাচরিত জ্ঞান ভাণ্ডারে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। গুণগত মান ভিত্তিক এই গবেষণায় গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে আঞ্চলিক মানুষদের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের দায়িত্ব তুলে দিতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে হবে। গবেষক কোন নির্দিষ্ট আদিবাসী এলাকা বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেননি।

এস কে কোলে (১৯৯৭) বিরহড়দের সম্ভাবনা এবং সমস্যা নিয়ে একটি মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা ধর্মী পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রটির শিরোনাম হল-**"Prospects and Problems of Birhor: an Evaluation".**

উদ্দেশ্য: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিরহড় উপজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মাইক্রো লেভেল মূল্যায়নমূলক অধ্যয়নের চেষ্টা এবং বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা অন্বেষণ করা।

পদ্ধতি: গবেষক তাঁর গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় বাঘমুণ্ডী থানার অন্তর্গত বিরহড় আদিবাসীদের থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন টুল ব্যবহার করেন যেমন- সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, কেস স্টাডি, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

ফলাফল: গবেষক তাঁর গবেষণায় অনুসন্ধান কৃত ফলাফলে পেয়েছেন যে আদিবাসী উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সাথে সাথে সরকার আদিবাসীদের জন্য জমি সরবরাহ করেছেন কিন্তু এই জমিগুলি ছিল অনুর্বর জমি। তাই বিরহড় আদিবাসী মানুষদের জমি বণ্টনের

মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার সম্পর্ক বা উদ্দেশ্য ছিল খুবই সামান্য। বিরহড়দের সম্পর্কিত তথ্য বলে ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থার প্রতি বিরহড়দের ঝোঁক প্রবল। এছাড়া বিরহড় আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। আর একটি বিশেষ সত্য যে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা তাঁদের জন্য সহজলভ্য নয়।

সুতরাং, বিরহড় আদিবাসীদের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতির জন্য ও বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেগুলি হল- পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য ও পরিছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা, শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি এবং বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা মাধ্যমে বিরহড়দের সুবিধা প্রদান করা।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯২) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি গবেষণা চালান। তাঁর গবেষণার শিরোনাম হল "**Poorest of the Poor Birhor- a Primitive Tribe of West Bengal".**

উদ্দেশ্য: এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার আধা-যাযাবর উপজাতি বিরহড়দের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিশেষ উল্লেখ সহ আদিমতার মাত্রা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতি: এই গবেষণা পত্রে পদ্ধতি হিসাবে সমীক্ষা পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। বিরহড়দের মধ্যে সাক্ষরতার হার পরীক্ষা করার জন্য বাঘমুন্ডি ও বলরামপুর নামে দুটি থানায় সমীক্ষা (survey) করা হয়েছিল।

ফলাফল: বাঘমুন্ডি ও বলরামপুর থানার বিভিন্ন গ্রামে বিরহড়রা রয়েছে। তাঁদের অর্থনীতি খুবই দুর্বল এবং তাঁদের জীবন জীবিকা নির্বাহ অনেক কঠিন। সুতরাং, তারা সাধারণত দিনে রাত্রে মোট দু'বার খাবার গ্রহণ করে। তাঁদের খাবার তালিকার মধ্যে থাকে সাধারণত চাল এবং

লবণ, শাকসবজি, সরিষার তেল সহ ডালের সামান্য ব্যবহার। তাই বিরহড় জনগোষ্ঠীর একক সদস্যরা দিনে ৪০০ গ্রাম ভাত খায়। তাদের কোন সঞ্চয় বা মূলধন ছিল না, তাই সম্পদ বা সম্পত্তি গঠনের প্রশ্ন আসে না, তাই তারা তাদের দৈনন্দিন অর্থনীতিতে একটি ভারসাম্য বজায় রাখে এবং এই ভারসাম্য অনেকটা দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে। এই পরিস্থিতি এবং সমস্যাগুলি সমস্ত পরিবারের জন্য সর্বজনীন এবং এটিকে তাদের অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে সরানো যায় না। সরকার নিবিড় গবেষণা ও সমীক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিরহড়বাসীদের জন্য নতুন দিশায় অবিলম্বে নতুন প্রকল্প সহ নতুন উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করবেন বলে গবেষণা পত্রে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

ভবেশ চক্রবর্তী (১৯৮০) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- **"The Birhors of West Bengal and the Rehabilitation Scheme: A Case Study".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রটির উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সালে বাঘমুন্ডি ও ঝালদা থানার অন্তর্গত দুটি স্থানে পরিকল্পিতভাবে নির্বাচিত পুনর্বাসন ও বিরহড়দের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য একটি সমীক্ষা চালানো এবং কার্যকর হওয়া প্রকল্পগুলির প্রভাব মূল্যায়ন করা।

পদ্ধতি: গবেষক এই গবেষণা পত্রটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য ডকুমেন্টারি সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ এবং স্ট্যান্ডার্ড নৃতাত্ত্বিক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে ছিলেন। তথ্যের পরিমাণ নির্ধারণের পাশাপাশি কল্যাণমূলক প্রকল্পের (আর্থ-সামাজিক) প্রতি তথ্যদাতার মনোভাব পরিমাপ করার জন্য একটি প্রশ্নাবলীও ব্যবহার করেছেন।

ফলাফল: পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় বিরহড়রা বসবাস করে, এই বিরহড় সম্প্রদায়রা প্রকৃত অর্থে আধা-যাযাবর উপজাতি হিসাবে পরিচিত ছিল। বিরহড়রা তাঁদের প্রতিবেশী কিছু 'হড়' মানুষ কৃষিবিদ শ্রেণি সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজ এবং ওরাওঁদের মতো প্রায় স্থায়ী জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছে। বৈবাহিক মৈত্রী ও সাম্প্রদায়িক শিকার অনুষ্ঠানের জন্য বিরহড়রা অন্যান্য বসতির সহযোগিতায় প্রায় সামাজিক, আচার, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। বিরহড়দেরকে আবাসন প্রকল্প এবং এখানে একটি পুনর্বাসন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ব্যাবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিরহড়দের বিকাশের জন্য আর্থ-সামাজিক ভিত্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, পরিকল্পনাবিদরা এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির দিকে অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক দিকে কোনও মনোযোগ দেননি যার উপর এর সাফল্য নির্ভর করে।

এই গবেষণা থেকে উঠে এসেছে যে বিরহড়দের সার্বিক বিকাশের জন্য কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কার্যকর করা পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করলে হবে না, নিম্নোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেগুলি হল- ১) বিরহড়দের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, পরিবেশ ও জীবনের প্রেক্ষাপটের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ২) বিরহড়দের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণে বিরহড় আদিবাসী প্রবীণদের সক্রিয় অংশগ্রহণই বেশি প্রয়োজন। পরিকল্পনাবিদদের অনুমান দ্বারা বিরহড়দের ব্যবহারিক কি কি সমস্যা রয়েছে সেই বিষয়ে সচেতনতা গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, বিরহড় সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং পরিকল্পনাবিদদের নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি বিরহড়দের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি।

২.৩ জ্ঞানের ব্যবধান (Knowledge Gap):

আদিবাসীদের শিক্ষা এবং উন্নয়নে সমাজবিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে চলেছেন। ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮৮ সালে M. B. Buch-এর তত্ত্বাবধানে আদিবাসী বিষয়ে ভারতে সংগঠিত বিভিন্ন গবেষণার সংকলন 'Survey of Research in Education' -এর তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। NCERT (NEW Delhi)-এর তত্ত্বাবধানে চতুর্থ খন্ডে আদিবাসীদের বিষয়ে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা হয়েছে---

১) আদিবাসী এলাকায় বিদ্যালয় গঠন এবং বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ।

২) আশ্রমিক বিদ্যালয়, বনবাসী আশ্রম বিদ্যালয় ইত্যাদি আদিবাসীদের দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান এবং পরিবেশ।

৩) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, বোধ মূলক সামর্থ্য, পরিবেশ এবং সহ পাঠক্রমের সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতা, সমাজ তাত্ত্বিক, বিজ্ঞান বিষয়ে মনোভাব ইত্যাদি।

৪) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের অসময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়া ও ফেল করে বছরের পর বছর থেকে যাওয়া এবং সম্পদের অপচয়।

৫) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক প্রয়োজন সমূহ।

৬) আদিবাসী পরিবারগুলির গঠন, আদিবাসী মা-বাবাদের আচরণ। শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সংরক্ষণ।

৭) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা এবং আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা এবং সমাজ পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণ বিষয়ে গবেষণা।

'Fifth Survey of Educational Research' (১৯৮৮-১৯৯২)-এ ধরা পড়েছে যে তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত এবং তথ্য নির্ভর উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তপশিলি উপজাতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নয়নে যে অসংখ্য সামাজিক, মানসিক বাধা রয়েছে সেই বিষয়েও গবেষণায় যথেষ্ট আলোকপাত হয়নি। তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায় ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণে সামাজিক স্তরবিন্যাসে পিছিয়ে পড়ার যে প্রবণতা সে বিশেষও কোনো আলোকপাত করেনি। সমাজের বিভিন্ন অন্যায়, নৈরাজ্য এবং আইন বহির্ভূত আচরণের সম্মুখীন হতে হয় আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিষয়েও গবেষকরা চুপ করে থেকে গেছেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সময়কালে যে ১৪ টি Ph.D. স্তরে গবেষণা হয়েছে তার কোনটিতে আদিবাসী সমাজ কিভাবে চিরাচরিত ধ্যান ধারণাকে বজায় রেখে আজও নিজেদেরকে টিকিয়ে নিয়ে চলেছে এই বিষয়ে কোন আলোকপাত ছিল না। এই সময়কালে যে গবেষণাগুলি সংঘটিত হয়েছে তাদের মূল ক্ষেত্র ছিল —

১) বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্যার সমূহ।

২) আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা, শিক্ষার সুযোগ সুবিধা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং আদিবাসীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক আগ্রহ।

৩) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ।

৪) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন বিষয়ে গবেষণা।

১৯৮৮ থেকে ৯২ এই পর্যায়েও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভাষাগত সমস্যা নিয়ে কোন গবেষণা চোখে পড়েনি। এছাড়াও আদিবাসীরা কিভাবে বিভিন্ন ধরনের ওষধি গাছ-গাছড়া

ব্যবহার করে নিজেদের সুস্থ এবং সবল রেখেছেন সেই বিষয়েও কোন গবেষণা বর্তমান গবেষকের চোখে পড়েনি।

'Sixth Survey of Educational Research' (1993-2000) এই সময় কালে আদিবাসীদের শিক্ষা বিষয়ে একটি D.Litt- স্তরে গবেষণা হয়েছে এবং সাতটি Ph.D. স্তরে গবেষণা হয়েছে এছাড়া এই সময়কালে NCERT (NEW Delhi) এই বিষয়ে দুইটি গবেষণা করেছেন, NIEPA (New Delhi) একটি গবেষণা করেছেন, ERIC সাহায্য পুষ্ট দুইটি গবেষণা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে আদিবাসীদের শিশু লালন-পালন বিধি শিক্ষা ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী এবং বিদ্যালয় গত শর্ত সমূহ, আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবৈজ্ঞানিক শর্ত সমূহ, আদিবাসী শিক্ষকদের শিক্ষকতা চলাকালীন প্রশিক্ষণ, 'Tribal Area Sub-Plan'-এর আদিবাসীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, আদিবাসী বিদ্যালয়গুলির জেলার সামগ্রিক বিকাশে ভূমিকা, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, আদিম আদিবাসী গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আদিবাসী যুবক যুবতীদের শিক্ষামূলক কৃতিত্ব অর্জনের মনোসামাজিক শর্ত সমূহ, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের অকালে পাঠ শেষ না করে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের যৌনতা এবং নৈতিকতা বিষয়ে বিচার বিবেচনা, বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা, আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হয়েছে সুতরাং এই সময় কালে স্বল্প পরিসরে হলেও আদিবাসী সমাজের শিক্ষা গত উন্নয়নে ভাষাগত সমস্যা বিষয়ে একটি গবেষণা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছর সমূহের গবেষণাগুলিতে সংগঠিত হয়নি।

আদিবাসীদের শিক্ষাগত উন্নয়নে বিভিন্ন মিশনারি স্কুল এবং সমাজ সেবামূলক ভূমিকা বিষয়ে এই পর্যায়ে গবেষণা সংঘটিত হয়নি। আদিবাসী এলাকায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমস্যা এবং আদিবাসী সমাজের উপর বয়স্ক শিক্ষার প্রভাব বিষয়ে গবেষণা হয়নি। আদিবাসীদের শিক্ষা তাদের সমাজ ব্যবস্থায় কোনরূপ প্রভাব ফেলেছে কিনা এই বিষয়ে গবেষণা সংঘটিত হয়নি। পাঠ্যক্রমে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে কিনা এই বিষয়েও কোন গবেষণা হয়নি।

২০০০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে যে সকল গবেষণা হয়েছে তাতে খুব কম ক্ষেত্রে 'Indigenous Knowledge System' কিভাবে আদিবাসীদের Sustainable Development এ ভূমিকা নিয়েছে এই বিষয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে।

২.৪ গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions):

১) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার কত?

২) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষাগত অবস্থা কি?

৩) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের অবস্থা কি?

৪) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা কি?

৫) বিরহড় আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে বনজ সম্পদ ব্যবহার করে এবং জীবিকা নির্বাহে তাঁদের অর্থনৈতিক স্থিতি কিরূপ?

৬) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের জন্য তাঁদের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু এবং দেশীয় পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা কি কি?

৭) পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারি উভয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী সমূহ কি কি?

৮) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে আদিবাসী দেশীয় জ্ঞান ব্যবস্থা প্রয়োগের পরামর্শ কিরূপ?

২.৫ উদ্দেশ্য সমূহ (Objectives):

১) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড়দের সাক্ষরতা হার অধ্যয়ন করা।

২) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাগত অবস্থা অধ্যয়ন করা।

৩) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড় আদিবাসীদের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সামাজিক, সংস্কৃতিক কার্যক্রম অধ্যয়ন করা।

৪) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড় আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে অধ্যয়ন করা।

৫) বিরহড়দের আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বনজ সম্পদের ব্যবহার এবং জীবিকা নির্বাহে অর্থনৈতিক জীবনের ধরণ অধ্যয়ন করা।

৬) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিরহড়দের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু, আদিবাসী পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা অধ্যয়ন করা।

৭) পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারি উভয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি অধ্যয়ন করা।

৮) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে পরিবেশবান্ধব গবেষণার দ্বারা আদিবাসী দেশীয় জ্ঞান পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য পরামর্শ প্রদান করা।

২.৬ অধ্যয়নের সীমাবদ্ধতা (Delimitations of the Study):

১) বর্তমানে গবেষণাটি কেবলমাত্র বিরহড় সম্প্রদায়ের উপর করা হয়েছে।

২) কেবলমাত্র পুরুলিয়া জেলায় বাসকারী বিরহড় জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

৩) কেবলমাত্র গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪) এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি ব্লক নির্বাচন করা হয়েছে।

৫) এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি ব্লকের অধীনে চারটি গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে।

References:

Chakraborty, B. (1980). The Birhor of West Bengal and the Rehabilitation Scheme: A Case Study. *Bulletin of the Cultural Research Institute,* 14(3&4), Scheduled Caste & Tribes Welfare Department, Government of India.

Ghosh, D., & Chatterjee, D. (2024). Birhor Society and Culture: A Study on Particularly Vulnerable Tribal Groups of Jharkhand, India. *International Journal of Research and Review,* 11(6), 191-201.

Orao, S. (2024). A Study of Cultural Practice of Birhor Tribes with Special Reference to Chhattisgarh. *Journal of Research in Humanities and Social Science,* 12(4), pp.58-65.

Bansal, S., Sarkar, T., Yadav, A., Garg, I., Gupta, M., & Sarvaiya, H. (2023). Indigenous Communities and Sustainable Development: A Review and Research Agenda, *Wiley*, pp.65-87.

Gorai, P., Dey, A., & Modak, B. K. (2022). Birhors of Purulia: Marching Toward Mainstream of the Society: Insights for Social, Ecological and Technological Sustainability. *Elsevier Inc,* 29-60.

Patra, S., Dutta, A. K., & Upadhay, P. (2021). An Analysis on the Educational Awareness of Marginalized Communities on Nayagram Block, Jhargram District, West Bengal. *NSDU-Open Journal*, 4(1), 36-44.

Samanta, S. (2021). Attitude towards Girls Education and Socio-Economic Status of a Tribal Village in West Bengal. *International Journal of Creative Research Thoughts. IJCRT,* 9(1), 2624-2630.

Mal, S., & Patro, B. (2020). A Study on Educational Status on Santal (Tribal) Communities: A Theoretical Study on Gourangdihi Gram Panchayet of

Purulia (1978-2011). *International Journal of Social Science and Humanist Research*, 8(1), 356-359.

Devi, S. K., & Dhal, N. (2020). Socio-Economic Initiative of the Government and Its Efficacy on Tribal Women. Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE).* 8(5), 22-35. ISSN: 2277-3878.

Singha, J., & Murmu, S. C. (2020). Religious Transformation of the Birhor Tribe: An Anthropological Analysis. Scholar Publications, Karimgang, Assam, India. *International Journal of Humanities and Social Science Studies*, 4(4), 23-32.

Bain, B., & Premi, J. K. (2019). An Investigation on the Ethno-Gynecological Medicinal Knowledge of the Birhor Tribe of Chhattisgarh, India. *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 12(11), 5138.

Mudi, N. C. (2018). Transformation of Socio-Economic Condition of Tribal Community in Frontier Bengal: Identity Crisis and Present Scenario. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 5(10), ISSN-2349-5162.

Daripa, S. K. (2018). Socio Economic Status of the Tribal of Purulia District in the Post-Colonial Period. *International Journal of Research in Social Sciences*, 8(2), 727-738.

Premi, J. K., & Kumar, A. (2018). Development and Social Inequality among Birhor: A Particularly Vulnerable Tribal Group of Chhattisgarh, India. *Indian Journal of Research in Anthropology*, 4(2), 37-43.

Nayak, K., & Nayek, D. (2017). Indigenous Knowledge and Healthcare Practices among the Santal Communities: A Case Study of Mayurbhangh District of Odisha. *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 3(3), 5-9.

Das, S. (2017). Economic Growth and Women Empowered through Education: A Study on Santal at Birbhum, West Bengal. *International Journal of Engineering Development of Research* (IJEDR), 5(3), 392-397.

Magni, G. (2017). Indigenous Knowledge and Implications for the Sustainable Development Agenda. *European Journal of Education*, 52 (4), 437-447.

Kurrey, V. K., Lokesh, S., Rakesh, N., & Sharja, P. (2017). Study of Health Status and Morbidity Pattern in 5-18 Years Birhor Children: A Primitive Tribe of Chhattisgarh. *Indian J Child Health*, 4(2), 180-183.

Chaudhury, S., chaudhury, H. R., & Singh, H. (2016). Some Ethno zoological uses of Birhor Tribes of West Bengal, India. *J. Traditional and Folk Practices*, 2, 3, 4(1), 33-42.

Sarkar, A. (2016). Vulnerable Tribal Groups: Birhor. *Indian Streams Research Journal*, 5(12), ISSN: 2249-894X. www.Isrj.in

Bhattacharjee, S., & Siddique, G. (2016). Significance of Forests in the Tribal Habitation of Jangalmahal Area in West Bengal. *International Journal of Research on Social and Natural Sciences*, 1(1), 1-13.

Manna, S., & Sarkar, R. (2015). Birhors way of life in 21 st Century: a micro study in a few villages of Hazaribagh District, Jharkhand. *Man and life*, 41(1-2), 71-78.

Chaudhury, S., Chowdhury, H., & Rahaman, Singh, H. (2016). Some Ethno zoological uses of Birhor Tribe of West Bengal, India. *J. Traditional and Folk Practices*, 02, 03, 04(1).

Mukherjee, S. (2014). Status of Female Education among Santal, Kheria Sabra and Birhor Tribal Communities of Purulia District, West Bengal, India. *Transactions Indian Geographers*, 36 (2), 271-278.

Basu, A., & Chattergee, S. (2014). Status of Educational Performance of Tribal Student: A Study in Paschim Mednipur District, West Bengal. *Educational Research and Review,* 9 (20), 925-937.

Tripathi, S. (2012). Birhor and Their Culture: An Ethnographic Account of Particularly Vulnerable Tribal Group of Chhattisgarh. *Jol Jungal Jamin Orr Jonojati*, 127-150. ISBN: 978-81-908246-1-3.

Lollen, M. (2012). Utilization and Conservation of Natural Resources in Mountain Habitat: A Study on Livelihood Pattern and Indigenous Knowledge System of the Memba Arunachal Pradesh. Arunachal Institute of Tribal Studies, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh, India.

Manna, S., Sarkar, R., & Ghosh, A. (2013). Education and Patterns of Marriage System: A Micro Study on the Birhors in Hazaribag District, Jharkhand. *International Journal of Social Science*, 2(2), 109-118.

Sengupta, S., & Ghosh, S. (2012). Problems of Education among the Scheduled Tribes in India; Finding a Balance. *Geo Analyst*, 2(1).

Lollen, M., & Lashkar, B. A. (2011). Soil Fertility Management by Memba Tribes of Mechukha Valley, Arunachal Pradesh. *Current Science*, 101 (11).

Chaudhuri, S. K. (2008). Folk Belief and Resource Conservation: Reflection from Arunachal Pradesh. *India Folk Life*. (A Quarterly Newsletter from National Folklore Support Center, 28, January), National Folk Lore Support Center, Chennai.

Farooquee, N. A., Dollon, M., & Kata, C. P. (2007). Traditional Wisdom of Apatani Community in the Management and Sharing of Natural Resources in North East India. Ink K. Misra (Ed). Traditional Knowledge in Contempory Societies: Challenges and Opportunities. Indregandhi Rastriya Manav Sangra Galaya, Simla Hills.

Rahman, F. (2007). Impact of Forest Economy on the Socio Economic Development of Tribes a Case Study of Chhattisgarh State. Department of Geography Aligarh Muslim University, India.

Singh, S. P. (2005). Collection and Utilization of Medicinal and Aromatic Plants in Arunachol Pradesh, *Arunachol Forest News*, 21 (1 and 2), 65-68.

Lartzman, D. A., & Vredenburg, H. (2005). Indigenous Peoples, Resource Extrusion and Sustainable Development: An Ethical Approach. *Journal of Business Ethics*, 56 (3), 239-254.

Mc. Gregor, D. (2004). Indigenous Knowledge, Environment and our Future. *American Indian Quarterly*, 28 (3/4), 385-410.

Willson, W. A. (2004). Indigenous Knowledge Recovery is Indigenous Empowerment. *American Indian Quarterly*, 28 (3/4, Special Issues), 359-372.

Gadgil, M. (1998). Grassroots Conservation Practices: Revitalizing the Tradition. Edited By in R. V. Anuradha, A. Kothari, N. Pathak and B. Taniga (Ed.). *In Communities and Conservation of Natural Resources Management in South and Central Asia*, SAGH India Private. Limited, pp. 219-238.

Nimachow, G., Joshi, R. C., & Dai, O. (2011). Role of Indigenous Knowledge System in Conservation of Forest Resources-A Case Study of the Aka Tribes of Arunachal Pradesh. *Indian Journal of Traditional Knowledge*, 10(2), pp.276-280.

Mukhopadhya, A. K. (1992). Poorest of the Poor Birhor a Primitive Tribe of West Bengal. *Cultural Research Institute*, SC & ST Welfare Department, West Bengal.

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি

(Research Methodology)

৩.১ গবেষণার নকশা (Research Design): গুণগত এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণা নকশা (Qualitative and Ethnographic Research Design):

৩.১.১ শিক্ষাবিজ্ঞানে গুণগত পদ্ধতিতে গবেষণার নকশা (Qualitative Research Design in Education):

গুনগত গবেষণার (Qualitative Research) সুস্পষ্ট এবং যথার্থরূপ বিংশ শতকে সমাজ বিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ প্রমুখদের গবেষণায় প্রথম প্রামাণ্যরূপ লাভ করেছে। যদিও গুনগত গবেষণার যথার্থতা প্রমানিত, কিন্তু এর পদ্ধতিগত স্পষ্টতা নিয়ে এখনও গবেষকরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। গুনগত গবেষণা এমন একটি পদ্ধতি যা কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনাকে পুরোপুরি ভাবে এবং ব্যাখ্যামূলক ভাবে দেখার চেষ্টা করে। একটি স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে গুণগত গবেষণা সংগঠিত হয় পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। সাধারণত কোনো সামাজিক বা মানবিক গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির সামগ্রিক চেহারাটিকে উন্মোচিত করার জন্য গুণগত গবেষণা ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নকরা, প্রশ্ন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা, আরোহি পদ্ধতিতে উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট থেকে সাধারণীকরনের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়।

McMillan এবং Schumaches (1997, p-469) গুণগত গবেষণার সংজ্ঞায় বলেছেন যে, "Primarily an inductive process of organization of data into categories and identifying patterns (Relationships) among categories".

Strauss এবং Corbin (1990) এর মতে, যে সকল গবেষণায় সাংখ্যমান ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে ব্যবহার করা যায় না এবং যেখানে প্রাপ্ত উপাত্তকে সংখ্যাগত ভাবে সাজানো যায় না সেখানেই গুনগত গবেষণাকে ব্যবহার করা হয়।

Creswell (1998) গুণগত গবেষণার নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। তাঁর মতে, "Qualitative research is an enquiry process of understanding based on distinct methodological tradition of enquiry that explores a social or human problem. The researcher builds a complex holistic pictures, analyes words, report detail view of informant and conduct the study in a natural setting".

বর্তমানে নৃতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণার ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, সামাজিক কাজ, সম্প্রদায় গত উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে গুণগত গবেষণা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে এখনো দ্বিধা রয়েছে, কোন কোন গবেষক এখনো গুণগত গবেষণা পদ্ধতিকেই ঋণাত্মক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এর কারণ, তারা মনে করেন যে কোন গবেষণা সংখ্যামানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তাকে গবেষণা বলা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গির দুইটি সমস্যা রয়েছে ১) কোন কোন গুণগত গবেষণায় সংখ্যাগত বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ব্যবহার কতবার ঘটছে। ২) এটির একটি ঋনাত্মক অর্থ রয়েছে। সংখ্যাগত গবেষণা যুক্তি নির্ভর ধনাত্মক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা পরীক্ষা মূলক গবেষণার সাথে খাপ খায়। অন্যদিকে গুণগত গবেষণা ঘটনা নির্ভর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা

অনেকগুলি গবেষণা সমাধানের সম্ভাব্য পথ (Best and Khan, 2006, page-254)। আবার সংখ্যাগত প্রশ্ন মালায় প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলি বদ্ধ অবস্থায় থাকে, কিন্তু গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে প্রশ্নমালায় ব্যবহৃত প্রশ্নগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে।

গুণগত গবেষণার নকশা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে A.K. Singh (2006, p.450) বলেছেন যে, "The Research design in the detail plan of the investigation, in fact it is the blueprint of the detail procedure of testing the hypothesis and analysing the obtained data. The research design those may be define as the sequence of those states taken a head of time to ensure that the relevant data will be collected in a way that permit objective analysis of the different hypothesis formulated with respect to the research problem…. The selection of any research design is obviously not based upon the whoms names of the researcher, weather it is based upon the purpose of the investigation type of variables and the condition in which the research is to be conducted".

গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে যে সকল গবেষক গবেষণা করেন তারা কখনোই প্রকল্প তৈরি করেন না, যদিও গবেষণাটিকে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে তাদের একটি প্রাথমিক নমনীয় কাজের পরিকল্পনা করতে হয়। গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতেও অনেকগুলি চলরাশি থাকে। গবেষক চলরাশিগুলিকে সূত্রকৌশলে ব্যবহার করেন। গুণগত গবেষণার নকশা তৈরির নীতি নির্দিষ্ট গবেষণার উপর নির্ভরশীল। এই পদ্ধতিতে গবেষক গবেষণার নকশা তৈরির সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দর্শনের অনুমান সমূহ সম্পর্কিত অনুসন্ধানের পদ্ধতি এবং গবেষণার পদ্ধতির ওপর দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। গবেষক কখনোই গবেষণার নকশা তৈরির সময় শুধুমাত্র কয়েকটি চলরাশির মধ্যে সম্পর্ক বা যথাযোগ্যকে প্রাধান্য দেবেন না। বরঞ্চ তিনি গবেষণার সমস্যাটিকে

সামগ্রিক ও জৈবিকভাবে দেখবেন এবং গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন শব্দ, ধারণা, অনুমানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে সচেষ্ট হবেন।

বর্তমান গবেষণায় গবেষক গুণগত গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন কারণ–

১) গুণগত গবেষণায় একটি ঘটনা বা একটি সমস্যা বা একজন ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে দেখবার চেষ্টা করা হয় যেহেতু কোন একটি ঘটনা বা একটি সমাজকে কয়েকটি নির্ভরশীল চলরাশিতে ভাগ করে নেওয়া অসম্ভব।

২) এই পদ্ধতিতে গবেষণার নকশা তৈরি কালে গবেষক কোন নির্দিষ্ট অনুমান, সীমাবদ্ধতা, সংজ্ঞা ইত্যাদি জ্ঞাত উপাত্তের উপর নির্ভর করে না। বরঞ্চ স্বাভাবিক পরিবেশে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা সহজ এবং স্বাধীনভাবে যে প্রতিক্রিয়া দেখায় সেটিকে গবেষক সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন।

৩) এই পদ্ধতিতে স্বাভাবিক পরিবেশে ব্যক্তি বিষয়টিকে যেভাবে দেখছে সেটি হল এই পদ্ধতির বাস্তবতা। এখানে গবেষক বাস্তবতাকে দেখেন অংশগ্রহণ কারীর চোখ দিয়ে এবং উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করেন পক্ষপাতহীনভাবে এবং সঠিকভাবে।

৪) এই পদ্ধতিতে তথ্য গ্রহণ কালে গবেষক আগে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। সিদ্ধান্ত উপাত্তের মধ্যে থেকে উঠে আসবে।

বর্তমান গবেষণায় গবেষক গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, বিশেষত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বিরহড় আদিবাসী সমাজে যুগ যুগ ধরে ভারতের নিজস্ব দেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে কিভাবে তারা তাদের জীবন বহু হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত উপায়ে চালিয়ে নিয়ে চলেছে এবং এর মাধ্যমে পরিবেশ

বান্ধব উপায়ে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রেখেছে এখানে সেই বিষয়ে গবেষক গবেষণা করতে চেয়েছেন। তাই স্বাভাবিকভাবে গবেষক নৃতাত্ত্বিক গুণগত গবেষণার আশ্রয় নিয়েছেন। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা মানবসমাজের সংস্কৃতি, সমাজ ও মানুষের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সমাজের প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবহ আচরণগুলিকে ব্যাখ্যা করে।

Brim এবং Spain (১৯৭৪) বলেছেন যে, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা যথেষ্ট শ্রমসাধ্য এবং এর জন্য প্রচুর গুণগত সময় দিতে হয়। কারণ এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে গবেষক তথ্য সংগ্রহ করেন। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নকশায় ক্ষেত্র সমীক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে সর্বনিম্ন ৬ মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত সময় লাগে। এই মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষার প্রকৃতি হল অনুসন্ধানমূলক। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতিতে গবেষক যে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা করেন তাতে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে আদিবাসী সমাজের ভাষা, তাদের গোত্র, জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ, ঐতিহাসিক তথ্য, আদিবাসী সমাজের মৌলিক সংস্কৃতি এবং প্রাপ্ত প্রাত্যহিক ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ভিত্তিক কাজকর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন। স্বাভাবিক ভাবে নৃতাত্ত্বিকরা এই ধরনের গবেষণায় দ্রুত কোন নির্দিষ্ট ফলাফলে না পৌঁছে দীর্ঘ মাঠ সমীক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকেন। এই গুলি হল—

১) সহযোগিতামূলক পর্যবেক্ষণ,

২) নৃতাত্ত্বিক সাক্ষাৎকার,

৩) আদিবাসী সমাজ দ্বারা হস্ত নির্মিত বিভিন্ন বস্তু যেগুলি তারা নিত্য ব্যবহার করে সেইগুলি সংগ্রহ।

৪) তথ্যদানকারীর বক্তব্যকে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন না করে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা এবং সেগুলিকে তথ্য দাতার দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করা।

এই পদ্ধতিতে গবেষকরা পর্যবেক্ষণ, বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা, এবং মৌখিক কথার সমাহারে গবেষণার ফলাফলকে লিপিবদ্ধ করেন।

বর্তমান গবেষণাটি করতে গিয়ে গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে ভারতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর যে সকল গবেষণাপত্র তৈরি ও প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সবকটিতেই সার্ভে বা সমীক্ষা পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে গবেষকরা কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। কোন কোন গবেষক জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন কিন্তু কিভাবে গবেষক নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে এগিয়েছেন তার কোন নির্দিষ্ট তথ্যসূত্র বিশেষ কোথাও পাওয়া যায়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গবেষকরা নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি বলতে আদিবাসী সমাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করাকে বুঝিয়েছেন। তাই বর্তমান গবেষক তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক এবং কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক যাঁরা এই ধরনের গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান তথ্য সংগ্রহের জন্য Observation Method, Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), Photo Shoot, Use of Secondary Data ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন। PRA এবং FGD পদ্ধতি দুইটি আধুনিক এবং আদিবাসী সমাজের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকরী বলে স্বীকৃত।

যেহেতু বিরহড় আদিবাসীদের নিকট থেকে এই গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাই গবেষক গবেষণার নকশা হিসাবে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। আর এই জন্য গবেষক চারটি আদিবাসী বিরহড় গ্রামে দীর্ঘ সময় তাদের সাথে থেকেছেন, তাদের সমাজ

ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্মাচরণ ইত্যাদিকে কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাদের সাথে দীর্ঘ সময় ঘনিষ্ট ভাবে আলাপ-আলোচনা করেছেন, কথোপকথন কালে তারা কি বলছেন এবং বাস্তবে তারা কি করছেন এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করার চেষ্টা করেছেন, ফলে গবেষক খুব কাজ থেকে বিরহড় আদিবাসী সমাজ এবং তার সংস্কৃতিকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন।

আদিবাসী সমাজে সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মাচরণ, জীবনচর্চা, খাদ্য, বেশভূষা, সংগীত-নৃত্য, চিরাচরিত পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিকে বাইরে থেকে কিছু প্রশ্ন মালার মাধ্যমে জানা বা বোঝা সম্ভব নয়। এদের সম্পর্কে জানতে গেলে এবং তাদেরকে বুঝতে গেলে এদের সাথে বসবাস করতে হয়, এদের ভাষাকে শিখে নিয়ে তাদের সাথে একাত্ম হতে হয়, তাদের হাতে হাত রেখে তাদের সঙ্গে থেকে তাদের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে ডুবে গিয়ে তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। যে কারণে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ যথেষ্ট শ্রমসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ। এখানে বর্তমান গবেষক নিজে সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় বিরহড় আদিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহে কোন ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হননি। এছাড়াও বিরহড়দের সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাস, ও ধর্মচরণ, সংগীত-নৃত্য ইত্যাদিতে তিনি একাত্ম হতে পেরেছেন।

নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য গবেষক নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির চারটি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে মেনে চলেছেন। সেগুলি হল—

১) বিষয়নিষ্ঠ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করবার লক্ষ্যে গবেষক গবেষণার গভীরে ডুব দিয়েছেন।

২) তিনি গবেষণার সমস্যাটিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে যারা তথ্য দিয়েছেন তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে।

৩) তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক প্রায় আড়াই বছর সময় ব্যয় করেছেন। প্রতিটি বিরহড়ের গ্রামে তাদের সাথে থেকেছেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

৪) গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক নিম্নলিখিত টেকনিকগুলি অনুসরণ করেছেন– পর্যবেক্ষণ, PRA, FDG, ডাইরি লিখন, পূর্বতণ গবেষণা পত্র এবং সম্পর্কিত বই, প্রবন্ধ ইত্যাদিকে গভীরভাবে পড়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, ছবি সংগ্রহ করেছেন এবং তথ্য দাতাদের বক্তব্যকে রেকর্ড করেছেন। খুব গভীরভাবে এই পদ্ধতিতে অনুসরণ করতে গিয়ে গবেষক অন্তর থেকে বুঝেছেন যে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির সঙ্গে অন্যান্য গুণগত গবেষণার মৌলিক পার্থক্যটি কোথায়।

৩.১.১.১ পর্যবেক্ষণ (Observation):

সমাজ বিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে সাধারণভাবে গবেষকরা প্রশ্নগুচ্ছ বা Questionnaire ব্যবহার করে উত্তরদাতার নিকট থেকে তাঁদের ভাবনা চিন্তা এবং কর্মধারার একটি চিত্র লাভ করার চেষ্টা করেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে ইতিবাচক পরিবেশে কথোপকথন চলে এবং এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সাক্ষাৎকার দাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। সাক্ষাৎকার কালে উভয় পক্ষই পরস্পরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পরস্পরের ভাব, মানসিকতা, মানবভাব, সংস্কৃতি, ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস ইত্যাদি জানার চেষ্টা করেন। তাই পর্যবেক্ষণকে নমুনা দলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রথম পদ্ধতি বলে স্বীকার করা হয়। বহু ক্ষেত্রে তথ্যদাতা লিখিত আকারে বা কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য দিতে পারেন না, সেক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্যগ্রহীতা তথ্যদাতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যদাতার যথাযথ আচরণ সম্পর্কে

সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তবে গবেষকের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা না থাকলে গবেষক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না। বর্তমানে গবেষণা ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ কৌশলকে বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল বলে স্বীকার করা হয়। শিক্ষাবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণায় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। সমাজবিজ্ঞানে চলরাশিগুলির (Variables) প্রভাবকে সর্বদা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, তাই আধুনিক গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সহায়তায় যথাযথ নির্ভরযোগ্য এবং প্রতিক্রিয়া যুক্ত তথ্য পাওয়া যায় বলে স্বীকার করা হয়। এই ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ককে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে হয় না। সুপরিকল্পিতভাবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে পারলে নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ তথ্য লাভ করা যায়। পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণকালে সর্বদাই নৈর্ব্যক্তিক থাকতে হয়। তিনি সর্বদাই সংগৃহীত তথ্যকে যাচাই করবেন এবং সম্ভব হলে সাংখ্যমান ভিত্তিকভাবে তথ্য সংগ্রহে জোর দেবেন। পর্যবেক্ষণকালে যে তথ্যকে সংগ্রহ করা হয় তাকে ততক্ষণাৎ নথিভুক্ত করতে হয়।

বর্তমান গবেষণায় গবেষক সুসংগঠিত এবং অসংগঠিত উভয় পদ্ধতিতে তথ্যদাতাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং পর্যবেক্ষণকালে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলির তাৎক্ষণিক নথিভুক্তিকরণ করেছেন। এছাড়াও সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দানের জন্য চেষ্টা করেছেন।

৩.১.১.২ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (Participatory Rural Appraisal):

সমাজবিজ্ঞানে, নৃতত্ত্বে, শিক্ষাবিজ্ঞানে এবং সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় Participatory Rural Appraisal (PRA) বা অংশগ্রহণ ভিত্তিক গ্রামীণ সম্পদের মূল্যায়ন পদ্ধতিকে ব্যবহার

করা হয়ে থাকে। আধুনিক কালে পরিবেশ বিজ্ঞানের গবেষণায়ও অংশগ্রহণ ভিত্তিক গ্রামীণ সম্পদের মূল্যায়ন বা PRA এর ব্যবহার লক্ষণীয়। মোটামুটি ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যের সময়ে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Development Studies এর একটি simposuem এ প্রথম PRA এর প্রাথমিক খসড়া রূপ Rapid Rural Appraisal (RRA) এর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। RRA এর প্রথম ধারণা তৈরি হয় গ্রামীণ উন্নয়নমূলক ভ্রমণের বা পর্যটনের অংশ রূপে। দেখা গেছে শহর অঞ্চলে অংশভিত্তিক পেশাদাররা গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ওই সময় গ্রামে আসতে শুরু করেন এবং এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে গ্রামভিত্তিক ভ্রমণের বা পর্যটনের ব্যবস্থা। তারা লক্ষ্য করেন যে বড় ধরনের প্রশ্নমালার সাহায্যে গ্রামীণ সম্পদের যে সমীক্ষা করা হয় তা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় সাপেক্ষ। এছাড়াও এই প্রশ্নমালা ভিত্তিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে গ্রামীণ সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন অসম্ভব (Chambers, 1980; Carruthers & Chambers, 1981; Longhurst, 1981). RRA পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলাকার সমাজ ব্যবস্থা, গ্রামীণ বনজ সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ, মানুষ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে এবং মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ ঘটে। ক্রমশ এই পদ্ধতিটি চল্লিশ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়নমূলক গবেষণার কাজে স্বীকৃতি লাভ করে। এই পদ্ধতিতে প্রথম স্পষ্টভাবে জানা যায় যে গ্রামীণ মানুষের অবস্থার সঙ্গে তাদের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাষার সংমিশ্রণের গুরুত্ব। RRA কে ব্যবহার করতে গিয়ে গবেষকরা লক্ষ্য করেন যে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রামীন এলাকার মানুষের বিভিন্ন তথ্য সঠিকভাবে সংগৃহীত হয় না। সর্বোপরি তথ্যের একত্রিকরণ বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা গ্রামীণ মানুষের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা থাকে না। তাই প্রশ্নকর্তা অর্থাৎ যিনি গ্রামীণ মানুষের নিকট থেকে উত্তর গ্রহণ করছেন তিনি এখানে প্রধান

ভূমিকা পালন করেন। আর উত্তর দাতারা সমগ্র কার্যক্রমে একটি ছোট অংশ রূপে পরিগণিত হন।

Robert Chambers (1994) এর নেতৃত্বে একদল গবেষক RRA এর পরিবর্তন ঘটিয়ে PRA বা Participatory Rural Appraisal পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এখানে 'Rapid' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'Participatory' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যান্য ধরনের গবেষণা পদ্ধতি এবং চিরাচরিত ধ্যান ধারণা থেকে PRA পদ্ধতির উদ্ভব। Activist Participatory Research (Freire, 1968) পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়েছে যে স্থানীয় মানুষরা নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারেন, এবং প্রয়োজনীয় নকশা তৈরি করতে পারেন। গ্রামীণ মানুষেরা যে উন্নয়নমূলক নকশা তৈরীর অংশীদার হতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

Gypmantasiri (1980) এবং Conway (1985, 1986, 1987) এর গবেষণায় প্রমাণিত যে গ্রামীণ মানুষরা কৃষিভিত্তিক পরিবেশ বিশ্লেষণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সামাজিক নৃবিজ্ঞান প্রমাণ করেছেন যে সাধারণ মানুষ বিশেষত আদিবাসীদের সঙ্গে গভীর সূক্ষ্ম সম্পর্ক রচনা করতে পারলে তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে লাভ করা সম্ভব যা গবেষণার পক্ষে সহায়ক হয়। Gilbert, Norman এবং Winch (1980), Shanr, Philipp এবং Schmehl (1982) অনুমান করেছেন যে গ্রামভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্ন রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে দরিদ্র কৃষকদের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

PRA পদ্ধতিতে একটি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্থানের মানুষের সম্পদের স্থান নির্ণয় করণ, সম্পদের পরিমাপন এবং সম্পদের স্থানান্তরিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ মানুষের আয় বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক কৃষি কাজের মডেল তৈরি করেন, প্রাতিষ্ঠানিক নকশা গড়ে তোলেন এবং চিরাচরিত ধারা এবং পরিবর্তন কে বিশ্লেষণ করেন এবং মডেলে গৃহীত নকশা বিশ্লেষণ করেন। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালনার ক্ষেত্রে মৃত্তিকা এবং জল সংরক্ষণে বনজ সম্পদ, মৎস্য চাষ, বনজ প্রাণীর সম্পদের সংরক্ষণে গ্রামীণ মানুষের ভূমিকা এই পদ্ধতিতে স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া PRA ব্যবহার করে কৃষিকাজ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রভৃতির মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা হয়।

মোটামুটি ভাবে ১৯৯৪ সালের প্রথমার্ধের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি রাষ্ট্রের এই পদ্ধতি Participatory Appraisal হিসাবে গৃহীত হয় যেমন-বাংলাদেশ, বলিভিয়া, বৎসোয়ানা, ব্রাজিল, বুরকিনা ফাশ, কম্বোডিয়া, ক্যামরুন, চিলি, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, মিশর, ইথিওপিয়া, গাম্বিয়া, ঘানা, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, কেনিয়া, মালিমৌরিতানিয়া, মেক্সিকো, নামিবিয়া, নেপাল, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, সুদান, তানজানিয়া, উগান্ডা, ভিয়েতনাম, জাম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্র যেমন-ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, জার্মানি ইত্যাদি রাষ্ট্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য PRA এর বহুল ব্যবহার শুরু হয়। বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি ভারত এবং কেনিয়াতে PRA পদ্ধতিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে বহুল মাত্রায় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় সংস্থাই তথ্য সংগ্রহে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করে। প্রায় কুড়িটিরও অধিক রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছাত্ররা এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করছেন। স্বাভাবিকভাবে PRA পদ্ধতি বর্তমানে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়।

PRA পদ্ধতিতে গ্রামীণ এলাকার মানুষজন সক্রিয়তার সাথে এবং প্রত্যক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী মানুষরা বুঝতে পারেন যে এই পদ্ধতিকে ব্যবহার করলে গ্রামীণ সমাজে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। বহিরাগত গবেষক এবং গ্রামীণ মানুষরা একত্রিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে কিভাবে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে সম্পদের সমহারে বন্টন করতে পারেন এবং সকলের উন্নতি ঘটাতে পারেন। খোলা আকাশের নিচে গ্রামের মাঝামাঝি কোন জায়গায় গ্রামের সমস্ত আদিবাসী একত্রিত হন, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে PRA পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা কেউ চাইলেও তার ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বকে ব্যবহার করে গ্রামীণ বা এলাকার সম্পদকে নিজের বা পরিবারের দিকে সঞ্চালন করতে পারেন না।

এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীরা সমবেত ভাবে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সূত্র খুঁজে বের করেন অর্থাৎ এখানে ব্যক্তির অংশগ্রহণের গুরুত্বের দিক থেকে সকল এলাকাবাসী মানুষদের জানতে হবে তাদের সমস্যা কি? কিভাবে তারা সমস্যা থেকে বের হতে পারবে ? এবং কিভাবে সম্পদের সমবন্টন সম্ভব হবে? এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ সাধারণ মানুষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, এবং গবেষক দলের মধ্যে তৈরি হওয়া মিথ্যা প্রাচীর অপসারিত হয় এবং পরস্পরের সহায়তায় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে সকলে এগোতে পারেন। এখানে প্রধান লক্ষ্য হলো সমস্যার দ্রুত সমাধান।

ক) PRA পদ্ধতির মান্য মৌলিক নীতিগুলি হল (The Basic Principles of the PRA System):

১) গ্রামীন এলাকার মানুষজন যারা এই পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করছেন তাদের সকলের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, এবং দূরদৃষ্টিকে গুরুত্ব সহকারে সম্মান জানাতে হবে।

২) গ্রামীণ মানুষজনের মধ্যে ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে হবে।

৩) কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং একটি নির্দিষ্ট নীতির উপর ভিত্তি করে PRA দল আলোচনা সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, যেখানে সকলের লক্ষ্য হবে সমস্যার সমাধানে একটি গঠনমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

৪) সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে যাতে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাকে যাতে বাস্তবসম্মত ভাবে কার্যকারী করে তোলা যায়।

খ) PRA পদ্ধতির শক্তিশালী দিক সমূহ (Strong aspects of the PRA approach):

১) গ্রামীণ মানুষেরা বুঝতে পারবেন যে তাদের নিজস্ব এলাকার উন্নয়নে তাদেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তারা সজ্ঞানে চেষ্টা করলে তাদের নিজ এলাকার সমস্যাগুলির নিজেরাই সমাধান করতে পারেন দলবদ্ধভাবে এবং তারা দায়বদ্ধ তাদের এলাকার উন্নয়নে।

২) গ্রামীণ মানুষেরা একেবারে তৃণমূল স্তরে সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করবেন এবং ওই সকল সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৩) PRA পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ, অক্ষমতা, ক্ষমতা, বা আদিবাসী বৈশিষ্ট্য কোনটি বিচার্য বিষয় নয়। সকলেই এই আলোচনায় অংশগ্রহণে সমান দায়িত্ব এবং সুযোগ পাবেন। দুরদৃষ্টি সম্পন্নরা সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রাধিকার পেতে পারেন।

৪) এই পদ্ধতিতে নকশা তৈরির জন্য গ্রামীণ মানুষরা একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ মানব সম্পদ বা গবেষক এর উপস্থিতিতে একত্রিত হন এবং নিজেরা চিন্তা ভাবনা করে সমবেত প্রচেষ্টায় একটি নকশা তৈরি করেন।

৫) গ্রামীন এলাকার সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে গ্রামীণ সম্পদ কোথায় কি রয়েছে কাগজ এবং পেনের দ্বারা তার অবস্থান নির্ণয় করবেন। এবং উপস্থিত সকলেই সেই সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৬) এই পদ্ধতির দ্বারা গ্রামীণ মানুষেরা বুঝতে শেখেন তাদের এলাকার কোথায় কি ধরনের সম্পদ রয়েছে এবং তাদের নিজস্ব গ্রামীণ সম্পদকে কিভাবে সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করবেন। যে অংশকে ব্যবহার করা হবে না সেই সম্পদকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং নতুন সম্পদের উৎপাদনে সকলে কিভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

৭) জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং নিজস্ব এলাকার সম্পদের সঠিক ব্যবহার এই পদ্ধতির আরেকটি অন্যতম শক্তিশালী দিক।

৮) যে সকল অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এলাকার উন্নয়নে তাদেরকে অতিরিক্ত দায়িত্বশীল হবার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে।

৯) PRA পদ্ধতিতে স্থানীয় সম্পদের সঞ্চালনে যে সকল ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে সক্ষম তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

১০) PRA পদ্ধতির শেষ পর্যায়ে এসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ মানুষদের হাতে কি ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হবে যাতে করে মনোযোগ সহকারে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় এবং ব্যবহার করা যায়।

গ) গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারা এই পদ্ধতিতে গৃহীত কার্যক্রম সমূহ (Activities Undertaken by Rural Institutions in this Manner):

১) জল সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যেমন সেচ প্রকল্প, জন গোষ্ঠী ভিত্তিক ও ছোট ছোট জলাধার তৈরির দ্বারা জলের প্রবাহকে ব্যবহার উপযোগী করা, মাটির নিচে জলকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহার করা।

২) মৃত্তিকা এবং জল সংরক্ষণ, অনুর্বর মাটিকে উর্বরতা দান করা, মাটির গভীরে জল প্রবেশের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, কৃষিভিত্তিক বনজ সম্পদ সৃষ্টি করা।

৩) জনগণের জমি, সরকারি জমি, এবং জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ, গবাদি পশুর জন্য চারণভূমি তৈরি করা।

৪) বায়োগ্যাস প্ল্যান তৈরি করা যাতে রান্নার জ্বালানি সহজলভ্য হয় এবং বৃক্ষ ছেদন করাকে রোধ করা যায়।

৫) গ্রামীণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে সার উৎপাদন, ফলের বীজ সংরক্ষণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে পোকামাকড় মারার বিষ তৈরি করা ইত্যাদি।

৬) গবাদি গৃহপালিত পশুর বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষ বৃদ্ধি করা এবং গবাদি পশুর সন্তান উৎপাদনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গড়ে তোলা।

৭) শুকনো মাটিতে ওই মাটির পক্ষে উপযুক্ত গাছ লাগানো, যেমন-লাল কাঁকুরে এবং পাথুরে স্থানে শাল, সেগুন, মহুয়া, বেল, কঁৎবেল, হরিতকি, বহেড়া ইত্যাদি বৃক্ষরোপণ।

৮) গবাদি পশুর চাষ বৃদ্ধি করা।

৯) সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ সময় ভিত্তিক আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য গ্রামীণ সমবায় সমিতি তৈরি করা।

১০) গরু, মোষ ইত্যাদির দুধ, মুরগি ও হাঁসের ডিম এবং ফসল ও সবজিকে দলবদ্ধভাবে সমিতির মাধ্যমে বাজারজাত করার ব্যবস্থাপনা।

১১) জমিতে লাঙ্গল দান, গাছকে সুরক্ষিত রাখা ইত্যাদি।

১২) গ্রামীণ মানব সম্পদের বিকাশ, গ্রামীণ মানুষদের প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ অভিজ্ঞতা, দক্ষতাকে নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী গ্রামের উন্নয়নে ব্যবহার করা।

ঘ) PRA পদ্ধতি ব্যবহার (Use of the PRA method):

যেকোনো এলাকার বিকাশমূলক কার্যক্রমে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ জরুরী। জনগণ এলাকার উন্নয়নে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন - কার্যক্রমটি প্রস্তুত করতে সহায়তা দান করা, শারীরিক শ্রম দান করা এবং মানবসম্পদকে ওই কাজে ব্যবহার হতে দেওয়া। যে সকল জনগণের মনোভাব যথেষ্ট নেতিবাচক তাদের মনোভাবের পরিবর্তনে সহায়তা দান করা ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে স্বল্প সময় ভিত্তিক উন্নয়ন ঘটানো হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়নে ওই এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ব্যতীত উন্নয়নের ধারাকে দীর্ঘদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে না। গ্রামীণ মানুষদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচীন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা কে অস্বীকার করে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন অসম্ভব। যে সকল ক্ষেত্রে বাইরের জ্ঞানকে জোরপূর্বক প্রয়োগ করে গ্রামীণ উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমে এলাকার মানুষজনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটা প্রয়োজন আর এটি

সম্ভব তাদেরকে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানোর মধ্যে দিয়ে। এ ধরনের কার্যক্রম অধিক কার্যকরী এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারণ এই ধরনের কার্যক্রমে এলাকার মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। তাই PRA পদ্ধতির বহুল প্রচলন ঘটছে। এই একই পদ্ধতিতে বাইরে থেকে আসা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ মানব সম্পদেরা গ্রামীণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন।

চ) PRA পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহকালে নিম্নলিখিত পর্যায়গুলিকে ব্যবহার করা হয় (PRA Method Uses the Following Stages During Data Collection):

১) ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য নিরূপণ।

২) পদ্ধতি নিরূপণ এবং গ্রামের কোন কোন মানুষ এ পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে তার স্থিতিকরণ।

৩) সমগ্র কার্যক্রমটির সম্বন্ধে গ্রামের মানুষকে অবহিত করণ এবং কেন সমস্ত মানুষের সঙ্গে বাইরে থেকে আশা দক্ষ ব্যক্তিরা কথা বলতে চাইছেন সেই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা।

৪) মূল কার্যক্রমের জন্য একটি ম্যাপ তৈরি করা।

৫) যে সমস্ত গ্রামে বিভিন্ন বর্ণ এবং নানা শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন সেখানে সমস্ত মানুষ যেন সমানভাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পান এই বিষয়টির সুনিশ্চিতকরণ। এ পর্যায়ে সামাজিক সম্পদের অবস্থান ও চিহ্নিত করা জরুরী।

৬) ফোকাস দল আলোচনা।

৭) গ্রামীণ আলোচনা সভা যেখানে গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষ অংশগ্রহণ করবেন এবং সম্পদ দল আলোচনা সভায় সক্রিয় ভূমিকা নেবেন।

৮) গ্রামীন এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রস্তুতকরণ-

ক) স্থানীয় মানুষরা একটি সমস্যার যে সম্ভাব্য সমাধান সূত্র বলেছেন তা যথার্থ কিনা অথবা বাইরের দক্ষ ও অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানব সম্পদকে দিয়ে বিষয়টিকে যাচাই করতে হবে।

খ) যে কার্যক্রমটি নেয়া হচ্ছে তার জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ভার।

গ) সম্ভাব্য ব্যয়ের অর্থের উৎস নির্ধারণ।

ঘ) এই কার্যক্রমটি সাফল্য লাভ করলে সাধারণ মানুষ বিশেষত দরিদ্র মানুষেরা কি বৈধভাবে উপকৃত হবেন? অথবা দরিদ্র মানুষের উপকারকল্পে কার্যক্রমের পুনরায় নকশা তৈরি করার যথার্থতার বিচারকরণ।

ঙ) কার্যক্রমটিকে সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করতে হলে বাইরে থেকে অর্থ পাওয়া যাবে কি না? এলাকার মানুষ আর্থিক দিক থেকে কতখানি সহায়তা দিতে পারবেন শারীরিক শ্রমদান, ক্যাশ টাকা দান, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে।

চ) গ্রামের মানুষের সহায়তায় কিভাবে লোকস্ট উন্নয়ন কার্যক্রম রচনা করা সম্ভব তার বিশ্লেষণ করা।

ছ) কার্যক্রমটিকে চালিয়ে যেতে গেলে যে সম্পদের প্রয়োজন তা কতটুকু গ্রাম থেকে আসতে পারে।

জ) গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদের ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রমে গ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। কার্যক্রমটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে গ্রামের কি ধরনের প্রশিক্ষণ জরুরী এবং এর জন্য বাইরে থেকে কি ধরনের পেশাদার সরবরাহ করতে হবে।

ছ) PRA পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল (Results Obtained through PRA Method):

১) ম্যাপ তৈরিকরণ।

২) মৌলিক তথ্য সমূহের সংগ্রহ করন।

৩) যে কাজগুলি করা হবে তার ক্রম অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুতকরণ।

৪) এই কার্যক্রমে গ্রামের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে যুক্ত করণ।

৫) সুযোগ-সুবিধা চিহ্নিতকরণ।

৬) গ্রামে প্রাকৃতিক সম্পদ পরিচালনা কার্যক্রম তৈরি করণ।

৭) গ্রামের বিভিন্ন দলের মধ্যে থাকা দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের পেছনে কি ধরনের স্বার্থ কাজ করছে সেই সম্বন্ধে ধারণা গঠন।

৮) সমগ্র কার্যক্রমটিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তুলে আনা, পরিচালনা, দেখাশোনা ও মূল্যায়ন।

জ) PRA পদ্ধতিতে গবেষকের বা প্রশিক্ষণ দাতার দায়িত্ব:(Responsibilities of the Researcher or Trainer in PRA Procedures):

১) গবেষককে প্রথমে জানতে হবে PRA তে অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ মানুষদের মনোভাব এবং দ্বন্দ্বের স্বরূপ।

২) গবেষক PRA কার্যক্রমে বর্তমানে কি পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখবেন এবং প্রাপ্ত গুনগতমান ভিত্তিক এবং সংখ্যাগত মান ভিত্তিক তথ্যের মধ্যে তুলনা করতে শিখবেন।

৩) গবেষক এলাকায় অধিক পরিমাণে সময় দেবেন এবং সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের চেষ্টা করবেন।

৪) গ্রামীণ মানুষের সৃজনশীল ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে হবে। এবং স্থানীয় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দানের চেষ্টা করতে হবে।

৫) গবেষক সমগ্র কার্যক্রমটিকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করবেন, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করবেন, মানুষদের সাথে নিরন্তর আলোচনা চালিয়ে যাবেন, এবং তাদের কাছ থেকে অর্থপূর্ণ এবং কার্যকরী অভিজ্ঞতা লাভে লাভের জন্য সক্রিয় থাকবেন।

ঝ) PRA পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষকের তথ্য সংগ্রহ:

PRA পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহকালে গ্রাম এলাকার অধিকাংশ মানুষ একত্রিত হন এবং গবেষকের সংগ্রহ করা আর্ট পেপারের উপর বিভিন্ন রঙের কলম ব্যবহার করে গ্রামের সম্পদ এবং সামাজিক মানচিত্র অংকন করেন। গ্রামের সম্পদগুলি হল গ্রামের রাস্তা, ধর্মস্থান, গ্রামের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেমন স্কুল, পাঠশালা, পাঠাগার ইত্যাদি, সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য জলাশয়, পুকুর, পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, নলকূপ ইত্যাদি, আদিবাসীদের ধর্মীয় স্থান, সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চাষযোগ্য জমি, জল ধরে রাখার বাঁধ ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা হয়।

সামাজিক মানচিত্রে গ্রামের বিভিন্ন পাড়া গোষ্ঠী জাতপাত ভিত্তিক শ্রেণী ইত্যাদির অবস্থান চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও ক্লাবঘর, অবসর বিনোদনের স্থান, গ্রামের স্থায়ী দোকান, এবং

অস্থায়ী হাট, ওষুধের দোকান, চিকিৎসকের বাড়ি ইত্যাদি কে চিহ্নিত করা হয়। যে সকল পরিবারে কোনো পুরুষ নেই বা যে সকল পরিবারে নারী পরিবারের প্রধান সেই পরিবারগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। দরিদ্র পরিবার এবং অতি দরিদ্র পরিবার বা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলিকেও চিহ্নিত করা হয়। PRA-এর জন্য তৈরি মানচিত্রে স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর বা সেলফ হেল্প গ্রুপের সদস্যদের বাড়িগুলিকে পৃথক বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। গ্রামের শ্মশান এবং কবরস্থানকেও পৃথক বর্ণের পেন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তথ্য সংগ্রহের জন্য PRA পদ্ধতিতে গবেষক বিভিন্ন বর্ণের আট পেপার, পেন্সিল, পেন্সিল কাটার, ইরেজার, পেপার ওয়েট ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।

সাধারণভাবে বর্তমান গবেষক বিরহড় উপজাতি এলাকায় অর্থাৎ পুরুলিয়ার তিনটি ব্লকে ঝালদা-১, বাগমুন্ডি, বলরামপুরে বিরহড়দের নিকট থেকে PRA পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এক একটি সেশনে গড়ে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় ব্যয়িত হয়েছে একটি PRA কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ করতে।

PRA পদ্ধতিকে ব্যবহারের পূর্বে গবেষক দীর্ঘদিন উল্লেখিত তিনটি ব্লকের চারটি গ্রামে প্রথমে নিয়মিত ভাবে কয়েক মাস যাতায়াত করে বিরহড় আদিবাসী মানুষদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করেন। প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের ৪/৫ দিন পূর্বে গবেষক উল্লিখিত গ্রামগুলিতে নির্দিষ্ট বিরহড় পরিবারে বসবাস করেছেন। এরপর নির্দিষ্ট স্থানে এলাকার সমস্ত বিরহড় পুরুষ ও মহিলা এবং ছেলেমেয়েদের একত্রিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক পরিবারকে পৃথকভাবে জানান। নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে বিকালে যেহেতু বিরহড়রা সকলেই ভোরে বের হয়ে জঙ্গলে যান বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং দুপুর গড়িয়ে বাড়িতে ফেরেন। পুরুষরা কেউ কেউ দূরের গ্রামে

বা নিকট শহরে কায়িক শ্রম দিতে যান এবং বিকালে ফেরেন। বিরহড়দের কমিউনিটি হলে মাদুর বা চাটাই নির্দিষ্ট স্থানে বিছিয়ে গবেষক গ্রামের সমস্ত মানুষের বসবার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর আজকে কেন তিনি সবাইকে একত্রিত ডেকেছেন তার কারণ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন এবং সবাইকে গ্রামের সম্পদ পরিমাপণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। এই পর্যায়ে গবেষক তার গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য উপস্থিত সমস্ত সদস্যকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেন। কারোর কোন প্রশ্ন থাকলে গবেষক প্রত্যেকের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত এবং যথার্থ উত্তর দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রশ্নকর্তা তথা অন্যান্যরা প্রাপ্ত উত্তরে খুশি হয়।

এরপর গবেষক বড় আর্ট পেপার মাদুরের উপর সমবেত জনগণের মাঝখানে মেলে ধরেন এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়সি যুবক যুবতীদের হাতে একটি করে পেন্সিল এবং রঙিন স্কেচ পেন ধরিয়ে দেন। এবার গবেষক উপস্থিত সকল গ্রামবাসীকে বুঝিয়ে বলেন গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করতে এবং সীমানার বাইরে কোন দিকে কি আছে অর্থাৎ বড় রাস্তা, পুকুর, জলাশয়, জঙ্গল, অন্য গ্রাম বা অন্য পাড়া, মন্দির, আদিবাসীদের ধর্মস্থান, শ্মশান, কবর ইত্যাদি স্পষ্ট করে লিখতে। এবার গবেষক বলেন গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়া প্রধান রাস্তা এবং অপ্রধান রাস্তাগুলিকে পৃথকভাবে আঁকতে এবং কোন রাস্তার কোন দিকে কটি করে বাড়ি রয়েছে তা আঁকতে এবং চিহ্নিত করতে বলেন। বাড়ি ছাড়াও কুঁয়ো, নলকূপ, পুকুর, ধর্মস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, চাষযোগ্য জমি, বর্ষার জল বের হওয়ার সরু নালা এবং বড়নালা ইত্যাদিকে চিহ্নিত করতে বলেন। এরপর গবেষক স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর সদস্যদের বাড়ি, দরিদ্র ও অতি দরিদ্র পরিবারগুলির বাড়ি, পুরুষ বিহীন এবং মহিলা নির্ভর বাড়িগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে বলেন। এরপর গবেষক বলেন যে কোথায় কোথায় বনজ সম্পদ রয়েছে, কৃষি জমি, পাড়ার দোকান ঘর, কুটির শিল্পের স্থান, ইত্যাদিকে এঁকে চিহ্নিত করতে। অংকন কালে

গবেষক প্রতিটি অংকন কারীকে উদ্বুদ্ধ করেন যে তারা যেন অঙ্কন কালে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপাদানকে বোঝানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট বর্ণের স্কেচ পেন ব্যবহার করেন।

গ্রামবাসীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবারগুলির আর্থিক উপায়ের উৎস ইত্যাদি নিয়ে গবেষক তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া কৃষি জমির চরিত্র, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার চিত্র শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা, উচ্চ শিক্ষা লাভের সমস্যা, দারিদ্র্য দূরীকরণে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, পানীয় জলের সমস্যা, পয়ঃ প্রণালীগত সমস্যা, ছেলেমেয়েদের জন্য মিড ডে মিল, এবং তার গুণগতমান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষক বিস্তারিত জানবার চেষ্টা করেন।

এই পর্যায়ে গবেষক গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেন কাদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা রয়েছে, কারা অধিক নমনীয় এবং সৃজনশীল, দ্রুততার সঙ্গে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কারা সমস্যার সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন। PRA পদ্ধতি ব্যবহার করে ম্যাপ অংকন এবং আলোচনা শেষে গবেষক ওই দিনের সমস্ত কার্যক্রমটিকে সংক্ষেপে আলোচনা করেন এবং উপস্থিত সকলের সহযোগিতায় এই আলোচনা থেকে নতুন কি কি বেরিয়ে এল তা গ্রামবাসীদের জানান। সকলের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তিনি সকলকে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানান। এরপর গবেষক আর্ট পেপার অংকনের অন্যান্য উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করে আজকের কাজ শেষ করেন। এরপর গবেষক সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আলোচনা শেষ করেন।

৩.১.১.৩ ফোকাস দল আলোচনা (Focus Group Discussion):

ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাসন (FGD) একটি গুণগত মান ভিত্তিক গবেষণাকে সূচিত করে। এটি একদিকে যেমন গবেষণা পদ্ধতি তেমনি অপরদিকে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের একটি টেকনিকও বটে। এই পদ্ধতিতে একই ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা এবং একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করা, কিছু মানুষকে একত্রিত করে গবেষক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং গভীরতর ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু তথ্য বা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। সাধারণত যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটিতে ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সদস্যের আগ্রহ থাকে। এই পদ্ধতিতে এমনভাবে গবেষক বা পেশাদার ব্যক্তি আলোচনায় যান এবং প্রশ্ন তোলেন যেখানে অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট সমস্যা বিষয়ে ধারণা, মনোভাব, বিশ্বাস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, মতামত ইত্যাদি উঠে আসে। পারস্পরিক আলোচনা কালে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের মতামত এবং অভিজ্ঞতাকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেন। এটি ধরে নেওয়া হয় যে PRA দলের আলোচনা কালে PRA দলে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, মতামত, মনোভাব, নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই সচেষ্ট হন। আবার ফোকাস দল এই কথাও বলে না যে ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীদের সকলের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমান হবে কিংবা একটি জনগোষ্ঠীর সকলের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সমতা এবং সাদৃশ্য থাকবে। বরঞ্চ ফোকাস গ্রুপ এই কথা বলে যে ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে মুক্ত মনে সম্মলিতভাবে সকলে আলোচনা করবেন। সুতরাং ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা গবেষণার প্রেক্ষিতে যথেষ্ট অর্থবহ হয়ে উঠবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সকলের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে।

ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা তাদের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যান সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা একটি Semi-Structure প্রশ্নমালাকে ভিত্তি করে। এছাড়াও এখানে গবেষক যথেষ্ট সাবধানতার সাথে আলোচনাটিকে চালিয়ে নিয়ে যান। এই ধরনের আলোচনায় একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অনেক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে মতামত, অভিজ্ঞতা, প্রবণতা ইত্যাদি উঠে আসে যা নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচনাতে নিযুক্ত হন। সুতরাং ফোকাস দলের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি গভীরভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করেন। কোনভাবেই তারা আলোচনার মূল বিষয় থেকে সরে যান না বা অন্যদেরকেও সরে যেতে দেন না, সুতরাং ফোকাস দলের আলোচনায় সমস্ত অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি গভীরভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করেন। কোনভাবেই তারা আলোচনার মূল বিষয় থেকে সরে যান না বা অন্যদেরকেও সরে যেতে দেন না।সুতরাং ফোকাস দলের আলোচনায় সমস্ত অংশগ্রহণকারীর সমানভাবে নিজস্ব মতামত তুলে ধরার এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

ক) ফোকাস গ্রুপের প্রকারভেদ

ফোকাস দলের আলোচনা মূলত দুই প্রকারের –

১) স্বাভাবিক দল বা সাধারণ দল (Natural Group):

এই দলের মধ্যে বহু অংশগ্রহণকারী থাকেন যারা কোন নির্দিষ্ট প্রথাগত বা অপ্রথাগত দলভুক্ত যেমন- পরিবার, সহকর্মী, বয়স্কদের শ্রেণী, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত Self Help Group (SHG), এলাকার ক্লাবের সদস্য বৃন্দ, এলাকার সমস্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্যরা। একটি স্বাভাবিক দলকে সঙ্গে নিয়ে ফোকাস দল আলোচনায় কিছু ইতিবাচক ও কিছু

নেতিবাচক দিক রয়েছে। যেমন এরূপ দলে অংশগ্রহণকারীরা প্রায় একই পরিবেশে বসবাসকারী, ফলে তাদের ভাবনা চিন্তা অনেকটাই একমুখী। আবার যেহেতু বিভিন্ন পেশা বিভিন্ন লিঙ্গের বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার মানুষ একত্রে বসে আলোচনা করেন তাই তাদের মধ্যে চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতার পার্থক্য থাকে।

২) এক্সপার্ট গ্রুপ (Expert Group):

এই ধরনের ফোকাস দলে সাধারণত অধিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষেরা অংশগ্রহণ করেন। প্রায়শঃ এদের গবেষণা সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকে তাই এই ধরনের দলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম এবং যথেষ্ট পরিমাণে সুনির্দিষ্ট তথ্য এই দলে অংশগ্রহণকারীরা সরবরাহ করেন। তবে এই কথা ঠিক যে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিস্তর ফারাকও থাকে।

খ) ফোকাস গ্রুপ আলোচনার জন্য গবেষক যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ-

১) প্রথমে গবেষক আলোচনা সভার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক এর সঙ্গে আলোচনা করে তৈরি করেন।

২) ফোকাস দলের আলোচনায় যে সকল ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার কথা জেনে নেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে তাদের সমবেত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

৩) স্থানীয় বিরহড় গোষ্ঠীর গ্রামীণ 'মাঝি' বা 'ন্যায়' এর সঙ্গে কথা বলে গবেষণা কাজটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি নেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে পরিচিত হন এবং প্রাথমিক আলোচনা করেন।

৪) গবেষক এর সাথে থাকা এলাকার অন্যান্য গোষ্ঠীর ১/২ জন তুলনায় শিক্ষিত যুবককে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেন যাতে তারা আলোচনা সভাটি চালিয়ে যেতে পাশ থেকে সহায়তা করতে পারে, যেমন- ছবি তোলা, অডিও রেকর্ডিং করা, চা বিস্কুট অংশগ্রহণকারীদের হাতে তুলে দেওয়া এবং ব্যবহারের পর চায়ের কাপটা সংগ্রহ করা, খাবার জলের ব্যবস্থা করা, বয়স্ক ব্যক্তিকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এবং বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সহায়করা অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির বক্তব্য দ্রুত হারে টুকে নেন।

৫) ফোকাস দলের আলোচনা স্থান এবং সময়ের পরিকল্পনা নেওয়া যেখানে গোল টেবিল আলোচনায় বা শতরঞ্জির উপর গোল ভাবে বসে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করতে পারেন তার পরিকল্পনা করা। গবেষক লক্ষ্য রেখেছিলেন এমন একটি স্থানকে নির্বাচন করতে যেখানে বিরহড় গোষ্ঠীর সকলেই সরাসরি পৌঁছাতে পারবে এবং আরাম করে বসে আলোচনা করতে পারবে।

৭) টেকনিক্যাল আলোচনায় অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিং, স্থির চিত্রগ্রহণ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন গবেষক।

গ) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পদ্ধতি এবং তথ্য সংগ্রহ (Focus Group Discussion Methods and Information Collection):

পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লক যেমন- ঝালদা ১, বাগমুন্ডি এবং বলরামপুর যেখানে বিরহড় আদিবাসীরা রয়েছেন সেখানে গবেষক পৌঁছান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পরিচিতি পত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলির আদিবাসী উন্নয়ন অফিসারের নিকট থেকে প্রয়োজনীয়

স্বীকৃতি পত্র বা পরিচয় পত্র গ্রহণ করেন। এরপর গবেষক নির্দিষ্ট বিরহড় আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে সেখানকার 'ন্যায়া' বা 'মাঝি' - এর সঙ্গে দেখা করেন এবং তিনি কেন এসেছেন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর গবেষক 'ন্যায়া' কে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বিরহড়দের প্রত্যেকের বাড়ি যান এবং তার আসার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলেন গ্রাম থেকে ফিরে গবেষক ন্যায়াকে বা মাঝির সঙ্গে আলোচনা করে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার দিন ও সময় নির্ধারণ করেন। এরপর গবেষক তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ককে অনুরোধ জানান যাতে তিনিও ফোকাস দলের আলোচনায় গবেষক এর সঙ্গে থাকেন।

এই পর্যায়ে গবেষক প্রত্যেকটি গ্রামে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েকটি দিন কাটান এবং বিরহড়দের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, শিশু লালন পালন, অর্থ উপার্জনের পদ্ধতি, ওষধি গাছের সংগ্রহ, ব্যবহার ও সুরক্ষিত রাখা, পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে শাল পাতা, ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ নিজেদের চোখে পর্যবেক্ষণ করেন।

গবেষক স্বয়ং সকালে বিরহড় মানুষদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যেতেন প্রায় সারাদিন তাদের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন জঙ্গলের প্রতি, পাহাড়ের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি বিরহড়দের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। প্রয়োজন ব্যতিরেকে একটি গাছের পাতা নষ্ট করতে বা আগাছাকে তুলে নেওয়ার কথা ও তারা যে ভাবতে পারেনা সে কথা গবেষক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন কি জঙ্গল থেকে ওষধি গাছ এবং ওষুধের গুণযুক্ত ফল বা বীজ সংগ্রহের নিপুন পদ্ধতি তিনি লক্ষ্য করেছেন যেখানে আদিবাসীরা একটিও গাছকে পুরোপুরি তুলে আনেন নি অথবা যে ক্ষেত্রে মূল সমেত গাছটিকে তুলতে হয়েছে সে ক্ষেত্রে কিছু গাছকে তার ভবিষ্যতের প্রজননের জন্য সুরক্ষিত রেখে অল্প কয়েকটিকে তুলে নিতে দেখেছেন।

যেহেতু বিরহড়দের পরিবারে গবেষকের রাত্রি বাসের কোন ব্যবস্থা হয়নি তাই গবেষক নিকটবর্তী আদিবাসী ও আদিবাসী পরিবারে রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এরপর একটি নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে গবেষক ফোকাস দলের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। আলোচনায় যে সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে তা তিনি তার সঙ্গে সহায়তা দানকারীদের সাহায্যে অডিও, ভিডিও, স্থিরচিত্র এবং নোট টেকিং এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে গবেষক সবার সামনে তুলে ধরেন। এবং তাদের আর কোন মতামত রয়েছে কিনা জানতে চান। আলোচনা শেষে গবেষক এবং সুপারভাইজার 'ন্যায়কে' বা 'মাঝিকে' এবং সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেন।

৩.২ পুরুলিয়া জেলায় তিনটি ব্লকের সম্বন্ধে আলোচনা (Profile of Three Blocks in Purulia District):

পুরুলিয়া জেলায় ২০ টি ব্লকের মধ্যে মুলত তিনটি ব্লকে বেশিরভাগ বিরহড় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করে। এই ব্লকগুলি হল- বাঘমুণ্ডী, ঝালদা-১, এবং বলরামপুর ব্লক। এছাড়াও হুড়া ব্লকেও কিছু বিরহড় আদিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নিম্নে ব্লক তিনটির সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ আলোচনা করা হল।

৩.২.১ বাঘমুণ্ডি ব্লকের প্রেক্ষাপট (Background of Baghmundi Block):

পুরুলিয়া জেলায় বাঘমুন্ডি ব্লক হল একটি সম্প্রদায় উন্নয়নমূলক ব্লক যেটি ঝালদা মহকুমার একটি প্রশাসনিক বিভাগ। ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে এই ব্লকের অধীনে মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৩৫,৫৭৯ জন। এটির গ্রামীণ জনসংখ্যায় পুরুষ জনসংখ্যা ছিল

৬৯,৫২০ (৫১%) এবং মহিলা জনসংখ্যা ছিল ৬৬,০৫৯ (৪৯%)। এই ব্লকে তপশীলি জাতির জনসংখ্যা ছিল ১৪,০৪২ (১০.৩৬%) এবং তপশীলি উপজাতির জনসংখ্যা ছিল ৩৪.০৩৮ (২৫.১১%)। ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে বাঘমুন্ডি ব্লকে অনেকগুলি বড় গ্রাম রয়েছে, সেই গ্রামগুলির মধ্যে বড় গ্রামগুলির জনসংখ্যা ছিল এইরূপ বাঘমুণ্ডি (৪,০৩৯) জন, বুর্দা (৫,১৫৯) জন, সিন্দ্রি (৪,১৩৮)জন ইত্যাদি।

ক) বাঘমুন্ডি ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location of Baghmundi Block):

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের আয়তন ৪২৭.৯৫ বর্গ কিলোমিটার। পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণ অংশে বাঘমুন্ডি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক অবস্থিত। সুবর্ণরেখা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে ঝালদা ওয়ান উন্নয়ন ব্লক এবং বাঘমুন্ডি ব্লকের ছোট অংশে অন্তঃরাজ্য সীমানা হিসাবে বিরাজ করছে। বলরামপুর এবং বাঘমুন্ডি ব্লক এই দুটি ব্লকের মধ্যে অযোধ্যা পাহাড়ের প্রধান উচ্চভূমি গঠন হয়ে রয়েছে। বাঘমুন্ডি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকটির উত্তরে ও পশ্চিমে ঝালদা-১, ঝালদা-২, উত্তরে আরসা ব্লক ও পূর্বে বলরামপুর ব্লক, দক্ষিণে ঝাড়খণ্ডের সরাই কেল্লা অবস্থিত এবং এই ব্লকগুলির দ্বারা বাঘমুন্ডি ব্লকটি চারপাশ দিয়ে ঘেরা।

৩.১ নকশা - বাঘমুন্ডি ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থানের মানচিত্র:

বাঘমুণ্ডি ব্লক (Baghmundi Block)

৩.১ বাঘমুন্ডি ব্লকের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের ছক:

SL NO.	বাগমুন্ডি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ
১	অয্যোধ্যা (Ajodhya)
২	বাঘমুন্ডি (Baghmundi)
৩	বিরগ্রাম (Birgram)
৪	বুরদা-কালিমাটি (Burda-Kalimathi)
৫	মাথা (Matha)
৬	সেরেংদিহি (Serengdihi)
৭	সিন্দ্রি (Sindri)
৮	টুনটুরি–সুইসা (Tunturi-Suisa)

খ) বাঘমুণ্ডী ব্লকের অধিবাসিদের সাক্ষরতার হার (Literacy Rate of People living in Baghmundi Block):

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাঘমুন্ডি ব্লকে মোট সাক্ষরতার হার ছিল ৬৪,৯৩৯ (৫৭.১৭%) জন। মোট সাক্ষরতা জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ৪২,০১৯ (৭২.১৪%) এবং মহিলাদের সাক্ষরতা ছিল ২২,৯২০ (৪১.৪২%) জন। এই ব্লকে মহিলা ও পুরুষদের সাক্ষরতা হারের লিঙ্গ পার্থক্য ছিল ৩০.৭২%।

৩.২ বাঘমুণ্ডী ব্লকের সাক্ষরতার হারের নকশা:

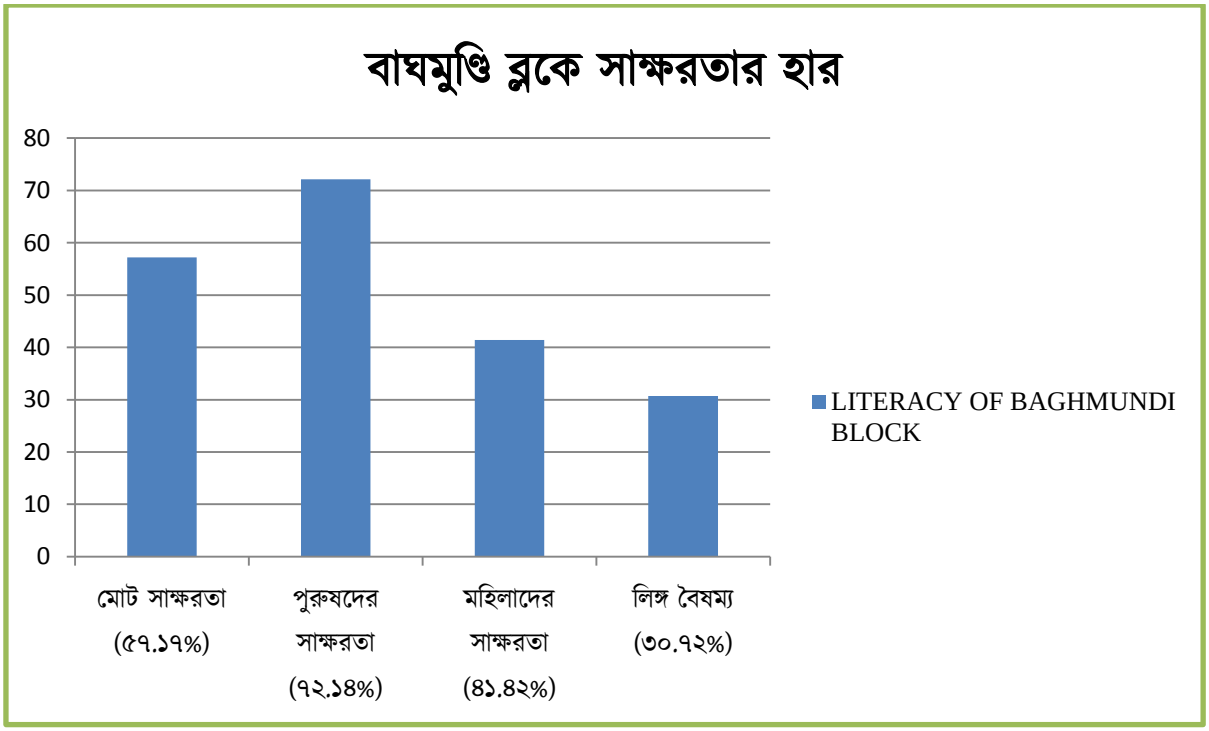

গ) বাঘমুন্ডি ব্লকের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition of people living in Bagmundi Block):

ভারতে ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে মোট শ্রমিক এবং কৃষকের সংখ্যা ছিল ১৭৩৫৯ জন অর্থাৎ ২৭.৪৫%। কৃষি শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ৩০৩০ টি (৯৩.৪৭%), গৃহস্থালি শিল্পের শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১৩৪০ অর্থাৎ ১২ %, শ্রমিকদের সংখ্যা হল ১৪২২৮ অর্থাৎ ২২.৫০%। সুতরাং এই ব্লকের মোট জনসংখ্যায় মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬৩,২৩৫ জন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪৬.৬৪%। অপরদিকে এই ব্লকে অ-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭২,৩৪৪ জন যেটি মোট জনসংখ্যার ৫৩.৩৬ শতাংশ।

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি ব্লকে শিল্প হিসাবে ছৌ নাচের সুনাম রয়েছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতে। এখানে ছৌ নাচের জন্য বিভিন্ন চরত্রের বা নাটকের মুখোশ রয়েছে, বাদ্যযন্ত্র

রয়েছে। এই ছৌ নাচের মুখোশ এবং বাদ্যযন্ত্র বাঘমুন্ডি থানার চড়িদা গ্রামে প্রায় ৪০ টি পরিবারে মুখোশগুলি তৈরি হয়। এই হস্ত শিল্প ও গ্রামীণ শিল্পের জন্য এই ব্লকে তথা এই জেলার অর্থনৈতিক বিকাশে অনেকটা ভুমিকা পালন করে। এছাড়া এই ব্লকে বিদ্যুৎ শিল্প অনেকটা সহযোগিতা করেছে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে। তাছাড়া চাষবাস এবং পর্যটন হল এই ব্লকের মূল অর্থনীতি।

৩.৩ বাঘমুন্ডি ব্লকের অর্থনৈতিক এবং শ্রমিক সম্পর্কিত অবস্থার নকশা

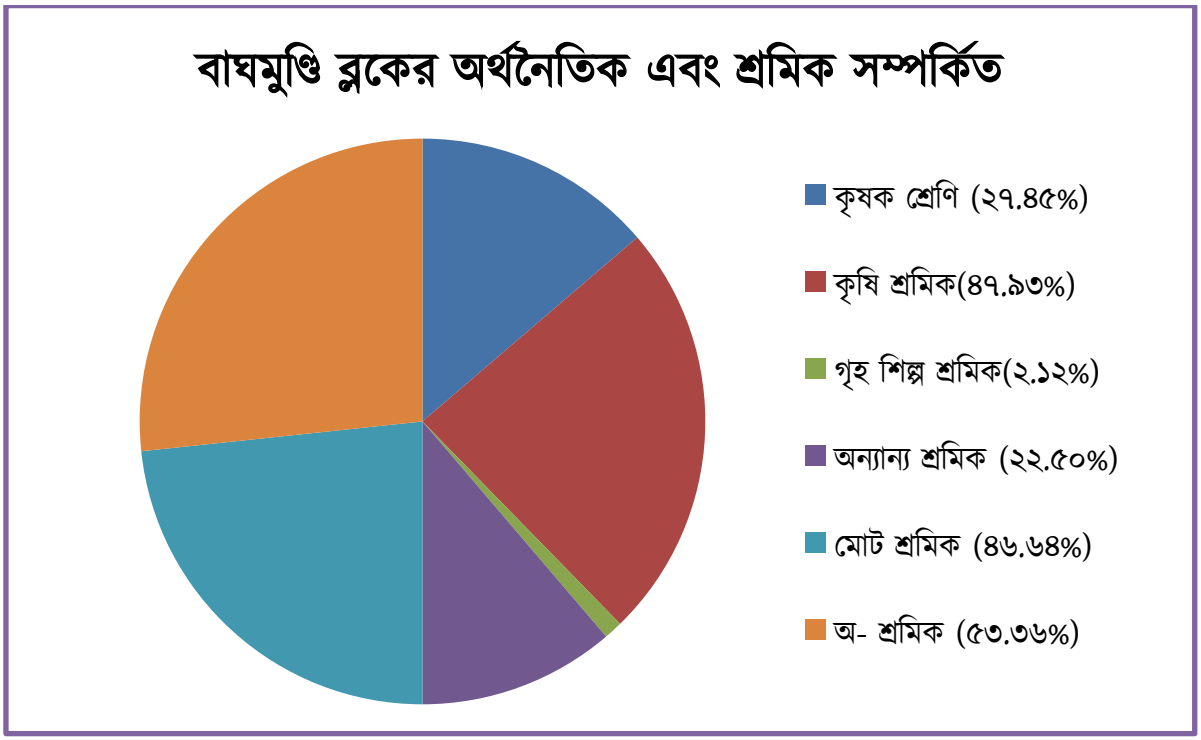

ঘ) বাঘমুন্ডি ব্লকের অধিবাসীদের কৃষি কাজ (Agriculture in Baghmundi Block):

বাঘমুন্ডি ব্লকের দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ ২০১৩-১৪ সালের বাগমুন্ডি ব্লকের অধিবেশনে নিয়োজিত কৃষিশ্রেণি ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ০.১৭%, পাট্টা দলিলধারী লোক সংখ্যা ছিল ১০.২৪৫%, ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা ছিল ৩.৪০%, প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা ছিল ৩৮.৪২%, এবং কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬১.০৫%।

এই ব্লকেই ২০১৩-১৪ সমসাময়িকে জল সেচের দ্বারা চাষবাসের জমির পরিমাণ ছিল ৭৭৯১.৬৭ হেক্টর, যার মধ্যে ৫৬২৭ হেক্টর ছিল বেনে সেচের মাধ্যমে। যেখানে ট্যাংকের জল সেচের পরিমাণ ১৩৬৬.৭৮ হেক্টর, নদী থেকে তোলা সেচের পরিমাণ ছিল ৪৭.৯২ হেক্টর, খাল ও কূপ থেকে সেচের পরিমাণ ছিল ১০৩.৮০ হেক্টর, এবং অন্যান্য সেচের দ্বারা ৬৪৬.২০ হেক্টর জমি চাষবাস হয়েছিল।

২০১৩-১৪ সমসাময়িকে বাঘমুন্ডি ব্লকে আমন ধান উৎপাদনের পরিমান ছিল ৮৮.৩৭৪ টন যেটি মূল শীতের শস্য হিসেবে উৎপাদন হয়েছিল ৩৫,২৪১ হেক্টর জমি থেকে। ভুট্টা উৎপাদন হয়েছিল এই বছরেই ৫৮৩ টন, যেটি ২৬৮ হেক্টর জমি থেকে উৎপাদিত ফসল আর এই সমগ্র উৎপাদন বাঘমুন্ডি ব্লকে হয়েছিল। এছাড়া বাঘমুন্ডি ব্লকে এইশস্যগুলি ছাড়াও আরও যে সমস্ত শস্য বা সবজি চাষ হয় বা উৎপাদন হয় সেগুলো হল মাছ, কলাই, খেসারি, সর্ষে ইত্যাদি।

ঙ) বাঘমুন্ডি ব্লকের শিক্ষা ব্যবস্থা (Education System of Bagmundi Block):

পুরুলিয়া জেলায় বাঘমুন্ডি ব্লকে ২০১৩-১৪ সালে ১৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২৭৭৪ জন। আর এই ব্লকের মধ্যে ২৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮৭৩ জন। এই ব্লকে ১১ টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১১২৭৩ জন।

বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও বাঘমুন্ডি ব্লকে একটি ডিগ্রী কলেজ রয়েছে যেখানে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮৬৬২ জন, আর একটি প্রফেশনাল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন আছে যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০ জন।

চ) বাগমুন্ডি ব্লকে ভাষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস (Language and Religious Beliefs in Bagmundi Block):

এই ব্লকের অধীনে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষজন ও বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসী মানুষের বসবাস। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাঘমুন্ডি ব্লকে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১,১৫,৬৩০ (৮৫.২৯%) জন। আদিবাসী বা জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ছিল ১৫,৩০১ জন, মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩,৮৮২ (০.৮৬%) জন, এবং খ্রিস্টান জনসংখ্যা ছিল ৭৬৬ (০.৫৬%)। তবে আদিবাসী বা জনগোষ্ঠীদের যে ধর্ম বিশ্বাস তা হলো মারাংবুরু, সারনা, সারি ধরম, আইচি, বিদিন, শন্ত, কারামা ইতাদি।

পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন জাতির বসবাস তাই বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষার ঐতিহ্য পূর্ণ সংস্কৃতি এখানে রয়েছে। এই ব্লকে বিভিন্ন ভাষার মানুষজনের সমাবেশ। ভারতের ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলা ভাষায় কথা বলার লোক সংখ্যা ছিল ৮৬.০৬%, আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাঁওতালি ভাষায় কথা বলার জনসংখ্যা ছিল ৯.৯৫%, কুরমি সম্প্রদায়ের কুরমালি ভাষায় কথা বলার লোক সংখ্যা ছিল ২.৯০% এবং এই ব্লকে অন্যান্য ভাষায় কথা বলার লোক সংখ্যা ছিল ১.০৯%।

৩.৪ বাগমুন্ডি ব্লকে ভাষা সম্পর্কিত নকশা:

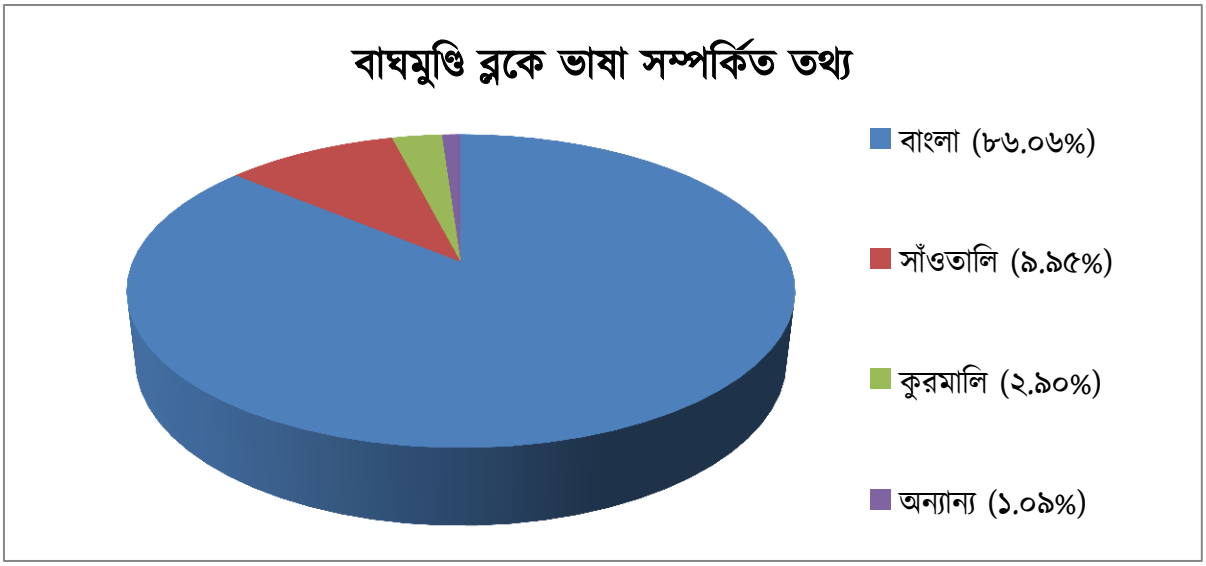

৩.৫ বাগমুন্ডি ব্লকে ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত নকশা:

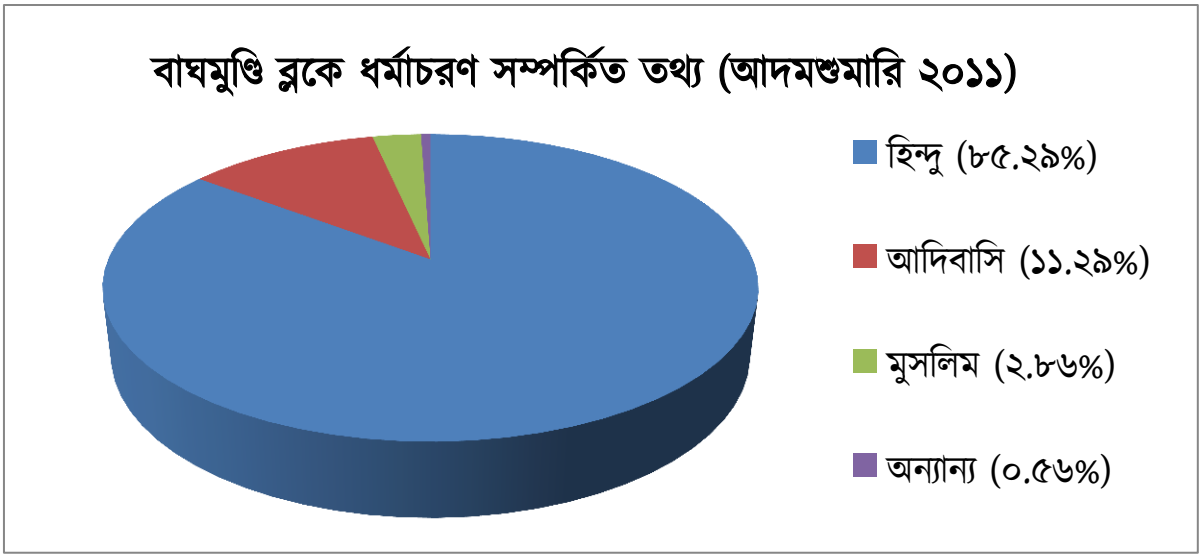

ছ) বাঘমুন্ডি ব্লকে পরিবহন ব্যবস্থা (Transport in Bagmundi Block):

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকগুলির মধ্যে বাঘমুন্ডি ব্লক অন্যতম। এই ব্লকে ২০১৩-১৪ সালে ৩ টি বাস রুট শুরু হয়েছিল। সেগুলি হল বাঘমুন্ডি ব্লক থেকে নিকটতম রেল স্টেশন বলরামপুর

শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে। এই ব্লকের মধ্যদিয়ে ঝালদা থেকে জনপুট (পূর্ব-মেদিনীপুর) পর্যন্ত ৪ নং রাজ্য সড়কটি গেছে।

জ) বাঘমুণ্ডি ব্লকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (Health System in Baghmundi Block):

২০১৪ সালে বাঘমুন্ডি সম্প্রদায় বিকাশ ব্লকে কেবলমাত্র ১টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৩ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মোট শয্যা সংখ্যা ছিল ৬২ ও ইনডোরেতে ৭ জন চিকিৎসক ছিলেন। এখানে রোগীর সংখ্যা ছিল ৭৭৫৬ জন। আর এই ব্লকে বাইরে থেকে ১৬১৯১৯ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই ব্লকে যে প্রধান সরকারি মেডিকেল গ্রামীণ হসপিটালগুলি রয়েছে সেগুলি হল- পাথরডিহি তে ৩০ টি শয্যার সুবিধা, করাং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত ছিল ৬ জন, টুনটুরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপস্থিত ছিল ১০ টি শয্যা, এবং অয্যোধ্যা পাহাড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১২ টি শয্যা ছিল।

৩.২.১.১ ভূপতিপল্লী গ্রামের প্রেক্ষাপট (Background of Bhupatipolly village):

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকে ভূপতিপল্লী নামে একটি বিশেষ গ্রাম রয়েছে যে গ্রামটির অপর নাম মাটিয়ালা। এই মাটিয়ালা বা ভূপতিপল্লী গ্রামটি বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েতের অধীনে অন্তর্গত। এই গ্রামটির জেএল নাম্বার হল ৯৯। গ্রামটি থেকে বাঘমুণ্ডি ব্লক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব ৪.৫ কিলোমিটার।

ভূপতিপল্লী গ্রামটিতে প্রথম বিরহড় আদিবাসীদের বসবাস শুরু হয়েছিল, এই গ্রামটিতে কেবলমাত্র বিরহড়দের উন্নয়নের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। এই গ্রামটিতে প্রায় ৭০ টিরও বেশি বিরহড় পরিবারের বসবাস এবং সাথে সাথে বিরহড় বিকাশের জন্য তাঁদের গ্রামেই একটি 'সম্প্রদায় হল' বা কমিউনিটি হল রয়েছে। সম্পূর্ণ জেলায় এই

ভূপতিপল্লী গ্রামে প্রথম বিরহড়দের পুনর্বাসন করা হয় পাহাড় থেকে তাদেরকে নামিয়ে এনে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রামে একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে, এই গ্রামে কোন উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রী কলেজ নেই। এই গ্রাম থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের দূরত্ব ৫.২ কিলোমিটার তাই বিরহড় শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষা শেষ করার পর তাদেরকে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনের জন্য ৫.২ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। এর ফলে বিরহড় আদিবাসী ছেলে মেয়েরা খুব বেশি শিক্ষালাভের সুযোগ পায়না। প্রথমত নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে বিরহড় গোষ্ঠীভুক্ত কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা/শিক্ষা কর্মী নেই। তাই বিরহড় আদিবাসী ছেলে মেয়েরা স্কুলে গিয়ে তাদের সংস্কৃতির কোন ছাপ দেখতে পায় না। ফলে এরা নিজেদেরকে ব্রাত্য বলে মনে করে। তাই একদিকে দূরত্ব এবং অন্য দিকে সংস্কৃতিগত দূরত্বের কারণে বিরহড় ছেলে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ নিতে পারে না।

৩.২.১.২ বাড়েরিয়া গ্রামের প্রেক্ষাপট (Background of Bareria Village):

বাড়েরিয়া গ্রামটি ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লক ও বাঘমুণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত। ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী বাড়েরিয়া গ্রামটির কোড নাম্বার হল ৩৩১৬১৬১২। এই গ্রামটি জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়া থেকে ৬৩.৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সাব-ডিসট্রিক সদর দপ্তর ‘পাথার ডিহি’ থেকে ১.৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাড়েরিয়া গ্রামের মোট ভৌগোলিক এলাকা হল ১৭০৮.৫৯ হেক্টর। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা হল ৩৯৮২ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ২০৪৬ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ১৯৩৬ জন। তপশীলি জাতির জনসংখ্যা ছিল ৫৯৯ জন, যার

মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৩০১ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ২৯৮ জন। বাড়েরিয়া গ্রামে আদিবাসীদের জনসংখ্যা ছিল ৭৩৮ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৩৭৬ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ৩৬২ জন। বাড়েরিয়া গ্রামের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৮.৫৪%, যার মধ্যে ৬০.৩১% পুরুষ এবং ৩৬.১১% মহিলা। বাড়েরিয়া গ্রামে মোট জনসংখ্যা নিরক্ষরতার সংখ্যা ছিল ২০৪৯ জন, যার মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৮১২ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ১২৩৭ জন। এছাড়া শিশুদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৮২ জন, যার মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা ৩৫৬ জন এবং মেয়ের সংখ্যায় ৩২৬ জন। এই গ্রামে বসবাসের বাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩৭ টি। বাড়েরিয়া গ্রামটি থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে বলরামপুর ব্লকটি অবস্থিত, এটি হল সবথেকে কাছের শহর এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্থান। বাড়েরিয়া গ্রাম থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে সরকারি ও বেসরকারি বাস স্টপেজ রয়েছে এবং প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। বাড়েরিয়া গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামগুলি হল শ্রাবন্দি, টানটান, অযোধ্যা, মাতিয়ালা, রাঙ্গা, গসায়ডি, বাঘমুণ্ডি, কুচিররাখা প্রভৃতি। এই গ্রামে একটি বাড়েরিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে এবং একটি সরকারি বাঘমুণ্ডি পলিটেকনিক কলেজ, ১৩২ কেভি বাঘমুণ্ডি এস.এস.টি.এন (WBSETCL), PPSP 11 KV সাবস্টেশন (WBSEDCL) রয়েছে। এই গ্রামটি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করে তাই এখানে আপার ড্যাম ও লোয়ার ড্যাম রয়েছে, বছরের একটা সময় পর্যটকের আগমন ঘটে।

৩.২.২ বলরামপুর ব্লকের পার্শ্বচিত্র (Background of Balrampur Block):

বলরামপুর ব্লকটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার পুরুলিয়া মহকুমার অন্যতম প্রশাসনিক বিভাগের একটি সমষ্টিগত উন্নয়ন ব্লক। এই ব্লকের আয়তন ৩০০.৮৮ কিমি। ২০১১ সালের

আদমশুমারি অনুযায়ী বলরামপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩৭৯৫০ জন যার মধ্যে গ্রামের জনসংখ্যা ১১৩৫১৯ জন এবং শহরের জনসংখ্যা ছিল ২৪৪৩১ জন। বলরামপুর ব্লকে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৭০,৯৯৫ (৫১%) জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ৬৬৯৫৫ (৪৯%) জন। বিশেষ করে এই ব্লকে তপশিলি আদিবাসীদের জনসংখ্যা ছিল ৪৩৭৩৮(৩১.৭১%) এবং তপশীলি জাতির লোক সংখ্যা ছিল ১৬৪২৭ (১১.৯১%) জন।

২০০১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকে মোট জনসংখ্যা ছিল ১১৮০৭১ জন। যার মধ্যে এই ব্লকটিতে পুরুষদের মোট জনসংখ্যা ৬০,৪২৪ জন এবং মহিলা জনসংখ্যা ছিল ৫৭,৬৪৭ জন।

ক) বলরামপুর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ (Gram Panchayats of Balrampur Block):

বলরামপুর ব্লকে ১ টি পঞ্চায়েত সমিতি, ৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৯২ টি সংসদ, ৯০ টি মৌজা, ৮৯ টি বসতি গ্রাম এবং ১টি আদমশুমারি শহর রয়েছে। ব্লকটি বলরামপুর থানার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ব্লকের মূল অফিস বাগমুন্ডিতে অবস্থিত।

৩.২ বলরামপুর ব্লকের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের ছক:

SL NO.	বলরামপুর ব্লকের অধীনে গ্রামপঞ্চায়েত সমূহ
১	বলরামপুর (BALARAMPUR)
২	বারাউরমা (BARAURMA)
৩	বেলা (BELA)
৪	দারদা (DARDA)
৫	জেনরুয়া (GENRUA)
৬	ঘাতবেরা-কেরয়া (GHATBERA-KEROWA)
৭	টেনটলো (TENTLOW)

খ) বলরামপুর ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location of Balrampur Block):

পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণে বলরামপুর ব্লক অবস্থিত। বলরামপুর ব্লক এবং বাঘমুণ্ডী ব্লকের মাঝে অবস্থিত পুরুলিয়ার অরণ্য কন্যা অযোধ্যা পাহাড়। এই পাহাড়ের সৌন্দর্য্যে বিভিন্ন দেশবিদেশ থেকে আসা পর্যটকরা আনন্দ উপভোগ করেন। বলরামপুর ব্লকের উত্তরে আরশা ব্লক, পূর্বে বরাবাজার ব্লক এবং দক্ষিণে নিমডিহ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এবং ঝাড়খণ্ডের সরাইকেল্লা, খারসাওয়ান জেলা এবং এই ব্লকের পশ্চিম অংশে বাঘমুণ্ডী ব্লক দ্বারা বেষ্টিত।

গ) বলরামপুর ব্লকের ভৌগোলিক মানচিত্রঃ

৩.৬ বলরামপুর ব্লকের ভৌগোলিক মানচিত্রের নকশা

বলরামপুর ব্লক, পুরুলিয়া জেলা (Balarampur Block, Purulia District)

ঘ) বলরামপুর ব্লকের পরিকাঠামো (Infrastructure of Balarampur Block):

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকের ৮৯ টি জনবসতিপূর্ণ গ্রাম রয়েছে। তার মধ্যে ৮৭টি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে (৯৭.৯৫%), ৮৯ টি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ (১০০%), ১৪ টি গ্রামে পোস্ট অফিস রয়েছে (১৫.৭৩%), ৭৮টি গ্রামে ল্যান্ডলাইন সহ টেলিফোন, পাবলিক কল অফিস এবং মোবাইল ফোনের ব্যবহার হয় (৮৭.৬৪৫ টি), আর ২২টি গ্রামে পাকা রাস্তা (২৪.৭২%), ২৮টি গ্রামে বাস পরিবহন, রেল সুবিধা এবং নেভিগেবেল

(Navigable) জলের সাথে পরিবহন যোগাযোগ রয়েছে (২৬.৯৭%), ৬ টি গ্রামে কৃষি ঋণ সমিতি (৬.৭৪%), এবং ৪ টি গ্রামে ব্যাংক (৪.৪৯%) রয়েছে।

ঙ) বলরামপুর ব্লকের সাক্ষরতার হার (Literacy Rate of Balarampur Block):

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বলরামপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে সাক্ষরতার মোট সংখ্যা ছিল ৭১১৭৬ জন অর্থাৎ ৬০.৪০%। যার মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৪৪৯৫০ (৭৪.১৮%) জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ২৬২২৬(৪৫.৮২%) জন। এই ব্লকে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে লিঙ্গ পার্থক্য ছিল সাক্ষরতার হারে ২৮.৩৫%।

৩.৭ বলরামপুর ব্লকের সাক্ষরতার হার সম্পর্কিত নকশা:

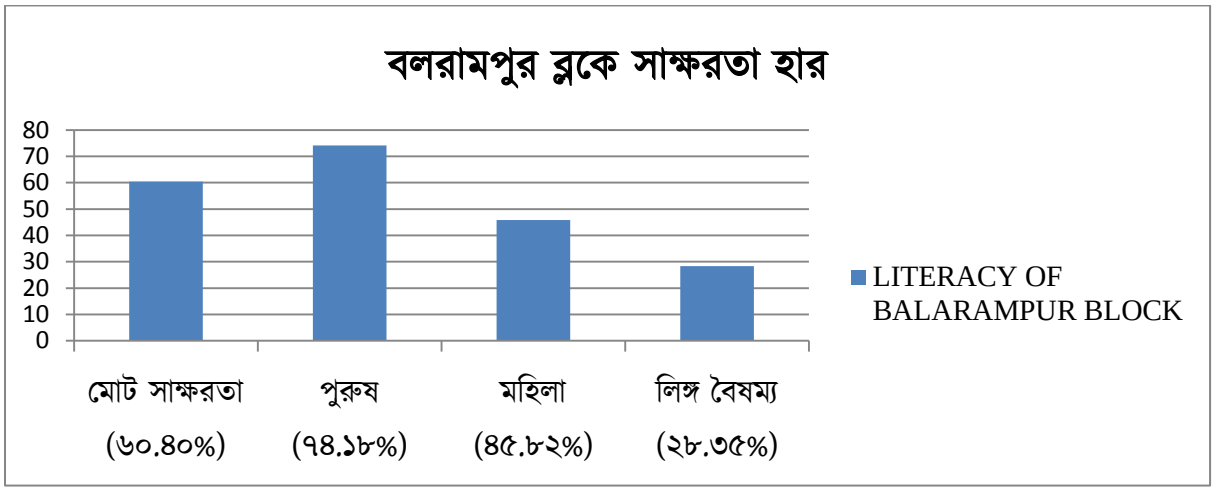

চ) বলরামপুর ব্লকের অর্থনৈতিক ও শ্রমিক সম্পর্কিত তথ্য (Information on Economy and Labour of Balrampur Block):

ভারতে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পুরুলিয়ায় বলরামপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১২৩০৩ জন (২১.৭৬%), কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২১৩৮৪ জন

(৩১.৭৩%), গৃহস্থ শিল্পের শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ১৫১৭ জন (২.৬৮%) এবং অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪১.০৮%।

৩.৮ বলরামপুর ব্লকের অর্থনৈতিক ও শ্রমিক সম্পর্কিত নকশা:

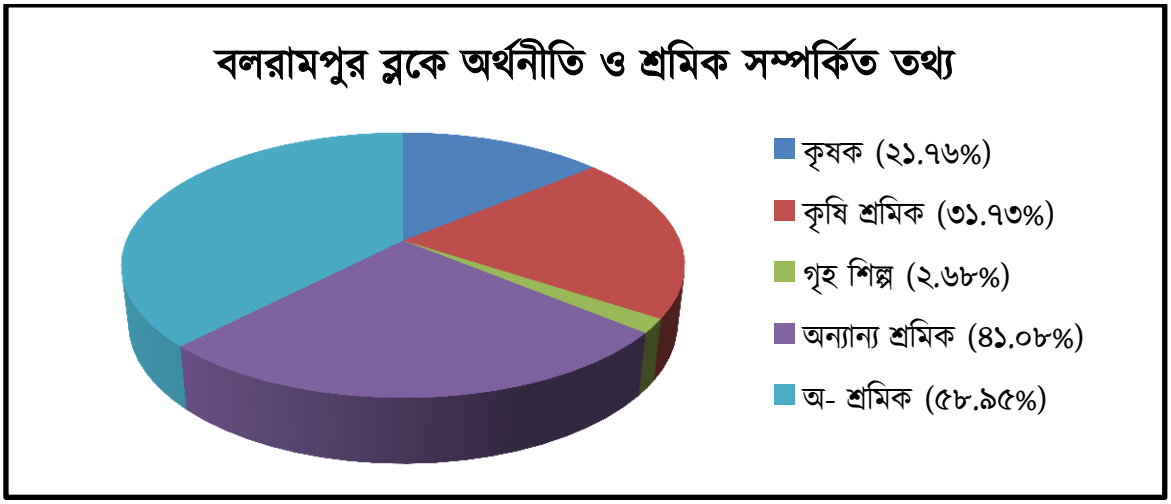

ছ) বলরামপুর ব্লকের কৃষি সংক্রান্ত তথ্য (Agricultural Information of Balrampur Block):

২০১৩-১৪ সালের সমসাময়িক কালে বলরামপুর ব্লকে সেচের মোট জমির পরিমাণ ছিল ৭৫৯১৭৩ হেক্টর যার মধ্যে ৩৩৯৩৬১ হেক্টর খালসেচের দ্বারা, ৩৭৩৬.৬৭ হেক্টর জলের ট্রাক্টর দ্বারা, ৬১.৫৭ হেক্টর নদী থেকে উত্তোলন সেচ, এবং ৯৯.৮০ হেক্টর খোলা কুপ সেচের দ্বারা চাষাবাদ করা হয়েছিল। এছাড়া সমসাময়িকে বলরামপুর ব্লকে যে সমস্ত ব্যক্তি এই চাষের সাথে যুক্ত সেই ব্যক্তিদের চাষের জমির পরিমাণ হল বর্গারদারদের ০.৭১%, পাট্টা ধারী ব্যক্তিদের জমির পরিমান ১৭.৬২%, জমির মালিক ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা ৬.৬৫%, এবং প্রান্তিক কৃষকদের জমির পরিমাণ ৫০.৯২%।

এই ব্লকে যে সমস্ত চাষাবাদ করা হয়েছিল সেগুলি হল আমন ধান ৭৪৪০১ টন প্রধান শীতকালীন ফসল হিসাবে ৩০০৩৪ হেক্টর জমি থেকে উৎপাদন হয়েছিল। বোরো ধান ১১৩

হেক্টর জমি থেকে উৎপাদন হয়েছিল, এছাড়া বসন্তকালীন ফসল গম ১২৫ হেক্টর জমি থেকে ২৯৯ টন গম উৎপাদন হয়েছিল। এই সমসাময়িকে ১৩৩ হেক্টর জমি থেকে ৩৭৩ টন ভুট্টা উৎপাদন হয়েছিল। আলু উৎপাদন হয়েছিল ৭৫ হেক্টর জমি থেকে ১৪৭৫ টন আলু। এছাড়াও অন্যান্য শস্যগুলি এই ব্লকে উৎপাদন হত বা হয় সেগুলি হল মাসকলাই, সরিষা এবং বিভিন্ন ধরনের সবজি ইত্যাদি।

জ) বলরামপুর ব্লকের শিক্ষা সমূহ (Education of Balrampur Block):

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকে ৮৯ টি জনবসতিপূর্ণ গ্রাম আছে কিন্তু কেবলমাত্র ৫ টি গ্রামে কোন বিদ্যালয় ছিল না। ৩৬ টি গ্রামে দুই বা ততোধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, তবে ৩৫ টি গ্রামে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আটটি গ্রামে কমপক্ষে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। এছাড়া এই ব্লকে বিদ্যালয় ছাড়াও একটি ডিগ্রী কলেজ আছে যেটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই ব্লকে ২০১৩-১৪ সালের শিক্ষাবর্ষে ১২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩৫৩৬ জন। কুড়িটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৩৪ জন এবং ১০টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩৯৩৮ জন। এই ব্লকে যে ডিগ্রী কলেজটি রয়েছে এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৬২ জন। বিশেষ ভাবে এই ব্লকে অপ্রথাগত ৩৭৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৮৬০ জন।

ঝ) বলরামপুর ব্লকের ভাষা অধিবাসীদের এবং ধর্মীয় বিশ্বাস (Language and Religious Beliefs of People Living in Balrampur Block):

ভারতের ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বলরামপুর ব্লকের হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১৫৮৮২৯ জন যেটি ব্লকে মোট জনসংখ্যার ৭৮.৮৯%। এই ব্লকে তপশিলি আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২০,৫০৭ জন (১৪.৭২%), মুসলিমদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭৯৬৬ জন (৫.৭%) এবং খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল ৬৪৮ জন (০.৪৭ %)।

২০১১ সালে আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী এই ব্লকে যে সমস্ত ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে তাদের সংখ্যা হল- বাংলা ভাষায় কথা বলা মোট জনসংখ্যা ৭৭.০৩%, সাঁওতালি ভাষায় কথা বলা জনসংখ্যা ১৮.৮৯%, হিন্দী ভাষায় কথা বলা লোক সংখ্যা ৩.৫৮%, এবং অন্যান্য ভাষায় কথা বলা জনসংখ্যা ছিল ০.৫০%।

৩.৯ বলরামপুর ব্লকের ভাষা সম্পর্কিত নকশা

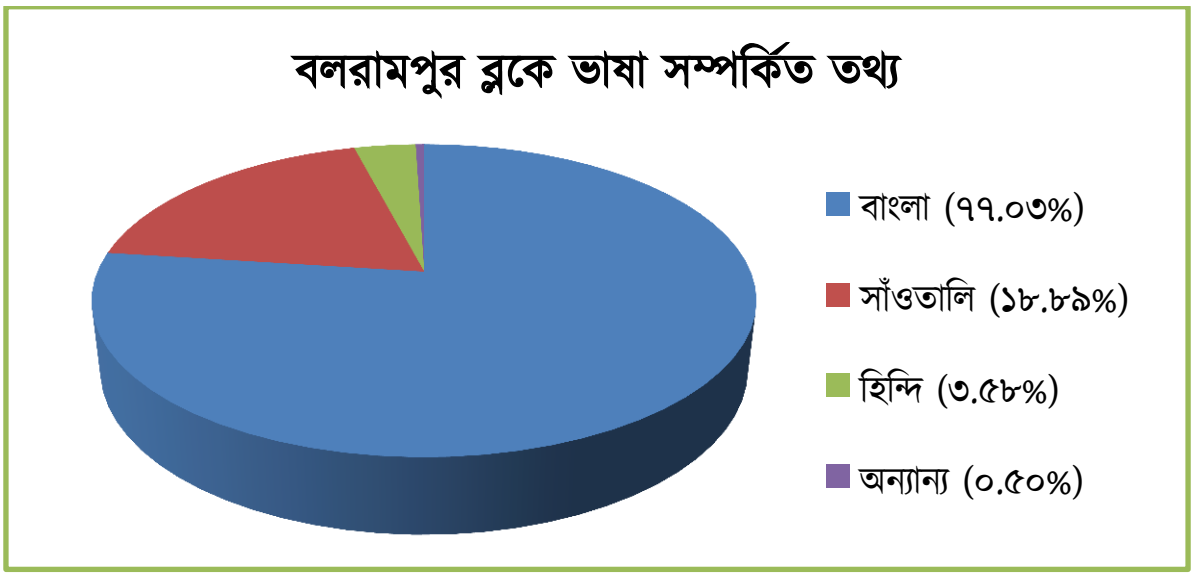

৩.১০ বলরামপুর ব্লকের ধর্ম সম্পর্কিত নকশা

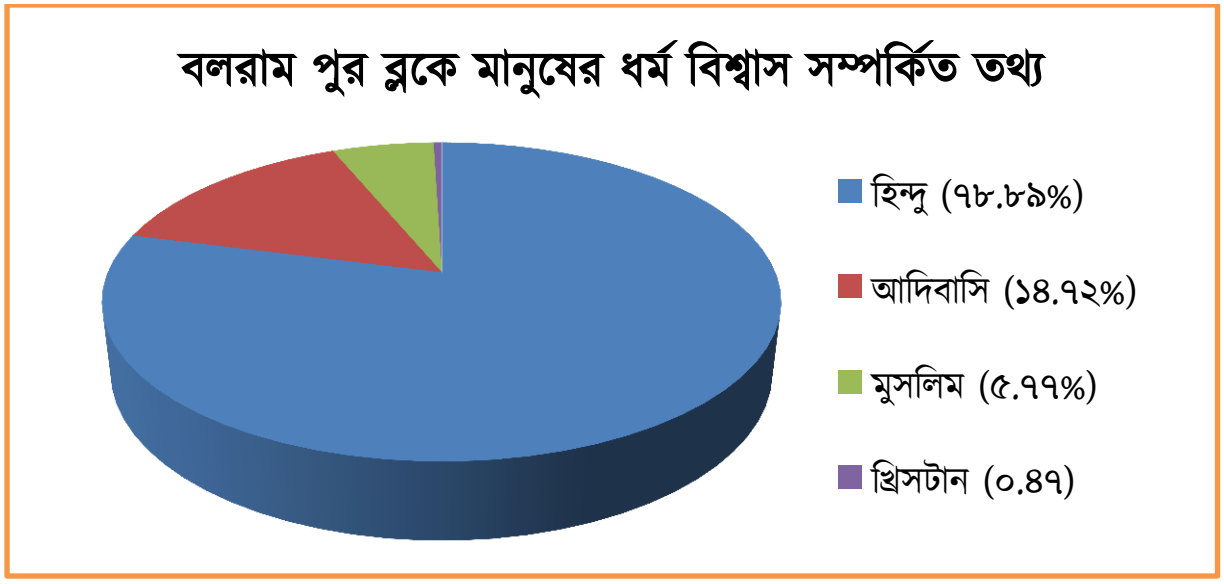

ঞ) বলরামপুর ব্লকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য (Health Information in Balrampur Block):

২০১৪ সালের জেলা রিপোর্ট অনুযায়ী বলরামপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একটি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা তিনটি। বেসরকারি নার্সিংহোমের সংখ্যা ১ টি, যার শয্যার সংখ্যা ৬৭ টি এবং চিকিৎসকের সংখ্যা ৮ জন। এছাড়াও হাসপাতালে বহির্বিভাগে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল ১০২৫৫ জন রোগীকে। এই ব্লকের বাসগড় গ্রামীণ হাসপাতালটি হল বলরামপুরের হাসপাতালগুলির মধ্যে প্রধান হাসপাতাল, যেখানে ৩০ টি শয্যা রয়েছে। এছাড়া কেরওয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০টি শয্যা রয়েছে।

ট) বলরামপুর ব্লকের পরিবহন ব্যবস্থা (Transport in Balrampur Block):

এই ব্লকে যে সমস্ত রাস্তাগুলি একটি ব্লক থেকে আর একটি ব্লকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার গোবিন্দপুর ১৯ নাম্বার জাতীয় সড়ককে অতিক্রম করে উড়িষ্যার বালেশ্বর পর্যন্ত ১৮ নাম্বার জাতীয় সড়কটি বলরামপুর এর

উপর দিয়ে গিয়েছে। এছাড়া ঝালদা থেকে জুনপুট পর্যন্ত ৪ নাম্বার জাতীয় সড়কটি বলরামপুর এর উপর দিয়ে অতিক্রম করে মেদিনীপুর পর্যন্ত গেছে।

৩.২.২.১ বেড়সা গ্রামের পটভূমি (Background of Bersa Village):

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের গেনরুয়া পঞ্চায়েতের অধীনে বেড়সা গ্রামটি অবস্থিত। ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী বেড়সা গ্রামের কোড নাম্বার হল ৩৩১৬৭৪। বেড়সা গ্রামটির সদর দপ্তর বলরামপুর থেকে প্রায় ১২.১ কিলোমিটার এবং জেলা সদর দপ্তর পুরুলিয়া থেকে প্রায় ৪৪.১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের গেনরুয়া পঞ্চায়েতের অধীনে বেড়সা গ্রামটি অবস্থিত। ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী বেড়সা গ্রামের কোড নাম্বার হল ৩৩১৬৭৪। বেড়সা গ্রামটির সদর দপ্তর বলরামপুর থেকে প্রায় ১২.১ কিলোমিটার এবং জেলা সদর দপ্তর পুরুলিয়া থেকে প্রায় ৪৪.১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বেড়সা গ্রামটির ভৌগোলিক সীমা হল ৫২৪.০৭ হেক্টর। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী বেড়সা গ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৯০০ জন পুরুষদের জনসংখ্যা ৪৫৮ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ৪৪২ জন। বেড়সা গ্রামে শিশুদের (০-৬ বৎসর) মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩১ জন, এর মধ্যে ছেলে শিশুদের জনসংখ্যা ছিল ৫৭ এবং মেয়ে শিশুদের জনসংখ্যা ছিল ৭৪ জন। এছাড়া এই গ্রামে আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৩২ জন, এর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ২১৫ এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ২১৭ জন। বেড়সা গ্রামে মোট সাক্ষরতার হার ৪০.৩৩ %, এর মধ্যে পুরুষদের ৫৭.২১% এবং ২২.৮৫% মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল। বেড়সা গ্রামে নিরক্ষর জনসংখ্যা ছিল ৫৩৮ জন, এর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ১৯৬ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ৩৪১ জন। বেড়সা গ্রাম থেকে সরকারি এবং

বেসরকারি বাস স্টপেজ যথাক্রমে ৫ কিলোমিটার এবং ১০ কিলোমিটার। রেলওয়ে স্টেশনের দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার। বেড়সা গ্রামে নিকটবর্তী গ্রামগুলি হল গিটিং, জুগিদি, কর্মফল, ডান্ডুডি, সিরিঙ্গি, উলিদি, কানা, আড়রুহাসা, লাহার, কাশিদি, নামশোল, কেরায়া প্রভৃতি। এই গ্রামে একটি বিদ্যালয় আছে, কোন উচ্চবিদ্যালয় নেয়। এছাড়া গ্রামে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেয়।

৩.২.৩ ঝালদা-১ ব্লকের প্রেক্ষাপট (Background of Jhalda-1 Block):

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অন্যতম সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক হল ঝালদা। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৪৩ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৭০,০৯৫ (৫১%), এবং মহিলাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৭০৪৮ জন (৪৯%)। অপরদিকে এই ব্লকে তপশিলি জাতির মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬৯৮৮ জন (১২.৩৯%) এবং তপশীলি উপজাতি বা আদিবাসীদের জনসংখ্যা ছিল ১৫৬০৮ জন (১১.৩৮%)। ভারতের ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বলরামপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মোট জনসংখ্যা ছিল ১১৫৪৯৩ জন। যার মধ্যে এই ব্লকে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৫৮৬১১ জন (৫০.৭৪%) এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ৫৬৮৮২ জন (৪৯.৬৮%)।

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঝালদা-১ ব্লকের যে সমস্ত বড় গ্রামগুলি রয়েছে সেই গ্রামগুলির মোট জনসংখ্যা হল - তুলিন গ্রামে মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৯৮৪৪ জন, ইচ্ছা গ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৯৫১ জন, এবং জার্গ গ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪০৮৩ জন, ব্লকে অন্যান্য গ্রামগুলির জনসংখ্যা ছিল- পুস্তির ২৩৭৪ জন, কলমার ২৫৩৬ জন, মশিনার ২৭২৪ জন, খামার ১৭৯৯ জন, উহাতুর ৬৬০ জন, নয়াদাল ১২৪৬ জন।

ক) পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ (Gram Panchayat of Jhalda-I Block of Purulia District):

৩.৩ ঝালদা-১ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের ছক

	ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহ
১	হেন্সাহাতু (HENSAHATU)
২	ইছাগ (ICHAG)
৩	ল-ঝারগো (LOO-JARGO)
৪	ঝালদা- দারদা (JHALDA-DARDA)
৫	কাল্মা (KALMA)
৬	মারুমসিনা (MARUMOSINA)
৭	মাথারি-খামার (MATHARI-KHAMAR)
৮	নয়াদিহ (NAYADIH)
৯	পুস্তি (PUSTI)
১০	তুলিন (TULIN)

খ) ঝালদা-১ ব্লকের ভৌগোলিক ব্লকের অবস্থান (Geographical Location of Jhalda-1 Block):

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ওয়ান ব্লকটি একটি অন্যতম ব্লক যেখানে পলাশ, শালগাছ এবং পাহাড়, জঙ্গল দ্বারা বেষ্টিত। পুরুলিয়া জেলায় এই ব্লকটি জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত,

এ ব্লকটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের মধ্যে আন্তঃরাজ্য সীমানা হিসাবে বিরাজ করে। এছাড়া অযোধ্যা পাহাড়ের কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে এই ব্লকটি।

ঝালদা-১ ব্লকের ভৌগোলিক মানচিত্র:

৩.১১ ঝালদা-১ ব্লকের ভৌগোলিক মানচিত্রের নকশা

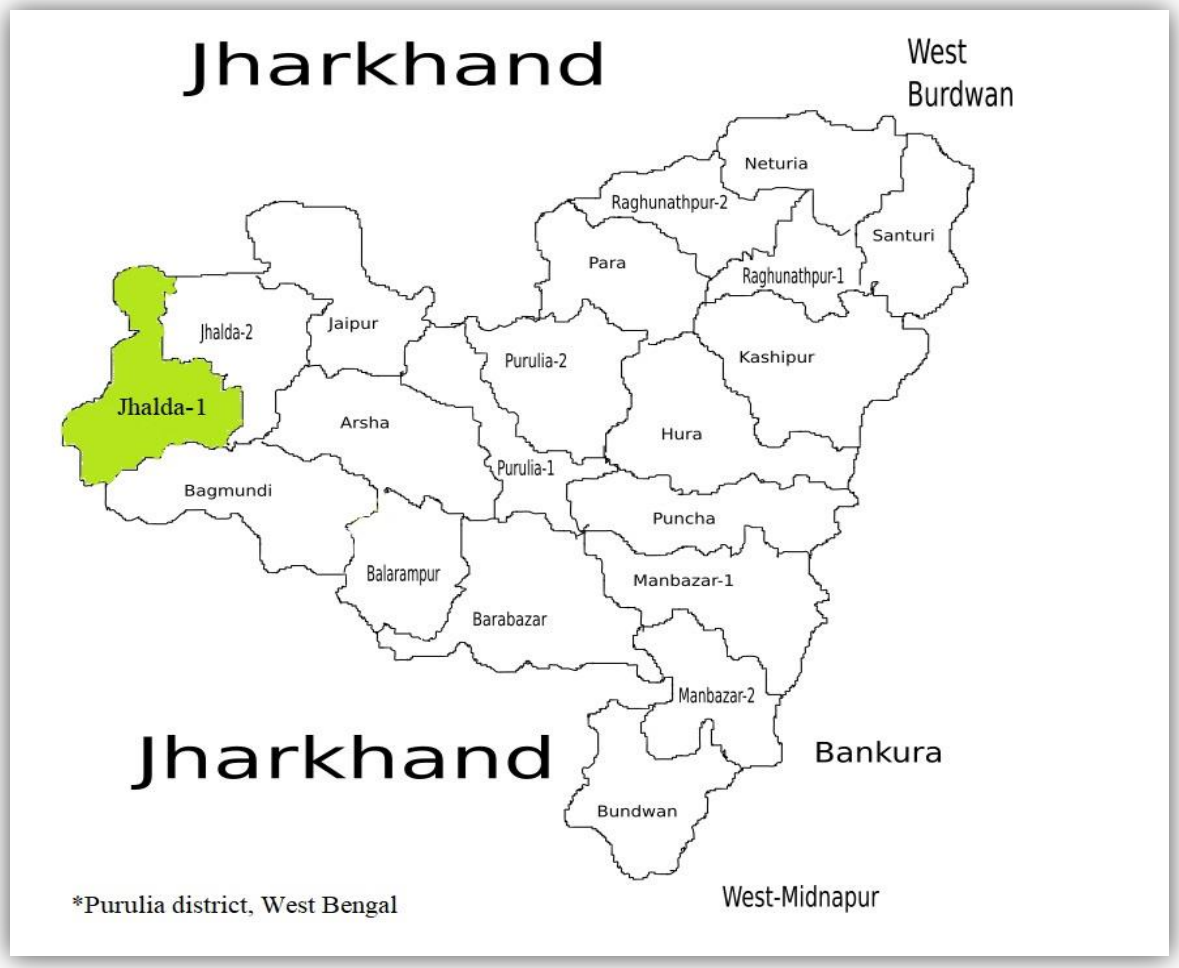

গ) ঝালদা-১ ব্লকের সাক্ষরতা হার (Literacy rate of Jhalda-1 block):

ভারতে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে মোট সাক্ষরতার হার ছিল ৭৬৯৭৩ জন, যেটি মোট জনসংখ্যার ৬৬.১৮%। এই ব্লকে পুরুষদের মোট সাক্ষরতার হার ছিল

৪৭৯৫১ যেটি ৮০.১৫% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল ২৯৩৮২ (৫১.৬১%), সুতরাং এই ব্লকের পুরুষ এবং মহিলাদের সাক্ষরতার লিঙ্গ বৈষম্য হার ২৮.৫৪% ছিল।

৩.১২ ঝালদা-১ ব্লকের সাক্ষরতা হার সম্পর্কিত নকশা

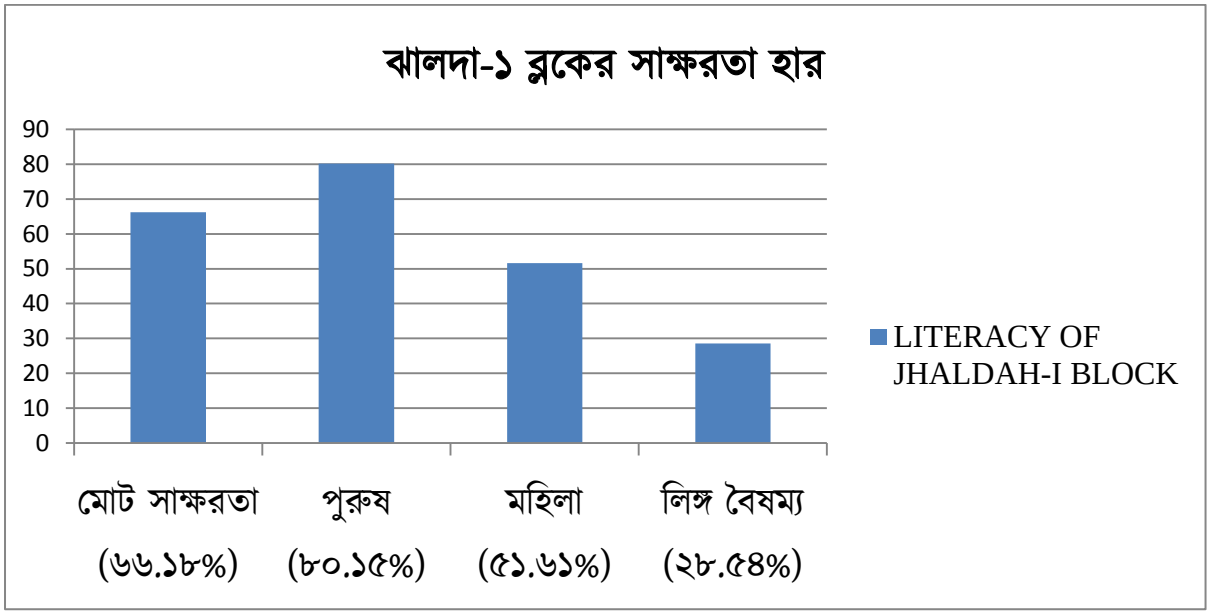

ঘ) ঝালদা-১ ব্লকের অর্থনৈতিক এবং শ্রমিকদের সম্পর্কিত তথ্য (Economic and Workers Information of Jhalda-1 Block):

ভারতের ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুসারে পুরুলিয়ার ঝালদা-১ ব্লকে মোট শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যার মধ্যে কৃষি/শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৯৭৭৬ জন, গৃহস্থালি শিল্পের শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৫৫৭২ জন এবং অন্যান্য শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৩৭৮৯ জন। এই ব্লকে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫৬২১৯ (৪০.৯৯%) জন। এছাড়াও অ-শ্রমিকের সংখ্যা ৮০৯২৪ জন যেটি মোট জনসংখ্যার ৫৯.০১%।

৩.৪ ঝালদা-১ ব্লকের অর্থনৈতিক এবং শ্রমিকদের সম্পর্কিত তথ্যের ছক:

ঝালদা-১ ব্লকের অর্থনৈতিক এবং শ্রমিকদের সম্পর্কিত তথ্য (আদমশুমারি, ২০১১)		
শ্রমিক	শ্রমিকদের সংখ্যা	শতাংশ
কৃষক শ্রমিক	১৯৭৭৬	৩৫.১৭%
গৃহস্থালি শিল্পে শ্রমিক	৫৫৭২	৯.৯১%
অন্যান্য শ্রমিক	১৩৭৮৯	২৪.৫২%
মোট শ্রমিক	৫৬২১৯	৪০.৯৯%
অ-শ্রমিক	৮০৯২৪	৫৯.০১%

ঙ) ঝালদা-১ ব্লকে চাষবাস (Agriculture in Jhalda-1):

পুরুলিয়া জেলায় ২০১৩-১৪ সালে জেলা জরিপ হ্যান্ডবুক থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঝালদা-১ ব্লকে পাট্টাধারী লোক সংখ্যা ছিল ১৭.৯৮%, ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা ছিল ৮.৮২%, প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা ২৯.৯৪% এবং কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হল ৪২.৪৮%।

এই ব্লকে ২০১৩-১৪ সালে আমন ধানের উৎপাদন হয়েছিল ৪২৫২১ টন যেটি প্রধান শীতকালীন ফসল হিসাবে উৎপাদিত হয়েছিল ১৯০৪২ হেক্টর জমি থেকে, এই ব্লকেই ২০১৩-১৪ সালে বোরো ধান উৎপাদিত হয়েছিল ৫.৫ টন। এই ঝালদা-১ ব্লকে ধান উৎপাদন ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের ফসল বা শস্য উৎপাদিত হয়। এই ফসলগুলি হল খেসারি, ছোলা, সরিষা ও গম ইত্যাদি।

চ) ঝালদা-১ ব্লকের শিক্ষা (Education of Jhalda -1 Block):

পুরুলিয়া জেলার অন্যতম ব্লকগুলির মধ্যে ঝালদা-১ ব্লক ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুসারে এই ব্লকে অনেক জনবসতিপূর্ণ গ্রাম রয়েছে যে সমস্ত গ্রামে বিদ্যালয় বা স্কুলের সংখ্যা গড়ে উঠেছিল তার সংখ্যাগুলি হল ২৮৭ টি গ্রামে দুটি বা ততোধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৮টি গ্রামে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৭ টি গ্রামে কমপক্ষে একটি মাধ্যমিক ও একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই ব্লকেই দুটি সাধারণ ডিগ্রী কলেজ রয়েছে যার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৫৪৯ জন। ঝালদা-১ ব্লকের ৮ টি গ্রামে কোন স্কুল নেই।

পুরুলিয়া জেলার ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ঝালদা-১ ব্লকে ১৪৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৫১৪ জন, এই ব্লকে ১০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৯৪ জন, এছাড়াও এই ব্লকে ১৩ টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৭৪৬ জন ছিল।

ছ) ঝালদা-১ ব্লকে ভাষা ও ধর্মীয় বিশ্বাস (Language & Religion in Jhalda one Block

ভারতে ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী এই ব্লকে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসী লোক সংখ্যা ১১৪৭৬৯ জন অর্থাৎ এই ব্লকের মোট জনসংখ্যার ৪৩.৬৯%, মুসলিমদের জনসংখ্যা ১১৬২৭৮ জন যেটি মোট জনসংখ্যার ৪৮%, এবং বিশেষভাবে ঝালদা ব্লকে উপজাতি বা আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের লোক সংখ্যা ছিল ১০৭৪৭ জন যেটি ঝালদা ব্লকের মোট জনসংখ্যার ৭.৮৩%।

২০১১ সালে আদমশুমারি অনুসারে ঝালদা-১ ব্লকের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ৫৯.৫৬%, কুরমালি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৫.৫৪%, উর্দু ভাষাভাষী মানুষের জনসংখ্যা

ছিল ২.২১%, হিন্দি ভাষাভাষী জনসংখ্যা ছিল ১.০%, এবং আদিবাসী ও সাঁওতালি ভাষাভাষী জনসংখ্যা ছিল ১.০%।

৩.১৩ ঝালদা-১ ব্লকে ভাষা সম্পর্কিত নকশা:

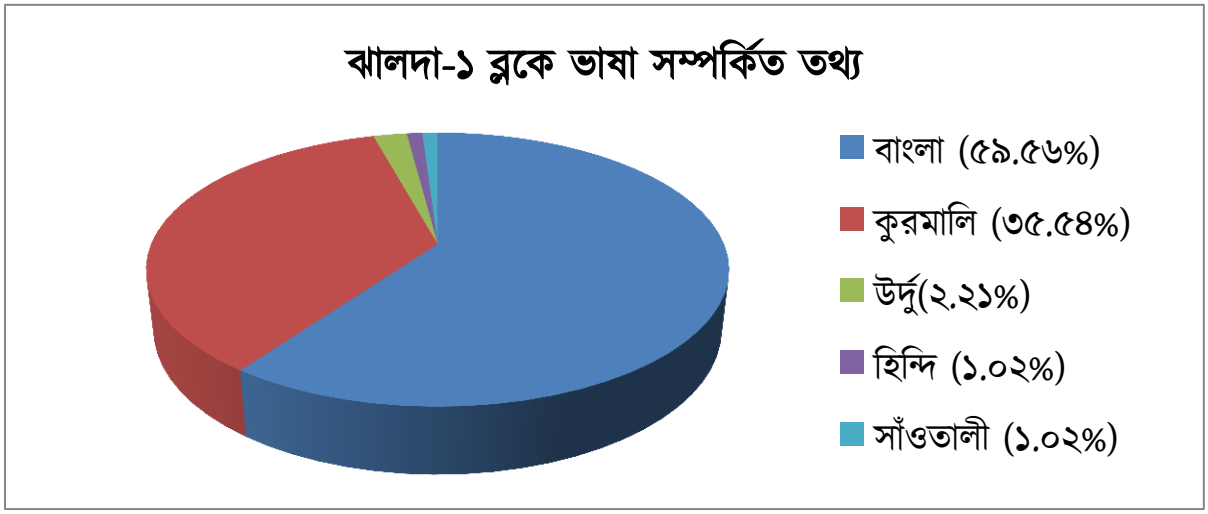

৩.১৪ ঝালদা-১ ব্লকে ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত নকশা:

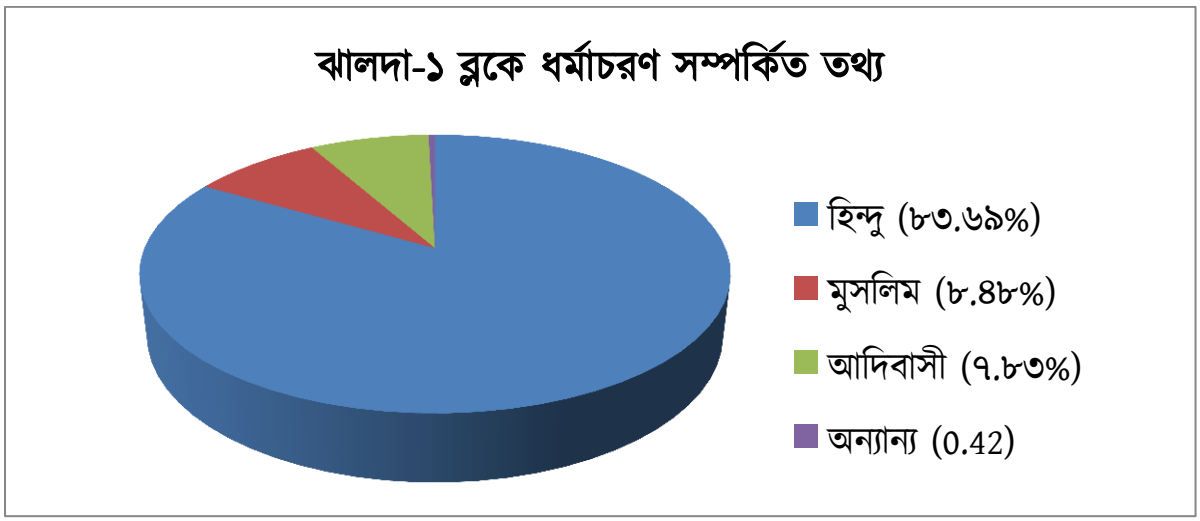

জ) ঝালদা-১ ব্লকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (Health System of Jhalda-1):

ঝালদা ব্লকে ২০১৪ সালে সমসাময়িকে একটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল এবং ব্লকে দুটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীর শয্যার সংখ্যা ছিল ৪৬ টি, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ৬ জন

চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ৪৮৫৭২ জন রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বহিরঙ্গনে ১৯৮৯৪৯ জন রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল।

ঝ) ঝালদা-১ ব্লকে পরিবহণ ব্যবস্থা (Transportation **System of Jhalda-1 Block):**

ঝালদা-১ ব্লকের পরিবহন ব্যবস্থা, পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকে ২০১৩-১৪ সালে ৫ টি বাসরুট চালু করার কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হল ঝালদা থেকে জুনাপুট যাওয়ার পথে ৪টি রাজ্য মহাসড়ক এবং তুলিন থেকে চাষমোড় পর্যন্ত 8A রাজ্য হাইওয়ে এই ব্লক থেকে শুরু হয়।

৩.২.৩.১ ডাকাই গ্রামের প্রেক্ষাপট (Background of Dakai Village):

ডাকাই গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের মাথারি-খামাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত। এই গ্রামটি ঝালদা ব্লক থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে এবং খামাড় হাই স্কুল থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মাথারি-খামাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রায় ২১ টি গ্রাম রয়েছে, গ্রামগুলি হল- ছোট ফুহরা, মাথার, ডাকাই, আকাশার, পাল্মা, বড় ফুহরা, কোতিয়া, উহাতু, পরমুরা, দুল্লা, অর্দানা, অলগাড়া, কাসিদি, হুরলং, জজুহাতু, খামার, লক্ষদী, আদালদি, পাঞ্জরি, বাঙ্গাসুর, পোকহরিয়া। ডাকাই গ্রামের তিন দিকে রয়েছে ঘন জঙ্গলে ভরা অযোধ্যা পাহাড়। ডাকাই গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ডাকাই গ্রামের শিশুদের ৫-৬ কিলোমিটার দূরে খামার উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতে হয়। বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা ভালো নয়। নির্জন পাহাড়ি চড়াই উৎরাই পথ। মাঝে মাঝে ছোট জঙ্গল আছে। হাতি পালের ভয় রয়েছে। দূরত্ব এবং চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে ডাকাই গ্রামের আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী ছেলে মেয়েরা স্কুল ছুট হয়ে যায়। এই গ্রামে গোপ, মুড়া এবং বিরহড় পরিবার মিলিয়ে প্রায় ৯০ থেকে ১০০ টি পরিবার রয়েছে। ডাকাই গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই।

References:

McMillan, J. H., & Schumaches, S. S. (1997). *Research in Education: A Conceptual Indroduction*. Longman, New York. p.469.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory. Procedures and Techniques.* Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell. J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions.* London: Sage.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006). *Research in Education*.Tenth Edition, Pearson Education, Inc.

Singh, A. K. (2006). Metal Working Fluids from Vegetable Fluids. *Journal of Synthetic Lubrication*, 123, 167-176. http://dx.doi.org/10.1002/jsl.19

Brim, J. A., & Spain, D. M. (1974). *Research Design in Anthropology: Paradigms and Pragmatics in the Testing of Hypotheses.* New York: Holt, Rinehart & Winston.

Chambers, R. (1980). "Rapid rural appraisal: Rationale and repertoire", *IDS Discussion Paper*, No. 155 Brighton: IDS. University of Sussex. September.

Carruthers, I., & Chambers, R. (1981). "Rapid appraisal for rural development". *Agricultural Administration*, 8(6), pp.407-422.

Longhurst, R. (1981). Rapid Rural Appraisal. *IDS Bulletin,* 12(4).

Chambers, R. (1993). *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development.* London: Intermediate technology Publication.

Freire, P. (1968). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: The Seabury Press.

Gypmantasiri et al., (1980). *An Interdisciplinary Perspective of Cropping System in the Chiang Mai Valley: Key Questions for Research*. Thailand:

Multiple-Cropping project. Faculty of Agriculture, University of Chiang Mai.

Conway, G. (1985). *Agroecosystem analysis.* Agricultural Administration, Vol. 20, pp.31-35.

Conway, G. (1986). *Agroecosystem Analysis for Research and Development* (India: Winrock International Institute for Agricultural Development).

Conway, G. (1987). "Rapid rural appraisal and agroecosystem analysis: A case study from Northern Pakistan", in KKU, *Proceedings of the 1985 International Conference on Rapid Rural Appraisal.* System research and Farming Systems Research Projects. Khon Kaen, Thailand: University of Khon Kaen, pp.228-254.

Gilbert, E. H., Norman, D. W., & Winch, F. E. (1980). *Farming Systems Research: A Critical Appraisal.* MSU Rural Development Paper No. 6, East Lansing: Department of Agricultural Economics, Michigan State University.

Shaner, W. W., Philipp, P. F., & Schmehl, W. R. (1982). *Farming System Research and Development: Guidelings for Developing Countries.* Boulder, CO: Westview Press.

Census Report 2011, Government of India.

Census Report 2001, Government of India.

West Bengal: Poverty, Growth and Inequality, *World Bank Group. Retrieved 11* January 2020.

District Census Handbook Puruliya, Census of India 2011, Series 20, Part XII A. *Table 33: Distribution of Workers by Sex in Four Categories of Economic Activity in Sub-district 2011. Directorate of Census Operations, West Bengal.*

West Bengal Summary. *Rural Household Survey 2005. Department of Panchayat & Rural Development, Government of West Bengal. Archived from* the original *on 13 January 2020.*

District Census Handbook, Puruliya, 2011, Series 20, Part XII A (PDF). *Page 79, Table 36:* Distribution of villages according to availability of different amenities, 2011

https://en.wikipedia.org/wiki/baghmundi

https://en.wikipedia.org/wiki/Balarampur,_Purulia_(community_development_block)

https://en.wikipedia.org/wiki/jhalda_I

চতুর্থ অধ্যায়

সংগৃহীত গুণগত তথ্য এবং বিশ্লেষণ

(Collection of Qualitative Data and its Interpretation)

এই অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি (যেমন, PRA, FGD, Observation, Interview) অবলম্বন করে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকে অর্থাৎ বাঘমুণ্ডী, বলরামপুর, ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে চারটি গ্রামে (ভূপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা এবং ডাকাই) বিরহড় আদিবাসীদের কাছ থেকে এবং তাঁদের সম্পর্কে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন, ফোকাস গোষ্ঠী আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেই প্রাথমিক তথ্যগুলিকে উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা হল।

৪.১ ভূপতিপল্লী গ্রাম (Bhupotipolly Village):

৪.১.১ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Obtained from Participatory Rural Appraisal):

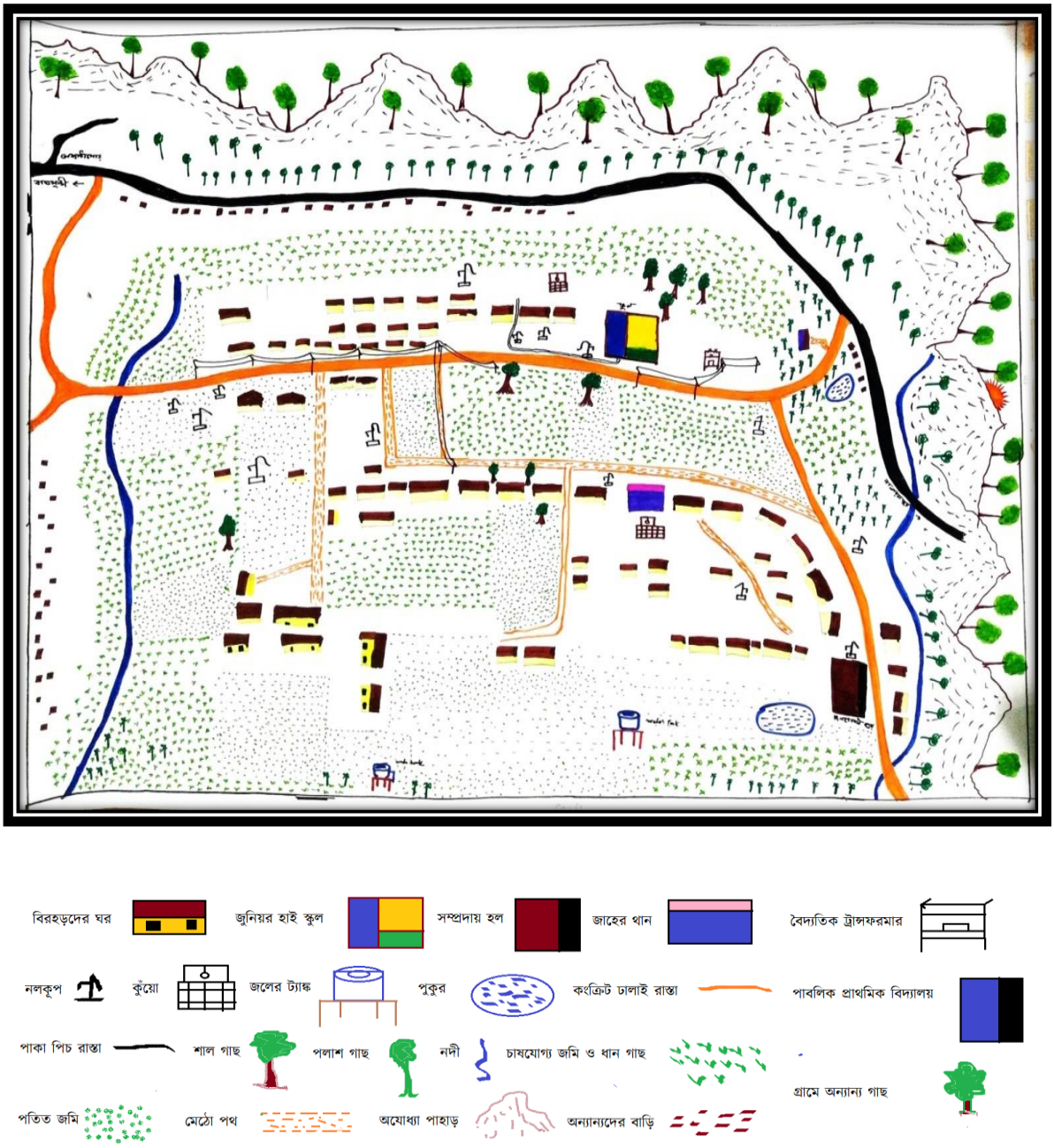

ভূপতিপল্লী গ্রাম (Bhupotipolly Village)

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী ব্লকের ভূপতিপল্লী গ্রামটি প্রধানত আদিবাসী গ্রাম এবং এখানে প্রায় ৭৫ টি বিরহড় গোষ্ঠীর পরিবারের বসবাস। বহু পূর্বে স্থায়ী বসবাসকারী বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা অযোধ্যা (আয়ঃদ্যা) পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে টাণ্ডাগুলিতে বসবাস করতেন। গভীর অরণ্যে উঁচু পাহাড়ে এরা চাষবাস করতেন না কারণ পাহাড়ের রুক্ষ মাটি চাষযোগ্য ছিল না। জীবন নির্বাহের জন্য তাঁরা মূলত শিকার এবং বনজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিরহড়দের মধ্যে স্থায়ী বসবাসের মনোভাব গড়ে তোলার জন্য তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডী থানার অধীনে একটি পল্লীর পত্তন ঘটান। এই সময়ে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার এর নামঅনুসারে পল্লীর নাম রাখা হয় 'ভূপতিপল্লী'। এই ভূপতিপল্লীতেই প্রথম বিরহড় আদিবাসীদেরকে সুউচ্চ পাহাড় (আয়ঃ দ্যা) থেকে প্রায় ৬/৭ কিলোমিটার দূরে ডুয়ার্স অঞ্চলে নামিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ২৯ টি বিরহড় পরিবারকে মাটির বাড়ি, কিছু গৃহপালিত পশু, এবং চাষের জমি দেওয়া হয়। তবে বিরহড়দেরকে চাষের জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছিল তা অনুর্বর জমি ছিল। ভূপতিপল্লী গ্রামের উত্তর এবং পূর্ব দিকে রয়েছে সুউচ্চ অযোধ্যা (আয়ঃ দ্যা) পাহাড়। ভূপতিপল্লী গ্রামের দক্ষিণ দিকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমিতে অন্যান্য আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সাধারণ মানুষরা চাষাবাদ করেন। যেহেতু বেশির ভাগ বিরহড়দের নিজস্ব কোন চাষযোগ্য জমি নেই তাই এখনও তাঁরা চাষবাসের সাথে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হতে পারেননি। তবে গ্রামের থেকে দূরে অন্যদের জমিতে তাঁরা দৈনিক মজুরীতে শ্রমসাধ্য কাজগুলি করেন। ভূপতিপল্লী গ্রামের পশ্চিমদিকে এবং পূর্ব দিকে দুইটি জলনিকাশী খাল রয়েছে, যেখানে বর্ষাকালে পাহাড়ের ঝর্ণাগুলি থেকে নেমে আসা প্রবল জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায়। এই খালের জল থেকে সেচের মাধ্যমে বর্ষার সময়ে চাষাবাদ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাষ করার জন্য বিরহড়দের কিছু কিছু জমি

দিলেও এখনও পর্যন্ত জমিগুলো চাষযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তাই এই গ্রামে কিছু কিছু বিরহড়রা তাঁদের জমিতে চাষ করলেও ভালো ফসল ফলাতে তাঁরা অক্ষম। তাই বাধ্য হয়ে এই গ্রামের যুবক যুবতীরা শ্রমসাধ্য কাজ করার জন্য পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দূর দুরান্তে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই গ্রামটির মাঝবরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে একটি কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা রয়েছে। পশ্চিমদিকে যাওয়া রাস্তাটির একটি শাখা বাঘমুণ্ডী ও বলরামপুর পিচ রোডের অযোধ্যা মোড়ের কাছে যুক্ত হয়েছে। এই কংক্রিট ঢালাই রাস্তাটির আর একটি শাখা অর্থাৎ ঢালাই রাস্তা গ্রামের পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ভূপতিপল্লী গ্রামে জলের জন্য প্রায় ১৪ টি নলকূপের ব্যবস্থা করে দিলেও বেশির ভাগ নলকূপ থেকে ভূ-গর্ভের জল বের হয় না। এই নলকূপগুলি নাম মাত্রই রয়েছে। এছাড়া এই গ্রামের উত্তর দিকে একটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি বহু পুরনো কুঁয়ো রয়েছে, যেটি ব্যবহার যোগ্য। বিরহড় আদিবাসীরা ভূপতিপল্লী গ্রামের উত্তর দিকে, মধ্য ভাগে, পশ্চিমে ও পূর্বে ঢালু স্থানে অনুর্বর জমিতে চাষ করেন বর্ষার একটি সময়ে। তবে চাষ করলেও ফসল ভালো হয় না। গ্রামের উত্তর-পূর্ব স্থানে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬২ সালে বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি ভূপতিপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা এই বিদ্যালয়কে জুনিয়ার হাই স্কুলে রূপান্তর করা হয়।

গ্রামের পূর্ব দিকে শুরুতে একটি পুরানো পাবলিক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকে প্রায় ২০০ ফিট দূরে ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার রয়েছে। এই ট্রান্সফরমার থেকে বিদ্যুৎ গ্রামের কিছুটা অংশে পৌছে দিয়েছে। এছাড়া এই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জল প্রকল্প থেকে পানীয় জলের জন্য দুইটি সোলার প্যানেল যুক্ত সাবমার্সাল এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক (জলের ট্যাঙ্ক) করে দেওয়া হয়েছে। ভূপতিপল্লী গ্রামের পূর্ব-দক্ষিণে বিরহড়

আদিবাসীদের তাঁদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের হল (Community Hall) রয়েছে। এছাড়া গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি বর পুকুর বা জলাশয় রয়েছে, যেখানে গ্রামের মানুষরা দৈনন্দিন কাজে এই পুকুরের জল ব্যবহার করেন। ভূপতিপল্লী গ্রামের পূর্ব দিকে এবং দক্ষিণ দিকে অনেকটা অংশ জুড়ে পলাশ গাছ রয়েছে, এছাড়া গ্রামের মধ্য ভাগে, উত্তর দিকে, পশ্চিমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু বর অশ্বথ গাছ রয়েছে। উত্তর এবং পূর্বে অযোধ্যা পাহাড়ের উপর শাল গাছ প্রচুর পরিমানে রয়েছে এছাড়া পাহাড়ের শিরায় এবং নিচের দিকে সমতলে পলাশ গাছ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। এই জঙ্গলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ও ওষধি গাছ গাছড়াও রয়েছে।

৪.১.২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Obtained from Focus Group Discussion):

১) স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা খুবই শান্তি প্রিয়। ভূপতিপল্লী গ্রামে তাঁরা তাঁদের জীবন নির্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই সমান ভাবে। তাঁদের প্রধান অর্থনীতি হল জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা শুকনো কাঠ, চিহড়লতা থেকে দড়ি তৈরি করে বাজারে বিক্রি এবং জঙ্গল থেকে মোম, মধু সংগ্রহ। কিছু পুরুষ উপার্জনের জন্য পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে জেলা ও রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ভুপতিপল্লী গ্রামের মহিলারা শ্রমিক হিসাবে গ্রামের বাইরে বর্ষার সময় অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজে নিযুক্ত হন। এছাড়া গ্রামের পূর্ব-পশ্চিমে যে দুইটি খাল রয়েছে তা বর্ষার জলে পূর্ণ হয় এবং এই জলকে কাজে লাগিয়ে সেচের মাধ্যমে কিছুটা ধান চাষ করেন তাঁরা। আর কিছু মহিলা এবং পুরুষ প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা অতিক্রম করে অযোধ্যা পাহাড়ে জঙ্গল থেকে

শুকনো কাঠ সংগ্রহ করেন, এই শুকনো কাঠকে মাথায় করে বয়ে এনে বাজারে বিক্রি করে এবং বিক্রয় মূল্য হিসাবে ১৫০-২০০ টাকা তাঁরা পান।

বিক্রয়ের জন্য জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা শুকনো কাঠ

আর কিছু শুকনো আ-কাঠ (ঝাটি-পাটি) বাড়িতে নিয়ে আসে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। কিছু যুবক ছেলেরা ট্র্যাক্টর চালায় এবং পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন দোকানে শ্রমিকের কাজ করেন। বর্তমানে এই গ্রাম থেকে তাঁরা শিকার করতে যান না কারণ গভীর জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি না পাওয়ায়। তাঁরা সামনের জঙ্গলে কিছুই শিকার পান না। বর্ষা কালে কিছুটা কাজ পেলেও গ্রীষ্ম কালে পুরুলিয়া অঞ্চল রুক্ষ প্রকৃতির হওয়ায় এখানে ব্যাপক ভাবে জলের সমস্যা অন্যতম হয়ে ওঠে। তাই এই সময় কোন চাষ হয় না এবং পানীয় জলের সমস্যা প্রখর হয়ে ওঠে। নলকূপ থেকে জল ওঠে না, কুঁয়োর জলের স্তর একে বারে নিচে চলে যায়। এই ভাবেই ভূপতিপল্লী গ্রামের বিরহড়রা তাঁদের জীবন নির্বাহ করেন।

২) বহু পূর্বে এই গ্রামে সকলের মাটির বাড়ি ছিল তবে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লক এর তত্ত্বাবধানে 'উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ' থেকে ২০১৮-১৯ বর্ষে, বেশির ভাগ বিরহড় পরিবারদেরকে একক কক্ষ অর্থাৎ পাকা দেওয়াল এবং এজবেস্টার দিয়ে ছাউনি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছেন। এখনও কিছু বিরহড় পরিবারদের মাটির বাড়ি আছে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে এই ইটের বাড়িগুলিকে কি ভাবে পরিষ্কার-পরিছন্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণা করতে হবে তা বিরহড়দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি।

৩) বিরহড়দের কিছু পরিবার তাঁরা গবাদি পশু হিসাবে গরু, শূকর, ছাগল, মুরগি, হাঁস পোষে। তবে সব পরিবারে এই গবাদি পশু নেই। যখন প্রয়োজন হয় তখন এই গবাদি পশুগুলিকে বিক্রি করে তাঁরা দৈনন্দিন সংসার চালান।

৪) বিরহড়দের সমস্ত উৎসবগুলি প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভূপতিপল্লী গ্রামে যে সমস্ত উৎসব পালিত হয় সেগুলি হল- 'সস বোঙ্গা' পরব, এটি আষাঢ় মাসে ধান রোপণের পরই ফসল যাতে ভালো হয় তার জন্য প্রকৃতি পূজা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে 'সস বোঙ্গা' উৎসব পালিত হয়। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে যে কোন দিন বিরহড় আদিবাসীরা 'সহরায়' উৎসব পালন করে, এই উৎসবে গরু, মোষকে তাঁরা সযত্নে লালন পালন করেন। গরু যেহেতু চাষের সময় অতি পরিশ্রম করে তাই বিরহড়রা তাঁদের অন্যতম উৎসব সহরায় অনুষ্ঠানে গরুকে স্নান করিয়ে তেল, হলুদ মাখিয়ে দেয়। এবং কিছু ভেষজ লতাপাতা গরুকে খাইয়ে দেয় যাতে ঐ সময়ে গরুর কোন পেটে ব্যাথা বা চর্ম রোগ না হয়। এই ভাবে বিরহড় আদিবাসীরা গরুর প্রতি সম্মান নিবেদন করেন। এছাড়া এই উৎসবে বাড়ির মেয়ে এবং জামাইরা বাড়িতে আসে এবং সকলে আনন্দের সাথে উৎসব অনুষ্ঠান পালন করে। ভাদ্র মাসের একাদশীর দিন

বিরহড়রা করম বা করমা পূজা করার মধ্যে দিয়ে উৎসব পালন করেন। এই করম উৎসব ও অনুষ্ঠান কর্ম এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পরব বা উৎসব। ফাল্গুন মাসে বিরহড়দের অন্যতম উৎসব হল 'সারহুল' উৎসব। এই সময় প্রকৃতির কোলে শালগাছে ফুলে ভরে যায় এবং সারা জঙ্গল শাল গাছের ফুলের গন্ধে ভরে ওঠে, মহুয়া ফুলে গাছতলা ছেয়ে যায়। প্রকৃতি এই অপরূপ সৌন্দর্য আবির্ভূত হয়, এই সময় বিরহড়রা 'সারহুল' বা 'বাহা' উৎসব পালন করে। এই সমস্ত উৎসব, পরবে বিরহড় আদিবাসীরা তাঁদের প্রাচীন পরম্পরাগত ঐতিহ্য বাদ্যযন্ত্র ধামসা-মাদল, বাঁশের তৈরি বাঁশি, কাঠের তৈরি 'বানাম', কাঁসার থালা, মোষের সিং দিয়ে তৈরি একধরণের বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র সব কিছু প্রকৃতি থেকে পাওয়া স্থিতিশীল উপকরণ দিয়ে তৈরি। এই গুলি থেকে কোন রকম শব্দ, মাটি, বায়ু দূষণ হয় না।

৫) অন্যান্য আদিবাসী সমাজের মতো বিরহড় সমাজেও সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে। এই ভূপতিপল্লী গ্রামে বিরহড়দের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, উৎসব অনুষ্ঠান, বিবাহ, সামাজিক অন্যায় থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব মোড়লের উপর বা মাঝির উপর, বিরহড়দের ভাষায় একে 'ন্যায়া' বলে। এই ন্যায়া সব কিছু দায়িত্ব পালন করেন। একটা সুসংঘটিত একটি সমাজ ব্যাবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব ন্যায়ার উপর থাকে। গ্রামের সমস্ত ভালো কাজের সিদ্ধান্ত ন্যায়া গ্রহণ করেন।

৬) এই গ্রামে বছরের একটি সময় বাঁধের জল দিয়ে ধান চাষ করা হয়। তবে যথেষ্ট পরিমানে উর্বর জমি না হওয়ার কারণে ভালো ফসল হয় না। ভূপতিপল্লী গ্রামে রুক্ষ মাটির কারণে সবজি চাষ ভালো হয় না এবং মাছ চাষের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি।

৭) ভূপতিপল্লী গ্রামের বিরহড় শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বাঘমুণ্ডী হাই স্কুল এ যেতে হয় এবং এই স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ১৫০০ টাকা লেগেছে। এই গ্রামে স্কুল ছাড়াও বিরহড়রা পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু আবাসিক বিদ্যালয় (ধাস্কা) তে অনেক ছেলে মেয়েরা থেকে পড়াশোনা করে।

৪.১.৩ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা (Experience Gained from Observation):

গবেষক বাঘমুণ্ডী ব্লকের অধীনে ভূপতিপল্লী গ্রামে বিরহড়দেরকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন। গবেষক লক্ষ্য করেছেন ও উপলব্ধি করেছেন যে কেবল মাত্র বিরহড়দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ যথেষ্ট নয়, দূরদৃষ্টির সাথে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব। তাই গবেষক প্রথম এই গ্রামে চারপাশে ঘুরে দেখেন বিরহড়দের বাড়ি ঘর, রাস্তা, বিদ্যালয়, নলকূপ, চাষযোগ্য জমি, গাছপালা, গবাদি পশু, গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়া কোন খালবিল, তাঁদের পোশাক, গ্রামে বিদ্যুৎ ও জলের সুবিধা, পুকুর, তাঁদের জাহের থান, কবর স্থান ইত্যাদি।

১) ভূপতিপল্লী গ্রামে প্রবেশ করে গবেষক লক্ষ্য করেন গ্রামটি বিরহড়দের জন্য তবে গ্রামের একপাশে কিছু সাঁওতাল পরিবার রয়েছে। গবেষক দেখেন যে এই গ্রামে বেশির ভাগ বাড়িগুলি সরকারের দ্বারা ইটের তৈরি এবং এজবেস্টর ছাউনি দিয়ে বাড়ি। তবে কিছু মাটির তৈরি দেওয়াল দেওয়া বাড়ি রয়েছে। গবেষক লক্ষ্য করেন বাঘমুণ্ডী ব্লকের তত্ত্বাবধানে 'উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের' অর্থ থেকে ২০১৮-১৯ বর্ষে এই গ্রামে নতুন বাড়িগুলি তৈরি করে দিয়েছে এবং কিছু পুরনো ইঁটের বাড়ি রয়েছে। গবেষক দেখেন যে প্রত্যেক বিরহড় পরিবারের ঘরের পাশে লম্বা ভাবে দাঁড় করানো জঙ্গলের শুকনো কাঠ ও ঝাটি-পাটি, এছাড়া শুকনো কাঠগুলোকে

যত্নে সাজিয়ে রাখা আছে। গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে বিকালে বিরহড় মহিলারা মাথায় করে শুকনো কাঠগুলিকে নিয়ে যাচ্ছে নিকটবর্তী কোন বাজারে বিক্রির জন্য। বাকি যে ঝাটি-পাটি কাঠগুলি রয়েছে সে গুলো তাঁরা রান্নার জন্য জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে।

গবাদি পশু, জ্বালানির জন্য শুকনো কাঠ, বিরহড়দের পুরনো বাড়ি

২০১৮-১৯ বর্ষে উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ থেকে তৈরি করে দেওয়া বাড়ি

২) গবেষক বর্ষার ঋতুতে এই গ্রামে উপস্থিত হয়ে বিরহড়দের লক্ষ্য করেন যে বিরহড়রা গ্রামের পাশের জমিতে চাষের কাজে মজুর হিসাবে কাজ করছে, বিশেষ ভাবে ধান চাষে। তবে বিরহড় মহিলারাই মজুর হিসাবে চাষের কাজ করেন। গবেষক দেখেন কিছু বিরহড় পুরুষরা ট্র্যাক্টর চালান ড্রাইভার হিসাবে, চাষের সময় মাটি চষে, অন্যান্য সময় মাটি ও বালি বইবার কাজ করেন। গবেষক লক্ষ্য করেন এখন তাঁরা আর শিকারে যান না। বছরের একটি সময় তাঁরা শিকারে যান শিকার উৎসব পালনের জন্য।

৩) গবেষক লক্ষ্য করেন পরিবারের বাবা-মা বা অভিভাবকরা দৈনন্দিন কাজের জন্য ও কাঠ সংগ্রহের জন্য ১০-১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অযোধ্যা পাহাড়ে, জঙ্গলে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে যান। এই সময় পরিবারের শিশুরা স্কুল এ যায়। তবে কিছু শিশু স্কুলেও যায় না। বাড়িতে শিশুগুলিকে বলার মত কেউ না থাকায় তারা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় খেলাধুলা করে ও ঘুরে বেড়ায়। এই কারণের জন্য ভূপতিপল্লী গ্রামে বিদ্যালয় থাকতেও বিরহড় শিশুরা স্কুল ছুট হচ্ছে।

৪) এই গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতে অর্থাৎ পরিবারে গবেষক পর্যবেক্ষণ করে তথ্য পেয়েছেন যে বিরহড়দের প্রত্যেক বাড়িতে গৃহপালিত পশু নেই, তবে অনেক বিরহড় পরিবারে গৃহ পালিত পশু রয়েছে এবং বিরহড় আদিবাসীরা এদের লালন পালন করে। যেমন- শূকর, গরু, মোষ, ছাগল, দেশী মুরগি, হাঁস ইত্যাদি।

৫) গবেষক যখন এই গ্রামে গবেষণার জন্য আসেন তিনি লক্ষ্য করেন যে বিরহড় পুরুষ এবং মহিলারা একটা অন্য দৃষ্টিতে গবেষকের দিকে তাকিয়ে আছে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। গবেষক যখন কথা বলতে যান তখন তাঁরা কথা বলতে বা কোন তথ্য দিতে রাজি নয়। কারণ গবেষক পর্যবেক্ষণ করেন যে বিরহড়দের মুখের ভাবভঙ্গী নেতিবাচক এবং

কথোপকথন আক্রমন মূলক। গবেষক চিন্তা করেন তিনি এই গ্রামে প্রথম এসেছেন এবং বিশেষ কিছু কথা তিনি এখনও বলেননি তাহলে এই ধরনের মনোভাব তাঁর প্রতি কেন। কিছুক্ষণ পর গবেষকের মনে হয়েছিল হয়তো বাইরে থেকে আসা মানুষদের বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষরা পছন্দ করেন না। গবেষকের ভাবনা তা কিছুক্ষণ সময় ঠিক হলেও বিষয়টা কিন্তু অন্য কিছু। গবেষক সাহস করে এই গ্রামের ন্যায়া বা মোড়ল বা মাঝির সাথে দেখা করেন, গবেষক এই গ্রামে কীসের জন্য এসেছেন তা বলেন। কিন্তু বিরহড়রা তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর দেবে না। এর পর গবেষক সাঁওতালী ভাষায় বিরহড়দের মাঝি বা মোড়লদের সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে বিভিন্ন কোম্পানি, এন জিও থেকে এই গ্রামে আসে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে আশ্বাস দিয়ে চলে যায়, আমাদের তথ্য নিয়ে গিয়ে তাঁরা তাঁদের উন্নতি করে কিন্তু আমাদের কোন উন্নয়ন হয় না। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানি থেকে সার্ভের নামে আসে এবং মহিলাদেরকে আপত্তিমূলক প্রশ্ন করে। তাই বিরহড়রা বলেছেন গবেষককে যে কেবল মাত্র সরকারের থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ এলে তাঁদেরকে তথ্য দেবেন।

৬) ভূপতিপল্লী গ্রামের উত্তরে অযোধ্যা পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট নদী বা খাল এই গ্রামের পাশদিয়ে চলে গেছে। বর্ষার সময় এই খালের বা নদীর জল চাষের কাজে সেচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গবেষক এই গ্রামে প্রবেশ করার সময় লক্ষ্য করেন যে গ্রামের শুরুতে রাস্তার পাশে একটি অর্ধ ভগ্না বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এখানে কোন লেখাপড়া হয়না। তবে গ্রামের বিদ্যালয়ে ২-৩ জন শিক্ষক রয়েছেন বিরহড় শিশু ও শিক্ষার্থীদের শেখানোর জন্য।

৭) গবেষক দেখেন যে গ্রামে কয়েকটি নলকূপের সাথে সরকার সোলার প্যানেল যুক্ত সাবমার্সাল ও জলের ট্যাঙ্ক তৈরি করে দিয়েছে জলের সমস্যা সমাধানের জন্য। গ্রামের মাঝ বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা চলে গেছে। এই গ্রামে একটি মুদীখানা

দোকান রয়েছে যেটি কোন একটি বিরহড় পরিবারের দ্বারা চলে। দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য খাবার, রান্নার জিনিস পত্র ও অন্যান্য জিনিস এই দোকান থেকে গ্রামের বিরহড় পরিবাররা টাকার মূল্যে সহজে পেয়ে যান।

৮) ভূপতিপল্লী জুনিয়র হাই স্কুলে গবেষক শিশু ও শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ এবং জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে এই বিদ্যালয়ে বিরহড় আদিবাসী শিশুরা ছাড়াও সাঁওতাল, মুণ্ডা আদিবাসী শিশুরা পড়াশোনা করেন। এই গ্রামের বিরহড় পরিবারগুলির মধ্যে ২/৩ তিন জন যুবক ও যুবতী বিরহড় শিশুদের সকাল এবং বিকালে পড়াশোনা করান। এছাড়া গবেষক ভূপতিপল্লী গ্রামে প্রবেশ করার আগে গ্রামে পূর্ব দিকে একটি ভূপতিপল্লী বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষাসত্র বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখন বিদ্যালয়টি অর্ধভগ্নাস্ন অবস্থায় বন্ধ আছে, কোন লেখাপড়া হয় না।

৪.১.৪ উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত (Information Gained from Open Interview):

প্রথমে গবেষক বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় কলোনির বিরহড় যুবকের কাছে জানতে পারেন যে ভূপতিপল্লীর বিরহড়দের ভালো মন্দ যিনি দেখেন তাঁর সাথে দেখা করে কথা বলে নিতে, ওনার কাছ থেকে সব কিছু ভূপতিপল্লী সম্পর্কে জানা যাবে। এছাড়া গবেষক বাঘমুণ্ডী ব্লক থেকে ভূপতিপল্লী সম্পর্কে জানতে পারেন। গবেষক পরের দিন বাঘমুণ্ডি থেকে ই-রিক্সা ধরে ভূপতিপল্লী গ্রামে পৌঁছান। এরপর গবেষক ভূপতিপল্লীর ন্যায়ার সাথে দেখা করেন এবং তিনি কীসের জন্য এই গ্রামে এসেছেন তা জানান। প্রথম পরিচয়ে গবেষককে তাঁরা কোন তথ্য দেবেননা বলে জানিয়ে দেয়। তবে কিছুক্ষণ কথা বার্তা হওয়ার পর বিশেষভাবে গবেষক আদিবাসী ভাষায় বিরহড় যুবকের সাথে কথা বলেন এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছেন তারফলে বিরহড় ন্যায়া এবং যুবক রাজি হন সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য। ন্যায়া বলেন এই

গ্রামে তিনিই ব্যবস্থাপনা করেন, যেমন গ্রামের ভালো, মন্দ তিনি দেখেন এবং গ্রামের বিকাশ থেকে শুরু করে অনেক কিছু। বিরহড় সমাজের দায়িত্ববান যুবক গবেষককে জানান যে গ্রামের সমস্ত মহিলারা সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়ে অযোধ্যা পাহাড় ও জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করার জন্য, এরপর তাঁরা ওই শুকনো কাঠগুলিকে বাজারে বিক্রি করে সন্ধায় বাড়ি ফিরে আসেন। গ্রামের কিছু যুবকরা পাহাড় ও জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে যান এবং কিছু জন অন্যান্য কাজে তাঁরা জেলার বাইরে কাজের জন্য গিয়েছেন। বয়স্ক বিরহড়রা গ্রামের মধ্যে চিহরলতার দড়ি তৈরি ও সিমেন্ট বস্তার দড়ি তৈরি করেন। এছাড়া গ্রামের বিরহড় শিশুরা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও জুনিয়র হাই স্কুলে যায়। এই স্কুলে ৪ জন শিক্ষক রয়েছে এছাড়া গ্রামের ৩ জন বিরহড় যুবক যুবতী বিরহড় শিশুদের টিউশন পড়ান। বিরহড় যুবক ও ন্যায়া গবেষককে জানান যে এই গ্রামে বিরহড়রা অতি মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করছে। সরকারী সুযোগ সুবিধা তাঁরা সঠিক ভাবে পাননা। এলাকার নেতা মন্ত্রীরা ভোটের সময় শুধু আসেন তারপর আর দেখা যায় না। আমাদের গ্রামের সকলের আন্দোলনে বিডিও ও ডিএম অফিসে গ্রামের সমস্যা নিয়ে বহুবার আবেদন দেওয়ার পর এই গ্রামে সরকারী প্রকল্পে বাড়ি, জলের ট্যাঙ্ক, সৌর চালিত জলের মোটর বানিয়ে দিয়েছে। তবে সরকার চাষযোগ্য জমি দেয়নি, এছাড়া বসবাসের জন্য কোন ফাঁকা জায়গা দেয়নি। যাতে বিরহড় পরিবাররা বাড়ি তৈরি করে ভালোভাবে বসবাস করতে পারেন। সময়ের সাথে সাথে বিরহড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু জায়গার পরিমান বাড়েনি। গবেষক বিরহড় যুবক ও ন্যায়াকে জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের পূর্ব পুরুষরা কোথায় ছিল? গবেষক উত্তরে জবাব পান যে বিরহড়দের পূর্ব পুরুষরা অযোধ্যা পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বসবাস করতো। তবে পুনর্বাসনের ফলে তাঁদের সাথে অন্যায় হয়েছে কারণ তাঁদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁদেরকে দড়ি

তৈরির জন্য যে চিহরলতা প্রয়োজন তা আনতে দেওয়া হয়না। ফলে তাঁদের বাধ্য হয়ে সিমেন্ট বস্তা থেকে দড়ি তৈরি করতে হয়। বিরহড় ন্যায়া ও যুবক গবেষককে জানান যে গ্রামে ভোটের কার্ড সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের থাকলেও রেশন কার্ড, জব কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী, জাতিগত শংসাপত্র বেশিরভাগ বিরহড়দের নেই। অতি দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে তাঁরা জীবনযাপন করছেন। গ্রামে প্রাথমিক ও জুনিয়র হাই স্কুল থাকলেও হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নেই। এই বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন। এছাড়া গ্রামের ২-৩ জন বিরহড় যুবক-যুবতী বিরহড় শিশুদের পড়ান। বিরহড় ন্যায়া ও যুবক বলেন যে গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই, চিকিৎসার জন্য বাঘমুণ্ডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। তবে বেশিরভাগ তাঁদের প্রাচীন পরম্পরাগত ভেষজ ওষধি গাছ গাছড়া থেকে তাঁরা তাঁদের রোগের চিকিৎসা করেন। তবে এখন ধীরে ধীরে তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ বিরহড়দেরকে গভীর জঙ্গলে যাওয়া নিষেধ করেছে বনদপ্তর। ফলে একদিকে তাঁদের জঙ্গলের অধিকার হনন হচ্ছে এবং চিরাচরিত পরম্পরাগত পদ্ধতি ব্যবহারে ব্যর্থ হচ্ছে। গবেষককে বিরহড় ন্যায়া ও যুবক বলেন যে তাঁরা অন্যান্য গ্রামের সাথে সংগঠন হিসাবে আছেন এবং বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীদের সাথে রয়েছেন। বিভিন্ন সময় তাঁরা প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করেছেন এবং জল, জঙ্গল-জমিন বাঁচাবার জন্য বারে বারে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এখনও জঙ্গল মাফিয়া, প্রকৃতি বিরোধী বনদপ্তর কর্মী, বিভিন্ন কোম্পানি ও অফিসারদের বিরুধে আন্দোলন করে চলেছেন। বিরহড়রা গবেষককে জানান যে পুরুলিয়া যখন গ্রীষ্ম কালে রুদ্র আকৃতি ধারণ করে তখন অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাঁদের জীবন নির্বাহ করতে হয়। তাঁরা দুঃখের সাথে গবেষককে জানান যে বছরের একটি সময় তাঁরা অতি দারিদ্র্যের সাথে দিন কাটান।

৪.১.৪ ভূপতিপল্লী গ্রামের কিছু বিশেষ চিত্র (Special Photo of Bhupotipolly Village):

ভূপতিপল্লী গ্রামে বিরহড় কলোনি

সরকারের দ্বারা তৈরি সৌর চালিত সাবমার্সাল এবং জলের ট্যাঙ্ক

ভূপতিপল্লী গ্রামে বহু পুরনো বিরহড়দের বাড়ি

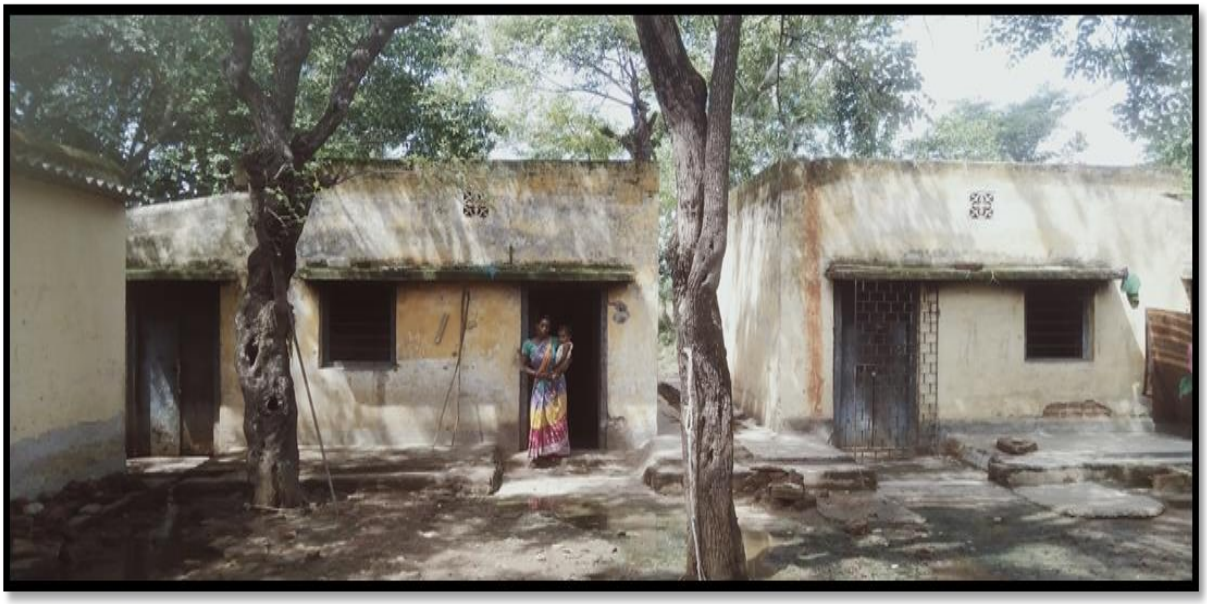

শিশুকে কোলে নিয়ে বিরহড় মহিলা

CONSTRUCTION OF Rural DWELLING
HOUSE (PART- 4)
Name of Beneficiary- CHUNU SIKARI
Fund- Tribal Dev. Deptt. (2018-19)
Tendered Amount- Rs.3,19,388-00
Date of Start- 18.07.2019
Date of Completion- 05.11.2019
Executed by-
BAGMUNDI DEVELOPMENT BLOCK

ডুপতিপল্লী জুনিয়ার হাই স্কুল
স্থাপিত- ২০১১
গ্রাম- ডুপতিপল্লী • পোষ্ট- মাদলা • থানা- বাঘমুণ্ডি • জেলা- পুরুলিয়া

মিশন
নির্মল বাংলা
আমাদের প্রতিজ্ঞা
আমাদের গর্ব

বিরহড় শিশুদের সাথে কথোপকথনে গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক

বিরহড় ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে গবেষক

ভূপতিপল্লী গ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজকর্মের দায়িত্ব পালন কারী বিরহড় যুবকের সাথে

গবেষক

৪.২ বাড়েরিয়া গ্রাম (Bareria Village):

৪.২.১ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Gained from Participatory Rural Appraisal):

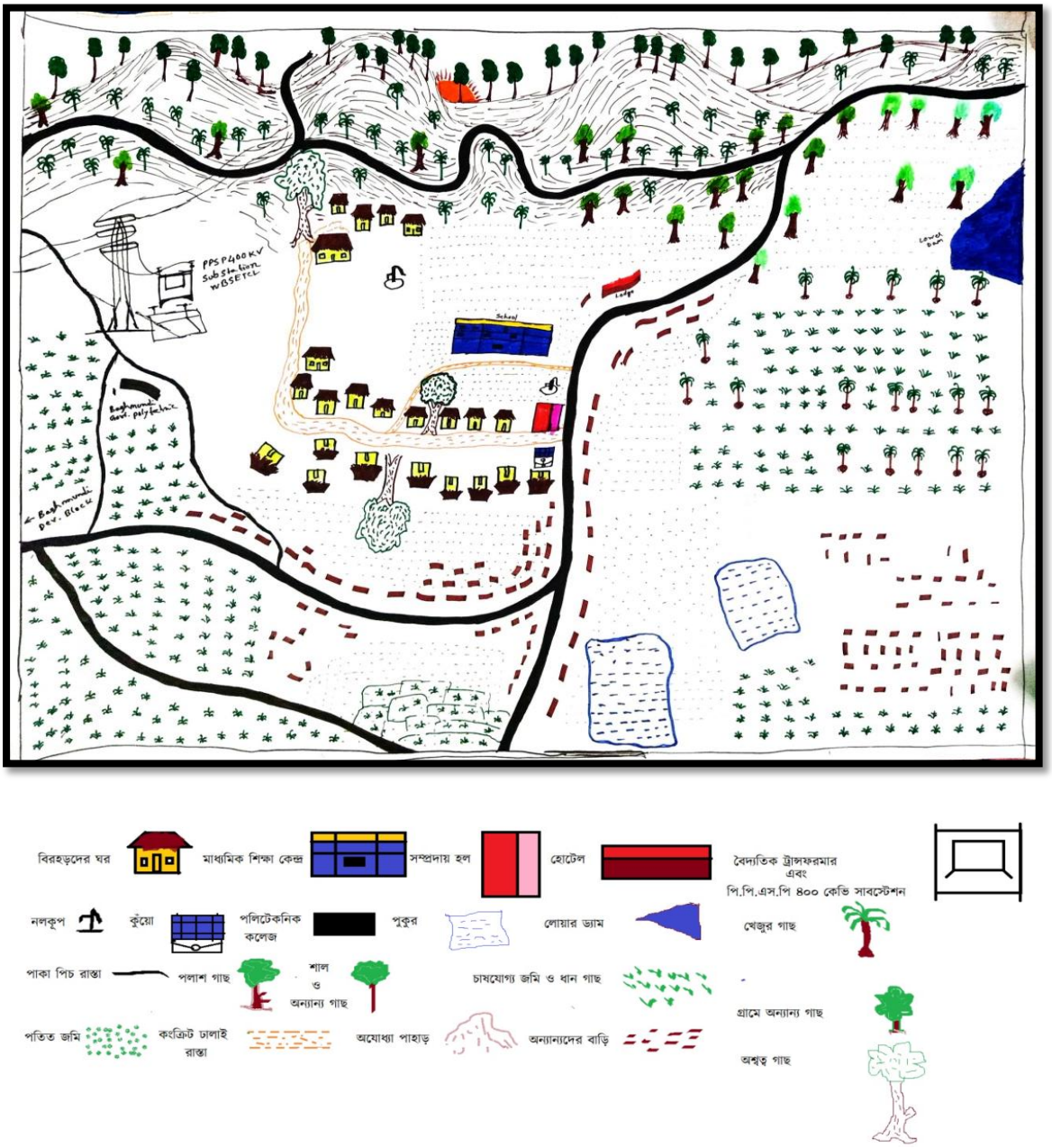

বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় কলোনি (Birhor Coloni in Bareria Village)

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের অধীনে অযোধ্যা পাহাড়ের ঢালে বা শিরায় বাড়েরিয়া গ্রামটি অবস্থিত। বাড়েরিয়া গ্রামটির পূর্বে সুউচ্চ অযোধ্যা পাহাড় রয়েছে, উত্তর দিকে রয়েছে বাঘমুণ্ডী গভর্মেণ্ট পলিটেকনিক কলেজ এবং পি.পি.এস.পি (PPSP) ৪০০ কেভি সাবস্টেশন (West Bengal State Electricity Transmission Company Limited, WBSETCL)।

West Bengal State Electricity Transmission Company Limited, Bareria

বাড়েরিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে আছে কিছু অ-আদিবাসীদের জনবসতী ও চাষ যোগ্য কিছু জমি। বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসীদের ১৮ টি পরিবার বসবাস করেন। এই গ্রামে বিরহড়দের গ্রামের দক্ষিণে একটি পাকা পিচ রাস্তা রয়েছে, এটির একটি অংশ পূর্ব-দক্ষিণে লোয়ার ড্যাম হয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে চলে গেছে, আর একটি অংশ পশ্চিম দিকে কিছুটা গিয়ে উত্তর দিক হয়ে বাঘমুণ্ডী ব্লকের দিকে চলে গেছে। বাড়েরিয়া গ্রামের পশ্চিমে অন্যান্য কিছু আদিবাসী এবং সাধারণ মানুষ জন বসবাস করেন এছাড়া। পশ্চিমে সমতল ভূমিতে বর্ষার জলে চাষবাস করার

জন্য সামান্য কিছু জমি রয়েছে। বিরহড়দের বাড়েরিয়া গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণে অন্যান্য সাধারণ মানুষ জনের বসতি রয়েছে, এছাড়া চাষ যোগ্য জমি আছে, বর দুইটি পুকুর বা জলাশয় রয়েছে যেটি বর্ষা কালে বৃষ্টির জলরাশি সমূহকে পুকুর বা জলাশয়ে নিয়ে যায় এবং জলের সংরক্ষণ হয়। গ্রীষ্মকালে এই জলকে কাজে লাগিয়ে চাষে ব্যবহার করা হয়, এবং বাড়েরিয়া গ্রামের মানুষজনের দৈনন্দিন জীবনের কাজ কর্মে জলের চাহিদা পুরন করে। এই গ্রামের বিরহড়দের সাথে কিছু 'মুড়া' (মুণ্ডা) পরিবারও বসবাস করেন। এই গ্রামের পূর্ব দিকে অযোধ্যা পাহাড়ের উপর দিয়ে একটি পাকা পিচযুক্ত রাস্তা বাঘমুণ্ডী থেকে পাহাড়ের উপর দিয়ে বিরহড়দের বসতির ঠিক উপরে পূর্ব দিকে উচ্চ পাহাড়ে চলে গেছে এবং আর একটি শাখা রাস্তা বিরহড়দের বসতির পাশ দিয়ে অর্থাৎ পাহাড়ের ঢাল দিয়ে দক্ষিণ দিকে লোয়ার ড্যাম হয়ে আপার ড্যাম এ চলে গেছে। বিরহড় আদিবাসীদের গ্রামের পানীয় জলের জন্য দুইটি কুঁয়ো রয়েছে, তবে একটি কুঁয়ো নিস্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ শুকিয়ে গিয়েছে। এছাড়া দুইটি নলকূপ রয়েছে তবে গ্রীষ্ম কালে জলের স্তর একে বারে নিচে চলে যায়। বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি জুনিয়র হাই স্কুল রয়েছে। এই স্কুল থেকে কিছুটা দূরে পর্যটকদের জন্য থাকা এবং খাওয়ার জন্য একটি বর লজ রয়েছে।

বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য একটি সম্প্রদায় হল বা কমিউনিটি হল (Community Hall) রয়েছে। বিরহড় আদিবাসীদের কমিউনিটি হলের পাশ দিয়ে বিরহড় আদিবাসীদের দুই দিকের বাড়ির মাঝ বরাবর (কুলহি) বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের তত্ত্বাবধানে পিভিটিজি গ্রুপ (PVTG) এর তহবিল থেকে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রামের বিশেষ আকর্ষণ এই যে গ্রামের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিন দিকের এলাকাগুলি পলাশ গাছে সুসজ্জিত। বিশেষ করে পূর্ব দিকে পাহাড়ের উপর শাল গাছে পরিপূর্ণ এবং পাহাড়ের ঢাল ও শিরায় পলাশ গাছে প্রকৃতির পরিপূর্ণতা চোখে পড়বে।

বিরহড়দের বাড়িগুলি পূর্বে মাটির ছিল তবে বেশির ভাগ বিরহড়দের বাড়ি পাকা ইটের দেওয়াল এবং এ্যাজবেস্টর দিয়ে ছাউনি রয়েছে। তবে এখনও মাটির দেওয়াল এবং টালি দিয়ে ছাউনি ঘর বিরহড়দের রয়েছে সাথে কিছু মুড়া পরিবারদেরও একই ব্যবস্থা। বাড়েরিয়া গ্রামটি যেহেতু পাহাড়ের ঢালে মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত তাই এই গ্রামে বসবাস করা বিরহড় আদিবাসীরা কম দূরত্বে জঙ্গল থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ পেয়ে থাকে।

৪.২.২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Gained from Focus Group Discussion):

পুরুলিয়া জেলায় যে সমস্ত গ্রামে প্রাচীন বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা বসবাস করেন তার মধ্যে বাড়েরিয়া গ্রামটি হল অন্যতম। এই গ্রামটি সূউচ্চ অযোধ্যা পাহাড়ের ঢালে মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। গবেষক তাঁর গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছ থেকে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। গবেষক তাঁর গবেষণার কাজের মধ্যে দিয়ে যে তথ্য পেয়েছেন সেই তথ্যগুলি নিচে দেওয়া হল।

১) বাড়েরিয়া গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী থানা এবং বাঘমুণ্ডী ব্লকের অধীনে অবস্থিত। বাঘমুণ্ডী ব্লক থেকে বাড়েরিয়া গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ২.৩ কিলোমিটার এবং বাঘমুণ্ডী থানা থেকে বাড়েরিয়া গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার। এই গ্রামে পূর্বে বিরহড়দের মাটির দেওয়াল এবং টালির ছাউনি ঘর ছিল, তবে বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের তত্ত্বাবধানে ২০১৫-১৬, ২০১৮-১৯ বর্ষে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের (BCW) তহবিল থেকে ইট দিয়ে তৈরি পাকা দেওয়াল এবং এ্যাজবেস্টর দিয়ে ছাউনি দেওয়া ঘর বিরহড় আদিবাসী পরিবারগুলিকে করে দেওয়া হয়েছে। এই বাড়েরিয়া গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছালেও বিরহড়দের ঘরে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি।

২) গবেষক গ্রামের বিরহরড় মানুষদের সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসী মানুষদের প্রধান কাজ হল, বিরহড় আদিবাসীরা পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই সমান ভাবে পরিশ্রম করেন। তাঁরা কঠিন সূউচ্চ পাহাড় পায়ে হেঁটে পার করে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করেন। এরপর তাঁরা জঙ্গল থেকে এনে বাজারে বিক্রি করেন, বিক্রয় মূল্য হিসাবে ১৫০-২০০ টাকা পান। বিরহড়রা কখনও কাঁচা বা জীবন্ত গাছ কাটেন না, জঙ্গলে যে

গাছগুলি মারা গিয়ে শুকিয়ে গেছে ও গাছের শাখা প্রশাখা রয়েছে সেগুলি তাঁরা কেটে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

বিরহড় দ্বারা সিমেন্ট বস্তা থেকে দড়ি তৈরি

দড়ি তৈরির জন্য চিহরলতার তন্তু

বিরহড় মহিলার দ্বারা দড়ি তৈরি

বিরহড় মোড়লের সাথে গবেষক

এছাড়া বিরহড়রা জঙ্গল থেকে 'চিহরলতা' সংগ্রহ করে দড়ি তৈরি করেন। তবে গভীর জঙ্গলে যাওয়ার জন্য বনদপ্তর থেকে অনুমতি না পাওয়ার কারণে 'চিহরলতা' সংগ্রহ করতে না পারায় বর্তমানে লতা দিয়ে দড়ি তৈরির পরিমান অনেকটা কমে গেছে। তবে বর্তমানে ব্যবহৃত

সিমেন্টের বস্তা থেকে প্লাস্টিক সুতো বার করে দড়ি তৈরি করেন, যেটি স্থিতিশীল উন্নয়নে একটি বিশেষ নিদর্শন। এছাড়া জঙ্গল থেকে তাঁরা মধু, মোম, কাজু বাদাম, কাঠ বাদাম, মহুয়া, টক জাতিয় ফল, শাল পাতা, ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড়দের বসতির কাছাকাছি শাল, পলাশ, নিম, খেজুর, বেল, বাঁশ, হরিতকী, কন্দ, বট, কূল, কাঠ বাদাম, অশ্বথ, মেহগিনি ইত্যাদি গাছ রয়েছে। বাড়েরিয়া গ্রামের বিরহড় আদিবাসীদের জঙ্গল এবং পাহাড় থেকে মধু সংগ্রহের একটি নতুন কৌশল গবেষক জানতে পারেন। মধু সংগ্রহের জন্য তাঁরা কোন রূপ মৌমাছির ক্ষতি না করে তাঁরা মধু সংগ্রহ করেন অর্থাৎ তাঁরা তীর-ধনুককে কাজে লাগিয়ে মধু সংগ্রহ করেন। এই জন্য বিরহড়রা একটি পরিষ্কার তীর নিয়ে তীরের পিছনে লম্বা মোটা সুতো বা দড়ি বেঁধে দেন। এইবার ধনুক থেকে তীর টিকে মৌচাকের মধু ভাণ্ডের ভেতরে ছুঁড়ে দেন যাতে তীরটি মৌচাকের মধু ভাণ্ডে আটকে যায়। এখন তীরের গাঁ বেয়ে মধু মোটা সুতো বা দড়ি বেয়ে বিন্দু বিন্দু করে নিচে নেমে আসে। দড়ি বা সুতোর শেষ প্রান্তে রাখা থাকে মধু সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট মাটির হাড়ি বা কাঠের বর বাটি। পুরো মধু সংগ্রহ হয়ে গেলে এঁরা ধীরে ধীরে টান দিয়ে তীর টিকে নামিয়ে আনেন এই পদ্ধতিতে মৌচাক, লার্ভা, মৌমাছির কারও ক্ষতি না করেও মধু সংগ্রহ করা হয়। যা স্থিতিশীল উন্নয়নের একটি উদাহরণ।

৩) জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ ছাড়াও জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা শিকার করতে যান, শিকার হিসাবে শূকর, বুনো বিড়াল, সজারু, কাঠবিড়ালি, মেঠো ইঁদুর, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি শিকার করেন। গভীর জঙ্গলে হরিণ রয়েছে কিন্তু বিরহড়রা হরিণ শিকার করে না। তবে বিরহড়দের শিকারের কিছু নিয়ম রয়েছে। জঙ্গলে যে স্থানে তাঁরা পূজা করেন অর্থাৎ ‘জাহের থান’ সেই স্থান থেকে কয়েক মিটার জঙ্গলের স্থান জুড়ে পবিত্র থানের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। ঐ এলাকার মধ্যে

কোন প্রাণী থাকলে বিরহড়রা শিকারে সেই প্রাণীকে হত্যা করে না। এই জাহের থানে 'বাহা' পরব বা উৎসব পালন করেন বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা।

৪) বিরহড়দের নিজস্ব কোন চাষ যোগ্য জমি না থাকার জন্য তাঁরা চাষ করতে পারেন না। তবে কিছু বিরহড় মহিলারা ১৫০-২০০ টাকার মূল্যে অন্যান্যদের জমিতে ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করেন। সরকারের তরফ থেকেও কোন চাষযোগ্য জমি বিরহড়দেরকে দেওয়া হয়নি। তাই এই গ্রামের বিরহড় মহিলাদেরকে অন্যের জমিতে মজুর হিসাবে কাজ করতে হয়।

৫) বিরহড়দের সাথে গবেষকের দীর্ঘ আলোচনায় বিশেষ তথ্য উঠে এসেছে যে বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় গোষ্ঠীর যুবকরা অর্থ উপার্জনের জন্য গ্রাম, জেলা, রাজ্য ছেড়ে তাঁরা প্রবাসী শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং কিছু বিরহড় যুবক অনেক বছর ধরে গ্রামের বাইরে থাকার ফলে বিরহড়দের জনসংখ্যা কমছে। বছরের একটি সময়ে যখন অরণ্যকন্যা অযোধ্যা পাহাড়ে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পর্যটকের আগমন ঘটে তখন বাড়েরিয়া গ্রামের সাধারণ মানুষদের কিছু আমদানি হলেও বিরহড়দের কোন অর্থ উপার্জন হয় না। বাড়েরিয়া গ্রামে ও পাশের পর্যটন কেন্দ্রের স্থানে ছোট খাটো মেলা, খাবারের ও অন্যান্য দোকান বসে। সেই পর্যটন কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সাধারণ মানুষরা বিরহড়দের কোন রকম দোকান দিতে বা পর্যটকদের পাহাড় ঘোরানোর কাজ করতে দেয় না। কারণ তাঁরা আদিবাসী সম্প্রদায় এবং খুবই কমসংখ্যক হওয়ার জন্য প্রতিবাদ করতে পারেন না। অথচ এই পাহাড়কে তাঁদের থেকে কেউ ভালো চেনেন না। এটি তাঁদের প্রাথমিক অধিকার। বছরের এই সময়টা যদি বিরহড়রা ঐ জায়গায় কাজ করার সুযোগ পেত তাহলে কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক ভাবে সবল হত এবং জেলা ছেড়ে অন্যত্র যেতে হত না। এই বিষয়ে নীরিহ বিরহড় মহিলা এবং পুরুষরা গবেষকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

৬) অযোধ্যা পাহাড়, জঙ্গল ও প্রকৃতিকে জঙ্গল মাফিয়া, পুঁজিপতি কোম্পানি, সরকারের দালালরা জঙ্গল, পাহাড় ধ্বংস করে প্রাকৃতিক সম্পদকে লুঠ করার ষড়যন্ত্র করছে এবং অযোধ্যা পাহাড়ে বার বার আঘাত করার চেষ্টা করছে, তাঁদের বিরুদ্ধে বাড়েরিয়া গ্রামের সকল বিরহড় আদিবাসী মানুষরা মাঝিদের অর্থাৎ সাঁওতালদের সঙ্গ দিয়ে প্রকৃতিকে ও প্রকৃতির সম্পদকে, জীবজগতকে রক্ষার জন্য বহুবার লড়াই ও বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদান করেছেন।

৭) বাড়েরিয়া গ্রামে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল এবং একটি পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে। তবে বিশেষ ভাবে বিরহড় শিশুদের ও অন্যান্য শিশুদের শিক্ষার জন্য বিরহড় কলোনিতে মাধ্যমিক স্কুলটি স্থাপন করা হয়েছে। এই স্কুলে পঠন পাঠন হিসাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া হয়। বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন। এই বিদ্যালয়টির নাম হল গয়াসুর মাহাত স্মৃতি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, স্থাপিত হয়েছে ২০০৮ সালে।

গয়াসুর মাহাত স্মৃতি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, বাড়েরিয়া

উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিরহড় গোষ্ঠীর শিশুদের সাথে সাথে অন্যান্য আদিবাসী এবং সাধারণ শিশুরা প্রায় ২.৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বাঘমুণ্ডী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে যায় এবং প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বাঘমুণ্ডী হাইস্কুলে যায়। চূড়ান্ত দরিদ্রতার কারণে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর শিশুরা এই মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে স্কুলের পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারে না স্কুলছুট হয়ে যায়। বিরহড় পরিবার থেকে কেবলমাত্র দুইটি মেয়ে বাঘমুণ্ডী বালিকা বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক) লেখাপড়া করেন। বাড়েরিয়া গ্রামে একটি মাত্র বিরহড় পরিবার থেকে একটি মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের 'মানভুম মহাবিদ্যালয়ে' লেখাপড়া করেন।

৮) দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস কারী বাড়েরিয়া গ্রামের বিরহড় আদিবাসীদের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটার কার্ড থাকলেও বেশির ভাগ বিরহড়দের আধার কার্ড, জব কার্ড, রেশন কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংক বই নেই। মোট ৩৬ জন প্রাপ্ত বয়স্ক বিরহড়ের ভোটার কার্ড আছে কারণ এলাকার নেতা বা সদস্যরা ভোট ব্যাংকের স্বার্থের জন্য সবাইকে ভোট দেওয়ার অধিকার পাইয়ে দিয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রাথমিক চাহিদা সমূহ খাদ্য, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি পাওয়ার অধিকারের জন্য রেশন কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড তৈরি করে দেয়নি। এছাড়া আধার কার্ড, প্যান কার্ড, জব কার্ড, ব্যাংক বই ইত্যাদি এখনও তাঁদের নেই। কয়েক জন বিরহড় পরিবার ৬ কেজি চাল এবং একটি আঠা প্যাকেট পায়। বিরহড় গোষ্ঠীদের কাছ থেকে গবেষক জানতে পেরেছেন যে তাঁরা বার বার পঞ্চায়েত এবং ব্লকে অর্থাৎ বিডিও অফিসে দরখাস্ত এবং আবেদন দিয়েছেন কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। বাড়েরিয়া গ্রামে ১৮ টি পরিবারের মধ্যে কেবল মাত্র একটি পরিবারে একটি মহিলা 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' পান। আর বাকি বিরহড় পরিবাররা সরকারি

লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসী পরিবারে সাংবিধানিক অধিকার শংসাপত্র (Scheduled Tribe Certificate) একটি পরিবারে পায়। এছাড়া আর কোনো পরিবারে নেই।

৯) বিরহড়দের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর গবেষক জানতে পারেন যে এই গ্রামে একটি বিশেষ সমস্যা হল জলের সমস্যা। বর্ষাকাল ছাড়া বাকি সব ঋতুতেই জলের সমস্যা প্রখর হয়ে ওঠে, বিশেষ ভাবে এই জলের সমস্যা প্রখর হয়ে ওঠে গ্রীষ্মকালে। গ্রীষ্মকালে বিরহড়দের গ্রামে যে জলের কুঁয়োগুলি রয়েছে সেগুলিতে জলের স্তর একে বারে নিচে নেমে যায়। আর সরকার যে সমস্ত নলকূপগুলি তৈরি করে দিয়েছেন সেগুলিতে জল ওঠে না। বিরহড় আদিবাসীরা পাহাড়ের চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া জলকে ঐ সময় পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। এছাড়া বাঘমুণ্ডী এলাকা জুড়ে গ্রীষ্মকালে যত নলকূপ রয়েছে তা থেকে আয়রন এবং ক্ষতিকর পদার্থ মেশানো জল বের হয়।

১০) বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাকে বলে ‘বিরহড়’ ভাষা। এই ভাষাটি খেরওয়াল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডাশাখা ভাষা গোষ্ঠীর অংশ। বিরহড় ভাষার সাথে অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষার মিল দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি হল সাঁওতাল, হো এবং মুণ্ডা আদিবাসী ভাষা। তবে সাঁওতালদের অনেকটা কাছের বিরহড় ভাষা, তাই সাঁওতালদের সাথে গোত্রগত মিল দেখতে পাওয়া যায়। মনে করা যেতে পারে যে সাঁওতালদের প্রাচীন একটি সম্প্রদায় যারা গভীর জঙ্গলে আলাদা হয়ে গিয়েছিল তারাই বিরহড়। এছাড়া এই গ্রামে বিরহড়দের সাথে কিছু ‘মুড়া’ পরিবারও বসবাস করেন, তবে মুড়ারা বিরহড় ভাষা কিছুটা বুঝতে পারলেও বলতে পারেন না।

১১) বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড়রা পূর্বে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত ওষধি ব্যবস্থার সাহায্যে রোগনিরাময় করতেন। অযোধ্যা পাহাড়ের সান্নিদ্ধ্যে থাকায় এবং গভীর অরণ্যের নিকট বসবাসের জন্য তাঁদের ভেষজ ওষধি গাছগাছড়ার কোন অভাব হয়নি। কিন্তু ফরেস্ট অফিসাররা বিরহড়দের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় এবং অনুমতি না পাওয়ায় বিরহড়রা গভীর জঙ্গল থেকে আর ভেষজ গাছগাছড়া পায়না, তাই নিজস্ব ওষধি ব্যবস্থার চিকিৎসা পদ্ধতি পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে অসমর্থ হচ্ছেন, ফলে বর্তমানে সাধারণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রামের বিরহড়দের কিছু শারীরিক সমস্যা হলে বর্তমানে তাঁরা বাঘমুণ্ডীর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। তবে এই গ্রামের কিছু বয়স্ক বিরহড় মানুষরা জঙ্গল থেকে ওষধি গাছ গাছড়ার মূল, ফুল-ফল, বীজ, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন, তাঁরা পরম্পরাগত প্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে ওষধি উপকরণ তৈরি করেন এবং রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করেন।

১২) গবেষক বিরহড়দের সাথে আলোচনা থেকে জানতে পারেন এই গ্রামের বিরহড়রা জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করলেও কখনও তাঁরা কাঁচা গাছ বা জীবন্ত গাছ কাটেন না। তাঁরা শাল গাছের পাতা সংগ্রহ করলেও কখনও গাছ থেকে সম্পূর্ণ ঐ গাছের পাতা গুলো তুলে নেন না। বর্তমানে শাল গাছের শুকনো পাতা তাঁরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেন না। কারণ বিরহড়রা অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে বসবাস করেন বলে তাঁরা সহজে জঙ্গলের ঝাটি-পাটি অর্থাৎ গাছের শুকনো শাখা-প্রশাখা গাছের ডালগুলি সংগ্রহ করে থাকেন এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেন। বিরহড়রা গাছের শুকনো পাতা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করেন না, বিশেষ কারণ হল বছরের একটা সময় গাছের সমস্ত শুকনো পাতাগুলি ঝোড়ে মাটিতে পরে যায় এবং বর্ষার জলে পাতাগুলি পচে জৈব সারে রূপান্তর হয়, ফলে মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। ঐ মাটিতে যখন গাছের

বীজ পড়ে তখন প্রকৃতিগত ভাবে নতুন গাছ জন্মায়। এইভাবেই মাটির ও জীব জগতের বাস্তুতন্ত্র বজায় থাকে এবং স্থিতিশীল উন্নয়নে বিরহড়রা সহযোগিতা করেন।

১৩) বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের কিছু নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠান রয়েছে। তবে বিশেষ উৎসব পরবগুলি হল সারহুল, বাহা, কারাম ইত্যাদি। এই উৎসবগুলি প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে বিরহড়রা পালন করেন। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ ও নিবেদনের জন্য তাঁরা এই উৎসব পালন করেন। এই উৎসবগুলির সময় মাঝি থানে লাল এবং সাদা মোরগ উৎসর্গ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিরহড় ছেলেরা তাঁদের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ধামসা-মাদল (টামাগ-তুমদা) ব্যবহার করে এবং মেয়েরা ঐতিহ্য প্রাচীন আদিবাসী নৃত্যে মন মুগ্ধ করে তোলেন।

১৪) বর্তমান সময়ে বাড়েরিরা গ্রামে বিরহড়দের সাপে কামড়ালে তাঁরা ওঝা, বা গুনিনের কাছে না গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এক দিক থেকে তাঁরা বর্তমান সময়ের চিকিৎসা বিদ্যাকে গ্রহণ করেছেন সাথে সাথে তাঁদের প্রাচীন সংস্কৃতিকেও টিকিয়ে রেখেছেন।

১৫) গবেষক বিরহড়দের কাছ থেকে জানতে পারেন যে বাড়েরিয়া গ্রামে পূর্বে যত বিরহড় আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল বর্তমানে সেই জনসংখ্যা অনেকটা কমে গেছে। যেখানে সাধারণ জনসংখ্যা প্রত্যেক বছর বাড়ছে কিন্তু বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের জনসংখ্যা কমছে। কারণ হিসাবে বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে অতি দরিদ্রতার কারনে বিরহড় পুরুষরা বিবাহ করতে রাজি নয়, কারণ ভাবি স্ত্রী'কে ও পরবর্তী সন্তানকে কি খাওয়াবে তা নিয়ে চিন্তিত। কিছু বিরহড় যুবক পুরুষরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে গ্রাম ছেড়ে রাজ্যের বাইরে চলে গেছে ফলে দীর্ঘ দিন না আশায় গ্রামটি জন শূন্য হচ্ছে।

১৬) বিরহড় সমাজের ছেলে মেয়েরা তাঁদের নিজস্ব বিরহড় সমাজে বিবাহ করেন। কিন্তু অন্য কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করেন না। যদি অ-আদিবাসী ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে বিরহড় সমাজকে জরিমানা হিসাবে ঐ ছেলে বা মেয়েকে ৩ টি মোরগ, ছাগল এবং ৪/৫ হাজার টাকা দিতে হয়।

১৭) বাড়েরিয়া গ্রামটি থেকে অনেক বিরহড় ছেলেরা জেলা ও রাজ্যের বাইরে প্রবাসী হয়ে শ্রমিকের কাজ করেন। তবে এই গ্রাম থেকে একটি মেয়ে চেন্নাই এ কাজ করেন। এই বিরহড় মেয়েটি মজুরি হিসাবে মাসে ১২ হাজার টাকা পান।

৪.২.৩ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা (Experience Gained from Observation):

১) গবেষক বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে বিরহড়রা কাজের জন্য গ্রামের বাইরে চলে যায় ও সারাদিন গ্রামে অনুপস্থিত থাকে এবং কিছু মহিলারাও জঙ্গলের শুকনো কাঠ সংগ্রহের জন্য সারাদিন গ্রামে অনুপস্থিত থাকেন। গ্রামের কিছু বয়স্ক ব্যক্তি এবং যুবক পুরুষরা সিমেন্ট বস্তা থেকে সুতো বার করে দড়ি তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকেন ও শিশুরা বিদ্যালয়ে যায়।

২) গবেষক বারেরিয়া গ্রামে থাকার সময়ে পর্যবেক্ষণ করেন যে গ্রামের কিছু পুরুষরা সকাল বেলায় রাতের পান্তা ভাত, শাক সেদ্ধ ও ভাজা বা সকালের গরম ভাত খেয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে পুরুলিয়া, বলরামপুর শহরে ২০০-২৫০ টাকার মূল্যে দিনমজুরি কাজে যায়। সারাদিন কাজ করার পর বিকালে/সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে আসেন। কিছু পুরুষ এবং মহিলারাও অযোধ্যা

পাহাড়ের জঙ্গলে পায়ে হেঁটে যায় জঙ্গলের শুকনো কাঠ, শুকনো ঝাটি-পাটি, ও মধু সংগ্রহের জন্য।

৪) এই গ্রামে থাকা অবস্থায় গবেষক নিজে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন, বিরহড়রা জঙ্গল থেকে যে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে মহিলারা শুকনো কাঠগুলিকে বোঝাই করে মাথায় নিয়ে সুউচ্চ পাহাড় পার করে এবং প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে বাঘমুণ্ডী বাজার ও অযোধ্যা মোড়ের দোকানে শুকনো কাঠগুলিকে ১৫০-২০০ টাকা মূলে বিক্রি করেন। একই ভাবে পুরুষরা জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করার পর সাইকেল করে পায়ে হেঁটে বাঘমুণ্ডী বাজারে শুকনো কাঠগুলিকে ঐ একই মূলে বিক্রি করেন। এই ভাবে কঠোর পরিশ্রমের পর দিনের শেষে ১৫০-২০০ টাকা হাতে আসে, সেই অর্থ দিয়ে তাঁদের নিজস্ব পরিবারের সংসার চলে। তবে কঠিন পরিশ্রম হয় যখন গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৫০-৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেড়ে ওঠে। তখন পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে বিরহড়রা তাঁদের জীবন নির্বাহের জন্য। এছাড়া বর্ষাকালে শুকনো কাঠ সংগ্রহে অনেক সমস্যা হয়। একদিকে বাড়ির জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং বিক্রি করার জন্য শুকনো কাঠ সংগ্রহ।

৫) সরকার বিরহড়দেরকে পাকা বাড়ি তৈরি করে দিলেও, ঐ বাড়ি বা ঘরগুলিকে কিভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় তা বিরহড়দেরকে বিশেষ করে মহিলাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়নি। তাই গবেষক এই গ্রাম পরিদর্শন কালে বিরহড়দের বাড়িগুলিকে অপরিচ্ছন্ন এবং নোংরা জিনিসপত্রে পূর্ণ লক্ষ্য করেছেন।

৬) গবেষক বিরহড়দের পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারেন যে তাঁরা কঠোর পরিশ্রমী এবং অতি দরিদ্রতার মধ্যে দিয়ে তাঁরা তাঁদের জীবননির্বাহ করেন। গবেষক দেখেন যে এই বাড়েরিয়া

গ্রামে দুইটি কুঁয়ো রয়েছে। তবে গ্রীষ্মকালে একটি কুঁয়ো অনেকটা উঁচু স্থানে অবস্থানের জন্য এক ফোঁটাও জল থাকে না, একে বারে জল শূন্য হয়ে যায়। আর একটি কুঁয়ো রাস্তার ধারে একটু নিম্ন স্থানে সমতল ভূমিতে রয়েছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই কুঁয়োতেও জলের স্তর একে বারে নিচে চলে যায়। কোন ক্রমে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা গ্রীষ্মকালে দৈনন্দিন জীবনে জীবন নির্বাহের জন্য প্রায় কয়েক কিলোমিটার দূরে উঁচু পাহাড় থেকে ঝরে পড়া ঝর্ণার জল সংগ্রহ করেন এবং পানীয় হিসাবে পান করেন। এছাড়া সরকারের তরফ থেকে তৈরি করা নলকূপগুলি গ্রীষ্মকালে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

৭) গবেষক যখন বিরহড়দের পর্যবেক্ষণ করেন তখন গবেষকের চোখে একটি বিশেষ বিষয় ধরাপড়েছে যে, বিরহড় ছেলে মেয়েরা সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের সাথে নিজস্ব ভাষায় কথোপকথন করছে। এই বিষয় থেকে গবেষক জানতে পারেন যে সাঁওতালী ভাষা বিরহড়রা জানেন এবং বিরহড় ভাষা সাঁওতালরা জানেন। তবে বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে কিছু কিছু বিরহড় ভাষার শব্দ সাঁওতালরা বুঝতে পারেন না।

৮) গবেষক দেখেন যে, বিরহড়রা জঙ্গলে প্রায় খাড়াই পাহাড়ি পথ দিয়ে শাল বন পার হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা মধু সংগ্রহ করতে যান এখানে একটি নতুন মধু সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করে বিরহড়রা মধু সংগ্রহ করেন, যেটি স্থিতিশীল উন্নয়নে সহায়ক। বিরহড়রা তীর-ধনুককে কাজে লাগিয়ে মধু সংগ্রহ করেন, কোন প্রকার মৌমাছি ও মৌচাকের ক্ষতি না করেই।

৯) বিরহড় পুরুষ এবং মহিলারা বিকালে এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে অর্থাৎ বিশেষ করে মহিলারা রান্না বান্না করেন। পুরুষরা দড়ি প্রস্তুত করেন এবং জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা শুকনো

কাঠ বোঝাই করে পরের দিন বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যান। গবেষক লক্ষ্য করেন যে, বিরহড়দের বাড়িতে বিরহড়রা যে সমস্ত জিনিস তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকেন সে গুলো হল- স্টেনলেস স্টিলের থালা, বাটি, গ্লাস ও কাঁসার ঘটি, কাঁসার গ্লাস, কাঁসার থালা, অ্যালুমিনিয়ামের বালতি, প্লাস্টিক বালতি, কুড়ুল, কাটারি, কাস্তে, ছুরি, কোদাল, শিকার ধরা জাল, মাছ ধরা জাল, বাঁশের তৈরি ঝুড়ি ও পেতে, নারকেলের ঝাঁটা, কাঠের চৌকী, পাথরের শীল ও নোড়া ইত্যাদি জিনিস রয়েছে। এছাড়া রয়েছে আদিবাসীদের জাতীয় হাতিয়ার তীর-ধনুক।

১০) বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব উৎসব, অনুষ্ঠান, পালা-পার্বন ছাড়াও তাঁরা অন্যান্য অ-আদিবাসী অর্থাৎ সাধারণ হিন্দুদের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। গবেষক দেখেছেন এই গ্রামের কিছু পুরুষ-মহিলা, কম বয়সী ছেলে মেয়ে এবং শিশুরা হিন্দুদের কোন একটি মন্দিরে হরিনাম, কীর্তন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ও শোনার জন্য যোগদান করেন।

১১) গবেষক লক্ষ্য করেছেন বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষদের বাড়িতে কোন ব্যক্তি এলে, ঐ অতিথিকে বসার জায়গা দিয়ে ও নমস্কার জানিয়ে তাঁরা আপ্যায়ন করেন। নম্রভাবের সাথে অতিথির সাথে তাঁরা কথাবার্তা বলেন। গবেষক যখন তাঁর পরিচয় দেন তখন বিরহড় আদিবাসী পুরুষ, মহিলা, যুবক, যুবতী, শিশুরা কথা বলেন নম্র ভাবে।

১২) বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড়দের জন্য বাঘমুণ্ডী ব্লকের অধীনে একটি সম্প্রদায় হল (Community Hall) ঘর রয়েছে। গবেষক দেখেন যে এই সম্প্রদায় হলটির ভেতরে বিরহড়দের প্রাচীন পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্র ধামসা ও মাদল সুসজ্জিত রয়েছে। প্রত্যেক রবিবার

বিরহড় পুরুষ মহিলা, শিশুরা একত্রিত হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক চর্চা করেন। এই ভাবে তাঁদের সামাজিক একতাকে মজবুত করেন।

১৩) গবেষক বিরহড়দের সাথে কথা বলে এবং পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারেন যে বিরহড়রা অনেকটাই লাজুক প্রকৃতির বিশেষ করে মহিলারা, এছাড়া প্রথম যখন বিরহড়দের সাথে সাধারণ বাংলা ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেন তখন বিরহড়রা কথা বলতে চান না এবং লাজুক প্রকৃতির জন্য তাঁরা কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। যখন গবেষক সাঁওতালী ভাষায় নিজের পরিচয় দেন এবং তিনি কিসের জন্য এসেছেন বিরহড়দের জানান তখন বিরহড়রা তাঁদের লাজুক ভাব থেকে বেরিয়ে গবেষকের সাথে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে থাকেন।

১৪) গবেষক দেখেন যে এই গ্রামে কম বয়সী কিছু ছেলে এবং মেয়েরা স্কুলে না গিয়ে তারা জঙ্গলে যায় কিছু শিকার এবং শুকনো কাঠ সংগ্রহের জন্য। গবেষক পরে জানতে পারেন যে এই বিরহড় ছেলে ও মেয়েরা স্কুলছুট হয়েছে এবং অতি দারিদ্র্যের কারণে বাধ্য হয়ে তাদেরকে কিছু উপার্জনের জন্য কাজে যেতে হয়। পরিবারকে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য তারা আর বিদ্যালয়ে যায়নি এবং তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাও শেষ করেনি।

৪.২.৪ উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Gained from Open Interview):

গবেষক তাঁর গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রথম বাঘমুণ্ডি ব্লকের বাড়েরিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। এরপর স্থানীয় গ্রামের মানুষজনের কাজ থেকে বিরহড় কলোনি সম্পর্কে জানতে পারেন। গবেষক দেখেন যে বাড়েরিয়া গ্রামটি অযোধ্যার লোয়ার ড্যাম এর পাশে অবস্থিত। বিরহড় কলোনিতে পোঁছে গবেষক বিরহড় ন্যায়া বা মোড়লের সাথে কথা বলেন। কথা বলার

পর গবেষককে বসতে দেওয়া হয় এরপর গবেষক কীসের জন্য এসেছেন তা বলেন। এরপর বিরহড়দের মোড়লের সাথে ও পরিবারগুলির সাথে কথা বলতে থাকেন। গবেষক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করে জানতে পারেন যে বিরহড় পরিবারগুলির পূর্বপুরুষরা অযোধ্যার গভীর জঙ্গলে বসবাস করতেন। তাঁরা এখন অযোধ্যায় পাহাড়ের ঢালে বা শিরায় বসবাস করছেন। বিরহড় ন্যায়া বা মোড়ল গবেষককে জানান যে পেশা হিসাবে কাঠ সংগ্রহ এবং দড়ি তৈরি হল তাঁদের প্রধান পেশা। জঙ্গল যেহেতু কাছে রয়েছে তাই শুকনো কাঠ সংগ্রহ কিছুটা হলেও বেশি পরিমানে সংগ্রহ করতে পারে। বিরহড় পুরুষ এবং মহিলারা সকালে কাঠ সংগ্রহ করতে যায় পায়ে হেঁটে ২-৩ টি উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করে। এরপর শুকনো কাঠগুলি বোঝাই করে বাজারে বিক্রি করে। এছাড়া অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত রয়েছে কিছু বিরহড় যুবক। সাক্ষাতকারে গবেষকের সাথে বিরহড় মহিলারা যখন কথা বলছিলেন তখন গবেষক লক্ষ্য করেন যে তাঁরা অনেক টাই লাজুক প্রকৃতির। তাঁরা ধীরে ধীরে নিম্ন স্বরে কথা বলছিলেন গবেষকের সাথে। গবেষক লক্ষ্য করেন যে একটি পরিবারে অনেকগুলি সদস্য কিন্তু থাকার ঘর তুলনামুলক ভাবে কম। বিরহড়দের সাথে কথা বলে গবেষক জানতে পারেন যে বিরহড়দের নিজস্ব কোন চাষযোগ্য জমি নেই। বিরহড় মহিলারা অন্যান্যদের জমিতে ক্ষেত মজুর হিসাবে কাজ করতে যান, মজুরী হিসাবে ১৫০-২০০ টাকা পান তাঁরা তাই দিয়ে তাঁদের সংসার চালান। এছাড়া চিহরলতা দিয়ে দড়ি তৈরি তাঁদের প্রধান পেশার মধ্যে অন্যতম। এই দড়ি নিকটবর্তী বাজারে তাঁরা বিক্রি করেন। তবে বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের দড়ি আসায় তাঁদের দড়ি আর ভালো বিক্রি হয় না ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে। তবে বিকল্প হিসাবে তাঁরা সিমেন্ট বস্তা থেকে প্লাস্টিক সুতো বার করে দড়ি তৈরি করছে, যেটি প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন কাজে আসে এবং বাজারে বিক্রি হয়। বাড়েরিয়া গ্রামে একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয়ে

কিছু কিছু বিরহড় শিশুরা পড়াশোনা করতে যায়। তবে মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়ার জন্য বাঘমুণ্ডি হাই স্কুল এ যেতে হয়। গবেষক জানতে পারেন যে এই গ্রামে একটি মাত্র মেয়ে কলেজ এ লেখাপড়া করে। ন্যায়া বলেন গবেষককে যে তাঁদের গ্রামে যে সমস্ত বিরহড় শিশুরা রয়েছে সরকার যদি বিভিন্ন বিকাশ মূলক প্রকল্প ও সুবিধা প্রদান করে তাহলে লেখাপড়া করে সরকারী কর্মসংস্থানের মধ্যে দিয়ে নিজের তথা সমাজ, রাজ্য, দেশের বিকাশে সহযোগিতার ভাগ নিতে পারবে। এছাড়া যে সমস্ত সরকারি প্রকল্প রয়েছে সেগুলি তারা যেন পায় তাহলে তাদের উন্নতি হবে বলে তাঁদের বিশ্বাস। যে সমস্ত নলকূপগুলি রয়েছে তা গ্রীষ্মকালে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় অর্থাৎ জল বের হয় না। তবে একটি কুঁয়ো রয়েছে সেখানকার জল পানীয় জল হিসাবে তাঁরা ব্যবহার করেন। ন্যায়া গবেষককে বলেন যে তাঁদের জন্য একটি সম্প্রদায় হল করে দেওয়া হয়েছে যাতে সমস্ত রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক কাজ কর্ম করতে পারেন। ন্যায়া বা মোড়ল বলেন যে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে পর্যটকদের আসার সময়ে একটি ছোট মেলা ও দোকান দেয় স্থানীয় লোকজন কিন্তু বিরহড়দেরকে দোকান করতে দেওয়া হয় না, বসতে দেওয়া হয়না কিছু খাবার জিনিস নিয়ে। এছাড়া বিরহড় মোড়ল বা ন্যায়া বলেন যে বিরহড় পরিবারগুলির প্রাপ্ত বয়স্কদের বেশির ভাগের রেশন কার্ড, জব কার্ড, আদিবাসী শংসাপত্র, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ইত্যাদি নেই। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের দ্বারা ভোটার কার্ড করে দেওয়া হয়েছে যাতে এদেরকে ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। ন্যায়া বলেন যে তাঁদের পরম্পরাগত ভেষজ ওষধি দ্বারা চিকিৎসা বা রোগনিরাময় এখন তাঁরা করেন না। কারণ সামনের জঙ্গলে অ-আদিবাসীরা গাছ কেটে ভেষজ গাছগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। অপর দিকে বনদপ্তর গভীর জঙ্গলে বিরহড়দের যেতে দেওয়া হয় না ফলে তাঁরা ভেষজ উদ্ভিদ না পাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে তাঁদের ঐতিহ্য পরম্পরাগত জ্ঞান ধ্বংসের দিকে। ন্যায়া গবেষককে বলেন যে সাঁওতালদের সাথে সঙ্ঘবদ্ধ

হয়ে তাঁরা প্রকৃতিকে রক্ষা করছেন এবং জঙ্গলকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের অধিকারের জন্য তাঁরা লড়াই করে যাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে জঙ্গল মাফিয়া ও বনদপ্তরের লোকজন জঙ্গলের গাছ কেটে পাচার করে, তাঁদের বিরুদ্ধে আদিবাসী সংগঠনগুলির সাথে বিরহড়রা আন্দোলন করেন। গবেষক জানতে পারেন যে সমগ্র অযোধ্যায় পাহাড়, জঙ্গল, জমিন, পশুপাখি বেঁচে আছে আদিবাসীদের জন্য। ন্যায়া ও বিরহড় যুবক গবেষককে জানান যে আমাদের বসবাসের জন্য যে টুকু জায়গা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, বিরহড় পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু থাকার বা বাড়ি তৈরির জায়গা নেই। ঐ ছোট জায়গার মধ্যে কোনোরকমে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু তাঁরা গবেষককে জানান যখন তাঁরা ছোট ছিলেন বাবা ঠাকুরদা অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে তাঁরা যখন জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন তখন তাঁরা স্বাধীন ভাবে বসবাস করতেন। এখন তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের জল জঙ্গল জমিনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না, বনদপ্তরের অফিসাররা কখনও কখনও পুলিশ কেস দেওয়ার ধমক পর্যন্ত দেয়, জঙ্গলের প্রতি যে তাঁদের অধিকার তা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যে জায়গায় বিরহড়রা বসবাস করছে সেই জায়গার ‘পাট্টা’ সরকারের দ্বারা বিরহড়দের এখনও দেওয়া হয়নি। বিরহড়রা গবেষককে জানান যে জমিতে তাঁরা পূর্বে চাষ করতেন সেই নিজস্ব জমিন বনদপ্তর কেড়ে নিয়েছে জোরপূর্বক এবং সেখানে চাষ করতে নিষেধ করেছে।

৪.২.৫ বাড়েরিয়া গ্রামের বিশেষ চিত্র (Special Photo of Bareria Village):

PRA দ্বারা তথ্য সংগ্রহের সময়

বাড়েরিয়া গ্রামে যাওয়ার পথ ও অযোধ্যা পাহাড়

অযোধ্যা পাহাড়ের নিচে বাড়েরিয়া গ্রাম

বিরহড় গ্রামের নিকটে পর্যটনের স্থান

সম্প্রদায় হল (Community Hall)

প্রকল্পের নাম - বিরহড় দের বাসগৃহ নির্মান
উপভোক্তার নাম - পুতন শিকারী
প্রকল্প মূল্য - ১,৩৫,৩৫১ টাকা
আর্থিক বর্ষ - ২০১৫-১৬
রূপায়নে - তমশুসর সম্প্রদায় কল্যান বিভাগ, পুরুলিয়া

গভীর জঙ্গলে ‘চিহ্নলতা’ সংগ্রহ কালে বাড়েরিয়া গ্রামের বিরহড় যুবকের সাথে গবেষক

অযোধ্যার গভীর জঙ্গলে ভেষজ উদ্ভিদ চিহ্নিত করণ কালে গবেষকের সাথে বিরহড় যুবক

অযোধ্যা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা শুকনো কাঠ (ঝাটি পাটি)

বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় কলোনি

বিরহড়দের ঘর ও গবাদি পশু

বাড়েরিয়া গ্রামের ন্যায়কে ও তাঁর পরিবারের সাথে গবেষক

৪.৩ ডাকাই গ্রাম (Dakai Village):

৪.৩.১ অংশগ্রহণ মূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Gained from Participatory Rural Appraisal):

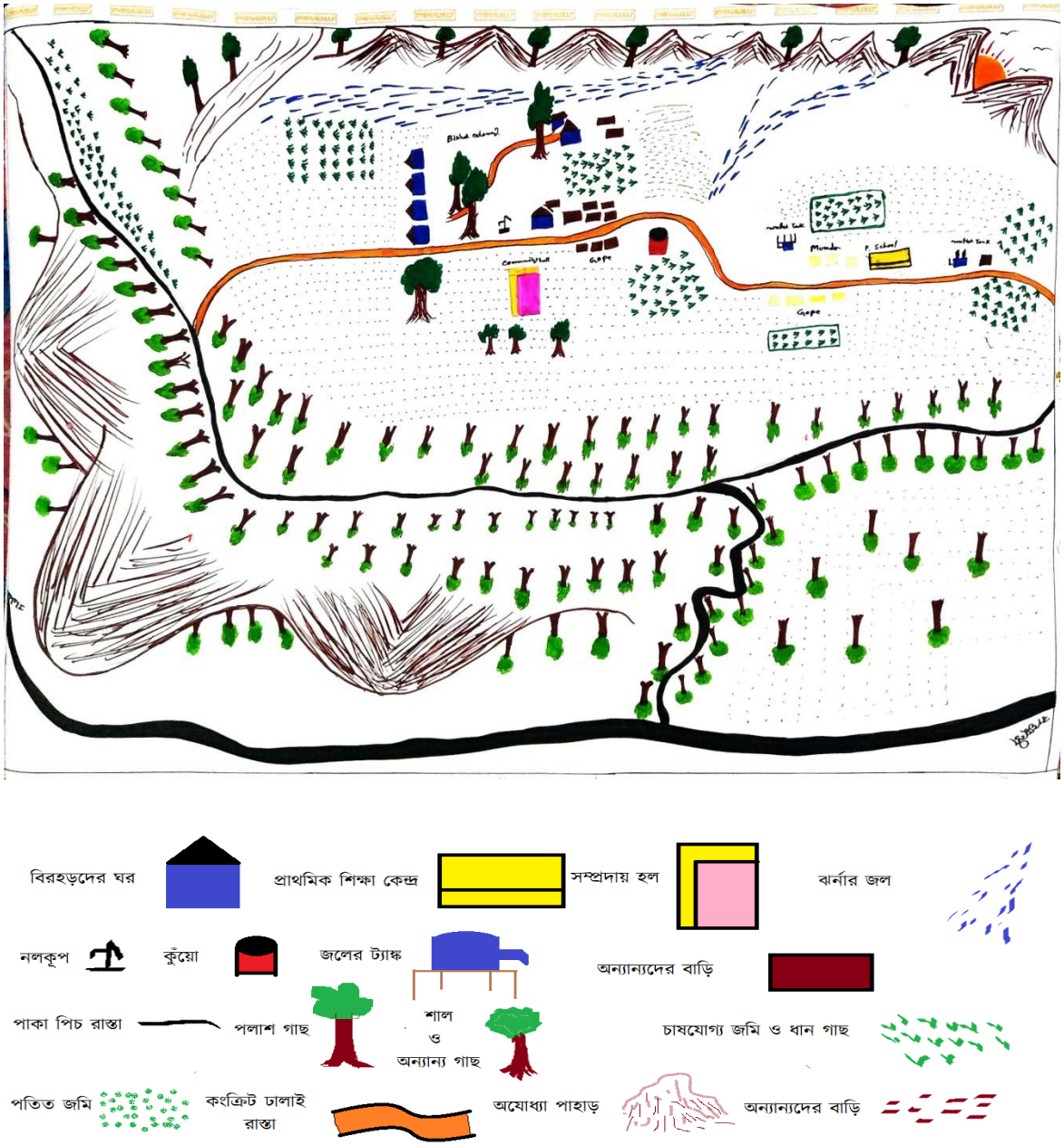

ডাকাই গ্রাম

ডাকাই গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে খামার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। এই গ্রামটি উচ্চ মালভূমি অঞ্চলে পাহাড়ের উপর রয়েছে। চারপাশে পাহাড় এবং ঘন জঙ্গল দিয়ে মোড়া। এই গ্রামে তিনটি বিরহড় আদিবাসী পরিবারের বসবাস। বিরহড়দের সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচটি ইটের দেওয়াল যুক্ত এজবেস্টর ছাউনি সহ পাকা ঘর করে দেওয়া হয়েছে।

ঝালদা-১ ব্লকের তত্ত্বাবধানে ডাকাই গ্রামে বিরহড় পরিবারকে দেওয়া ঘর (Fund-PVTG)

ডাকাই গ্রামের উত্তরে এবং উত্তর পূর্বে সুবৃহৎ পাহাড় এবং জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। এই গ্রামের পশ্চিমে এবং উত্তর পশ্চিমে পাহাড় ঘেরা ও পলাশ গাছের জঙ্গলে মোড়া। ডাকাই গ্রামটি থেকে ঝালদা ১ ব্লকের দূরত্ব প্রায় ১৬-২০ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ। বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে কিছুটা পূর্ব দিকে 'মুড়া' আদিবাসী এবং গোপ বা গোয়ালাদের বাড়ি রয়েছে। ডাকাই গ্রামটি দক্ষিণ, পশ্চিম এবং পশ্চিম উত্তর দিকে ঘন পলাশ গাছে আবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রামের পূর্ব দিকে

সুউচ্চ পাহাড়ের ঢালে কিছুটা চাষ যোগ্য জমি রয়েছে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে রয়েছে গোপদের চাষ যোগ্য জমি। বিরহড়দের বাড়িগুলির পাশ দিয়ে রয়েছে একটি কংক্রিট ঢালাই রাস্তাযার দুই পাশে বিরহড়, মুড়া এবং গোপদের বাড়িগুলি সারিবদ্ধ ভাবে রয়েছে। বাঘমুণ্ডী থেকে ঝালদা যাওয়ার পাকাপিচ যুক্ত রাজ্য সড়কটি গেছে। এই সড়কটি থেকে উত্তরে একটি পাকা সরু রাস্তা উত্তর পূর্ব দিক হয়ে খামার গ্রাম পঞ্চায়েত এর পাশ দিয়ে উচ্চ পাহাড়ের ঢাল দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে ডাকাই গ্রামে গিয়ে মিশেছে। গ্রামের দক্ষিণ পূর্বে কিছুটা চাষযোগ্য জমি থাকায় বর্ষাকালে সামান্য কিছু সবজি চাষ হয় এবং পাথুরে মাটি হওয়ার কারণে ফসল ভালো হয় না। ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কিছুটা দূরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র রয়েছে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার কিছুটা আগে একটি কুঁয়ো রয়েছে ও গ্রামের মাজ বরাবর আর একটি কুঁয়ো রয়েছে। বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীদের বাড়িগুলির পাশে একটি নলকূপ রয়েছে কিন্তু তা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। বিরহড়দের বাড়িগুলির দক্ষিণে একটি সম্প্রদায় হল (Community Hall) রয়েছে। এই গ্রামের উত্তর-পূর্বে উচ্চ পাহাড় থেকে বর্ষার সময় উত্তর দিক হয়ে পশ্চিমে প্রচণ্ড জোরে নিচের দিকে ঝর্ণার জল বয়ে চলে। তবে গ্রীষ্মকালে ঝোরা বা ঝর্ণাটি দেখতে পাওয়া যায় না। ডাকাই গ্রাম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার দূরে খামার গ্রাম পঞ্চায়েত এর কাছে অবস্থিত। ডাকাই গ্রামটির মধ্যে দিয়ে যে ঢালাই রাস্তাটি গেছে তার একটি অংশ উত্তর-পশ্চিম দিক হয়ে ঝালদা মহকুমার দিকে চলে গেছে। আর একটি অংশ পূর্ব-দক্ষিণ দিক হয়ে বাঘমুণ্ডী যাওয়ার পিচের পাকা রাস্তার সাথে যুক্ত হয়েছে। এই গ্রামে পলাশ গাছ ছাড়াও রয়েছে অশ্বথ, বাঁশ, বেল, নিম, কদম, কন্দ, এবং শাল গাছ। ডাকাই গ্রামের উত্তর-পূর্বে যে পাহাড় এবং ঘন জঙ্গল রয়েছে সেখানে ভেষজ গুনযুক্ত

ওষধি গাছগাছড়া রয়েছে। তবে বর্তমানে ভেষজ গাছগাছড়াগুলির সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে।

৪.৩.২ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Obtained from Focus Group Discussion):

(ক) ডাকাই গ্রামের সামাজিক পরিচিতি:

১) ডাকাই গ্রামে বিরহড়, মুড়া, আদিবাসী গোষ্ঠীদের সাথে অনেক সংখ্যক সাধারণ গোপ পরিবাররা বসবাস করে। তবে ডাকাই গ্রামে বিরহড় আদিবাসী পরিবারের সংখ্যা হল তিনটি। যদিও দুইটি পরিবার একটি করে মাত্র পুরুষকে নিয়ে গঠিত। ঐ দুইটি পরিবারে কোন মহিলা বা শিশু নেই। অন্য দুইটি পরিবারেও আর কোন সদস্য জীবিত নেই।

২) ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের সাথে মোট ৭-১০ টি 'মুড়া' পরিবার বসবাস করে।

৩) এই গ্রামে প্রায় ৩০ টি গোপ (গোয়ালা) জাতিভুক্ত পরিবার রয়েছে, এছাড়া সাধারণ কিছু পরিবার মিলিয়ে ডাকাই গ্রামে মোট ৯৩ টি পরিবার রয়েছে। ডাকাই গ্রামে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২০০ জন।

৪) বিরহড় পরিবারগুলি অতি দরিদ্র হওয়ার জন্য তাঁরা নিজেদেরকে সক্ষম করে তুলতে পারেন নি। এছাড়া এই গ্রামে গোপরা (গোয়ালারা) তাঁদের সাধ্য মত বিরহড়দেরকে আর্থিক এবং অন্যান্য কিছু সাহায্য দিয়ে থাকেন।

(খ) ডাকাই গ্রামের অর্থনৈতিক চিত্র:

১) ডাকাই গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিবারের কোন চাষযোগ্য জমি নেই এবং সরকারের থেকে কোন চাষযোগ্য জমি তাঁদের দেওয়া হয়নি।

২) তবে এই গ্রামে গোপ পরিবারের চাষযোগ্য কিছু জমি রয়েছে, তাঁরা বর্ষার সময়ে কিছু সবজি ও ধান চাষ করেন। পাহাড়ের উপর এবং সংলগ্ন জমি হওয়ায় বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে জলের অভাবে চাষ করা যায়না।

৩) পুরুলিয়া জেলা গ্রীষ্ম ঋতুতে রুক্ষ প্রকৃতির, এই সময় ঝালদা সমেত ডাকাই গ্রামেও পানীয় জলের সমস্যা প্রখর হয়ে ওঠে। তাই এই সময় জলের অভাবের জন্য সামান্য সবজি চাষও করতে পারে না। ডাকাই গ্রামের সমস্ত মানুষকে সব্জির জন্য তাই বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। এখন আর কেউ লাঙল টানে না তাই বলদও রাখে না।

৪) ডাকাই গ্রামে পশুপালন হিসাবে গোপ পরিবারগুলি কিছু গরু এবং ছাগল লালন পালন করে। এছাড়া মুড়া পরিবারগুলি কিছু সংখ্যক ছাগল পোষে এবং বিরহড় পরিবারের এক পরিবারে মাত্র ২ টি ছাগল রয়েছে।

৫) ডাকাই গ্রামে জলের সমস্যা একটি বর সমস্যা, তাই গ্রামবাসী এখানে ভালোভাবে চাষবাস ও হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু, লালন পালন করতে পারে না। এই গ্রামের মানুসদেরকে তাই জীবন ও জীবিকার জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভর করতে হয়। জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে এবং জ্বালানির জন্য জঙ্গল থেকে বিরহড় এবং মুড়ারা শুকনো ঝাটি পাটি সংগ্রহ করে। কাঁচা গাছ বা জীবন্ত গাছ এরা কাঠেন না।

৬) ডাকাই গ্রামে কিছু যুবক এবং যুবতীরা রয়েছে যারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। এবং দুইজন যুবক সিভিক ভলেণ্টিয়ারে কাজ করে। এই গ্রামে বিরহড়রা জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করে। বিরহড়রা কোন সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে কাজ করে না।

(গ) ডাকাই গ্রামের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণ:

১) ডাকাই গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিবারগুলির মধ্যে তিনজন বিরহড় পুরুষ, ৩০-৪০ বছর বয়স, সকলেই জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। যেমন তারা জঙ্গল থেকে শাল পাতা তোলা, শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রী করা তাদের একমাত্র জীবিকা, অন্য কোন কাজ তারা করে না বা পায় না।

২) ডাকাই গ্রামে তিনটি মাত্র পরিবার আছে তার মধ্যে একটি মাত্র পরিবারের একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা রয়েছেন যিনি সরকারের থেকে কোন অর্থ পান না। তাঁরা রেশন পান না কারণ তাঁদের রেশন কার্ড নেই। তিনটি বিরহড় পরিবারের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা প্রাপ্ত বয়স্ক বিরহড়দের ভোটার কার্ড আছে। এলাকার নেতা বা সদস্যরা ভোট ব্যাংকের কারণে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব গরজে ভোটার কার্ড করে দিলেও সকলের জন্য জব কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, সম্প্রদায় শংসাপত্র , প্যান কার্ড ইত্যাদি তৈরি করে দেননি। বিরহড়দের নিজস্ব কোন মাথা ব্যথাও নেই কারণ পরের দিন কি খাবেন সেই নিয়ে তাঁরা চিন্তিতনন এবং সকালেই তাঁরা জঙ্গলে চলে যান।জীবিকার আশায়।

৩) ডাকাই গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের বিকাশের জন্য কোন রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী সংস্থা, ধর্মীয় সংস্থা, বা শিক্ষিত সম্প্রদায় এগিয়ে আসেনি এদেরকে এসটি কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, জব কার্ড ইত্যাদি তৈরি করে দেবার জন্য।

৪) ডাকাই গ্রামের বিরহড় আদিবাসীরা নিজ এলাকা থেকে বাইরে গিয়ে পুরুলিয়া বা অন্য জায়গায় কাজ করতে যাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

(ঘ) ডাকাই গ্রামে জনসংখ্যা হ্রাস হওয়ার কারণ:

১) ডাকাই গ্রামে ১০ বছর আগে অনেক সংখ্যক বিরহড় পরিবার বসবাস করতেন। যদিও সেই অর্থে এই গ্রামে বিরহড়দের কোন পাকা বাড়ি ছিল না, তাঁরা কুঁড়েঘরে বসবাস করতেন। পূর্বে এই ডাকাই গ্রামে বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষরা জঙ্গলে শিকার করতেন এবং জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ, চিহড়লতা থেকে দড়ি তৈরি, এবং মধু সংগ্রহ করতেন। ১০ বছর পরে এই ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের পরিবারের সংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪ টি পরিবার। তবে গবেষকের গবেষণা চলাকালিন একটি পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্যের মৃত্যু হলে এখন বর্তমানে তিনটি পরিবারের বসবাস ডাকাই গ্রামে। এই গ্রামে বিরহড়দের তিনটি পরিবারে তিনটি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, একটি মহিলা প্রাপ্ত বয়স্ক আর চারটি সন্তান রয়েছে। চারটি সন্তানের মধ্যে তিনটি সন্তান কন্যা সন্তান আর একটি পুরুষ সন্তান রয়েছে। আশা করা যায় যে আগামী দিনে বাঘমুণ্ডী, বলরামপুর, বা ঝাড়খণ্ডে তিনটি মেয়ের বিয়ে হলে গ্রামে শিশুর সংখ্যা এক এ নেবে আসবে। অর্থাৎ ডাকাই গ্রামে বিরহড় আদিবাসীরা শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

২) ডাকাই গ্রামে বাকি দুইটি পরিবারের দুই পুরুষ ৩০-৩৫ বছর বয়স হলেও এখনও তাঁরা বিয়ে করেননি চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে ও তাঁদের গ্রামে কোন বিবাহ যোগ্য বিরহড় মেয়ে নেই বলে। এছাড়া ডাকাই গ্রামে বিরহড় পুরুষরা অন্য মুড়া পরিবারের মেয়ে বা গোপ পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করবে না। তাছাড়া বিয়ের জন্য যেমন ব্যয় রয়েছে এবং ভাবি স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার ও লালন পালন করার জন্য সামর্থ্য তাঁদের নেই, তাই বিয়ের স্বপ্ন তাঁদের কাছে অধরা থেকে গেছে।

৩) তাঁদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিরহড় পরিবারের মেয়ে বা ছেলে ছাড়া অন্য কোন আদিবাসী গোষ্ঠী পরিবারের ছেলে বা মেয়ে অর্থাৎ সাঁওতাল, মুড়া, মুণ্ডার সাথে বিয়ে দেবে না। তাই ডাকাই গ্রামে একবছর আগে পর্যন্ত চারটি পরিবার ছিল কিন্তু ২০২৩ সালে একটি পরিবারের একমাত্র জীবিত জন মারা গেলে এখন বর্তমানে তিনটি পরিবার বসবাস করছে এই গ্রামে। তবে ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের যে জনসংখ্যা তা থেকে মনে হয় কিছু বছরের মধ্যে গ্রাম থেকে বিরহড়রা একে বারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৪) ডাকাই গ্রামে লক্ষণীয় যে রাজনৈতিক নেতা, সামাজিক নেত্রীবৃন্দ কেউই এই ব্যাপারে চিন্তিত নয়। কেবল মাত্র বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(ঙ) ডাকাই গ্রামে শিক্ষাগত চিত্র:

১) ডাকাই গ্রামে একটি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে বিরহড় পরিবারের চারটি শিশু বিদ্যালয়ে যায়। এছাড়া মুড়া এবং গোপ পরিবারের শিশুরাও এই বিদ্যালয়ে যায়।

২) বিরহড় পরিবারের পুরুষ এবং মহিলারা কেউই প্রাথমিক শিক্ষা পায়নি। একটি পরিবারে চারটি শিশুর মধ্যে একজন পঞ্চম শ্রেণিতে (ছেলে), একজন তৃতীয় শ্রেণিতে (মেয়ে), একজন প্রথম শ্রেণিতে (মেয়ে), আর একজন অঙ্গনওয়ারীতে (মেয়ে) লেখাপড়া করে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে মুড়া এবং গোপ পরিবারের শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা খামার হাই স্কুলে যায়।

৩) ডাকাই গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও হাই স্কুল খামার গ্রামে হওয়ার জন্য অনেক গোপ এবং মুড়া পরিবারের শিশুরা স্কুল ছুট হয়েছে। কারণ হাই স্কুল এ যাওয়ার পথটি চড়াই উতরাইতে অর্থাৎ পাহাড়ি পথ হওয়ায় তারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ্রহ হারায় এবং দরিদ্রতা একটি অন্যতম কারণ।

৪) এই গ্রামে সাধারণ বিদ্যালয় থাকলেও বৃত্তি মূলক কোন শিক্ষা কেন্দ্র নেই তাই বিরহড়, মুড়া, এবং গোপ পরিবারের শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ডাকাই গ্রামে বেশির ভাগ সন্তানের বাবা-মা'রা নিরক্ষর হওয়ার কারণে তাঁদের নিজের সন্তানদের শিক্ষাদানে তাঁরা অংশগ্রহণ করতে পারেন না। বিশেষ ভাবে এই গ্রামের পুরুষরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে গ্রামে থাকার কারণে সন্তানরা তাদের মা ঠাকুমার কাছে লালিত-পালিত হয়ে বর হয়।

৫) ডাকাই গ্রামে বিদ্যালয় ছুট হওয়ার কারণে কেউ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পৌছাতে পারেনা। তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যে লক্ষ্য সেভাবে তারা তৈরি হয়না। তাছাড়া এই এলাকায় দরিদ্রতা চূড়ান্ত হওয়ার কারণে সকলের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ একটি স্বপ্ন মাত্র। এই গ্রামে বিরহড়দের সাথে সাথে মুড়া এবং গোপ পরিবারের সকল শিশুকে শিক্ষার জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে বলে সমবেত হওয়া গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।

(চ) বর্তমানে ডাকাই গ্রামে বিশেষ সমস্যাগুলি হল:

১) করোনার সময়ে এই গ্রামে অনেকে আক্রান্ত হয়েছিল, যদিও কেউ মারা যায়নি। কেউ কোনো রোগে আক্রান্ত হলে রোগীকে ঝালদা ব্লকের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। গ্রামে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক খারাপ এবং গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। এই গ্রামে কোন হাতুড়ে চিকিৎসক বা যথার্থ প্রশিক্ষণ বিহীন চিকিৎসকও নেই। ডাকাই গ্রামে কোন ডাক্তার বা নার্স আসে না। হটাৎ করে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে মোটর সাইকেলে ২০ কিলোমিটার দূরে ঝালদাতে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কিছু বছর আগে এই অঞ্চলে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। মাওবাদিদের আন্দোলনের কারণে বর্তমানে সামান্য হলেও সাইকেল ও মোটর সাইকেল যাওয়ার রাস্তা সরকার থেকে তৈরি করে দিয়েছে।

২) বিরহড়রা বহু বছর পূর্বে ডাকাই গ্রামের জঙ্গলে ওষধি গাছপালা দিয়ে তাঁদের পরম্পরাগত পদ্ধতিতে রোগনিরাময়ের জন্য চিকিৎসা করতেন। তবে বর্তমানে তাঁদের জনসংখ্যার ব্যাপক হ্রাসের ফলে এবং জঙ্গলে ভেষজ উদ্ভিদ এখন আর না পাওয়া যাওয়ার কারণে তাঁরা আর তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন না। বর্তমানে পুরোটাই তাঁরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। তবে এই গ্রামে কেউ কুষ্ঠ রোগে এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়নি।

৩) ডাকাই গ্রামের সাথে সাথে ঝালদার জঙ্গলে যে সমস্ত গাছগুলি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল- শাল, মহুয়া, কুসুম, করঞ্জা, পলাশ, অশ্বথ, বট, বাঁশ, নিম, বেল ইত্যাদি।

৪) পাহাড়ের পাদদেশে মালভূমি অঞ্চলে ডাকাই জনপদটি অবস্থিত তাই এখানে বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছর জলের স্তর সব সময় অনেক নিচে চলে যায়। গ্রীষ্মকালে ডাকাই গ্রামের নলকূপ এবং কুঁয়োগুলিতে জলের স্তর একে বারে নিচে চলে যায়। এর ফলে নলকূপগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে

যায় এবং কুঁয়োগুলিতে সামান্য পরিমানে জল দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে ডাকাই গ্রামের পাশে যে পাহাড় রয়েছে তা থেকে ঝোরা বা ঝর্ণাগুলি পাথরের গা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যেখানে একটি ডোবায় পড়ছে সেখান থেকে বিরহড়রা বালতিতে গামছা বিছিয়ে ডোবা থেকে ঐ নোংরা জল ছেকে পান করে। সেইখান থেকেই বিরহড়, মুড়া এবং গোপ পরিবারের মানুষরা সেই জল ব্যবহার করে জীবন নির্বাহ করছেন।

৪.৩.৩ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা (Experience Gained from Observation):

ডাকাই গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের এমন একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত যেখানে গবেষককে বিরহড় গ্রামটিকে খুঁজে বেরকরাতে একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ঝালদা মহকুমা থেকে প্রায় ১৬-২০ কিলোমিটার দূরে এই গ্রামটি অবস্থিত। কোন গাড়ি এই দুর্গম পাহাড়ি আঁকাবাঁকা অপরিসর রাস্তা ও গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়নি। তবে গবেষক ঝালদা উন্নয়ন ব্লক থেকে জানতে পারেন খামার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ডাকাই গ্রামে কয়েকটি বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিবার বসবাস করেন এবং তাঁদের জনসংখ্যা প্রায় শেষের দিকে। গবেষক তাঁর চেষ্টায় বিরহড়দের সাথে দেখা ও তাঁদের সম্পর্কে জানার তাগিদে এবং গবেষণা করার প্রেরণায় ডাকাই গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ডাকাই গ্রামে পৌঁছে গবেষক বিরহড়দের সাথে সাথে সম্পূর্ণ গ্রামটিকে পর্যবেক্ষণ করেন, এবং কতকগুলি বিষয় তিনি লক্ষ্য করেন-

১) ডাকাই গ্রামে গবেষক পৌঁছে দেখেন যে এই গ্রামে চারটি পরিবার ছিল, একজন আকস্মিক ভাবে মারা যাওয়ার কারণে তিনটি পরিবার রয়েছে। দুইটি পরিবারে একজন করে পুরুষ এবং একটি পরিবারে একটি পুরুষ-মহিলা ও তাঁদের ৪ সন্তান।

২) গবেষক দেখেন বিরহড়দের একটি মাত্র মাটির বাড়ি, টালির ছাউনি দিয়ে ঘর। এছাড়া চারটি পরিবারের জন্য সরকার সারি বদ্ধভাবে চারটি ইটের পাকা দেওয়াল যুক্ত এজবেস্টর ছাউনি ঘর করে দিয়েছেন এবং আর একটি পাকা ঘর একটু উচ্চ স্থানে পূর্বের দিকে মাটির বাড়ির পাশে তৈরি করে দিয়েছেন।

৩) এই গ্রামে বিরহড়রা জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এছাড়া জঙ্গলে তাঁরা শিকার করতে যান না, তারা যা পান তাই দিয়েই তারা চালান।

৪) বিরহড় পরিবারের সন্তানরা বা শিশুরা অঙ্গনওয়ারি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় এবং সেখানে তারা একবেলা খাবার পায় তাই দিয়ে তাঁদের একবেলা একমুঠো খেয়ে দিন চলে।

৫) যে পরিবারে বিরহড় মহিলাটি রয়েছেন তাঁদের ২ টি ছাগল রয়েছে - সেই ছাগলগুলিকে চরাতে যান এবং বাড়ির কাজকর্মগুলি তিনি করেন। তবে সকালের দিকে ঐ মহিলা জঙ্গলে যান বাজারে কাঠ বিক্রির জন্য শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে এবং কিছু কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য।

৬) গবেষক বিরহড়দের বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেন যে বিরহড়রা তাঁদের জিনিস পত্রগুলি চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। আসবার পত্রের মধ্যে স্টিল গ্লাস, বাটি, থালা, খুন্তি, চামচ এছাড়া অ্যালুমনিওমের থালা, মাঝারি বর বাটি, বালতি, হাড়ি, ও মাটির হাড়ি, কলসি ইত্যাদি রান্নার জিনিস পত্র রয়েছে। গবেষক দেখেন বাড়ির ভেতরে একদিকে রয়েছে শিকার ধরার জাল, মাছ ধরার জাল, তীর-ধনুক, বাটুল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারি, শাবল ইত্যাদি। ঘরের বাইরে উঠানের একপাশে গোটা মসলা বাটার শিল ও নোড়া, আর পাশে রয়েছে রান্না করার

মাটির উনুন যেখানে তাঁরা সকাল ও রাত্রিতে রান্না করেন। ঘরের ভেতরে একটি রান্না করার উনুন রয়েছে। বিরহড় পরিবারগুলির নিজস্ব ইটের তৈরি পাকা বাড়ি থাকলেও তারা তাঁদের মাটির বাড়িতেই বসবাস করেন। এবং সরকারের তৈরি ঐ ইটের বাড়িটি নোংরা এবং অপরিষ্কার অবস্থায় রয়েছে।

৭) ডাকাই গ্রামে অন্যান্য বিরহড় পরিবারকে যে ইটের তৈরি ঘর দেওয়া হয়েছে তা অপরিষ্কার, অ-ব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গবেষক লক্ষ্য করেন এর একটি বিশেষ কারণ হল বাকি দুই পরিবারের পুরুষরা মাঝে মধ্যে গ্রামের বাইরে কাজে যান এবং বাড়িতে থাকার মত বিরহড় মানুষের অভাব রয়েছে।

৮) গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে বর্ষাকাল ছাড়া কোন ঋতুতে এখানে চাষ করার জন্য উপযুক্ত মাটি নেই। চারিপাশে পাথুরে মাটি ও রুক্ষ আবহাওয়া, বিশেষ করে এখানে জলের সমস্যা, যার কারণে এখানে চাষ ভালো হয় না।

৯) গবেষক ডাকাই গ্রামে উপলব্ধি করেছেন যে গ্রীষ্মকালে গরমের উত্তাপ পাথর থেকে বেরিয়ে এলাকায় ছড়িয়ে যায় এবং পাহাড়ের উপর গ্রামটি থাকার জন্য ও চারিপাশে উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা থাকায় কখনও কখনও ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত চলে যায়। যার ফল স্বরুপ ডাকাই গ্রামে মানুষদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করা ও পরিবেশের সাথে অভিযোজন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে গবেষকের পক্ষে এই প্রচণ্ড গরমে এই গ্রামে কাজ করাটা একটা সমস্যা ছিল।

১০) এই গ্রামে গবেষক লক্ষ্য করেন যে বিরহড়দের গৃহ পালিত পশু বেশি না থাকলেও মুড়া ও গোপ গোয়ালা পরিবারদের বেশী পরিমানে গৃহপালিত পশু রয়েছে যেমন-ছাগল, গরু, মুরগি

ইত্যাদি। এই গ্রামে প্রায় বেশির ভাগ নলকূপগুলি থেকে জল ওঠে না। গ্রামে দুইটি কুঁয়ো রয়েছে, এই কুঁয়োগুলি থেকে পানীয় জল ও স্নানের জল সংগ্রহ করা হয়।

৪.৩.৪ উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Gained from Open Interview)

গবেষক প্রথমে ডাকাই গ্রামে পৌঁছে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলে বিরহড়দের বসতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে এই গ্রামে কেবল মাত্র ৪ টি বিরহড় পরিবার বসবাস করছেন। গত বছর একটি পরিবারের বিরহড় যুবক মারা যাওয়ায় এখন বর্তমানে ৩ টি বিরহড় পরিবার বসবাস করেন। গবেষক তাঁদের সাথে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে জানতে পারেন যে এই গ্রামটি যেহেতু পাহাড়ের উপর অবস্থান করে তাই বিরহড়দের এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপ ও গরমের ফলে অনেক কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই গ্রামে জলের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পাহাড় শিরা দিয়ে চুঁইয়ে পড়া জল জলাশয় থেকে গামছায় ছেঁকে ছেঁকে পানীয় জল সংগ্রহ করেন গ্রামবাসীরা। এই গ্রামে বিরহড়দের প্রধান কাজ হল শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে এনে বাজারে বিক্রি করা এবং যেটুকু মূল্য পায় তাই দিয়ে সংসার চলে তাঁদের। গবেষক বিরহড়দের সাক্ষাৎকারে যে তথ্য পেয়েছেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল এই গ্রামে বিরহড়রা অতিদারিদ্র্যের কারণে ঠিক ভাবে তাঁদের খাবার জোটে না, যারফল স্বরূপ ২ যুবকের বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলেও এখনও তাঁরা বিয়ে করেননি। গবেষক বিরহড় যুবককে জিজ্ঞাসা করলে যুবকটি জানান বিয়ে করে আনলে ভাবি স্ত্রীকে কি খাওয়াবেন। তাই আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে বিয়ে না করতে পারার জন্য ধীরে ধীরে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা অবলুপ্তির দিকে খুব দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। গবেষক বিরহড় যুবকের কাছ থেকে জানতে পারেন যে যদি তাঁদের বিয়ে করতে হয় তাহলে

ভূপতিপল্লী বা ঝাড়খণ্ড থেকে মেয়ে নিয়ে আসতে হবে। বিরহড়দের শিশুগুলি প্রাইমারী স্কুলে যায় এবং সেখানে এক বেলা তারা খাবার পায়। সরকারের দ্বারা তৈরি গ্রামের মধ্যে পানীয় নলকূপ থাকলেও তা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে জল ওঠে না। এছাড়া বিরহড়দের নিজস্ব কোন চাষযোগ্য জমি নেই। ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে এই গ্রামে মুড়া আদিবাসী এবং সাধারণ গোপ গোয়ালাদের বসবাস। গবেষক গোপ গোয়ালাদের কয়েক জন বয়স্ক বাক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকারে কথা বলে জানতে পারেন যে বিরহড় পরিবারগুলির সাথে সাথে মুড়া আদিবাসী পরিবার এবং অন্যান্যরা দারিদ্র্যের সাথে দিন কাটাচ্ছেন। সরকারী সুবিধা ঠিক মতো তাঁরাও পাননা। গবেষক আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তা হল এই গ্রামটি কেউ জানত না অর্থাৎ পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মধ্যে এতোগুলো পরিবারের বসবাস তা সরকারের কাছে কোন রেকর্ড ছিল না। মাওবাদীদের আন্দোলনের চাপে এই গ্রামের পরিচিতি এবং কিছুটা বিকাশ হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ সংযো, জল, রাস্তা, সরকারী বাড়ি, পানীয় জলের জন্য নলকূপ ইত্যাদি সরকার থেকে তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের দ্বারা কোন রকম কর্ম সংস্থান করে দেওয়া হয়নি। বিরহড়দের সাথে সাক্ষাৎকারে গবেষক জানতে পারেন যে বিরহড়দের জনসংখ্যা অনেক কম থাকায় তাঁদের কোন ন্যায়া বা মোড়ল নেই এই গ্রামে, তবে তাঁরা মুড়া পরিবারগুলির সাথে যুক্ত। সরকার থেকে মুড়া এবং বিরহড়দের সামাজিক বিকাশের জন্য একটি সম্প্রদায় হল তৈরি করে দিয়েছে। গবেষক জানতে পেরেছেন যে বিরহড়দের যে পরম্পরাগত গাছগাছড়া থেকে ভেষজ ওষধি দ্বারা রোগনিরাময় করতো তা ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে। কারণ অতিদারিদ্র্যের ফলে তাঁরা আর কেউ এই গ্রামে পরম্পরাগত ভাবে চিকিৎসা করেন না। কারও কিছু হলে তাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

যান। এছাড়া বিরহড়দের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে বনদপ্তর থেকে গভীর জঙ্গলে প্রবেশে নিষেধ থাকায় তাঁরা আর ওষধি গাছগাছড়া পাননা।

ডাকাই গ্রামে নলকূপগুলি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে

১১) ডাকাই গ্রামে গ্রীষ্মকালে বিরহড় ও মুড়া আদিবাসীরা তাঁদের বাড়িগুলি থেকে প্রায় ৪০-৫০ ফুট নিচে একটি তালাতে বা ডোবা মত স্থানে পাহাড়ের গাঁ দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া জমা জল ব্যবহার করেন। গবেষক দেখেন যে বিরহড়রা ঐ নোংরা জলকে তুলে একটি বালতিতে গামছা রেখে ছেঁকে নিচ্ছেন পানীয় জল হিসাবে পান করার জন্য।

গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের গাঁ দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা হওয়া পানীয় জল

ডাকাই গ্রামে বিরহড় পরিবার

জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা শুকনো কাঠ, ডাকাই গ্রাম

গ্রীষ্মকালে পাহাড় থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা হওয়া জলরাশি

ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের জন্য তৈরি করে দেওয়া বাড়ি (Fund- PVTG)

ডাকাই গ্রামে বিরহড় পরিবারের সদস্য মারা যাওয়ায় বাড়িগুলি ব্যবহার অযোগ্যতে পরিণত হয়েছে

ডাকাই গ্রামে বিরহড় পরিবারগুলির মধ্যে একটি পরিবারে মাটির বাড়ি রয়েছে

বিরহড় ও মুড়া আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং বিকাশের জন্য সম্প্রদায় হল

ডাকাই গ্রাম পরিদর্শন কালে বিরহড় যুবক এবং গবেষক

গবেষককে গ্রাম পরিদর্শন কোরানোর কালে উচ্চ পাহাড় থেকে নিম্ন ভূমির দিকে বিরহড়

যুবকের পানীয় জলের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া

বিরহড় যুবকের সাথে গবেষক

৪.৪ বেড়সা গ্রাম (Bersa Village):

৪.৪.১ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন থেকে সংগৃহীত তথ্য (Information Collected from Participatory Rural Appraisal):

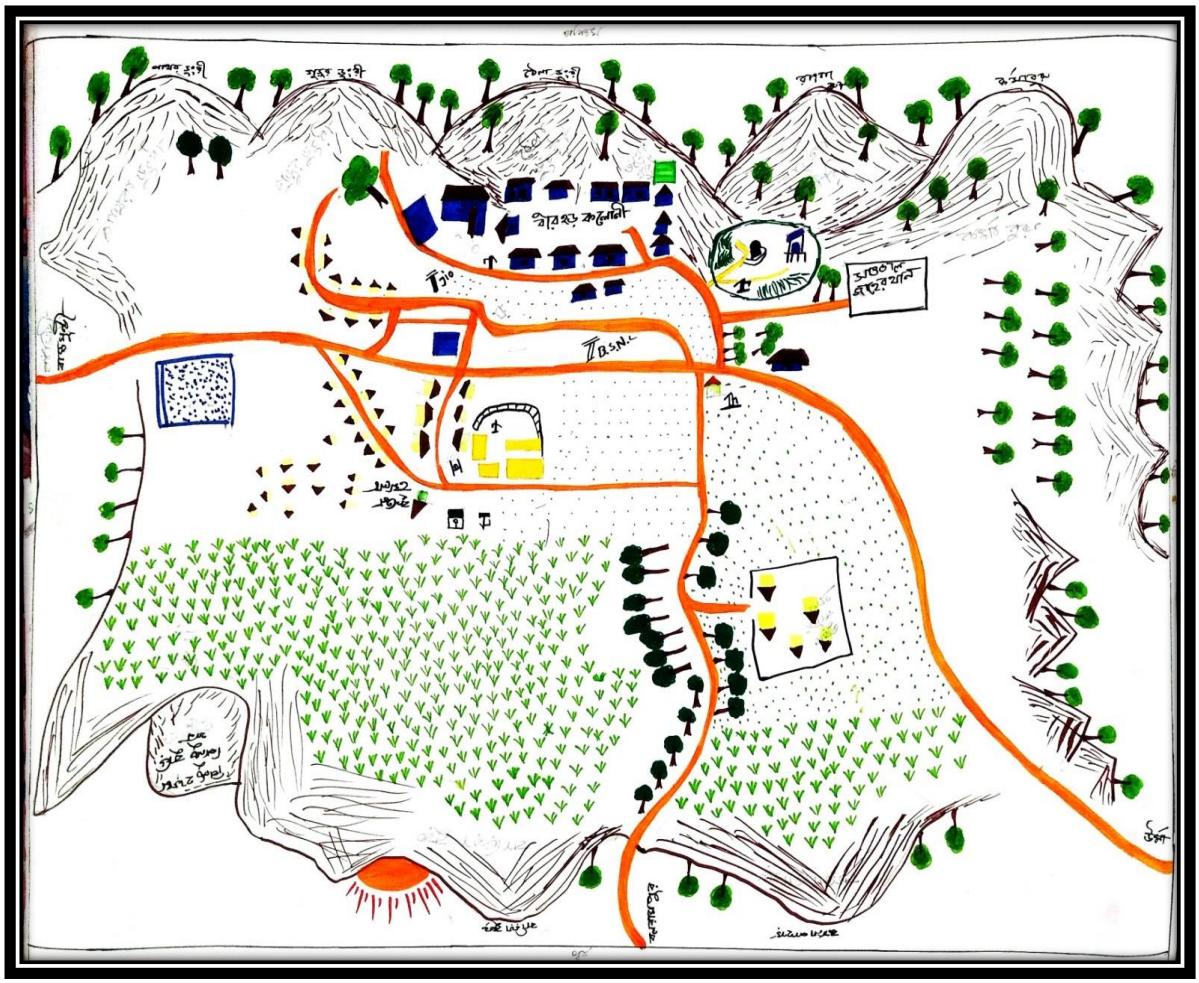

পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর উন্নয়ন ব্লকে বেড়সা গ্রামটি রয়েছে। বলরামপুর মহকুমা থেকে বেড়সা গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ১২-১৩ কিলোমিটার। বেড়সা গ্রামটির চারপাশ সুউচ্চ পাহাড় দ্বারা ঘেরা এবং এই গ্রামটির কিছু অংশ পশ্চিম দিকে পাহাড়ি ঢাল ও পাহাড়ের শিরায় জনবসতি। বেড়সা গ্রামটির বাকি কিছু অংশ সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এই গ্রামটির পূর্ব দিকে একটি রাস্তা উঁচু পাহাড়ের (কানা পাহাড়) পাশ দিয়ে বলরামপুর ব্লকে বা মহকুমায় চলে গেছে। কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অর্থাৎ উর্মা থেকে পাহাড়ের গা দিয়ে বেড়সা গ্রামে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে 'পাথরা ডুংরি' পাহাড়ের ঢাল হয়ে বাঘমুণ্ডী ব্লকের দিকে চলে গেছে। বেড়সা গ্রামটির পশ্চিম দিকে 'ঢেলা ডুংরি' পাহাড়ের ঢালে ও শিরায় বিরহড়দের কলোনি রয়েছে অর্থাৎ ঘরবাড়িগুলি রয়েছে। এছাড়া বাড়িগুলির পাশে একটি সম্প্রদায় হল রয়েছে। বিরহড়দের কলোনির দক্ষিণ দিকে কিছু সাঁওতালদের বসতি রয়েছে এবং কিছুটা দূরে পূর্ব দিকে সাধারণ হিন্দু জনবসতিদের বসতি। এই হিন্দু জনবসতিদের উত্তরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই গ্রামের সকল শিশু এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকে একটি কুঁয়ো রয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্বে একটি কীর্তন মন্দির রয়েছে। বেড়সা গ্রামের মাজ বরাবর অর্থাৎ বিরহড়দের কলোনির পূর্ব দিকে কিছুটা দূরে একটি জিও নেটওয়ার্ক টাওয়ার (Jio Tower) এবং আর একটি বিএসএনএল নেটওয়ার্ক টাওয়ার (BSNL Tower) এর সুবিধা রয়েছে। হিন্দু জনবসতির দক্ষিণে একটা বর জল সংরক্ষণের জন্য পুকুর রয়েছে। বিরহড় কলোনির উত্তরের দিক অনেকগুলি উঁচু পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত - সেগুলি হল- পাথর ডুংরি, গুরুর ডুংরি, ঠেলা ডুংরি, রাংবা বুরু, কর্মা বুরু এবং দক্ষিণে পাথরা ডুংরি দিয়ে ঘেরা। বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে ঠিক উত্তর দিকে 'ঠেলা ডুংরির' ঢালে বিরহড়দের 'জাহের থান' রয়েছে। এবং কিছুটা দূরে নিচের দিকে উত্তরে সাঁওতালদের 'জাহের থান' রয়েছে। বেড়সা

গ্রামের একে বারে পূর্বে ‘বাড়িয়া বুরু’র পাসে ‘পিলচু হারাম পিলচু বুড়ি’ থান অবস্থিত। বেড়সা গ্রামের পূর্ব দিকে ও উত্তর-পূর্বে বর্ষাকালে ধান চাষ হয়। তবে এই অঞ্চলটি অনেকটা পাথর মাটি হওয়ার জন্য এখানে গ্রীষ্মকালে জলের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। তাই নলকূপ থেকে জল ওঠে না। বিরহড়দের কলোনির দক্ষিণে একটি প্রায় ২০-৩০ ফুট গর্ত পুকুর খনন করা হয়েছে বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্য এবং মাছ চাষ করার জন্য যাতে বিরহড়রা মাছ চাষ করে অর্থনৈতিক ভাবে সবল হতে পারেন। এই গ্রামটির চারপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, এই পাহাড়ে শাল গাছ, নিম, অশ্বত্থ, ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এই গ্রামে ঢালাই রাস্তা বরাবর দুই দিকে আকাশমণি, শিরিশ, পলাশ, নিম ইত্যাদি গাছ রয়েছে। বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে পশ্চিমে পাহাড়ের ওপারে ও গভীর জঙ্গলে ওষধি গাছ-গাছড়া রয়েছে। বিরহড়রা এগুলিকে রোগনিরাময়ে ব্যবহার করেন।

৪.৪.২ ফোকাস গোষ্ঠী আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Gained from Focus Group Discussion):

গবেষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের অধীনে বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের সাথে দেখা করেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করলেও গবেষক ফোকাস গোষ্ঠী আলোচনার মাধ্যমে বিরহড়দের জীবন ধারা, সংস্কৃতি, আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান ব্যবস্থা, স্থিতিশীল উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন।

১) গবেষক বেরসা গ্রামে পৌঁছে বিরহড় কলোনির বিরহড়দের মোড়ল বা ন্যায়ার সাথে দেখা করেন এবং কীসের জন্য এসেছেন তা জানান। এরপর গবেষক কিছু বিরহড়দেরকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। গবেষক জানতে পারেন বহু পূর্ব কাল থেকে বিরহড়দের পূর্বপুরুষরা

ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ অযোধ্যার গভীর জঙ্গলে ও পাহাড়ে বসবাস করতেন, বর্তমানে বিরহড়রা পাহাড়ের ঢালে বসতি স্থাপন করেছেন।

২) গবেষক বিরহড়দের কাছ থেকে জানতে পারেন যে পূর্বে বিরহড়রা ঝুপড়ি বানিয়ে সেখানে বসবাস করতেন, তবে এখন সরকারের তরফ থেকে ইটের দেওয়াল ও অ্যাজবেস্টর ছাউনি ঘর করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গ্রামে অনেকগুলি নলকূপ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব নলকূপ থেকে জল ওঠে না। এছাড়া সরকারের তরফ থেকে সম্প্রদায় হলও (Community Hall) করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পূর্বে বিরহড়দের কলোনি যাওয়ার রাস্তা কাঁচা ছিল তবে বর্তমানে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে।

৩) গবেষক বিরহড়দের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর জানতে পারেন যে এই গ্রামে বিরহড়দের মূল পেশা হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা, মধু সংগ্রহ, চিহরলতা থেকে দড়ি তৈরি করা ইত্যাদি। বিরহড়রা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিন থেকে চারটি উঁচু পাহাড় অতিক্রম করে গভীর জঙ্গলে যান শুকনো গাছের কাঠ সংগ্রহ করার জন্য। এরপর বিরহড়রা শুকনো কাঠগুলিকে মাথায় করে খাড়া পাহাড় পার হয়ে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার পথ হেঁটে বলরামপুর বাজারে কাঠ বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। এছাড়া মধু সংগ্রহ করেন এবং চিহরলতা থেকে দড়ি তৈরি করেন, এছাড়া বর্তমানে সিমেন্ট বস্তা থেকে দড়ি তৈরি করেন। গবেষক জানতে পারেন বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের মূল অর্থনীতি হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ।

৪) বিরহড়রা গবেষককে জানান যে চাষের জন্য তাঁদের কোন নিজস্ব জমি জায়গা নেই, অন্যের জমিতে ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করতে হয়। সরকারের তরফ থেকে কোন চাষযোগ্য জমি দেওয়া হয়নি। তবে বিরহড়দের সাথে আলোচনা করে গবেষক জানতে পারেন যে বিরহড়দের

কলোনির আশে পাশে কিছু ফাঁকা পাথর ও কাঁকর যুক্ত জমি রয়েছে। সরকারের তরফ থেকে পাহাড়ের ঢালে একটি পুকুর করে দেওয়া হয়েছে। যাতে বর্ষার জল পাহাড়ের শিরা দিয়ে বয়ে এসে পুকুরে সঞ্চয় হয়। এছাড়াও বিরহড়রা যাতে এই পুকুরে মাছ চাষ করতে পারে এবং নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারেন।

৫) বিরহড়দের কাছ থেকে গবেষক একটি বিশেষ ঘটনা জানতে পেরেছেন যে বেরসা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে সরকারের দ্বারা নির্মিত একটি কুঁয়ো থেকে বিরহড়দের জল পান করতে দেওয়া হচ্ছিল না, এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বসবাস হিন্দু জনবসতির মানুষ জনের দ্বারা। কারণ বিরহড়রা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও বাংলার মাটিতে এখনও জল পান করতে দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয় বেরসা গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিরহড়দের শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি ছিল না। গবেষক জানতে পারেন যে এই বিষয়গুলির জন্য বিরহড়রা সাঁওতালদের সহযোগিতায় আন্দোলন করেছেন, এছাড়াও বিডিও অফিস, ডিএম অফিসে দরখাস্ত করেন এবং চিঠি লেখেন। এরপর সরকারের তরফ থেকে বিরহড়দের কলোনিতে কয়েকটি নলকূপ ও সোলার প্যানেল যুক্ত সাবমার্সাল জলের ট্যাঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ ভাবে বর্তমানে বেড়সা গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ শিশুদের সাথে বিরহড় ও সাঁওতাল শিশুরাও লেখাপড়া করতে যান।

৬) গবেষক বিরহড়দের সাথে আলোচনার পর জানতে পারেন যে এই গ্রামে বিরহড়রা অতি দরিদ্র। কিছু বিরহড় পুরুষরা বলরামপুর, পুরুলিয়া বাজারে বিভিন্ন দোকানে মজুর হিসাবে কাজ করেন। কিছু পুরুষরা জেলার বাইরে মজুর হিসাবে কাজে গেছেন। তাই গ্রামে বিরহড়দের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, বর্তমানে বেড়সা গ্রামে ৯-১০ টি বিরহড় পরিবার রয়েছে।

৭) বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে বলরামপুর ব্লকের তত্ত্বাবধানে ইটের বাড়ি, নলকূপ তৈরির সাথে সাথে বর্তমানে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে বিরহড়রা তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতীয় আদিবাসী সংস্কৃতিকে চর্চার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের সাংস্কৃতিক হল রয়েছে যেখানে তাঁরা প্রাচীন আদিবাসী বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সুসজ্জিত রেখেছেন এবং যাতে বাদ্যযন্ত্রগুলির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বিরহড় সংস্কৃতিকে পরম্পরাগত ভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে শিখিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থাও করেছেন।

৮) বেড়সা গ্রামে গবেষক বিরহড়দের কাছ থেকে জানতে পারেন যে এই গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় (চতুর্থ শ্রেণী) রয়েছে, গ্রামে কোন উচ্চবিদ্যালয় নেই। উচ্চবিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য গ্রামের সকল শিশুদের বা শিক্ষার্থীদেরকে প্রায় ১০ কিলোমিটার পাহাড়, জঙ্গল ও নির্জন পথ অতিক্রম করে বলরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে যেতে হয়। এছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁদের কাছে একটা স্বপ্ন। বিরহড় কলোনিতে একটি বেসরকারি ছোট 'অল চিকি' শিক্ষা নিকেতন রয়েছে অর্থাৎ বিরহড়দেরকে 'অল চিকি' শেখানো হয়। ২/৩ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা তাঁদের নিজেদের প্রচেষ্টায় বিরহড় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসেন। বিরহড় মাঝির কাছ থেকে গবেষক জানতে পারেন যে পুরুলিয়া থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ও আড়ষা থানা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে, আড়ষা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ফাঁকা জঙ্গলের মাঝে ছোট ছোট ডুংরির (পাহাড়) তলায় রয়েছে নরেন হাঁসদার তৈরি 'সিধু-কানহু মিশন' আশ্রম শিক্ষালয়। বিরহড় আদিবাসী কিছু শিশুরা এই আশ্রমে থেকে লেখাপড়া করেন। নরেন হাঁসদার আশ্রমে পুরুলিয়ার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিশুরা বসবাস করেন এবং লেখাপড়া করেন। গবেষক জানতে পারেন যে এখনও পর্যন্ত বিরহড়রা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। অতি দারিদ্র্যের কারণে স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে।

৯) বহু পূর্বে এই গ্রামে বিরহড়রা পদবি হিসাবে ‘শিকারি’ পদবি ব্যবহার করতেন। কারণ বিরহড় মানুষেরা শিকার করতেন বলে তাঁদেরকে শিকারি হিসাবে ডাকার ফলে সরকারি শংসাপত্রে শিকারি পদবি লিখে দিত সরকারি কর্মচারীরা, তবে বর্তমানে বিরহড়রা এই পদবীর বিরোধিতা করেছেন। সরকারকে বলেছেন যে তাঁদের পদবী যাতে ‘বিরহড়’ লেখা হয়। তাই বর্তমানে বিরহড়দের পদবী ‘বিরহড়’ লেখা হচ্ছে।

১০) বেড়সা গ্রামে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। গবেষক বিরহড়দের সাথে কথোপকথনে জানতে পারেন যে কেউ যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তাকে বলরামপুর বা বাঘমুণ্ডী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে। তবে বিরহড়দের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, তাঁরা গভীর জঙ্গল থেকে ভেষজ ওষধি গাছগাছড়া দিয়ে তাঁদের রোগ নিরাময় করেন যেমন- জর, সর্দি, কাশি, চামড়ার কোন রোগ, চুলকানি, অ্যালার্জি, পেটে ব্যাথা, শরীরে ব্যাথা/ যন্ত্রণা, ইত্যাদি। তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির সহায়তায় প্রাচীন কাল থেকে পরম্পরাগত ভাবে গভীর জঙ্গলে ও পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁদের জীবনধারা অতিবাহিত করে চলেছেন। তবে বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে বর্তমানে ফরেস্ট অফিসাররা তাঁদেরকে গভীর জঙ্গলে যেতে দেননা এবং অনুমতি না পাওয়ার জন্য সামনের পাহাড়, জঙ্গলে ভেষজ উদ্ভিদ না পেয়ে তাঁদের চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে অসমর্থ হচ্ছেন।

১১) বেড়সা গ্রামে বিরহড়রা বর্তমানে আর শিকার করেন না। তবে বছরের একটা সময় তাঁরা শিকারে যান তাঁদের শিকার উৎসব পালনের জন্য। তবে বহু পূর্বে বিরহড়রা বাধ্য হয়ে কিছু

প্রাণী শিকার করতেন জীবন নির্বাহের জন্য, যেমন- বন্য শূকর, কটাস, সজারু, কাঠবিড়ালি ইত্যাদি।

১২) বিরহড়রা গবেষককে জানান যে বিভিন্ন জঙ্গল মাফিয়া, পুঁজিপতি, এমনকি ফরেস্ট অফিসাররাও এই জঙ্গল/ অরণ্যকে ধ্বংসের জন্য ও জঙ্গলের সম্পদকে লুঠ করার জন্য অনেক বার চেষ্টা করেছিল এবং অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে শেষ করেছে। তবে বিরহড়, সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসী সংগঠন জঙ্গল এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য জঙ্গল মাফিয়াদের সাথে লড়াই করেছেন, এমনকি বহুবার আন্দোলন করেছেন। বর্তমানেও সাঁওতাল, মুণ্ডা, বিরহড়, ভূমিজ ইত্যাদি আদিবাসী গোষ্ঠীরা এখনও লড়াই করে চলেছেন গবেষক আলোচনার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে বেড়সা গ্রামে যে সাধারণ মানুষ আছেন তাঁরা পাহাড়ের জীবন্ত গাছগুলিকে কেটে শেষ করে ফেলছে, বিরহড়রা বাধা দিলে বিরহড়দের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

১৩) আলোচনার মাধ্যমে উঠে এসেছে যে বিরহড়দের বিকাশের জন্য কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রোজেক্ট থেকে যাতে বিরহড়রা বঞ্চিত না হয় তাঁর জন্য বলরামপুর ব্লকের তত্বাবোধানে তত্ত্বধানে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার বিকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৪.৪.৩ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা (Experience Gained from Observation):

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের অধীনে বেরসা গ্রামটি অবস্থিত। বলরামপুর ব্লক থেকে বেরসা গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার। বেরসা গ্রামে পাহাড়ের শিরায় বা ঢালে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর বসতি। গবেষক বলরামপুর শহর থেকে ৩ চাকার ইলেকট্রিক

যানবাহনে চেপে নির্জন পথ এবং পাহাড়ের গা দিয়ে বেড়সা গ্রামে পৌঁছেছেন। গবেষক গ্রামে পৌঁছে সমগ্র গ্রামটিকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বহুদিন এই গ্রামে থেকে বিশেষ তথ্য এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন সেগুলি হল-

১) গবেষক বিরহড় কলোনিতে পৌঁছে লক্ষ্য করেন যে বিরহড়দের বাড়িগুলি পাকা ইটের তৈরি দেওয়াল এবং এজবেস্টর ছাউনি ঘর সকারের তরফ থেকে করে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া সোলার প্যানেল যুক্ত সাবমার্সাল জলের ট্যাঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে। গবেষক ২০২২ সালে যখন প্রথম বেড়সা গ্রামে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন তখন মূল রাস্তা থেকে বিরহড় কলোনি পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা কাঁচা ছিল। কিন্তু গবেষক ২০২৪ সালে বেড়সা গ্রামে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, উর্মা থেকে বাঘমুণ্ডী যাওয়ার পাকা রাস্তা পর্যন্ত বিরহড় কলোনি থেকে একটি কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে।

২) গবেষক বিরহড় কলোনিতে দীর্ঘ সময় ধরে থেকে পর্যবেক্ষণ করে জানতে পেরেছেন যে এই গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ-মহিলা, কিছু যুবক যুবতীরা সকাল বেলায় বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলের শুকনো কাঠ সংগ্রহের জন্য এবং হাতে থাকে কাঠ কাটার কুরুল, কাটারি, দড়ি ইত্যাদি উপকরণ এবং শুকনো কাঠ তাঁরা ৬-৭ কিলোমিটার গভীর জঙ্গল থেকে কয়েকটি উঁচু পাহাড় অতিক্রম করে বিরহড় কলোনিতে নিয়ে এসে এবং শুকনো কাঠগুলিকে বোঝায় করে একটি বর গাছে হেলান দিয়ে রাখে বা খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখে। এরপর সকাল হলেই মহিলারা বোঝাই করা শুকনো কাঠগুলিকে মাথায় করে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার দূরত্ব নির্জন পথ অতিক্রম করে বলরামপুর বাজারে ১৫০-২০০ টাকার মূল্যে বিক্রি করেন। একই ভাবে পুরুষরা

সাইকেলে বোঝাই করা শুকনো কাঠগুলিকে চাপিয়ে পায়ে হেঁটে বলরামপুর বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যান।

৩) গবেষক একটি বিষয় লক্ষ্য করেন যে বেড়সা গ্রামের বিরহড়রা অনেকটা সচেতন হয়েছেন পুরুলিয়ার অন্যান্য বিরহড়দের তুলনায়। গবেষক দেখেন যে এই গ্রামে কমিউনিটি হোল এর পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পারেন।

৪) ২০২৪ সালে গবেষক এবং গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক বেরসা গ্রামে উপস্থিত হয়ে বিরহড়দের সাথে আলোচনা এবং পর্যবেক্ষণ থেকে জানতে পারেন যে এই গ্রামটি যেহেতু পাহাড়ের ঢালে বা শিরায় অবস্থান করে তাই গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলটির তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি উপরে উঠে, এর ফলে এই গ্রামে জীবন নির্বাহ করা এবং প্রকৃতির সাথে অভিযোজন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময় জলের সমস্যা প্রখর হয় সাথে সম্পূর্ণ পুরুলিয়া জেলা জলের সঙ্কটে পড়ে যায়।

৫) বেড়সা গ্রাম পর্যবেক্ষণ করে গবেষক দেখেন যে বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য বেড়সা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে হয়। গবেষক লক্ষ্য করেন এই গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এছাড়া কোন উচ্চ বিদ্যালয় নেই। গবেষক দেখেন যে বিরহড় কলোনির ঠিক পশ্চিমদিকে ধেলু ডুংরি পাহাড়ের গায়ে একটি জাহের থান রয়েছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ উৎসব বা পার্বনে পূজা করা হয়। বিরহড়দের জাহের থানের উত্তর দিকে কিছুটা নিচু স্থানে সাঁওতালদের জাহের থান রয়েছে।

৬) গবেষক বেড়সা গ্রামে প্রবেশ করে দেখেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং তাঁর পাশে কয়েকটি হিন্দু বসতি রয়েছে, এছাড়া বিরহড় কলোনির দক্ষিণ প্রান্তে কিছু সাঁওতাল আদিবাসী

পরিবারের জনবসতি লক্ষ্য করেন। গবেষক দেখেন যে বর্ষার সময়ে বেড়সা গ্রামে চারিদিকে বেষ্টিত পাহাড়ের মাঝে সমতল ভূমিতে ধান চাষ হয়। গবেষক লক্ষ্য করেন যে বিরহড় কলোনির দক্ষিণ দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা একটি পুকুর খনন করে দেওয়া হয়েছে যাতে বিরহড়রা মাছ চাষের দ্বারা তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বৃদ্ধি করতে পারেন। বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য বিরহড় কলোনিতে 'অলচিকি' দ্বারা শিক্ষণ বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষালয় রয়েছে। এই গ্রামে কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা তাঁদের নিজেদের প্রচেষ্টায় সপ্তাহে ৩/৪ দিন বিরহড় কলোনিতে এসে লেখাপড়া করান।

৭) বেড়সা গ্রামের বিরহড়দেরকে পর্যবেক্ষণ করে গবেষক দেখেছেন যে বিরহড়রা প্রাচীন পরম্পরাগত ওষধি ব্যবহার করেন রোগনিরাময়ের জন্য - যেমন জ্বর, সর্দিকাশি, পেটে ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, অর্শ, হাঁপানি ইত্যাদি। গবেষক বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে এই গ্রামে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, তাই আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের জন্য বলরামপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা বাঘমুণ্ডী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। বিরহড়রা তাঁদের পরম্পরাগত চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে রোগনিরাময় করে থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

৪.৪.৪ উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য (Information Gained from Open Interview)

পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের বেড়সা গ্রামে বিরহড় আদিবাসীদের বসবাস। গবেষক বলরামপুর থেকে বেড়সা গ্রামে ই-রিকসা করে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার নির্জন পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে বিরহড় কলোনিতে পৌঁছে ছিলেন। গবেষক প্রথমে বিরহড় মোড়ল বা ন্যায়ার সাথে দেখা করে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং কোথা থেকে এসেছেন পরিচয় সেই দেন। ন্যায়া বা মোড়ল ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গবেষকের সাথে কথা বলতে থাকেন এবং সাক্ষাৎকার

পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। গবেষক জানতে পারেন যে এই গ্রামে ১২ টি বিরহড় পরিবার বসবাস করেন এই গ্রামে। তাঁদের প্রধান পেশা হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি এবং দড়ি তৈরি। এছাড়া কিছু জন বলরামপুর বাজারে মজুর হিসাবে কাজ করেন, কিছু মহিলা ও পুরুষরা চাষবাসের সাথে যুক্ত। তাঁদের বর একটা সমস্যা হল তাঁরা এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছেন। তাঁদের একটি বর সমস্যা হল জলের সমস্যা। তাঁরা যেহেতু পাহাড়ের শিরা অর্থাৎ পাহাড়ের ঢালে বসতি নির্মাণ করেছেন তাই সেখানে বর্ষার জল সংগ্রহ বা জল সংরক্ষণ না হওয়ার কারণে পানীয় জলের সমস্যা প্রখর হয়ে ওঠে। বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে এই গ্রামেই কিছুটা দূরে সাধারণ হিন্দুদের দ্বারা সরকারী কুঁয়ো থেকে জল নিতে দিত না। কারণ বিরহড়রা যেহেতু আদিবাসী তাই কুঁয়ো থেকে জল দেওয়া হতো না। গ্রীষ্মকালে চারপাশে পানীয় জলশূন্য হওয়ার কারণে নিজেদের জীবন বাঁচাবার জন্য সাঁওতাল এবং বিরহড়রা বিডিও, এসডিও, ডিএম এই কাছে আবেদন পত্র লেখেন। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে বিরহড় কলোনিতে কয়েকটি নলকূপ, এবং সৌরচালিত সাবমার্সাল ও জলের ট্যাঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে, বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন করে দেওয়া হয়েছে, পিভিটিজি তহবিল থেকে এবং আদিবাসী উন্নয়ন তহবিল থেকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। বিরহড়রা সাক্ষাৎকারে গবেষককে জানান যে জঙ্গল থেকে কোন জঙ্গল মাফিয়া, অ-আদিবাসী, বনদপ্তরের অফিসাররা বেআইনি ভাবে গাছ কাটে জঙ্গল ধ্বংস করতে আসে তখন বিরহড় সাঁওতাল যুবক যুবতীরা আন্দোলন করে ও রুখে দাঁড়ালে বিরহড়দের জেলে ভরার এবং মেরে ফেলার হুমকি আসে। তবে সাহসের সাথে তাঁরা বাধাদেন যাতে জঙ্গল ধ্বংস না হয়।

৪.৪.৫ গবেষকের দ্বারা তোলা বেড়সা গ্রামের বিশেষ ছবি:

PRA দ্বারা তথ্য সংগ্রহ, বেড়সা গ্রাম

বেড়সা গ্রামে বিরহড় কলোনি

সরকারের দেওয়া বিরহড়দের পাকা ঘর

বেড়সা গ্রামে বিরহড়ের দ্বারা দড়ি তৈরি

বেড়সা গ্রামে যাওয়ার নির্জন প্রবেশ পথ

বেড়সা গ্রামে বিরহড় কলোনি পর্যন্ত কংক্রিট ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ চলাকালীন

বিরহড়দের সম্প্রদায় হল (Community Hall)

বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের জন্য সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি চলাকালীন চিত্র

বিরহড় কলোনিতে মাটির বাড়ি ও গবাদি পশু

বেড়সা গ্রামে বিক্রয় ও জ্বালানির জন্য জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা শুকনো কাঠ

পানীয় জলের জন্য বিরহড়দেরকে সৌর চালিত সাবমার্সাল জলের ট্যাঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্য পুকুর-বিরহড়দের সাথে গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক

গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল শুকিয়ে যায়

বিরহড় কলোনিতে কিছু গাছপালা

বেড়সা গ্রামে বিরহড় কলোনিতে বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য ‘অলচিকি’ পাঠশালা

বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের ‘জাহের থান’

বিরহড় কলোনিতে বিরহড় যুবকদের সাথে গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক

বিরহড়দের সাথে গবেষক

বিরহড়দের সাথে গবেষক এবং তত্ত্বাবধায়ক

বলরামপুর ব্লকের বেড়সা গ্রামে বেড়সা প্রাথমিক বিদ্যালয়

বেড়সা গ্রামে প্রাথমিক স্কুলের পাশে কুঁয়ো

কাঁনা পাহাড়ের পাশ দিয়ে বেড়সা গ্রামের প্রবেশ পথ

পঞ্চম অধ্যায়

বিরহড়দের সমাজ ব্যবস্থা

(Social System of Birhors)

৫.১ ভারতে বিরহড়দের সম্বন্ধে একটি সাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমি (A General Historical Background of the Birhors in India):

এই অধ্যায়ে গবেষক তথ্য সংগ্রহকালে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন বিরহড় গ্রামে নিরন্তর যাতায়াত, অবস্থান, গ্রামবাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ–আলোচনা এবং বিরহড়দের সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তক ও গবেষণাপত্র পাঠ করে বিরহড়দের ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা, বিবাহ, সংস্কৃতি, ধর্মাচরন, শিকার, মৃতদেহের সৎকার ইত্যাদি বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা এখানে তুলে ধরা হল।

ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার, ছত্রিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গে আদিম অধিবাসী বিরহড় আদিবাসীকে পাওয়া যায়। এই সবকটি রাজ্যেই বিরহড়রা Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র পুরুলিয়া জেলায় বিরহড়রা বসবাস করেন। 'বির' শব্দটির অর্থ 'জঙ্গল' এবং 'হড়' শব্দটির অর্থ 'মানুষ'। সুতরাং 'বিরহড়' শব্দটির অর্থ হল 'জঙ্গলের মানুষ' বা 'বন্য সন্তান'। বিরহড়রা পূর্বে যাযাবর গোষ্ঠী ভুক্ত ছিলেন। এদের কোন স্থায়ী ঘরবাড়ি, বাসস্থান ছিল না এবং দল বেঁধে জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। জঙ্গলে কোন এক প্রান্তে তাঁরা জঙ্গলের লতাপাতা দিয়ে সাময়িক ছাউনি করে তার মধ্যে বসবাস করতেন।

ইংরেজ আমলে এবং তারও পূর্ব থেকে ঝাড়খণ্ডে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিরহড়রা যাযাবরের ন্যায় জঙ্গলে বাস করত। ঐ সময় কালে বিরহড়রা নরমাংস খেত (Dalton, 1872) [১৮৫৭-১৮৭৫ সাল পর্যন্ত Dalton ছোটনাগপুর মালভূমি ডিভিশনে কমিশনার পদে ছিলেন।] Dalton লিখেছেন, "With murch trouble some Birhors were caught and brought to me. They were wretched-looking objects, but had more the appeared of the most object on of one of those degraded castes of the Hindus, the domes or pariahs, to who must flesh in food, them of hill people. Assuring me that they had themselves given up the practice, they admitted that they are fathers were in the habit of disposing of the dead in the mamer indicated, viz., by feasting on the bodies: but they declared they never shortened life to provide such feast. And shank with horror at the idea of any bodies but those of their own blood-relations being surved upto them!" ঐ সময়ে যশপুরের রাজাও ডালটনকে বলেছিলেন যে তিনি শুনেছেন, যখন কোন বয়স্ক বিরহড় ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না, মৃত্যু আসন্ন, তখন তিনি তাঁর নিকট রক্ত সম্পর্কের বিরহড়দের আহ্বান করতেন যে তাঁরা যেন তাকে হত্যা করে তাঁর মাংস খায় এবং তাঁদের ক্ষুধার নৃবৃত্তি ঘটায়। যদিও যশপুরের রাজা একথাও বলেছিলেন যে তাঁর কাছে যে সকল বিরহড়কে আনা হয়েছিল তাঁরা কেউ নরমাংস খাওয়ার কথা স্বীকার করেনি।

১৮২৪ সাল থেকে ১৮২৫ সালে Mr. Henry Paddington যখন পালামৌর দক্ষিণ অঞ্চলে কফির চারা বসানোর কাজে সরকারের থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন সেই সময়ে তিনি দু'জন বিরহড় যাযাবর গোষ্ঠীকে পান। তাঁর কাছে কাজ করতে আসা ওঁরাও (ধাঙ্গর) এবং মুণ্ডাভাষী (কোল) শ্রমিকরা দু'জন বিরহড়কে এনেছিলেন এবং পরিচয় দিয়েছিলেন 'Monkey People' অর্থাৎ 'Bandarlok' বলে। ঐ সময়ে ঐ স্থানে থাকা অন্যান্য আদিবাসীরা দল বেঁধে

ঐ দু'জন বিরহড়কে দেখতে আসত। তাঁদেরকে দেখতে অনেকটা বড় আকৃতির বানর বলে Paddington এর মনে হয়েছিল।

Paddington– এর বর্ণনায় ঐ দু'জন বিরহড়ের চেহারা ছিল দৈর্ঘ্যে ছোট আকৃতির, নাকটি চ্যাপ্টা, মুখে এবং গালে অসংখ্য চামড়ার ভাঁজ, হাত দুটি অস্বাভাবিক ভাবে বড়, সারা গায়ে গাঢ় কালো রঙের চামড়ার উপর লালচে রঙের লোম। অন্ধকারে কোন গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁদের ওরাং ওটাং বলেভ্রম হবে। মহিলাটিকে একইরকম ভাবে দেখতে। ওঁরাও বা ধাঙ্গরদের তুলনায় চেহারায় তারা এতটাই পৃথক যে তাঁদের পৃথক কোন প্রজাতি বলে ভাবা অসম্ভব ছিল। এই আদিম বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষ দুইটি নিজস্ব ভাষায় কথা বলত, যদিও ওঁরাও বা ধাঙ্গররা তাঁদের ভাষা বুঝতে অসমর্থ ছিল। Paddington অনেক পরিশ্রম করে বার করেন যে এই বিরহড়রা সেই সময়ে পালামৌয়ের দক্ষিণ দিকে গভীর জঙ্গলে বাস করছিল। তিনি আরও খোঁজ করে দেখেন যে ঐ সময়ে তাঁরা পালামৌ জেলার চাঁদোয়া ও বেলুড়মঠ অঞ্চলে এবং হাজারীবাগ, রাঁচি জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জঙ্গলে এবং দক্ষিণ সিংভূম জেলার জঙ্গলে তাদের অস্তিত্ব ছিল।

১৮৬৮ সালে Captian Deprec যখন ছোটনাগপুর অঞ্চলে ভূ-সংস্থানগত সমীক্ষা করেছিলেন তখন লক্ষ করেন যে কিছু বিরহড় মানুষ ছোটনাগপুর জঙ্গল ছেড়ে আসামের চা বাগানে কাজ পাবার আসায় স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে চলে গেছেন। ১৮৭২ সালে L.R. Forbes (I.C.S) ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের পালামৌ মহকুমায় Settlement Officer এবং অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার হিসাবে কার্যরত থাকা কালে বিরহড়দের সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন। Forbes-এর কথায় বিরহড়রা আসলেই মুণ্ডা গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী মুণ্ডারি এবং সাঁওতালী এই

দুইটি ভাষা মিশ্রণে বিরহড়দের নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়েছে, যদিও তাঁরা উল্লিখিত দুইটি ভাষা থেকে পৃথক। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্যতম আদিম আদিবাসী বিরহড়রা যদিও পালামৌ এবং হাজারীবাগ জঙ্গলে এদেরকে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। প্রকৃতিগতভাবে বন্য স্বভাবের হলেও এরা ক্ষতিকারক নয় বা কারোর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। উচ্চ পাহাড়ে এবং পাহাড়ের শিরাগুলিতে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে এরা বসবাস করে। চাষবাস তারা জানত না, এরা লাঙলে হাত দেয় না এবং কেউ লাঙ্গল স্পর্শ করলে নিজেদের থেকে গোষ্ঠীচূত করেন। বাণিজ্য সম্পদ যেমন গাছের ডাল, শাকপাতা, ফলমূল, পাখি এবং বানরের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকতেন, এরা অনেকেই বানর ধরে পোষ মানায় এবং বানরকে নাচতে শেখায়, এরা বিভিন্ন পরবে কোল আদিবাসীদের ন্যায় বাঁশি, বানাম, ঢোলগ ও ধামসা-মাদল বাজায়। এদের গায়ের রং অত্যন্ত কালো, বেঁটে চেহারা, পুরুষ এবং মহিলাদের মাথায় বড় চুল যা প্রায়শ মুখকে ঢেকে রাখে। অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের কারণে এরা অন্য কোন মানুষকে দেখলে সেই স্থান ত্যাগ করে, যেন ভয়াত্ত হরিণ। জঙ্গলে তাঁদের পছন্দের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা অন্য জঙ্গলে যায় না। অন্য জঙ্গলে যাওয়ার আগে তারা কয়েকজনকে পাঠায় পরিচিত জঙ্গলে তাদের জন্য তাদের কয়েক বছরের জীবন যাপনের যথেষ্ট খাদ্য মজুত রয়েছে কি না। ৪০-৫০ কিলোমিটার দূরে কোন গভীর পাহাড়ি জঙ্গলে এরা খাবারের সন্ধানে নিজেদের বাসভূমিকে তুলে নিয়ে যান। এরা একত্রে বহুজন বাস করেন না, সম্ভবত খাদ্যের যথেষ্ট সংস্থান এক স্থানে না পাওয়ার কারনে। সাধারণত তিন-চারটি পরিবার একত্রে একটি পাহাড় বা শৈলশিরাতে বসবাস করেন। বাঁশ এবং জঙ্গলের গাছের পাতা দিয়ে তৈরি ছাউনি ঘরে এরা বসবাস করেন, এই ছোট কুঁড়ে ঘরগুলিতে মাত্র একজোড়া দম্পত্তি বসবাস করে, সাথে বড় ছেলে মেয়েগুলি নিকট অন্য কুঁড়ে ঘরে থাকে। ছেলে এবং মেয়েরা বিয়ের আগে একটি ঘরে থাকে এবং সমস্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে

বিয়ের ব্যাপারে সংযত অর্থাৎ বিরহড় ছাড়া অন্য গোষ্ঠীকে বিয়ে করে না। যখন একজোড়া ছেলে মেয়ে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন উভয় পরিবারের বড়রা তাদের সমস্ত খাবার একত্রিত করে আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। ঘরে ঢোকার দিক সবসময় পূর্ব দিক থাকে, এছাড়াও ছাউনি এতটা বড় থাকে যে ঘরের মধ্যে জল পরেনা, ঘরগুলি মাটি থেকে দুই ফুট উচ্চতা, এবং ঘরগুলি মোটামটি ছয় বর্গফুট আয়তনের হয়। খেঁজুর পাতার চাটাইতে এরা ঘুমায়। এদের বাড়িগুলিকে বলে 'টাণ্ডা' এবং গ্রামগুলিকে বলে 'জাঘি'।

মনে করা হয় বিরহড়রা সাধারণত চাষবাস জানত না তবে ১৮৬৮ সাল নাগাদ কিছু বিরহড় আসাম এবং কাছাকাছি চা বাগানে কাজ করতে গিয়েছিল। সুতরাং চা বাগানে অন্যান্য উপজাতি এবং সাধারণ জাতির মানুষদের সান্নিধ্যে এদের আসার সুযোগ হয়েছিল।

Forbes-এর রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে বিরহড়দের জীবিকা হিসাবে জঙ্গল থেকে বন্য শূকর, খরগোশ, বনমোরগ, পাখি, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি শিকার করত। জঙ্গল থেকে শক্ত লতা সংগ্রহ করে পাকদিয়ে শক্ত দড়ি তৈরি করত। জঙ্গল থেকে মধু ও মোম সংগ্রহ করত। কাঁধে ভার বইবার জন্য বড় লাঠি, শিকা তৈরি করত এবং এইভাবে এরা জীবনযাপন করত। পুরুষ এবং মহিলারা বিশেষত মহিলারা সুন্দরভাবে জামাকাপড় পরে এবং বুক, হাত এবং হাঁটুতে ট্যাটু করত, মুখে কখনই ট্যাটু করে না।

বিরহড়দের পরিবারে বাচ্চা জন্মের পরে মা এবং নবজাতক কুঁড়ে ঘরে ৬ দিন থাকে, ঐ ৬ দিন মা কোন খাবার খায় না কেবলমাত্র কিছু ওষুধগুলি খায়, ৬ দিন পরে নবজাতককে টাণ্ডার পেছনে বিশেষ দরজা দিয়ে বাইরে বের করে আনা হয়। এর কারণ হিসাবে মনে করা হয় যে এতে বাচ্চাটিকে সাপে কাটবে না এবং বাঘে খাবে না।

বিরহড়দের পরিবারে কোন সদস্য মারা গেলে মৃত দেহকে এরা পোড়ায়। এরা অশৌচ পালন করে, এরা ১০ দিন এই সময় কেউ চুল দাড়ি কাটে না। অশৌচ শেষ হলে এরা ছোট অনুষ্ঠান করে প্রতিবেশী সকলে খাওয়া দাওয়া করে ধর্মীয় ভাবে হিন্দু ধর্মকে পালন করে। এরা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় দেবদেবীর পূজা করে এদের মতে দেবতাদের তুলনায় দেবী এবং তাঁর কন্যাদের স্থান অনেক উপরে। যেমন দেবী হলেন আদিতে সৃষ্টির কর্তিত এবং ধ্বংসেরও কারণ। এরা ভূত ও প্রেত পূজা করে, যেমন বিরুভূত, বিরু আবার খরিয়াদের দেবতা। এরা দেবী মহামায়া, বুড়িমা এবং কন্যাদের পূজা করেন। বাড়ি (টাণ্ডা) পূর্ব পশ্চিম দিকে লাল রং দিয়ে দেবীর চিত্র এঁকে রাখে। এদের বিশ্বাস দেবী এবং হনুমান বিরহড়দের সমস্ত খারাপ শক্তি সাপ, বাঘ, অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করে। S.C Ray লিখেছেন যে "The people with home they [Birhor] the exchange commodities are all Hindus handiest, so is no surprising that they should take up Hindus notions".

৫.২.১ বিরহড়দের জীবনচর্চা (Life of the Birhors):

৫.২.১.১ বিরহড়দের আদি বাসস্থান (Native Abode of the Birhors):

ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড় এবং জঙ্গল ঘেরা উচ্চস্থানগুলিতে বিরহড়দের আদিবাসস্থান বলে জানা গেছে, এরা যদিও মূলত আধা যাযাবর প্রকৃতির কিন্তু এদের মধ্যে কোন কোন দল অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী ও সর্বসাধারনের কাছাকাছি থাকার ফলে যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে আধুনিক মানুষদের ন্যায় চাষবাসে সমসংযোগ করেছে। জঙ্গলে বসবাসকারী বিরহড়রা অত্যন্ত দরিদ্র। জঙ্গলের পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের কুঁড়েঘরগুলি তৈরি করত। এদের ঘরগুলি লম্বা ৮-১০ ফুট, চওড়া ৬ ফুট এবং উচ্চতা ৬ ফুট, দরজার উচ্চতা ২ ফুট, প্রস্থে ১.৫ ফুট, ঘরগুলি প্রায় গোলাকারে তৈরি হয় এবং দরজা বৃত্তের ভেতরে দিকে থাকে। এর রূপ

গোলাকারে থাকা অনেকগুলি ঘরে কেন্দ্রীয় স্থানটি উপযুক্ত বা খোলা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। এর খোলা স্থানে বিরহড়রা চাঁদনী রাতে একত্রে বসে গল্পগুজব এবং নাচ-গান করে। কলারিয়ান আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে বিরহড়দের দৈহিক গঠন হল- তাঁরা দৈর্ঘ্য খাটো, গায়ের রং কালো এবং এরা অত্যন্ত নোংরা থাকে, মাথার চুল কাটে না, অস্ত্র হিসাবে এদের হাতে থাকে ছোট ছোট কুড়াল। জঙ্গল থেকে এরা দড়ি তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের লতা, মধু, রেশম ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। কাঠের তৈরি পাত্রে এরা বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখে। এদের প্রধান বাসস্থান দামোদর নদীর উত্তর দিকের হাজারীবাগ জেলার উত্তর দিকের মালভূমির জঙ্গলে। এদের মধ্যে কিছু জন পূর্ব দিকে মানভূম জেলার এবং পশ্চিম দিকে সিংভূম জেলার দক্ষিণে ছড়িয়ে রয়েছে। আর কিছু কিছু বিরহড় গোষ্ঠী উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমে রাঁচি জেলায় এবং পালামৌ জেলার পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

৫.২.১.২ বাসস্থানের উদ্ভিদ এবং প্রাণিজ সম্পদ (Habitat Flora and Fauna Resources):

সাধারণত গভীর জঙ্গলে উঁচু পাহাড়ে এবং পর্বত শিরাতে এদের টাণ্ডায় (Tandas) বাসস্থান। এই সমস্ত জঙ্গলে শাল (Shorea robusta), গামার (Gomelina arborea), বিভিন্ন ধরনের জঙ্গলের ফল গাছ যেমন– জামুন (Eugenia jambolena), বেয়ার (Zizyphus jujuba), মহুয়া (Bassia latifolia), বিভিন্ন ধরনের কন্দ, বাঁশ, লতানো গাছ যেমন- চপ (Bauhinia scandens), পিয়াল (Buchania latifolia), ইত্যাদি গাছ সমৃদ্ধ জঙ্গলে এদের বসবাস। তাই স্বাভাবিক ভাবে এরা যথেষ্ট পরিমানে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন না।

যে সমস্ত প্রাণীর মাংস এরা খেতো সেগুলি হল- বন্য শূকর, বন্য মোরগ, হরিণ, খরগোস, ইঁদুর, বানর, সজারু ইত্যাদি। এই সকল জঙ্গলে যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে সেগুলি হল -

চিতাবাঘ, হায়না, ভালুক, শিয়াল, নীল গাই ইত্যাদি। কোথাও কোথাও পাখির মধ্যে ময়ূর, পায়রা, চড়াই, তোতাপাখি, তিতির পাখি, বালিহাঁস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গভীর জঙ্গলে পশুপাখিদের সান্নিদ্ধ্যে থাকার কারণে এরা পশুপাখিদের কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করে তাদেরকে শিকার করে। জঙ্গল ভিত্তিক জীবনযাপন করায় এরা জঙ্গলের ওষধি গাছগাছড়া সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

৫.২.১.৩ বিরহড়দের বাসস্থানের আবহাওয়া (Weather of the Habitat of the Birhors):

বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পুরুলিয়ার মধ্যে বিস্তৃত ছোটনাগপুর মালভূমির যে সকল অঞ্চলে এরা বসবাস করেন সেই স্থানের আবহাওয়া অত্যন্ত রুক্ষ প্রকৃতির। গ্রীষ্মকালে ঐ সকল অঞ্চলের আবহাওয়ার তাপমাত্র ১১০° ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে এবং শীতকালে তাপমাত্রা নামে প্রায় ৪০° ডিগ্রি তে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত গড়ে ৫০-৬৫ সেমি। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে এবং জঙ্গলের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সময়ে বিরহড়রা টাণ্ডার বাইরে বিশেষ যেতে পারে না ফলে সামান্য যে শুকনো খাবার, শুকনো মহুয়া ফুল, কিছু খাদ্য যোগ্য পাতা, কন্দ ইত্যাদি টাণ্ডার মধ্যে জমানো থাকে তা দিয়েই এঁরা বর্ষাকালে জীবনযাপন করেন। জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা মধু, মোম, লতা থেকে তৈরি দড়ি, কাঠের পাত্র ইত্যাদি নিকটের গ্রামগুলিতে বিক্রি করে। এরা এই সময় খাবার সংগ্রহ করে। সুতরাং আবহাওয়ার সঙ্গে জড়িত উদ্ভিদ-প্রাণী ইত্যাদি বিরহড়দের জীবনযাত্রাকে, পেশাকে, সংস্কৃতিকে এবং সামাজিক গঠনকে প্রভাবিত করে ।

৫.২.১.৪ বিরহড়দের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Birhors):

বিরহড় আদিবাসী মানুষরা গভীর জঙ্গলে শিকারের উপর জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। যদিও শিকার তাঁদের প্রধান জীবিকা তবুও তাঁদের জীবিকার পরিবর্তনের কারণে তাঁদেরকে দুইটি

প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। (১) যাযাবর (Uthlus or Bhuliyas), (২) স্থায়ী বাসিন্দা (Jaghis or Thanias)। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বাকি সময়গুলিতে যাযাবর প্রকৃতির বিরহড়রা ছোট ছোট দলে তাঁদের পরিবার, অল্প জিনিসপত্র ইত্যাদিকে ঝুড়িতে চাপিয়ে নিয়ে খাবারের সন্ধানে এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এরা জাল দিয়ে এবং ছোট কুঠার দিয়ে শিকার করেন তাই ঝুড়িতে থাকে শিকার ধরার জাল এবং কুঠার। মহিলারা খেজুর পাতার চাটাই এবং কাঠের পেশাই করার হামান দিস্তা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে চলে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে তাঁদের ঝুড়িতে শুকনো মহুয়া ফুল, বিভিন্ন শস্যদানা ইত্যাদি বহন করে। মেয়েরা মাটির হাড়ি (রান্নার কাজে ব্যবহৃত) এবং মাটির কলসি (জল আনতে এবং সঞ্চয় করে রাখতে) বহন করে। কেবলমাত্র বর্ষার সময় (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস) তারা একটি স্থানে টাণ্ডাতে থাকতে বাধ্য হয়। বাকি সারাবছর তারা এক একটি স্থানে এক থেকে দুই সপ্তাহ বসবাস করে নিকটবর্তী জঙ্গলে শিকার করে এবং উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে। সপ্তাহ দুই পরে এরা আবার অন্য জঙ্গলে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে টাণ্ডা তৈরি করে। প্রায় দুই বছর এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে তারা আবার পূর্বের স্থানে একই পথে বা ভিন্ন পথে ফিরে আসে।

স্থায়ী বাসিন্দারা এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন তাই তারা উচ্চপাহাড়ে অথবা গভীর জঙ্গলে অথবা পাহাড় শিরায় স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করেন। এই ধরনের বিরহড়রা জঙ্গলের কোন একটি স্থানকে বা পাহাড়ে কোন সমতল ভূমিকে পরিষ্কার করে চাষযোগ্য জমিতে রুপান্তর করে চাষাবাদ করেন। তবে এদের বেশির ভাগেরই জমি থাকে না, তাই পশু শিকার, মধু সংগ্রহ, মৌচাকের মোম সংগ্রহ, উদ্ভিদজাত খাবার সংগ্রহ, জঙ্গলে লতা থেকে দড়ি তৈরি ও বিক্রি ইত্যাদির উপর জীবন এবং জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। স্থানীয় ভূ-স্বামী, জমিদারের খারাপ ব্যবহার বা অত্যাচার, নিকট গ্রামের অন্যান্য আদিবাসী এবং অ-

আদিবাসীদের সঙ্গে বিবাদ এমনকি নিকটে জঙ্গলে প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব, দড়ি তৈরির লতার অভাব হলে এরা বসতি ত্যাগ করে অন্যত্র দূরের কোন জঙ্গলে চলে যায়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যাযাবর বিরহড় যুবক স্থায়ী বসতিতে অভস্থ বিরহড় মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরের টাণ্ডার নিকট নিজের স্থায়ী বসতি তৈরি করেছেন এবং যাযাবরের জীবন ত্যাগ করেছেন। যাযাবর প্রকৃতির বিরহড়রা তাঁদের ছেলে মেয়েদের স্থায়ী বসতি বিরহড়দের সঙ্গে বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থায়ী বসতি বিরহড়রা প্রায়শ অন্যান্য হিন্দু ধর্মাবলম্বি আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী হিন্দুদের স্পর্শে আসায় তাঁদের আদিম প্রথা এবং নিজস্ব রীতিনীতিগুলিকে হারিয়ে ফেলেছে, পক্ষান্তরে হিন্দু প্রথা এবং রীতিনীতিকে গ্রহণ করেছে। স্থায়ী বসতি কোন কোন বিরহড় পরিবার তাঁদের কুঁড়ে ঘড়ে মাটির দেওয়াল দিয়ে থাকে এমনকি একটি ভিন্ন কুঁড়েতে ছাগল, মোরগ ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা। এদেরই কোন কোন দলের মধ্যে একটি পৃথক ছোট কুঁড়েঘর থাকে একে বলে 'চুকুম্বা' (Chu'kumba)। এটি আত্মার কুঁড়েঘর 'বোঙ্গা-কুম্ভা' (Bonga-Kumba) নামে পরিচিত। এই কুঁড়েঘরের মধ্যে কখনও কখনও একটি বোঙ্গা পেটি বা Spirit Box থাকে এটি বাঁশের তৈরি বাক্স, এর মধ্যে বিভিন্ন পূজার দ্রব্য থাকে। কোন কোন বিরহড় আদিবাসীর স্থায়ী বাসস্থানের নিকট একটি 'থান' (পবিত্র স্থান) বা আত্মার স্থান থাকে। এখানে কিছু কাদামাটি পাথর খণ্ড কাঠের খণ্ড ইত্যাদিকে তাঁদের দেবতার বিগ্রহ রুপে রাখা থাকে। বিরহড়রা এই সকল পবিত্র স্থানে ভাত, মিষ্টি, মাংস ইত্যাদি দেবতাকে উৎসর্গ করেন। প্রায় প্রতিটি স্থায়ী বিরহড়দের বাসস্থানের নিকট 'বনাঞ্চলের একটি পবিত্র স্থান' (Sacred Groves) বা বিরহড়দের ভাষায় 'Jaher' বা জাহের বা জিলু জাহের থাকে যেখানে কিছু গাছ ও পাথরের খণ্ড থাকে। এই স্থানে 'সিন্দ্রা বোঙ্গা' (Sendra Bongas) বা Spirit বা আত্মা বাস করেন।

বিরহড়রা শিকারে যাবার পূর্বে এখানে তাঁদের শিকারেরজাল এবং শিকারের অস্ত্র রাখে এবং দেবতার উদ্দেশ্যে মোরগ উৎসর্গ করেন। এদের বাড়িতে কোন বেড়া লাগানো থাকে না, পাড়ার শেষপ্রান্তে একটি ছোট কুঁড়েঘরে অবিবাহিত যুবকরা একত্রে ঘুমায় একে বলে 'গিতিঃ ওরাঃ' (Bachelors Dormitories or Sleeping Hat)। একই ভাবে সামান্য দূরে আর একটি কুঁড়েঘরে অবিবাহিত মেয়েরা একজন বৃদ্ধা বিধবার সঙ্গে ঘুমায়। আপাত ভাবে যদিও মনে হয় যে বিরহড় যুবক যুবতীরা যথেষ্ট সামাজিক নিয়ম কানুন এবং সংযমের মধ্যে থাকে কিন্তু বাস্তবে এদের নৈতিকতার মধ্যেও কিছু খামতি দেখা যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বসবাস বিরহড় আদিবাসীকে দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণ ভাবে বিভিন্ন টাণ্ডার বিরহড়দের কোন ভাষা এবং সামাজিক প্রথা একই প্রকারের হলেও তাঁদের প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনের প্রথা ভিন্ন ভিন্ন টাণ্ডাতে পৃথক এবং এদের ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়।

৫.২.১.৫ বিরহড়দের প্রাত্যহিক জীবন (Daily life of the Birhors):

ভোরে মোরগ ডাকার সাথে সাথে বিরহড় পুরুষরা বিছানা ছেড়ে বাইরে আসে, জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা গাছের ছাল (Bohunia seandens) এবং 'চিহরলতা' ইত্যাদি দিয়ে জলে ভিজিয়ে পাকদিয়ে দড়ি তৈরি করে। 'ছুটিলি' নামক এক প্রকার লাঠি দিয়ে দড়িতে পাকদেয় এবং দড়িকে শক্ত করে। মহিলারা কিছুক্ষণ পরে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠে আসে এবং পুরুষদের দড়ি তৈরিতে সহযোগিতা করেন। সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মহিলারা গৃহ কর্মে যায় এবং পুরুষরা দড়িকে মসৃণ করে একটি চেরা কাঠের সাহায্যে। এরপর পুরুষরা ঐ দড়ি দিয়ে জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখার জিনিস, শিকার করার দড়ি এবং গরু, মোষ, ছাগল

ইত্যাদি বাঁধার জন্য বিশেষ ধরনের দড়ি তৈরি করেন। সকাল ৮ টা পর্যন্ত পুরুষরা দড়ি তৈরী করেন তারপর গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাঝে ও মুখ ধোয়। সকালে সকলে মিলে সেদ্ধ ভাত, পান্তা ভাত অথবা মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খায়। বহু পূর্বে পুরুষ ও মহিলা কেউ প্রতিদিন স্নান করতেন না, সপ্তাহে ১ থেকে ২ বার স্নান করতেন মাত্র। তবে বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার বিরহড়রা সকলেই প্রত্যেকদিন স্নান করার চেষ্টা করেন। সপ্তাহে একবার অথবা বিশেষ কোন উৎসবের সময় এরা কাপড় ধোয়, যদিও এদের পরার মত যথেষ্ট কাপর থাকে না। মেয়েরা চওড়া লেহেঙ্গা পড়ে এবং ছেলেরা ধূতি পরে। সকালে খাবারের পর পুরুষরা জঙ্গলে যায় জ্বালানি কাঠ, এবং দড়ি তৈরির জন্য গাছের ছাল ও লতা আনতে। এই সময় তাঁরা জঙ্গলে মধু ও মৌচাকের মোম সংগ্রহ করেন। মহিলা তাঁদের কুঁড়েঘরটি পরিষ্কার করে সামান্য বাসন এবং নিকটে কোন ঝর্ণা এবং হ্রদ থেকে জল সংগ্রহ করে আনেন। এরপর মহিলারাও জঙ্গলে যায় মহুয়া ফুল, শাকপাতা, কন্দ, ফলমূল ইত্যাদি সংগ্রহ করতে। কোন কোন দিন মহিলারা নিকটে গ্রামে যায় দড়ি, শিকা ইত্যাদি বিক্রি করতে। কোন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে একজন স্ত্রী দড়ি পাকানো এবং শিকা তৈরির কাজ করেন। ১০-১১ বছর বয়সের আগে থেকে ছেলে মেয়েরা বাবা মাকে শিকা তৈরিতে সাহায্য করে। যেদিন পুরুষ শিকারে ব্যর্থ হয় বা মহিলা দড়ি তৈরি ও বিক্রি করে খাবার আনতে পারেন না সে দিন জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা কন্দ বা মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খায়।

বিরহড়রা সামান্য কিছু হাতের কাজ করতে পারেন যেমন কাঠ দিয়ে তৈরি বাসন, দড়ি দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র ইত্যাদি। বেঁচে থাকার জন্য ঐগুলিকে বিক্রি করে এরা লোহার যন্ত্রপাতি, টিনের গয়না, কুঠার, মাটির হাড়ি, কলসি, লবন ইত্যাদি সংগ্রহ করে। অল্পক্ষেত্রে বর্ষাকালে বিরহড় মহিলারা পাশাপাশি গ্রামের জমিতে অন্যান্য আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে কাজ করেন।

৫.২.১.৬ বিরহড়দের শারীরিক গঠন ও ভাষা (Physical Structure and Language of the Birhors):

নৃতাত্ত্বিকভাবে বিরহড়দের গায়ের রং ঘন কালো (Melanous), দীর্ঘ ছোট (Dwarf), বড় মাথা (Dolicocephalic), ঢেউ খেলানো কুঁচকানো চুল (Cymotrichous), এবং চ্যাপ্টা নাক (Platyrrhine), তাই বিরহড়দের সঙ্গে শারীরিক গঠনে মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ, হো প্রভৃতি আদিবাসীদের মিল রয়েছে। বিরহড়দের ভাষাকে 'বিরহড়' বলে, এই বিরহড় ভাষা অনেক প্রাচীন একটি ভাষা। বিরহড় ভাষা কথ্য রূপ মুণ্ডারি ভাষার সঙ্গে অধিক সদৃশ, তুলনায় সাঁওতাল ভাষার সঙ্গে কিছু শব্দগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রাঁচিতে বহু মুণ্ডাই বিরহড়দের বিরমুণ্ডা অথবা জঙ্গলমুণ্ডা বলে পরিচিত। কিন্তু বিরহড়রা মনে করেন যে তাঁরা গোত্রের দিক থেকে মুণ্ডাদের তুলনায় সাঁওতালদের অনেক কাছের এবং ভাষাগত মিল রয়েছে। তাঁরা সাঁওতাল ভাষা বুঝতে পারেন। রাঁচি অঞ্চলের বিরহড়রা যে ভাষায় কথা বলেন তা সাঁওতাল ভাষায় তুলনায় মুণ্ডারি ভাষার অনেকটা কাছাকাছি।

৫.২.১.৭ বিরহড়দের সমাজ ব্যবস্থা এবং শিকার পদ্ধতি (Social System and Hunting Method of the Birhors):

ক) সমাজ ব্যবস্থা (Social System):

বিরহড়রা আদিম আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ এদের সমাজ ব্যবস্থা খুবই প্রাচীন। মোটামুটিভাবে এদের সমাজকে আমরা দুইটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। সমাজের একটি অংশ খাবার খোঁজার দায়িত্বে থাকেন এবং অপর অংশটি বিবাহ এবং বন্ধুত্ব সম্পর্ক রক্ষার কাজে জড়িত থাকে। সাধারণভাবে বিরহড় আদিবাসী পরিবারগুলি প্রায় বিচ্ছিন্নভাবেই খাদ্যের জন্য এবং অন্যের সঙ্গে জঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে অথবা একটি জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ান।

এক একটি পরিবার গোষ্ঠীতে তিন/চারটি থেকে নয়/দশটি সদস্য একটি পরিবারে একত্রিত থাকেন। এই পরিবার গোষ্ঠীগুলি খাবারের প্রয়োজনে যেমন জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বা নিকট বা দূরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তেমনি অনেক সময় জঙ্গল লাগোয়া উচ্চভূমিতেও এদের বসবাস করতে দেখা যায়। একত্রে কয়েকটি পরিবার নিয়ে বিরহড়দের যে জনপদ তৈরি হয় তাকে 'টাণ্ডা' (Tanda) বলে। প্রতিটি টাণ্ডার একটি করে প্রধান বা মাঝি থাকে, টাণ্ডার পরিবারগুলি তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান হিসাবে নির্বাচন করেন। বিরহড়রা তাঁদের এই নির্বাচিত প্রধানকে বলে 'ন্যায়া' বা 'ন্যায়কে' (Naya or Nayke)। ন্যায়া বা টাণ্ডার প্রধান টাণ্ডার সকল ধর্ম কর্মের পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করে, যদিও বিরহড়রা মনে করেন যে তাঁদের প্রধান একজন ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা। ন্যায়া ইচ্ছা করলে খারাপ আত্মাগুলিকে একাই তাড়িয়ে দিতে পারে যাতে করে টাণ্ডার মধ্যে থাকা বিরহড়দের কোন বিপদ বা ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ টাণ্ডায় অন্তর্ভুক্ত বিরহড়দের সৌভাগ্য আনতে ন্যায়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন টাণ্ডাতে ন্যায়াকে মালিকও বলে, ন্যায়ার মৃত্যু হলে তাঁর মনোনীত একজন পরবর্তী ন্যায়ার পথ গ্রহণ করেন। ন্যায়ার মৃত্যুর পর আধি ভৌতিক পদ্ধতিতে 'Medium' এর মাধ্যমে বিরহড়রা নিশ্চিত হন ন্যায়া কাকে পরবর্তী প্রধানের জন্য নির্বাচন করেছেন। তবে ন্যায়ার মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে টাণ্ডার পরবর্তী ন্যায়া নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ন্যায়া পদটি মোটামটি ভাবে বংশগত।

খ) শিকার পদ্ধতি (Hunting Method):

নতুন ন্যায়া নির্বাচন হলে ঐ ন্যায়াকে প্রথমেই নিকটবর্তী কোনো ঝর্ণা বা হ্রদে স্নান করে এসে শিকারের জাল (Jilu Jayar) যেখানে স্তূপ করে রাখা আছে সেখানে স্পর্শ করতে হয়। নতুন

ন্যায়া এবার আত্মার উদ্দেশ্যে ভাত উৎসর্গ করেন এবং টাণ্ডার পুরুষেরা দলবদ্ধভাবে জঙ্গলে শিকার করতে বের হয়, যে তাঁদের ন্যায়া নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা। ঐ দিন শিকার মিললে টাণ্ডাতে আনন্দ ছড়িয়ে যায়। কিন্তু শিকার না পাওয়া গেলে ন্যায়াকে জবাবদিহি করতে হয়। সুতুরাং নতুন ন্যায়া আত্মার উদ্দেশ্যে অন্য উৎসর্গের উপর শিকার দলের সাফল্য নির্ভর করেন। ঐ দিন শিকারে যা পাওয়া যায়, তাঁর ঘার (khandi) এবং পিছনের দিকে মাংসের অর্ধেকের ন্যায়া ভাগ হিসাবে পায়। শিকার করা প্রাণীর দেহের পিছনের মাংসকে 'Bisi' বলে। ন্যায়া যে ক্ষেত্রে শিকারে যোগ দেয় সেখানে শিকারের প্রাপ্য ভাগ ছাড়াও ন্যায়ার ভাগ সে আলাদা পায়। শিকার করা মাংস বা পুরো শিকারটাই যে ক্ষেত্রে টাণ্ডার লোকেরা অন্যকে বিক্রি করে দেয় সেখানে ন্যায়া 'Bisi' এবং 'Khandi' এর মূল্য হিসাবে দুই আনা লাভ করেন।

ন্যায়া টাণ্ডার মধ্যে থেকে একজনকে 'Kotwar' বা 'Diguar' হিসাবে নির্বাচন করেন, যার কাজ হয় টাণ্ডার পুরুষদের ডেকে নিয়ে শিকারে যাওয়া, আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গের সময়ে ন্যায়ার নিকট উপস্থিত থাকা জরুরী। ন্যায়ার কাজে এই উৎসর্গের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। 'Kotwar' এবং 'Diguar' শিকারে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও শিকারে পাওয়া প্রাণীর মাংসের অন্যান্য শিকারিদের সমান ভাগ লাভ করেন।

টাণ্ডার মধ্যে ব্যক্তির মধ্যে যে ভর হয় তাকে বলে 'মাটি' (Mati)। ন্যায়া ও কোটয়ার থেকে মাটির কাজকর্ম পৃথক। টাণ্ডার মধ্যে কাউকে মাটি হিসাবে নির্বাচন করা হয় না বা নিয়োগ করা হয় না। সব টাণ্ডাতেই একজন মাটি নাও থাকতে পারেন, সে ক্ষেত্রে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী টাণ্ডার মাটিকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা হয়। সাধারণত যে ব্যক্তি স্নায়বিক ভাবে দুর্বল তাকেই মাটির দায়িত্ব নিতে পূর্বের কোন মাটির তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নিতে হয়, নির্দিষ্ট

কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়। খাদ্যের বিষয়ে মাটিকে কিছু নিয়ম মানতে হয় এবং তাকে আত্মাদের পূজা করতে হয় যাতে মাটি আত্মার নিকট থেকে শক্তি লাভ করেন এই রূপে শক্তি লাভ করা মাটির অন্তর্দৃষ্টি জেগে ওঠে বলে টাণ্ডার বিরহড়রা বিশ্বাস করেন।

টাণ্ডার সমস্ত সমর্থ পুরুষ একত্রে শিকারে যায় এবং শিকার থেকে প্রাপ্ত প্রাণীর মাংস সকলে সমান ভাবে ভাগ করে নেয়। কিন্তু টাণ্ডার অন্যান্য পরিবারগুলি স্বাধীন ভাবে নিজেরা জঙ্গল থেকে দড়ি তৈরির জন্য 'চিহরলতা' এবং অন্যান্য গাছের ছাল, মৌচাক থেকে মধু এবং মোম, ওষধি গাছ, খাদ্য যোগ্য ফলমূল ও কন্দ, শালপাতা, মাশরুম, মহুয়া ফুল ও সবজি, শাল বীজ, হরিতকী, বহেরা, আমলকী, কাজু ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। এছাড়াও জঙ্গল থেকে জ্বালানি আকাঠ, নিজেদের প্রয়োজনে সংগ্রহ করেন এমনকি দূরের গ্রামে শহরে বিক্রির জন্য সংগ্রহ করেন। চিহরলতা থেকে দড়ি তৈরি করে এরা দল্লা, শিকার ধরার জাল, গৃহস্থালি খাবার ঝোলানর শিকার তৈরি করে এবং বিক্রি করে। দড়ি তৈরির সময়ে প্রায়শ টাণ্ডার মাঝে ফাঁকা জায়গাতে এরা একত্রিত হয়ে বসে গল্প করতে করতে দড়ি তৈরি করে। বানর শিকারের জন্য এরা যে 'গারি-সেন্দ্রা' বা বিশেষ ধরনের জাল তৈরি করেন তা টাণ্ডার সকল সদস্য মিলে হাত লাগায়। বানর ধরতে যাওয়ায় এবং বানর শিকার করবার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে সমস্ত শিকারিকেই এই নিয়মগুলি অবশ্যই মেনে চলতে হয়।

বিভিন্ন টাণ্ডার সক্ষম সমর্থ পুরুষরা একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রতি বছর একত্রিত হয়ে দূরের কোন জঙ্গলে শিকারে যায় তাকে বলে 'দিসম সেন্দ্রা' বা 'দেশীয় খোঁজ'। সাধারণত বৈশাখ মাসে পূর্ণিমা তিথির আগে কোন রবিবার এই 'দিসম সেন্দ্রা' এই দেশীয় খোঁজ পূর্ব থেকে শুরু হয়। বিভিন্ন টাণ্ডার ন্যায়া ও অন্যান্য প্রবীণরা একত্রিত হয়ে এই দিন স্থির করেন। বিভিন্ন টাণ্ডার

'দিগুয়াররা' (Diguars) গ্রামে গ্রামে এবং এলাকার হাটে ঢেরা পিটিয়ে দিশম সেন্দ্রার দিনে কোন পাহাড় ও জঙ্গলে শিকারে যাওয়া হবে তা জানিয়ে দেন। দিশম সেন্দ্রার পূর্ব রাত্রে প্রতিটি টাণ্ডার ন্যায়া এবং তাঁর স্ত্রী কোন রূপ যৌন ক্রিয়ায় অংশ নেন না। শিকারে যাবার সময় কোন নারী বা পুরুষ খালি কলসি দেখে যান না। শিকারিরা সকালের খাবার খেয়ে নিজেদের শিকারের জাল, বাঁশের মোটা লাঠি, তীর-ধনুক, কুঠার ইত্যাদি নিয়ে শিকারে যান। টাণ্ডার মহিলারা ঐ সময়ে কোন রূপ যৌন ক্রিয়া করেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন মহিলারা এই রূপ করলে তাহলে পুরুষরা শিকার কালে সাফল্য লাভ করবে না। শিকারের পূর্বে পাহাড় ও জঙ্গলে নির্দিষ্ট স্থানে জড় হয় ন্যায়াদের মধ্যে একজন। 'Baibera' নামক একটি অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করেন যাতে উপস্থিত সমস্ত শিকারি শিকারে সাফল্য পায়।

হরিণ শিকার করলে শিকারি দলের 'ন্যায়া' শালপাতায় হরিণের রক্ত নিয়ে পূর্ব দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসে বিভিন্ন আত্মার উদ্দেশ্যে শিকারের রক্তকে উৎসর্গ করেন। শিকারি দল শিকার করে টাণ্ডাতে ফিরলে প্রতি পরিবারে স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীদের পা ধুইয়ে দেন। এরপর স্ত্রীরা তেল ও জল নিয়ে ন্যায়ার কুটিরে যান। সমস্ত স্ত্রীরা 'ন্যায়া'র পা ধুইয়ে দেন এবং পায়ে তেল মাখিয়ে দেন। টাণ্ডার মধ্যে শিকারের মাংসকে শিকারিদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। হরিণ, ছাগল, শূকর ইত্যাদি শিকার করা প্রাণীর মাথাটি কেবল মাত্র শিকারি পুরুষরা দলবদ্ধ ভাবে আগুনে ঝলসে খাওয়ার অধিকারি।

৫.২.১.৮ বিরহড়দের গোত্র, গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য এবং বিবাহ পদ্ধতি (Gotra, Group Similarity and Marriage System of Birhors):

বিরহড়দের গোষ্ঠীগত সাদৃশ্য ও পারস্পরিক আত্মীয়তা, গোত্র বিভাগ এবং বিবাহ পদ্ধতিতে মোটামটি মুণ্ডা এবং সাঁওতালদের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সাঁওতাল এবং মুণ্ডাদের মতই

এদের গোত্র কোন প্রাণী, গাছ, ফুল, ফল ও অন্যান্য বস্তুর নামে হয়। বিরহড়রা তাঁদের গোত্রের মধ্যে কিছু আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয়কে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

কোন একটি টাণ্ডার মধ্যে যে সকল বিরহড় পরিবারগুলি বাস করেন তা সকলেই একই বংশ বা দলভুক্ত নয় তাই স্বাভাবিক ভাবে একটি টাণ্ডার মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক হয় ভিন্ন ভিন্ন বংশ বা গোষ্ঠী বা দলভুক্তদের মধ্যে। সুতরাং একই বংশ বা গোষ্ঠী থেকে আসা বিরহড় পরিবারগুলি একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হন। পারস্পরিক এই সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর হওয়ার কারণে কোন টাণ্ডা থেকে কোন পরিবার সাধারণত ভিন্ন হতে চায় না।

ক) বিরহড় গোষ্ঠী বা বিরহড়দের গোত্র নাম (Birhor Groups or name of the Birhor Gotro):

১) বনবিড়াল (Andi)

২) একধরণের বনঘাস (Bonga Sauri)

৩) হিন্দুদের বিশেষ জাতি নামে (Bhat)

৪) ঘুড়ি (Bhont or Bhuntial)

৫) একটি উপজাতি বিশেষ (Bhuiya)

৬) চাল সুপারি (Chouli Hembrom)

৭) শুকনী (Ganda Garua)

৮) একধরণের ছোট পাখি (Geroa)

৯) শকুনি (Gidhi)

১০) গোয়াল আজাদ (Goar)

১১) Guleria Orr Galaoria (dellet-bow)

১২) একধরণের পাখি (Gundri)

১৩) সুপারি (Hembrom)

১৪) চালের তুষ বা সুপারি (Here Hembram)

১৫) মহুয়া ফুল দিয়ে তৈরি (Jegseria Latha)

১৬) কচ্ছপ (Kauch Horo)

১৭) Kawan Hembrom

১৮) একধরণের ফল (Keonduar)

১৯) মুণ্ডাদের একটি উপগোষ্ঠী (Khangar)

২০) একটি বিশেষ গোষ্ঠী (Kharia)

২১) ভাঙ্গা চাল (Khundi Hembrom)

২২) একধরণের ফুল (Ludamba)

২৩) লকুর ছাতা (Lundi-Jal)

২৪) একটি বিশেষ উপগোষ্ঠী (Mahali)

২৫) একটি বিশেষ জাতি বা উপগোষ্ঠী (Modi)

২৬) নীল গাই (Murun)

২৭ গোখরো সাপ (Nag)

২৮) সাদা রং (Sada)

২৯) ঘোড়া (Samduar)

৩০) একধরণের বনঘাস (Saunria)

৩১) একধরণের ফল (Singpuria)

৩২) একধরণের পাখি (Suia)

৩৩) পালামৌ জেলার পরগনা তরীভুক্ত (Toria)

সুতরাং বিরহড়দের গোত্র কখনও ফুল-ফল, অন্যান্য খাবার, প্রাণী, পাখি, অন্য আদিবাসী, এমনকি স্থানের নাম ভিত্তিক হয়। [Source: Ray (1925), *The Birhors*, pp.90-92]

Risley বিরহড়দের ৮ টি গোত্রের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল- Hembram, Jegseria, Mahali, Nagpuri, Singpuria, Liluai, Nag, Siruar।

গোত্রের যে নামগুলি রয়েছে তার মধ্যে কতগুলি স্থানীয় নাম তরিয়া (Toria) এটি পালামৌ জেলার তরী (Tori) পরগণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকা। আবার নাগপুরিয়া অঞ্চলটি ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্ভুক্ত একটি নাম বিশেষ। ঐ অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী বিরহড়রা আঞ্চলিক নামকে তাঁদের গোত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আবার কোন কোন বিরহড় পরিবারের গোত্র নাম অন্য আদিবাসী নাম থেকে এসেছে, যেমন ভাট (Bhat), গয়ার (Goar), ভুইয়া (Bhuiya), খাঙ্গার (Khangar), মাহালি (Mahali), মদি (Modi) ইত্যাদি।

বিরহড়দের গোত্র লিঙ্গ নির্ভর নয়, এটি বংশগত এবং সাধারণত অর্জিত নয়। বিরহড়দের কোন ব্যক্তিগত গোত্র নেয়। গোত্র সমন্ধে এদের বিশ্বাস অনেকটাই প্রকৃতি নির্ভর যেমন কোন বিরহড় পুরুষ বা মহিলা রাত্রে কোন প্রাণী যেমন- সাপ, পাখি, কন্দ, কেঁচো, অন্যান্য কীটপতঙ্গের স্পর্শ দেখলে এবং সেই দিন সকালে তাঁর বাড়িতে কোন বন্ধু বা আত্মীয় দেখা করতে এলে ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখা প্রাণীটিকে নিজের গোত্র বলে চিনহ্নিত করে। এই ভাবেই নাগ (Nag), সামদুয়ার (Samduar), সুইয়া (Suia), কাছ বা হোড় (Kauch Or Horo), গুনড্রি (Gundri), গিধি (Gidhi), জেরয়া (Jeroa), গাণ্ডাগারুয়া (Gandagarua), অ্যান্ডি (Andi) ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট গোত্রভুক্ত বিরহড়রা নির্দিষ্ট কোন উল্কি (Tattoo) শরীরে আকে না অথবা তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ বা চুলের মধ্যে বা ঘরের চারিদিকে কোন চিত্র অঙ্কন বা নির্দিষ্ট কোন বস্তুর সঙ্গে তাঁরা নিজেদের যুক্ত করেন না। তবে কোন কোন আত্মার সঙ্গে তাঁরা পরিবার গতভাবে একটি সম্পর্কে বিশ্বাস করে যেমন- Ora-Bonga (গৃহ দেবতা বিশেষ), Buru bonga (পাহাড়ের দেবতা বিশেষ)।

বিরহড় মহিলাদের নির্দিষ্ট কোন গোত্র থাকে না মেয়েরা তাঁদের বাবার গোত্রে অন্তর্ভুক্ত হলেও বাবা বা স্বামীর দিক থেকে তাঁর গোত্রের প্রতি সন্তানরা সম্মান জানায় না তবে বিয়ের পূর্বে বাবার বাড়িতে কিংবা বিয়ের পড়ে স্বামীর বাড়িতে নির্দিষ্ট গোত্রের সঙ্গে জরিত, এছাড়া প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতি করতে পারে না, সম্মান দেখাতে বাধ্য থাকে। বিরহড় জনগোষ্ঠীর মানুষরা বিশ্বাস করেন যে কোন মহিলা তাঁর স্বামীর গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন প্রাণী ও উদ্ভিদ এর কোন ক্ষতি করে তা হলে তা তাঁর স্বামী হত্যার সমতুল্য পাপের হয়। যদি মহিলা এই রূপ

কোন গর্হিত কাজ করে তাহলে তাকে পাঁচ আনা জরিমানা করা হয় এবং টাণ্ডার সমস্ত আধিবাসিদের নিমন্ত্রন করে ভোজ দিতে বাধ্য করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রে গর্হিত কাজের জন্য যায় মহিলা এবং টাণ্ডার সবাইকে ভোজ দিতে অপারগ হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে টাণ্ডার প্রতি পরিবারের একজন সদস্যকে নিমন্ত্রন করে ভোজ দিতে বাধ্য করা হয়। এর ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মার আর গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না অথবা মৃত গোত্রের আত্মা ঐ গোত্রভুক্ত কোন গর্ভবতী মহিলা গর্বস্থতিতা ভ্রুনে প্রবেশ করতে পারে না। বিরহড়রা তাঁদের গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন প্রাণীর সঙ্গে সংঘাত হওয়া পছন্দ করেনা বা সাক্ষাত হলে সেই প্রাণীকে নমস্কার জানানো বাধ্য নয়।

নির্দিষ্ট গোত্রভুক্ত বিরহড়রা পূর্বে ছোটনাগপুর মালভূমিতে এবং বর্তমানে অযোধ্যা পাহাড়ের কোন একটি ফাঁকা স্থানে একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হন। এবং তাঁরা ‘ওরা বোঙ্গা’ বা ‘গৃহ দেবতা’ এবং ‘বুরু বোঙ্গা’ বা ‘পাহাড় দেবতার’ উদ্দেশ্যে কিছু ফলমূল, মাংস ইত্যাদি উৎসর্গ করেন। সাধারণত উথলু বা যাযাবর বিরহড়রা গৃহ দেবতা বা ওরা বোঙ্গা উদ্দেশ্যে এবং জাঘী বা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী বিরহড়রা বুরু বোঙ্গা বা পাহাড়ের দেবতার উদ্দেশ্যে সেবা উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গ কালে অন্য গোত্রের বিরহড়রা উপস্থিত নাও থাকতে পারেন, কিংবা উপস্থিত থাকলেও ঐ সেবা উৎসর্গের কাজে অংশ গ্রহণ নাও করতে পারেন। তবে বিরহড়রা সেবা উৎসর্গ করার কালে ঐ অনুষ্ঠানে গোত্রভুক্ত সব থেকে বয়স্ক ব্যক্তির উপস্থিতি থাকা বাধ্যতামূলক। উৎসর্গের পূর্বে চারটি চারকোণা চিত্র সমতল মাটির উপরে আটা দিয়ে রেখা টেনে তৈরি করেন। এর মধ্যে একটি চতুষ্ক কোন দাগের মধ্যে নির্দিষ্ট গোত্রভুক্ত বিরহড়রা তাঁদের আদিবাসস্থান অর্থাৎ যে পাহাড়ে ছিল তাঁর দিকে মুখ করে বসে,

সামনে একটি চতুষ্ক কোনে তাঁদের গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর অংশ বিশেষকে রাখা হয়। যেমন

১) লুড়ুম্বু (Ludumbu) গোত্রভুক্তরা লুড়ুম্বু ফুলকে উৎসর্গ স্থানে রাখেন।

২) মুরুম (Murum) গোত্রভুক্তরা মুরুম বা নীল গাই– এর সিং বা চামড়ার টুকরো রাখেন।

৩) কেন্দুয়া (Kendua) গোত্রভুক্তের বিরহড়রা কেন্দ (Diospurou melanoxynon) গাছের পাতা রাখেন।

৪) জেরয়া (Jeroa) গোত্রভুক্তরা জেরয়া পাখীর পালক রাখেন।

৫) অ্যান্ডি (Andi) গোত্রের বিরহড়রা অ্যান্ডি বা বুনো বিড়ালের একটু চামড়া উৎসর্গ করেন।

৬) চাউলি হেমব্রম (Chauli Hembrom) গোত্রভুক্ত বিরহড়রা আরুয়া চাউল (Arua Choul) উৎসর্গ করেন।

৭) হেরে হেমব্রম (Here Hembrom) গোত্রের লোকেরা উৎসর্গ করেন এক মুঠো চালের তুষ।

৪) খুণ্ডী হেমব্রম (Khundi Hembrom) গোত্রের বিরহড়রা ভাঙ্গা চাল (Khud) রাখেন।

৯) শ্যাম ঝাকয়া (Sham-Jhakoa) গোত্রভুক্ত বিরহড়রা লাক্ষা এবং বালি দিয়ে তৈরি একটি আঠালো পদার্থকে উৎসর্গ করেন।

১০) সাউনরিয়া (Saunria) গোত্রভুক্তরা সাউনরি বা জংলি ঘাস এক মুঠো রাখে।

১১) লাথা জেগসেরিয়া (Latha Jegseria) গোত্রভুক্তরা লাথা বা মহুয়া ফুল ও চাল দিয়ে তৈরি গোলাকার পিঠে উৎসর্গ হিসাবে রাখেন।

১২) সিংপুরিয়া (Singpuria) গোত্রভুক্ত বিরহড়রা সিঙ্ঘারা [Singhara (Trapa bispirosa)] পাতা বা কাণ্ডের অংশ বিশেষ উৎসর্গ করেন।

১৩) গিধি (Gidhi) গোত্রভুক্তরা গিধি অর্থাৎ শকুনীর পালক কিংবা ডানা বা নখ যুক্ত আঙ্গুল উৎসর্গ করেন।

১৪) জুথসেরিয়া (Juthseria) গোত্রভুক্তরা মে-জুন মাসে যে জ্যাঠ (Jath) ফুল ফোটে সেটি উৎসর্গ করেন এবং নিজেদের কানের উপর কিছু ফুল গুঁজে রাখেন।

১৫) গুলেরিয়া (Guleria) গোত্রভুক্তরা গুলে (Gule) অর্থাৎ শিকার কালে ব্যবহৃত ধনুকটি উৎসর্গ স্থানে রাখেন।

১৬) তিরিও (Terio) গোত্রভুক্তরা তিরিও (Terio) বা বাঁশি উৎসর্গ স্থানে রাখেন।

১৭) খাঙ্গার (Khangar) গোত্রভুক্ত বিরহড়রা সরিষার খোল উৎসর্গ স্থানে রাখেন।

১৮) মাহালি (Mahali) গোত্রভুক্তরা সুপ্লি (Supli) বা নতুন বোনা ঝুড়ি উৎসর্গ স্থানে রাখে।

১৯) ভুইয়া (Bhuiya) গোত্রভুক্তরা একটি পেতলের ঘণ্টা উৎসর্গ স্থানে রাখেন।

২০) ভাট (Bhat) গোত্রভুক্ত বিরহড়রা একটি নতুন বোনা ঝুড়ির মধ্যে একটি নতুন মাটির প্রদীপ রেখে বিরনি (Birni) বা এক ধরনের জঙ্গলি ঘাস দিয়ে তৈরি করা সলতে পাকিয়ে প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেন।

২১) সাদা (Sada) গোত্রভুক্তরা তাঁদের দেবতা ‘বুরুবোঙ্গা’ এর উদ্দেশ্যে একখণ্ড সাদা কাপড় উৎসর্গ করেন। এই গোত্রভুক্তরা নিজেদের খাবারে কখনও হলুদ দেননা, অথবা হলুদ দিয়ে

মাখানো কাপড় কোন অনুষ্ঠানে বা বিয়েতে পরেন না, অথবা ঘরের মধ্যে হলুদ রং দেওয়ালে দেন না, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের পূর্ব পুরুষদের আত্মা তাঁদের ঘরের মধ্যে আছেন।

যে সকল গোত্রের সঙ্গে পশুপাখি নাম জড়িয়ে গেছে তাঁরা পাহাড় দেবতাকে (বুরুবোঙ্গা) ঐ সমস্ত প্রাণীর চামড়া, সিং, নখ, পালক ইত্যাদি প্রতীক হিসাবে পুজাতে উৎসর্গ করেন। কিন্তু এর জন্য ঐ প্রাণীগুলিকে তাঁরা হত্যা করেন না। অন্য গোত্রভুক্তরা যখন ঐ প্রাণীগুলিকে শিকার করেন তখন তাঁদের কাছ থেকে গোত্র নামের সঙ্গে যুক্ত প্রাণীগুলির অংশ বিশেষ সংগ্রহ করেন এবং পূজার জন্য নির্দিষ্ট বিশুদ্ধ ঝুড়িতে ঐ বস্তু বা দ্রব্যগুলি স্বাধীনতার সঙ্গে রক্ষা করেন। এর থেকে জানা যায় বিরহড় উপজাতির বা আদিবাসীর লোকেরা তাঁদের বংশের গোত্র তথা গোত্রের প্রতীক বিষয়ে কতখানি শ্রদ্ধাভাব পোষণ করেন।

বিরহড়রা তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান যে পাহাড় বা জঙ্গলে ছিল কখনই তার এক মাইল এর মধ্যে কাছাকাছি যান না। এর কারণ তাঁরা তাঁদের আদিবাসী ভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবান বলে। তাঁরা বিশ্বাস রাখেন যে ছেড়ে আসা বাসস্থানে তাঁদের পূর্বপুরুষদের আত্মারা এখনও রয়েছেন। তাই ঐ স্থানে প্রবেশ করে তাঁরা পূর্ব পুরুষদের আত্মাকে বিরক্ত করতে চান না। যে সকল ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের কোন আত্মীয় এখনও পূর্বের ঐ স্থান থেকে গেছেন তাঁরা যারা নিয়মিত পূর্বপরুষদের আত্মাকে ও পাহাড় দেবতাকে পূজা উৎসর্গ করেন তাঁদের বাড়িতে প্রয়োজনে যাতায়াত রাখেন। উথলু বিরহড়রা অর্থাৎ যাযাবর বিরহড়রা খাদ্যের জন্য পূর্বপুরুষদের বাসস্থানের নিকটে কোন জঙ্গল বা পাহাড়ে পৌঁছালেও ঐ স্থান থেকে ফিরে আসেন। এর পিছুনে যাযাবর বিরহড়দের বিশ্বাস হোলো যেহেতু তাঁরা শিকার এবং খাবারের খোঁজে নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে এসেছেন তাই তাঁরা আর জঙ্গল দেবতা, পাহাড় দেবতা এবং

পূর্বপুরুষদের আত্মা দেবতাকে নিয়মিত পূজা উৎসর্গ করেন না। তাই ঐ পাহাড় এবং জঙ্গলে প্রবেশ করলে পূজা না পাওয়া অপ্রসন্ন দেবতারা ক্ষতি করবেন। অন্য দিকে জাঘি বা এক স্থানে বসবাস করা বিরহড়রা পূর্ব পুরুষদের বাসস্থান পাহাড় এবং জঙ্গল ছেড়ে এলেও ঐ পাহাড় বা জঙ্গলে প্রয়োজনে প্রবেশ করেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই এক রাত্রি বেশি কাটান না। প্রতিটি গোত্রভুক্ত বিরহড়দের নিজস্ব পূর্ব পুরুষদের বাসভূমি রয়েছে।

৫.২.১.৯ বিবাহ পদ্ধতি (Marriage System):

বিয়ে করার পর একজন পুরুষ এবং মহিলা বিরহড় সমাজে পুর্নাঙ্গ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। সাধারণত কোন স্থানে স্থায়ীভাবে বাসকারী (জাঘি) বিরহড়রা ১১-১২ বছর বয়সে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬-১৭ বছর বয়সে বিয়ে দিতে পারেন কিন্তু সাধারণত যুবক যুবতী মেয়েদের মধ্যে দেওয়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতি। এ ক্ষেত্রে ১৬-১৭ বছরে মেয়ের সঙ্গে ২০-২১ বছর বয়সের একটি ছেলের বিয়ে দেওয়া হয় বিয়েতে ছেলে এবং মেয়ের পরিবারের প্রধানরা বিয়ের ব্যাপারে সব রকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। অসবর্ণ বিয়ে কিংবা একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ যোগ্য ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ে হয় না। যদি এক গোত্রের মধ্যে কেউ বিয়ে করে বা অসবর্ণ বিয়ে করে তবে সেই বিয়ে ব্যভিচার বলে স্বীকার করা হয় এবং ঐ রূপ স্বামী স্ত্রীকে বিরহড় সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিরহড় সমাজে ছোট ভাই মারা গেলে ছোট ভাই এর দাদা তাঁর ভাই এর বউকে বিয়ে করতে পারেন না, কারণ দাদা বা ভাসুর এর নিকট ছোট ভাই এর স্ত্রী হলেন মেয়ের মত। তবে বড় ভাইয়ের মৃত্যু হলে ছোট ভাই বিধবা বউদিকে বিয়ে করতে পারেন। ছোট ভাই বিধবা বউদিকে নিজে বিয়ে না করে যদি অন্য কোন পুরুষ-এর সঙ্গে বিয়ে দেয় সে ক্ষেত্রে ছোট ভাই কন্যাপণ পাওয়ার অধিকারি ।

বিরহড়দের মধ্যে দশ রকমের বিবাহ পদ্ধতি চালু রয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ রকমের বিবাহ দেখতে পাওয়া যায়। বিরহড়রা তাঁদের বিবাহকে বলে 'বাপলা' অর্থাৎ বিবাহ। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বিরহড়দের মধ্যে প্রচলিত পাঁচ প্রকারের বিবাহ পদ্ধতিকে নিয়ে আলোচনা করা হল।

১) সদর বাপলা (Sadar Marriage):

এটি বিরহড় সমাজে অধিক প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি। সাধারণত জাঘি বিরহড় অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিরহড়দের মধ্যে সদর বাপলা পদ্ধতিতে বিয়ে হয়। উথলু বিরহড় অর্থাৎ যাযাবর বিরহড়দের মধ্যে এই বিবাহ প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সদর বাপলা পদ্ধতিতে ছেলে এবং মেয়ের অভিভাবকরা বিয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকারি। এই পদ্ধতিতে ছেলের বাবা তাঁর বিবাহ যোগ্য ছেলেটির জন্য উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ পেলে কয়েকজন বন্ধুকে মেয়ের বাড়িতে পাঠান প্রাথমিক কথা বার্তা বলার জন্য। সাধারণত অন্তত তিনজন বয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যা দেখার এবং বিয়ের প্রাথমিক কথাবার্তা বলার জন্য ছেলের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়। ছেলেপক্ষ সূর্যঅস্ত যাওয়ার কিছু আগে মেয়ের বাড়িতে পৌঁছায় এবং হাতের লাঠিটি তাঁরা মেয়ের বাড়ির ঘরের বাইরে রাখেন না। এর দ্বারা ছেলে পক্ষ জানিয়ে দেন যে তাঁরা মেয়ের পক্ষে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্য এসেছেন। যেহেতু একটি টাণ্ডার থেকে অপর টাণ্ডাটি অনেক দুরত্বে রয়েছে এবং যেহেতু পাহাড় এবং জঙ্গল পার হয়ে পাত্র পক্ষকে বহু দূরে কন্যা পক্ষের টাণ্ডায় আসতে হয়েছে তাই প্রত্যেকের হাতে আত্ম রক্ষার জন্য একটি লাঠি থাকে। আদিবাসীরা বন পথে এমন কি সমতল ভূমিতেও কিছু দূরে যাবার সময় একটি লাঠি সঙ্গে রাখেন। এটি একটি প্রচলিত প্রথা। যে সকল ক্ষেত্রে মেয়ে পক্ষের অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি থাকেন

তাঁরা ছেলে পক্ষের লাঠিগুলি হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। এর মধ্যে দিয়ে মেয়ে পক্ষ ছেলে পক্ষকে জানায় যে তাঁরা তাঁদের মেয়েকে বিয়েদিতে প্রস্তুত। এখন মেয়ে পক্ষের কয়েকজন মহিলা ঘটি বা জগ ভর্তি জল নিয়ে বাইরে আসেন এবং ছেলে পক্ষের লোকেদের পা ধুইয়ে দেন। এখন শিকারের জাল বিছিয়ে দিয়ে তাঁর উপর ছেলে পক্ষকে বসতে দেওয়া হয়। এর পর মেয়েপক্ষের মহিলারা তামাক গুঁড়ো করে তাতে চুন মিশিয়ে দেন। এরপর বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে আলোচনা হয় এবং অতিথিরা ঐখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পরেন।

পরদিবস মেয়েটির বাবা ন্যায়া বা মোড়লকে বিয়ের বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য ন্যায়ার বাড়িতে যান। ন্যায়া যখন বাবার কাছ থেকে শোনে বা বোঝেন যে এই বিবাহটি উপযুক্ত তখন তিনি দিগুয়ারকে নির্দেশ দেন টাণ্ডার সমস্ত পুরুষদের খবরদিয়ে টাণ্ডার ভিতরের ফাঁকা স্থানে (Angan) মেয়ের বাবার কুঁড়ে ঘরের সামনে সবাইকে জড় করতে। ঐ স্থানে গিয়ে ন্যায়া উপস্থিত সবার সামনে বলেন যে বিবাহ বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য তাঁদের ডাকা হয়েছে। এই আলোচনার মধ্যে দিগুয়ার অংশ গ্রহণ করেন। উপস্থিত সবার সামনে ছেলে পক্ষের অভিভাবকরা হিসাবের এক টাকা চারআনা Nata-Tarouni হিসাবে রাখেন এবং সকলের পা ধোয়ার জন্য (Gordhowar) আটআনা রাখেন।

এখন টাণ্ডায় সকলের সামনে মেয়ে পক্ষের একজন মহিলা আটা দিয়ে ছবি আঁকেন। এই ছবির উপর একটি পিতলের থালাকে তেল এবং তার উপর চার টাকা দেওয়া হয়। তিন টাকা কন্যা পন এবং এক টাকা কনের কাপড়ের জন্য। এছাড়া চার টাকার কাছে চারটি পয়সা রাখা হয়। যে পয়সাগুলিকে চার টাকার ডিম বা Panrki Anda হিসাবে রাখা হয়। যে মহিলা

ছবিটি আঁকে সেই শিল্পীকে চারটি পয়সা দেওয়া হয়। এখন মেয়ে পক্ষের কয়েক জন আত্মীয় বিবাহ যোগ্য মেয়েটিকে চারজন পুরুষের হাতের উপর বসিয়ে টাণ্ডার বাইরে আনা হয় এবং পূর্বদিকে মুখ করে ছবির পূর্বপ্রান্তে বসানো হয়। মেয়ের বাবা ছবির পশ্চিম দিকে পূর্ব মুখি হয়ে বসেন। এখন টাণ্ডার মানুষরা বাইরে থেকে আসা ছেলেপক্ষের আত্মীয়, বন্ধুদের বলেন,"বন্ধুরা দেখে নাও আমাদের মেয়ে অলস বা খোয়া বা দৃষ্টিহীন কি না? তার কোন অঙ্গ হানি রয়েছে কি না সে এত দিন আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের সঙ্গে খেলাধুলা এবং নাচ-গান করেছে। সে কতখানি কাজ কর্ম করেছে সেটা খুব বেশি আলোচনার বিষয় নয়। এবার ছেলে পক্ষের একজন আত্মীয় কিংবা ছেলের বাবা বলবেন 'আমাদের সামনে যাকে আনা হয়েছে আমরা তাকেই গ্রহণ করবো'। এখন মেয়েটি উঠে দাঁড়াবে এবং প্রত্যেককে প্রণাম করবে। এরপর একইভাবে পুরুষদের হাতের উপর বসে টাণ্ডার ঘরের ভেতরে যাবে। এবার দিগুয়ার পেতলের থালাসহ কন্যাপন তুলে নেবেন এবং টাণ্ডাতে উপস্থিত সবার হাতে দিয়ে বলবেন, "দেখুন ছেলে পক্ষ আমাদের মেয়ের জন্য এই কন্যাপণ আজকে দিয়েছে"। এখন টাণ্ডার সমস্ত পুরুষ ঐ পয়সাকে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করবে এবং স্পর্শ করা আঙ্গুলগুলিকে চুম্বন দিবে। এর দ্বারা বোঝানো হয় যে কন্যাপণটি আসলেই টাণ্ডার সমস্ত মানুষকে দেওয়া হয়েছে। এরপর পেতলের থালা সমেত কন্যাপণ নিয়ে টাণ্ডার এক কনে থান বা থানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে সমস্ত নাম ধরে ডেকে বলা হয়, 'হে পবিত্র আত্মারা আমাদের মেয়ের জন্য ছেলে পক্ষ এই কন্যা পণ দিয়েছে আমরা কি তাঁদের বিয়ের আয়োজন করি'। এখন কন্যাপণ সমেত প্লেটটিকে তুলে নেওয়া হয়। মেয়ের বাবার কুঁড়েতে নিয়ে আসা হয় এবার কুঁড়েঘরের মধ্যে এক কোনে থালা সমেত পয়সাগুলিকে রাখা হয়। একই ভাবে পরিবারের পূর্ব আত্মাকে আহ্বান করে বলা হয় বিয়ের কথা। বিরহড়রা

বিশ্বাস রাখেন যে প্রতিটি পরিবারের কুঁড়েঘরের মধ্যে তাঁদের পূর্বপুরুষদের আত্মারা রয়েছেন। থালা সমেত কন্যাপণ ঐ খানেই রেখে দেওয়া হয়।

পাত্রপক্ষযে একটাকা চারানা টাণ্ডার লোকেদের হাতে কন্যা পণ হিসাবে দিয়েছে তা দিয়ে মদ কেনা হয় এবং টাণ্ডার সমস্ত পুরুষ ও পাত্র পক্ষকে সেই মদ ক্ষেতে দেওয়া হয়। আদিবাসী সমাজে কোন পণ প্রথা নেই, আসলে কন্যাপণ যারা মনে করে সেটা হল মাঝিদের কাজকর্মের ও খাওয়া দাওয়ার জন্য দিতে হয়। সন্ধ্যা বেলা টাণ্ডার সমস্ত অতিথিসহ পাত্র পক্ষকে লাইন করে বসিয়ে শাল পাতাতে ভাত ও ডাল ক্ষেতে দেওয়া হয়। দুই দিকে line এর মাঝখানে বসেন কন্যাপক্ষের টাণ্ডার ন্যায়া এবং পাত্রপক্ষের কোন আত্মীয় তাঁদের সামনে বড় পাতাতে তাঁদের সম্মান দেখাতে বেশি পরিমানে ভাত এবং ডাল দেওয়া হয়। কন্যা পক্ষের ন্যায়ার গোত্র যদিও কন্যার বাবার সঙ্গে একই না হয় তা হলে কন্যার বাবা ন্যায়ার বদলে পাত্র পক্ষের প্রধানের কাছে বসেন। এখনও কন্যা পক্ষ এবং পাত্র পক্ষের হাতে অনেকটা পরিমান ডাল মাখানো ভাত নেন ও একটি একটি করে মাটিতে ফেলেন এবং বলতে থাকেন যে, ‘আজ আমরা আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে অন্নদান (Takchanrhi) করছি। আমাদের ওমুক মেয়ের সঙ্গে ওমুক টাণ্ডার ওমুক ছেলের সঙ্গে বিবাহ হবে। তোমরা সকলে আমাদের পাত্র এবং কন্যাকে আশীর্বাদ করুণ। এই সময়ে ছেলে এবং মেয়ের নাম বলা হয় এবং উভয়পক্ষের প্রধানরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের নাম ধরে অন্নদান করেন।

এবার ন্যায়া সমস্ত পুরুষ এবং যুবকদের Takchanrhi নামক অনুষ্ঠানে ডাল, ভাত খাওয়ার আহ্বান জানান। এবার ন্যায়া এবং দিগুয়ার প্রথমে ডাল, ভাত খান এবং টাণ্ডার বাকিরা বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কন্যার হাত থেকে পাতা ভর্তি ভাত, ডাল নিয়ে নিজের কুঁড়ে ঘরে

ফিরে যান সেখানে প্রথমে পুরুষরা খাবার খান ও পরে মেয়েরা খান এবং সকলে বিছানাতে ঘুমাতে যান। পর দিবস সকালে দিগুয়ার তিনটি আরেন্ডী বীজ এর মালা তৈরি করেন এবং ছেলেপক্ষের তিনটি অতিথিকে সকালে প্রাতরাশ খেতে দেওয়া হয়। তখন বিবাহের পাত্রীটি একটি পাত্রে বাটাহলুদ জলে গুলে অতিথি তিনজনের কোমর এবং পিঠে হলুদজল দিয়ে তাঁদের কাপর ভিজিয়ে দেয়। ঐ দিন দিগুয়ার মেয়ের বাবার বাড়িতে দুপুরের খাবার খায়, খাবার শেষে দিগুয়ার টাণ্ডার মানুষজনকে ডাকে এবং শিকার ধরার জালের উপর বসতে দেয়। দিগুয়ার সবার গলায় একটি করে আরেণ্ডী বীজের মালা পরিয়েদেয়। এখন টাণ্ডার লোকজনেরা ছেলে পক্ষকে জিজ্ঞাসা করে কবে মেয়ে পক্ষ ছেলের পক্ষের টাণ্ডাতে যাবে এবং বিয়ের দিন স্থির (Jommandi) হবে। সাধারণত ৭-৯ দিন পরে এই দিন স্থির হয়। এবার মেয়ে পক্ষের সবাই ছেলে পক্ষের আত্মীয়দের নমস্কার জানিয়ে বিদায় দেয়। 'জমমাডী' (Jommadi) অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট দিনে মেয়ে পক্ষের কয়েকজন পুরুষ লাঠি হাতে নিয়ে ছেলে পক্ষের টাণ্ডাতে যায় এবং ছেলের বাবার কুঁড়ে ঘরের দরজার একপাশে লাঠিগুলি দাঁড় করিয়ে রাখেন। এখন বিয়ের পাত্রটি প্রতিটি লাঠি হাতে নিয়ে মেয়েপক্ষের অভিভাবকদের হাতে দেয়। এবং এই সময়ে দিগুয়ার পাত্রপক্ষের টাণ্ডা থেকে বেরিয়ে আসে এবং অতিথিদের কাছ থেকে লাঠিগুলি সংগ্রহ করে একত্রে বেঁধে নির্দিষ্ট স্থানে রাখেন। এবার দুইটি ঘটিতে জল এনে পাত্রীপক্ষের পা ধুইয়ে দেন। শিকারের জন্য তৈরি জালকে পিছিয়ে তারপর অতিথিদের বসতে দেওয়া হয় এবার পাত্রপক্ষের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে পাত্রী পক্ষকে, 'আপনারা এখানে আসার সময় রাস্তা কি দেখেছেন'। পাত্রী পক্ষযথাযথ উত্তর দেবেন এবং উভয় পক্ষকে নমস্কার জানাবেন। এবার পাত্রপক্ষথেকে উপস্থিত সকলকে মদ দেওয়া হয় এবং বন্ধুত্ব পূর্ণ পরিবেশে আলোচনারপর পাত্রী পক্ষকে ভাত, ডাল এবং সব্জি খেতে দেওয়া হয়। পরদিবস সকালে পাত্রপক্ষএবং পাত্রী

পক্ষঅতিথিরা, পাত্র এবং তাঁর বাবা এক সঙ্গে স্নান করেন। এবং পাত্রী পক্ষের ন্যায়। একই রকম ভাবে পাত্রীর বাড়ির সামনে চারকোণা ছবি আঁকা হয় চালগুঁড়ো দ্বারা। চারটি কোনে একটি করে তামার পয়সা রাখা হয় এবং আল্পনার উপর শাল পাতার দুইটি থালা রাখা হয়। পূর্ব দিকে শালপাতার থালার উপর পাত্র বসে এবং তাঁর পশ্চিমে শালপাতার থালার উপর পাত্রের বাবা বসেন, এবার পাত্রপক্ষপাত্রী পক্ষকে বলেন যে আমাদের বিবাহ যোগ্য পাত্রটি সামনে বসেছে। ভালকরে লক্ষ করো সে দৃষ্টিহীন কি না বা হানী হয়েছে কি না। এবার পাত্রের বাবা বলেন আমি খুসি আমার ছেলের জন্য পছন্দের পাত্রী পেয়ে এবার পাত্র তাঁর বাবাকে নমস্কার জানায় এবং নিজের আসন থেকে ওঠে সেখানে উপস্থিত সকল বয়স্ক ব্যক্তিকে নমস্কার করে। এরপর পাত্রের বাবা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। পাত্রপক্ষএবং পাত্রী পক্ষসকলকে একে অপরকে নমস্কার জানায়। পাত্রপক্ষ উপস্থিত সকলকে হাঁড়িয়া ক্ষেতে দেন। রাত্রে সবাই মিলে ভাত, ডাল এবং মাংস আহার করেন। এরপর পাত্র এবং পাত্রী পক্ষের দুইজন ন্যায়া উপস্থিত সকলের মাঝে হাঁড়িয়া নিয়ে বসেন এবং ঘটি থেকে হাঁড়িয়া পাত্র এবং পাত্রীর পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং প্রত্যাশা করেন যে পূর্বপুরুষরা বা পূর্বপুরুষদের আত্মা আশীর্বাদ দেবেন যাতে জমমাণ্ডি অনুষ্ঠানটি সফল হয়।

এবার পাত্রের প্রসারিত দুই হাতের উপর একটি শালপাতা রেখে তারপর এক ঘটি জল রাখা হয়। পাত্র এবং পাত্রীর বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁরা কোন সামাজিক অপরাধ করেছেন কি না। ছেলে এবং ছেলের বাবা কোন রূপ অন্যায় না করে থাকলে এবং পাত্রপক্ষএতে সম্মতি জানালে ঘটির জল সকলে স্পর্শ করেন। এর পর পাত্রী পক্ষপাত্র পক্ষের অভিভাবকরা ভাত, ডাল এবং মাংস পাত্র পক্ষের বাড়িতে গ্রহণ করেন।

ঐ দিন রাত্রি উভয়পক্ষের ন্যায়াকে প্রথমে শাল পাতায় ক্ষেতে দেওয়া হয় এবং পড়ে উপস্থিত অন্যান্যদের শালপাতায় খাবার দেওয়া হয়। এখানে সবাই মিলে পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে খাবার উৎসর্গ করেন এবং পাত্র ও পাত্রী সুস্বাস্থ্য জীবন কামনা করেন। এখন অতিথিরা সকলে অন্য গ্রহণ করেন, হাত মুখ ধোয়ার পর প্রত্যেকে তামাকপাতায় চুন মিশিয়ে চিবতে থাকেন এবং বাড়িতে শুতে যান। পরের বিবাহের দিন অর্থাৎ সময় বা লগ্ন স্থির করেন। এবার পাত্রপক্ষের দিগুয়া লাঠিগুলি পাত্রীপক্ষের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেন। এবং পাত্রের বাবা পাত্রপক্ষের দিগুয়ারের হাতে দুইটি পয়সা দেন কারণ তিনি পাত্রী পক্ষের অভিভাবকদের লাঠিগুলি সুরক্ষিত রেখে ছিলেন (Thanga-Dharouni) আর দুইটি পয়সাদেন কারণ পাত্রী পক্ষের অভিভাবকদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন, (Gor-Dhoauni)।

বিয়ের নির্দিষ্ট লগ্নে পাত্র পক্ষের তিনজন পাত্রীর বাড়িতে যান, স্নান ও খাওয়া দাওয়ার পর পূর্বের ন্যায় একটি চালের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা আঁকে যেটি পশ্চিমের দিকে বসানো হয়। পূর্ব দিকে বসেন মেয়ের বাবা মেয়ে দুইটি হাতকে প্রসারিত করে জরবদ্ধ করে। হাতে দেওয়া হয় হলুদ দিয়ে রং করা তুলর উপরে পাঁচটি গিট দেওয়া সুত এর অর্থ আজথেকে পাঁচ দিন পড়ে তাঁদের বিবাহ হবে একজন মহিলা হাত দিয়ে পাত্রীর চোখ দুইটি ঢেকে রাখেন যাতে পাত্রী কাকেও দেখতে না পায়, মহিলাটি পাত্রীর পেছন থেকে চার চোখকে বন্ধ রাখেন। এবার পাত্রীকে বলা হয় হাত দুইটিকে খুলতে যাতে হাতের নিচে থাকা শালপাতার থালাতে সেদ্ধ ভাত এবং গিট দেওয়া সুত পড়ে। ছেলেপক্ষ একটি সুতনেন এবং বাকি দুইটি একটি মেয়েরপক্ষের কাছে থাকে এবং একটি থাকে শালপাতার উপরে। এবার পাত্রীর মা ঐ পাঁচটি গিট দেওয়া সুতকে অন্যান্য মহিলাদের সামনে চুম্বন দেন। ঐ সময় তিনি একটি চউরা ঝুড়িতে এক মুঠো ধান এবং একটি বা দুইটি ঘাসের পাতা এবং মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনবার ঝুড়িটিকে পাখার

বাতাস করে ঘরের বাইরে (Logon) সুতর কাজ নিয়ে আসেন এবং ঝুড়িটিকে বসিয়েদেন। এবার লগন সুতোকে ঝুড়িটিকে তিনবার ধান নিয়ে ছিটিয়ে দেন, মহিলা সঙ্গে আসেন বা পাত্রীর মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গি অন্য দুইজন মহিলা ও লগ্ন সুতোর উপর তিনবার ধান ছরিয়েদেন। এবং প্রদিপেন উত্তাপ লগান সুতোর উপর দেন এবং ঝুড়ি নিয়ে তাঁরা কুঁড়েঘরে ফিরে আসেন। বিয়েতে মেয়ের বাবা ছেলের বাবার কাছ থেকে কন্যা পণ পায়। ছেলের বা মেয়েকে একজোড়া শারি দেয়, মেয়ের পক্ষে কোন কিছু দিতে হয় না বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান হয় কন্যের বাড়িতে।

নির্দিষ্ট বিয়ের দিনে বরপক্ষ কন্যের বাড়িতে পৌঁছায়, এবং সাথে বর পক্ষের 'ন্যায়া' থাকেন। কন্যে পক্ষের লোকেরা বরপক্ষকে সাধর অভন্থনা জানায়। বিয়ের দিনে সকাল থেকে শুরু হয় নাচ-গান, পান ভোজন, আপ্যায়নের ত্রুটি থাকে না। মেয়ের বাড়িতে দুইটি মেয়ে আম পাতার ডাল জলে ডুবিয়ে বড়ের গায়ে ছিটিয়ে দেয় এবং কোনের মা এসে বরকে বিয়ের মণ্ডপে নিয়ে যান। বিয়ের মণ্ডপে বা ছামডা নিচে নিয়ে যান। বিয়ের মণ্ডপে ন্যায়া 'বাঁচ বোঙ্গা'র পূজা করেন, পূজার শেষে কোনেপক্ষের লোকেরা বাঁশের দোলায় কন্যাকে চাপিয়ে ঘর থেকে বের করে আনেন এবং বর যেখানে বসে আছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ বাঁশের ডালাকে বলা হয় 'দউরো' (Daura) উপরে শালপাতা দিয়ে কন্যে পশ্চিম দিকে মুখ করে দারায় এবং বর পূর্ব দিকে মুখ করে দাড়ায় এবং বর কন্যের চার পাসে একটি কাপরের পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়, এবার বর এবং কনের করি আঙ্গুল থেকে একফোঁটা করে রক্ত বার করে একটু কাপড়ে লাগিয়ে বর ও কণের হাতে দেওয়া হয় তাঁরা সেই রক্ত লাগা কাপড়টি পরস্পরের গলায় ছোঁয়ায় এবং বর ও কনের মধ্যে শুরু হয় বিয়ে। তবে বর্তমানে রক্তের বদলে সিঁদুর ব্যবহার হয়। মালা বদল হয় আম পাতা ও গাঁদা ফুল দিয়ে তৈরি মালা দিয়ে, বর ন্যায়া এর

কথা মত মাটিতে তিন ফোঁটা তেল ফেলে তাঁর উপর সিঁদুর ঢেলে দেয়। এখন ন্যায়া কথা মত টাণ্ডার কথা মত সবার সামনে বর কন্যের সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেয় অর্থাৎ বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। পাত্র পাত্রীর উপর স্ত্রীর অধিকার এখন প্রতিষ্ঠিত হয়, এরপর শুরু হয় নাচ-গান, পানভোজন ও মেয়েরা গান গাঁয় ইত্যাদি। বিরহড়দের বিয়েতে আরও বেশকিছু নিয়ম কানুন রয়েছে, যা অনেকটাই হিন্দুদের বিয়ের নিয়ম কানুনে প্রায় সম গোত্রীয়।

বিয়ের দিন সকালে পাত্রের বাড়িতে পাত্রের আত্মীয়রা সারী দিয়ে নিকটবর্তি কোন ঝর্ণা, পুকুর, নদী কিংবা হ্রদে যান বিয়ের উৎসবের জন্য পবিত্র জল আনতে (হিন্দুরা এই ভাবে বিবাহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য তুলে আনা জলকে বলে ‘কুইলি জল’) যাওয়ার মহিলা দলের মধ্যে দুই জন দুইটি মাটির ঘরা কাঁধে নেন। অন্য একজন মহিলা একটি তরওয়াল হাতে নেন এবং অন্য আর একজন হাতে নেন তিরধনুক। মহিলা দুজন কলসিতে জল ভরার পর অন্য মহিলারা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হলুদ দিয়ে রাঙ্গানো সুতো তিন পাকে কলসি উপর গলায় জড়িয়ে দিয়ে বেঁধে দেন এবং হলুদ রাঙ্গানো একটি নতুন কাপর হাড়ির মুখে ঢাকা দিয়ে দেন। এবার মহিলা দুইজন বিবাহ উৎসবের জন্য সংগ্রহ করা পবিত্র জল ভরা কলসি/ঘরা দুইটি মাথায় তুলে নেন। এবার মহিলাদের দলটি পুনুরায় টাণ্ডায় পাত্রের বাড়ির সামনে এসে পোঁছায়। কলসি বা ঘরা দুইটি বহনকারী মহিলা দুইজন মাথায় কলসি নিয়ে পাত্রের কুঁড়ে ঘরের দরজায় দুই দিকে দাড়ায় পাত্রের মা জ্বলন্ত কাঠ কয়লা নিয়ে কুড়ের বাইরে আসেন এবং একমুঠো সরষে ঐ জ্বলন্ত কাঠ কয়লার উপর ছরিয়ে দেয়। সরষেগুলি পুরে গেলে দুই জন মহিলা মাথা থেকে বিবাহ উৎসবের জন্য নিয়ে আসা মাঙ্গলিক পবিত্র জলের ঘরা দরজার পাসে নামিয়ে রাখেন। দুইজন মহিলা যারা দরজার এবং তিরধনুক বহন করেছিলেন তাঁরা প্রতিকি ভাবে বিয়ের বিন্ধুজে দাঁড়ান যাতে যে কোন খারাপ আত্মাকে ধ্বংস করে এসেছেন বলে মনে করা হয় এবং

মা আগুনে সরষে পরানো মধ্যে দিয়ে মনে করেন যে খারাপ আত্মা এবং অন্যান্যদের খারাপ দৃষ্টি থেকে বিয়ের পাত্রকে রক্ষা করেছেন। যে দুই জন মহিলা কলসি ভরা জল বহন করে ছিলেন তাঁদের দুই জনকে পাত্রের মা দুইটি পয়সা পুরুস্কার হিসাবে দেন। সাধারণত কুঁড়েঘরে দুই দিকে বালির উপর জল ভরা ঘড়া দুইটি রাখা হয়। পাত্রের বনের স্বামী অর্থাৎ জামাই বাবু কুঁড়েঘরের সামনে দুই ফুট বাই দুই ফুট আকারের একটি চতুরস্কন গর্ত খোঁড়েন যার গভীরতা দুই ফুট। ঐ গর্তের পূর্ব দিকে একটি চারা গাছ পুতে দেওয়া হয় এবং পশ্চিম দিকে তিন আঁটি কাটা ঘাসের উপর একখণ্ড পাথরকে বসানো হয়। ঐ পাথর খণ্ডের উপর পাত্র এবং তাঁর মা পূর্ব দিকে মুখ করে বসেন। পাত্রের বরো বনের স্বামী আম ডাল আনলে দুইজন মেয়ে ঐ ঘড়া থেকে জল বিবাহের পাত্র এবং তাঁর মা উপর ছিটিয়ে দেন। এখন ঝর্ণা থেকে সংগ্রহ করা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য এক ঘড়া জলে বিবাহের পাত্র স্নান করে এবং অন্য ঘড়া জলে পাত্রের মা স্নান করেন। এরপর পাত্রের মা পাত্রের উপর একটি নতুন সুঁড়ি (Sup) বসিয়েদেন তাতে থাকে একটি তীর, একটি প্রজ্বলিত মাটির প্রদীপ, কিছুটা চাল, চারটি পয়সা এবং পাত্রকে কুঁড়েঘরের দরজায় ঠিক উপরে মাটির উপর বসতে দেন। পাত্র মায়ের দিকে মুখ করে বসে, মা বসেন দরজার বাইরে এবার পাত্রের বনের স্বামী পাত্রের বাম হাতে করে আঙ্গুল কেটে কিছুটা যুক্ত একটি ছোট কাপড়ে নেন এই কাপড়কে বলে সিনাই (Sinai) রক্ত মাখা কাপড়টিকে আর একটি কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে পাত্রের জামাতে বা জামার ভেতরে রাখা হয়। এইবার পাত্রের বর বন দুইটি আম পাতা কে সিগারেট এর ন্যায় পাকিয়ে নিয়ে তাই নিয়ে পাত্রের মাথায় এবং শরীররে জল ছিটিয়ে দেয়। এবার বর বন ছয়টির আম পাতার মালা গাঁথে। একটি মালা পাত্রের হাতের বাহুতে, একটি মালা পাত্রের পায়ে পরানো হয়, একি ভাবে পাত্রের বাবা ও

মায়ের বাহু ও পায়ে পরানো হয়। এবার পাত্রের জামাই বাবু সুপারি দিয়ে গাঁথা একটি তারের পইতে পাত্রের ডান কাঁধে ব্রাম্ভনদের ন্যায় উল্টো দিকে পরিয়ে দেন।

এবার পাত্র হলুদ দিয়ে কষানো একটি ধুতি পড়ে, মাথায় নেয় হলুদে কষানো একটি পাগড়ি এবং সম্ভব হলে গায়ে একটি হলুদ রঙের চাদর নেয়। এবার পাত্রের জামাই বাবু পাত্রকে নিজের হাতের বাহুর উপরে অর্থাৎ কাঁধে তুলে পাত্রীর বাড়ির যাবার পথে ধারে আম গাছের নিকট নিয়ে আসে সঙ্গে থাকেন পাত্রের মা এবং টাণ্ডার অন্যান্য মহিলারা পাত্রের টাণ্ডার মহিলারা সঙ্গে নিয়ে আসেন জলের ঘটি দুই শালপাতার থালা, কয়েকটি শালপাতার কাপ, কাপগুলিতে থাকে চাল, গুড় এবং হাঁড়িয়া এছাড়া তাঁরা কিছু সুতো সঙ্গে নিয়ে আনেন। এখন পাত্র বিয়ে করতে যাওয়ার নিদর্শন হিসাবে আম গাছে একটি বিশেষ চিহ্ন এঁকে দেন তার হাতে আম গাছ ধরা থাকে তখন সেই চিহ্ন নিচে টাণ্ডার এক মহিলা পাত্রের হাতে কয়েকটি আম পাতা তুলে দেন পাত্র, আম পাতাগুলি সামান্য চিবিয়ে মা এর হাতে দিলে মা কিছুটা মদ ঢেলে দেন এই প্রক্রিয়া পাঁচবার চলে। এর অর্থ পাত্র পাত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক এবং সন্তান উৎপাদনের অধিকারকে সামাজিক ভাবে নিশ্চিহ্ন করা বোঝায়, এরপর পাত্র, টাণ্ডার অন্যান্য পুরুষ ও মহিলারা সমবেত ভাবে পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে পাত্রীর টাণ্ডাতে যান। পরের দিন সকালে বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত পাত্রের মা অভুক্ত থাকে তবে কিছু পবিত্র জল গ্রহণ করতে পারেন। পাত্র এবং পাত্রী উভয় পক্ষের কয়েকজন করে পাত্রের বাড়ি থেকে পাত্রীর বাড়িতে এবং পাত্রীর বাড়ি থেকে পাত্রের বাড়িতে হলুদ এবং তেল নিয়ে আসে। পাত্রীর বাড়ি থেকে আসা হলুদ এবং তেল মেখে পাত্র স্নান করে এবং একি ভাবে পাত্রের বাড়ি থেকে আসা তেল এবং হলুদ নিয়ে বিয়ের পাত্রী স্নান করে এঁকে বলে তেল হলুদ অনুষ্ঠান বা Jhamra (হিন্দু বিবাহ তেও এই তেল হলুদ অনুষ্ঠান চালু রয়েছে)।

পাত্র সমেত পাত্রপক্ষ পাত্রীর বাড়িতে সারি দিয়ে পৌঁছালে পাত্রীর বাবার কুঁড়ে ঘর থেকে পাত্রীপক্ষের তিন জন বা পাঁচজন মহিলা বেরিয়ে এসে পাত্রকে স্বাগত জানায়। তাঁরা একটি ঝুড়িতে কিছু হলুদ বাটা তিনটি বা পাঁচটি কাপড় পাকিয়ে তেলে ভিজিয়ে এবং আম পাতার উপর রেখে নিয়ে আসেন। প্রত্যেক মহিলা তেলে ভেজানো সলতে দিয়ে পাত্রকে আরতি করেন এবং পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের মধ্যে পরস্পরিক পরিচয় পর্ব শুরু হয়।

পাত্র সমেত পাত্রপক্ষ পাত্রীর বাড়িতে পৌঁছালে পাত্রীকে একজন পাত্রী পক্ষের মহিলা কোলে নিয়ে একি ভাবে পাত্র পক্ষের ন্যায় আমগাছের নিকট নিয়ে যান এবং একি ভাবে কাজ করা হয়। যদি টাণ্ডার কাছাকাছি অল্প দূরত্বে কথাও আমগাছ না থাকে তা হলে পাত্রের টাণ্ডার নিকটে আমগাছের একটি ডাল কেটে এনে পুতে দেওয়া হয় এবং পাত্রীর 'উলি সাক্ষী' বা 'Uli-Sakhi' অনুষ্ঠান করা হয়।

এখন পাত্র বাড়ি থেকে আনা নতুন ধুতি গলায় পেছিয়ে পাত্রীর ছোট ভাই এর সামনে দাড়ায়। দুই জন একমুঠো শুকনো চাল মুখে নিয়ে পরস্পরের দিকে ছুরে দেয় এবং পাত্রীর ভাই পাত্রের গলা থাকে নতুন ধুতিটি (Sarai-Dhuti) ছিনিয়ে নেনে।

এরপর পাত্র এবং পাত্রী রক্তের সিঁদুর উভয়ের মাথায় পড়িয়ে দিলে সমবেত সবাই হিন্দুদের ন্যায় হরিবল হরি বলে ধ্বনি তোলেন, যত খননা এই রক্তের সিঁদুর অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ পাত্র এবং পাত্রীর বাবা-মা কিছু খাননা তবে হাঁড়িয়া পান করতে পারেন।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলে কুঁড়েঘরের দুই ভিন্ন দিকে পাত্র এবং পাত্রীকে খেতে দেওয়া হয় ভাত, সবজি, মাংস। পাত্রীর মা পাত্রকে খাবার দিলেও পাত্র ততখন খাবার খাননা যতক্ষণ পর্যন্ত না পাত্রী পক্ষপাত্রকে একটি ছাগল বা অন্য কোন গৃহপালিত প্রাণী উপহার হিসাবে দেন।

পাত্র পক্ষের লোকজন নিকটে কোন ঝর্ণা বা হ্রদে স্নান করে ফিরে এলে পাত্রী পক্ষে একজন বা দুই জন পাত্র পক্ষের পা ধুইয়েদেন এবং তাঁদের সামনে দুইটি পাত্র ভর্তি হাঁড়িয়া এনে রাখা হয়। পাত্র এবং পাত্রী পক্ষের একজন করে এই হাঁড়িয়া ভর্তি পাত্র হাতে তুলে নেন এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া উৎসর্গ করেন। এই অনুষ্ঠানকে বলে 'জমহাণ্ডি' (Jom-Handi) এবার প্রত্যেককে ঐ পাত্র ভর্তি হাঁড়িয়া দেওয়া হয়। এবার পাত্রী পক্ষের একজন এগিয়ে এসে একটি শালপাতার থালার উপর পিতলের ও কাঁসার ঘটি (Lota) রাখেন। পাত্রের বাবা পাত্রের কোন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করেন এই লোটা বা ঘটি কি জন্য এনেছেন, পাত্রী পক্ষের লোকটি বা আজিয়া (Ajia), উত্তর দেন যে, 'আমাদের বিরহড় আদিবাসীরা সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা কি এখানে অন্য গ্রহণ করবেন (Khudi-Markhu) আমরা আপনাদের মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি'। এই পর্যায়ে পাত্রীর বাবা কোন রূপ সামাজিক অন্যায় করে থাকলে তিনি স্বীকার করেন এবং এই জন্য সকলের সামনে কয়েকটি পয়সা রাখেন এরপর পাত্র এবং পাত্রী উভয় পক্ষের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হয় এবং উভয় পক্ষের বাবা কাঁসার ঘটিটি স্পর্শ করেন। এবার উভয় পক্ষের সম্মতিতে অনুষ্ঠান স্থানে একটি ছাগল বা অন্য পশু আনা হয় এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এরপর পশুর মাথাটি রান্না করে ও পুরুষ অতিথিরা হাঁড়িয়া সঙ্গে তৃপ্তি ভরে খান। সন্ধার সময় 'জমহান্ডি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাত্র-পাত্রীর উভয় পক্ষের ন্যায়া পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে খাবার এবং হাঁড়িয়া উৎসর্গ করেন। এরপর সবাই মেতে ওঠে পানভোজনে। খাবার শেষে চুন দিইয়ে তামাক পাতা চিবিয়ে তাঁরা রাত্রে বিছিনায় যায়। ঐ দিন রাত্রে পাত্র এবং পাত্রী উভয় তাঁদের পছন্দের যথাক্রমে বন্ধু, বান্ধবি/আত্মীয়দের (lukundi) সঙ্গে পৃথক পাতা দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরে ঘুমাতে যায়।

পরদিন সকালে পাত্রীপক্ষের কয়েকজন মহিলা পাত্র এবং পাত্রীকে খেঁজুর পাতার চাঁটায়ে টাণ্ডার মাঝখানে রেখে তাঁর উপর পাত্র এবং পাত্রীকে বসতে দেন, পাত্রের বাম দিকে পাত্রী ও পাত্রের ডান দিকে বন্ধু বা আত্মীয়। এবার ঝুড়িতে রাখা ধান, দুর্বা এবং মাটির প্রদীপে তেল দেওয়া সলতে জ্বালিয়ে মহিলারা এক এক করে প্রথমে পাত্র এবং পাত্রীকে আরতি করেন এবং প্রদীপের আগুনের উত্তাপ হাতে নিয়ে তিনবার পাত্র-পাত্রীর মাথায় এবং কপালে ছুঁইয়ে দেন পাত্র-পাত্রীর মাথায় ধান, দূর্বা ছরিয়ে দেন। এবার ঐ মহিলারা পাত্র এবং পাত্রীর মাথায় হাত স্পর্শ করেন আশীর্বাদ দেন ও নিজেরা চুম্বন করেন। একে বলে 'চুম্বন' (Chuman) অনুষ্ঠান। তবে এই অনুষ্ঠানটি হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানের পুরোপুরি সমতুল তবে হিন্দুরা ধান দূর্বা পাত্র পাত্রীর মাথায় ছড়ানোর সময়ে সংস্কৃতি সমবেত ভাবে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করেন। এই চুম্বন অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ কারী মহিলা পাত্র পাত্রীর সামনে রাখা কাঁসার থালায় একটি করে পয়সা রাখেন। বিবাহের পাত্রীর বর দিদিরা সবার শেষে চুম্বন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। পূর্বের ন্যায় পাত্রীর বর দিদিরা প্রথমে তাঁদের বনের স্বামীকে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে তাঁর নাম কি? নতুন জামাই তাঁর নাম জানানোর পরে জামাই এবার তাঁর স্ত্রীর দিদিকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর নাম কি? দিদি উত্তর দেওয়ার পর দিদি এবং জামাই উভয় কাঁসার ঘটিতে রাখা জলে আম ডাল ডুবিয়ে পরস্পরের উপর জল ছিটিয়ে দেয়, এই অনুষ্ঠানকে বলে 'Jhamka-Jhimki'। এবার পাত্রীর দিদি জামায়ের কান টেনে ধরে এবং পিঠে তিনটি তাপ্পর দিয়ে বলেন 'কান খুলে শুনে রাখো আজ থেকে আমি তোমার জ্যেঠ সাস (Jeth-Sas) তাই কোন দিন নিজের মুখে আমার নাম উচ্চারন করবে না'। এই দিন থেকে নতুন জামাই (Banhoi) এবং পাত্রীর দিদি (Jeth-Sas) দুই জন কাছাকাছি বসে না, একি আসনে দুই জন বসে না, পরস্পরের নাম মুখে আনে না, এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সামনা সামনি দুইজনে কথা বলে না বা ঠাট্টা ইয়ার্কি করে না।

বিদায় পর্ব:

বিবাহের শেষে নতুন জামাই তাঁর নিজের টাণ্ডাতে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হয়। পাত্রী (নতুন বউ) তাঁর পিতৃগৃহে কুটিরের বাইরে এসে দাড়ায় এবং দুই হাতে দুইটি খেঁজুর পাতা ভেতরের দিকে জোর করে ধরে রাখে। পাত্রীর স্বামী অর্থাৎ নতুন জামাই দরজার চৌকাঠে পাত্রীর পিছনে দাড়ায় এবং পিছুন থেকে নিজের দুই হাতের কব্জিকে ধরে, পাত্রীর মা কুঁড়েঘরের দরজার ভিতরের দিকে পাত্রের পিছনে এসে দাড়ায়। পাত্রী পক্ষের কয়েকজন মহিলা পাত্রীর মায়ের পিছনে দারিয়ে একটি শাড়িকে প্রসারিত করে উভয় দিক থেকে ধরে রাখে। অপর একজন মহিলা একটি ঝুড়িতে রাখা কিছু চাল নিয়ে পাত্রীর পাশে গিয়ে দাড়ায় এবং ঝুড়ি থেকে একমুঠো চাল নিয়ে পাত্রীর পেতে রাখা দুই হাতে মধ্যে দিয়ে পাত্রীকে প্রশ্ন করে 'তুমি কার ঘরকে ভালোবাসা দিয়ে পুরন করেছো?' এখন পাত্রীর মা মেয়ের ঘোমটা (মাথার কাপড়) পিছুনের দিকে একটু খানি টেনে ধরেন এবং পাত্রী নিজের মাথার উপর তিনবার কিছুটা করে চাল ছুরে দেয়। এই অনুষ্ঠানের অর্থ হল পাত্রী তাঁর ভাই বাবার ঘর থেকে টাকা পয়সা সৌভাগ্য কোন কিছু নিয়ে চলে যাচ্ছে না। এবার পাত্র এবং পাত্রী পাত্রের টাণ্ডার দিকে এগবার উপক্রম করলে পাত্রী পক্ষের কয়েকজন মহিলা এসে রাস্তা ঘিরে দারান এবং বলেন যে তাঁরা যে এতখন পাত্র পাত্রী উভয়কে সময় দিয়েছে তাঁর বিনিময়ে তাঁদের কিছু পাপ্য হয়। পাত্রের বাবা মহিলাদের হাতে কয়েক আনা পয়সা দেন এবং মহিলারা রাস্তা ছেড়ে দেন। এবার নতুন জামাই তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে নিজের টাণ্ডায় ফিরে যান।

পাত্রের বাড়িতে পাত্র-পাত্রীকে বরন:

পাত্রের বাড়িতে পাত্র-পাত্রী এলে পাত্রের মা ছেলে এবং নতুন বৌমাকে বাড়ির সামনে একটি ফাঁকা জায়গায় দারকরায় এবং উভয় এর মাথায় কাঁসার ঘটিতে রাখা হলুদ জল আমডাল দিয়ে ছিটিয়ে দেয়। পাত্রের বাড়িতে এই অনুষ্ঠানকে বলে 'স্বাগত অনুষ্ঠান' বা 'Archha-Parchha'। এই অনুষ্ঠানে পাত্রের মা নতুন বৌয়ের মাথায় একটি লোহার চুরিকে (Kharu) স্পর্শ করিয়ে বৌমার বাম হাতে পড়িয়েদেয় এই সময় পাত্রের টাণ্ডার অন্যান্য মহিলারা নতুন বৌ এবং তাঁদের ছেলেকে (বর) ঘিরে গান গেয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি ইঙ্গিত করে নতুন স্বামী-স্ত্রীকে উত্তেজিত করে।

এবার নতুন বৌকে নিয়ে তাঁর স্বামী যাতে নিজের টাণ্ডাতে ঢুকতে না পারে তাই পাত্রের বন ও দিদিরা বা সম্পর্কিত দিদিরা টাণ্ডার দরজা আটকে দাড়ায় এবং ভেতরে প্রবেশের জন্য কিছু উপহার চেয়ে বসে একে বলে Duar-Chhekowni Paisa অনুষ্ঠান। নতুন বৌ বন ও দিদিদের এক আনা পয়সা তুলে দিলে তাঁরা নতুন স্বামী স্ত্রীকে দরজা খুলে দেয়। কুঁড়েঘরে স্বামী-স্ত্রী প্রবেশ করলে পাত্রের ছোট বন নতুন বৌয়ের পা ধুইয়ে দেন এবং কষ্ট স্বীকার করে পা ধুইয়ে দেওয়ার জন্য নতুন বৌ লুকুণ্ডী (Lukundi) থেকে চারটি পয়সা ননদের হাতে দেয়। এবার মা তাঁর ছেলে ও নতুন বৌমাকে ভাত, ডাল, সবজি এবং মাংস খেতে দেন। এর পর পাত্র এবং নতুন বৌমাকে টাণ্ডার বাইরে আনা হয় যে খানে অধিবাসের সময়ে একটি পুকুর কাটা হয়ে ছিল। সধবা স্ত্রীরা ঐ অধিবাসের ছোট পুকুর থেকে জল নিয়ে ছেলে এবং নতুন বৌমাকে স্নান করায়। এবার ছেলে এবং নতুন বৌমা টাণ্ডার ভেতরে গেলে মেয়ের বাড়ির ন্যায় চুম্বান (Chuman) অনুষ্ঠান করা হয়। একি ভাবে ছেলের দাদা বৌমাকে বলেন যে আমি

তোমার ভাশুর হয় (Bau-Hanhar)। আমার সাথে তুমি কখনও ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে না, নাম মুখে আনবে না, এক আসনে বসবে না, ঘনিষ্ঠ ভাবে দারিয়ে কথা বলবে না। আমি তোমার 'আঝনার' (Ajnar)। কোন কোন জাঘি বা স্থায়ী ভাবে বসবাস কারী বিরহড়দের মধ্যে ছেলের বাড়িতে দ্বিতীয় বার 'Sinduri Rakab' অর্থাৎ সিঁদুরদান অনুষ্ঠান হয় একি রকম ভাবে।

সন্ধ্যায় পাত্রের বাবা তাঁর টাণ্ডার আত্মীয় সজনকে পানভোজন, নাচ-গান অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করেন। উপস্থিত টাণ্ডার সদস্যরা প্রথমে পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে হাঁড়িয়া এবং সেদ্ধ চাল উৎসর্গ করেন এবার নতুন বৌমা একটি শাল পাতার বর থালাতে ভাত নিয়ে এসে দাড়ায় এবং উপস্থিত সকল আত্মীয়কে সে ভাত দিতে চায়। উপস্থিত আত্মীয়রা বা বয়স্করা নতুন বৌমাকে বলেন, তুমি যদি আমাদের প্রত্যহ এমনি করে খেতে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা কর তাহলে আমরা আজ এখানে খাবো। অন্যথায় আমরা এখানে কিছু খাবো না, নতুন বৌ কথা দেন যে তিনি সবাইকে নিয়মিত খাবার দেবেন। আবারে সকলে খাবার খান ও নাচ-গানে আনন্দ করেন। খাবার পর তামাক এবং চুন চিবোতে চিবোতে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান।

নিরনিপির বা চৌঠা চৌঠী অনুষ্ঠান (Nir-Nipir or Choutha-Chouthi):

তৃতীয় দিন সকালে নতুন স্বামী ও স্ত্রী বিয়ের সময় থেকে পড়ে থাকা হলুদে রাঙানো কাপড়গুলি খুলে ছায় মিশিয়ে গরম জলে ফুটিয়ে পরিষ্কার করেন এবং কাপড়গুলি রোদে শুকাতে দেন। এখন নতুন স্বামী স্ত্রী নতুন শ্বশুরের টাণ্ডার উদ্দেশ্যে একত্রে গমন করেন। বৌয়ের হাতে থাকে ঘটি ভর্তি জল এবং মাথায় ঝুড়িতে থাকে কিছু পাথর অন্য দিকে স্বামীর হাতে থাকে তীরধনুক। পিছনে স্বামী এবং কিছুটা দূরত্বে সামনে স্ত্রী হাটতে থাকে। শ্বশুর বাড়ি কাছাকাছি এলে স্ত্রী ঝুড়ি এবং ঘটিটি নামিয়ে রেখে বাবার বাড়ির দিকে দৌর লাগায়, স্বামীও তখন ধনুক থেকে তীর

ছুরে স্ত্রীর পথ আটকানোর পথ চেষ্টা করে এইভাবে পরস্পর লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে। নতুন বৌ ঝুড়ির পাথরের নিচে রাখা কাদা নিয়ে স্বামীর গালে মাখিয়ে দেয় এবং এরপর ঘটি থেকে জল নিয়ে স্বামীর গালের কাদা ধুইয়ে দেন এরপর বউটি স্বামীর হাতে তীর-ধনুক তুলে দেন, এই পুরো বিষয়টি পাঁচবার সংঘটিত হয়। স্বামী এবং স্ত্রী ঝুড়ি থেকে পাথর তুলে নিয়ে পরস্পরের উদ্দেশ্যে পাঁচবার করে ছুরতে থাকে। প্রথমে বৌ-স্বামীর দিকে তারপর স্বামী-স্ত্রীর দিকে পাঁচবার পাথর ছোড়ে। এরপর স্বামী-স্ত্রী পুনরায় স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসে। নতুন বৌ মাথায় পাথর খণ্ড সমেত ঝুড়ি এবং হাতে ঘটি নিয়ে ফেরে এবং স্বামীর হাতে থাকে তীর-ধনুক। এবার স্বামী ও স্ত্রী ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নেন এবং স্নানের পর উভয় মিলে গ্রামের সমস্ত থানে যায় এবং পূর্বপুরুষদের আত্মার প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধা জানায়। চৌঠাচৌঠী প্রকৃতি পক্ষে একটি লোকচুরির নাটক বা লিলা। এর মধ্যে দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে আরষ্ঠতা কেটে যায়। পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় ও ভালোবাসা বাড়াবার অনুষ্ঠান এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব গ্রহণ করাকে বোঝায়।

পিছা সেঁটের অনুষ্ঠান (Pichha-Seter)

বিশেষ তিন থেকে চারদিন পড়ে নতুন বৌয়ের মেয়ের বাবার বাড়ি টাণ্ডা থেকে নতুন বৌয়ের জামাই বাবু এবং অন্যান্য আত্মীয়রা নতুন বৌয়ের শ্বশুর বাড়িতে আসে। নতুন জামাই সমস্থ অতিথিদের পা ধুইয়েদেন এবং তাঁদেরকে চুন-তামাক সেবন করতে দেন। এবার পরস্পর আলাপপরিচয় দেয়। এখন নতুন জামাই তাঁদেরকে পানভোজনে আপ্যায়িত করেন, এবং পরদিবস নতুন স্বামী-স্ত্রীকে স্ত্রীর বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় নতুন জামায়ের বাবা বা

শ্বশুর বৌমার বাপের বাড়ি থেকে আগত অতিথিদের হাতে Kunutam-Paisa যাতায়াতের ব্যায় হিসাবে তুলে দেন।

মেরম কুটম উৎসর্গ (Merom Kutom):

মেয়ে জামাই বাবার বাড়িতে ফিরে এলে মেয়ের বাবা গবর দিয়ে তাঁর বাড়ির উঠান পরিষ্কার করেন। ছেলের বাড়ি থেকে পাওয়া আটআনা পয়সা (বর্তমানে প্রকৃত মূল্য দিয়ে) একটি ছাগল বা শূকর কিনে আনেন। মেয়ের বাবা টাণ্ডার সকল অধিবাসিদের Kunutum অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানান, সকলে এলে ছাগল বা শুকরটিকে টাণ্ডার বাইরে আনা হয় এবং হাঁড়িয়া খেতে দেওয়া হয় পশু ও খাবার মুখে দিলে মেয়ের বাবা বা টাণ্ডার কোন বয়স্ক পুরুষ পশুটিকে মেরে ফেলে। এরপর নতুন জামাই অন্যদের সাথে হাত লাগিয়ে পুরুষ টাণ্ডার মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে পশুটিকে উৎসর্গ করেন। এবং পার্থনা করেন যাতে নতুন বিবাহিত মেয়েটির কোন অমঙ্গল না হয়। এরপর নতুন বিবাহিত মেয়েটি ঐ দিন মাংস রান্না করে সঙ্গে তাঁর মা অথবা অন্য মহিলারা সাহায্য করতে পারে। মেয়েটি সবাইকে ভাত এবং মাংস খেতে দেন। এই সময়ে মেয়েটির বাবা জামাইকে ঐ ছাগল বা শুকরটি কেনা হয়েছে জামায়ের বাবার দেওয়া Kunutam-Paisa থেকে ।

মারাং পূজা (Maroa-Puja):

পরদিবস নতুন স্বামী-স্ত্রী তাঁদের নিজেদের টাণ্ডাতে ফিরে যান। ছেলের বাবা সামর্থ অনুযায়ী একটি বা দুইটি ছাগল পূর্বের ন্যায় একি পদ্ধতিতে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে ছাগল বা শূকর উৎসর্গ করেন।

বানা সানা (Bana-Sana):

স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিরহড়দের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি চালু রয়েছে, নতুন স্বামী-স্ত্রীর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এবং পূর্বপুরুষদের আত্মাকে এই অনুষ্ঠানে ক্রিপ্ত থাকার স্বামী-স্ত্রীর মঙ্গল ভাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

১) সদর বাপলা (Sadar Marriage):

বিরহড়দের মধ্যে সদর বাপলা পদ্ধতিতে বিবাহ বা বিয়ে অধিক প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। ভালোভাবে খেয়াল করলে বোঝাযায় যে হিন্দু পদ্ধতি বিবাহের সঙ্গে বিরহড়দের সদর বাপলা বিবাহ পদ্ধতির অনেক কাংসে মিল রয়েছে। সদর বাপলা যদিও বিরহড়দের প্রধান বিবাহ অনুষ্ঠান, কিন্তু সদর বাপলা ছারাও বিরহড়দের মধ্যে আরও চার প্রকারের বিবাহ পদ্ধতি চালু রয়েছে যেমন –

২) বোলো বাপলা (Bolo Marriage):

এটি আসলে প্রেমকরে বিয়ের পদ্ধতি, কোনো মেয়ে যদি কোন বিরহড় ছেলেকে ভালবেসে ফেলে তাহলে মেয়েটি সরাসরি ছেলের বাড়িতে উপস্থিত হন এক্ষেত্রে মেয়ের পরিবার কিংবা ছেলের পরিবারের কোন সদস্যার নিসিদ্ধ বা বারন সুনতে সে বাধ্য নয়। ছেলের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে পছন্দ না করলে এমনকি শারীরিক এবং নির্যাতন করলেও সে স্বামীর বারিতেই থেকে যায় এবং শেষে পর্যন্ত বাড়ির বৌ হিসাবে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করে নেয় এই ধরনের বিয়েতে ছেলে এবং মেয়ের কোন দিকে সমাজ বা টাণ্ডার পক্ষ থেকে কোন রূপ বাধা তৈরি করা হয় না। বরপক্ষ যখন মেনে নেয় মেয়েটিকে বাড়ির বৌ হিসাবে তখন বিবাহের সমস্থ খরচ বরকে বহন করতে হয়। এই বিয়েকে ‘ধ্যুক্কু’ বিয়েও বলা হয়।

৩) অপরতাপ্পি বাপলা (Oportappi Marriage):

এই ধরনের বিবাহ বিরহড়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীন একটি বিবাহ পদ্ধতি। এটিও একধরণের প্রেমজ বিয়ে। কোন বিরহড় ছেলে যখন বিবাহযোগ্য বিরহড় মেয়েকে পছন্দ করে তখন সে মেয়েটিকে জোর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, যদি অন্য কোন বিরহড় ছেলে ঐ মেয়েকে ভালোবাসে তাহলে মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়ার অধিকারের জন্য উভই মেয়েটিকে নিয়ে টানা টানি করে। অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মারামারি পর্যন্ত গরায়। ছেলে বা মেয়ের পরিবার এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কোন ভাবে অংশ নেননা বা কোন পক্ষ গ্রহণ করেন না। হাতা হাতির মধ্যে যে ছেলেটি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় সে মেয়েটিকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করবার অধিকার পায় এবং মেয়েটিও বীর পাত্রকে স্বামী বলে গ্রহণ করে এই ধরনের বিয়েতে ছেলে এবং মেয়ে কোন পক্ষ থেকেই কোন রূপ বাধা সৃষ্টি করা হয় না। মেয়েটি ছেলের ঘরে থাকে এবং ছেলে পক্ষও মেয়েটিকে সাদরে গ্রহণ করে। প্রাচীন এই বিবাহ প্রথা 'উথলু বিরহড়'দের মধ্যে এবং সিংভূম জেলার 'হো' আদিবাসীদের মধ্যেও এখনও দেখা যায়। এই ধরনের বিবাহতে আলাদা করে কোন অনুষ্ঠান হয়না ফলে ছেলেপক্ষ এবং মেয়েপক্ষ কারুরি কোন ব্যায় হয় না।

৪) উরাউরি বাপলা (Urauri Marriage):

ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ থাকলে তখন এই ধরনের বিয়ে হয়। এক্ষেত্রে ছেলেরা ও মেয়ের বাবা-মা'রা কোন রূপ আপত্তি টেকে না। যে সকল ক্ষেত্রে মেয়ের পরিবার এই বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সে ক্ষেত্রে ছেলেটি মেয়েটিকে গোপনে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে। বিরহড় সমাজ 'উরাউরি' বাপলাকে বিবাহের একটি পদ্ধতি হিসাবে স্বীকার করেছেন। ফলে এই রূপ স্বামী-স্ত্রীরা বিরহড় সমাজে অন্যান্যদের মত

স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা পেয়ে থাকেন। জাঘি বিরহড়রা এই রূপ বিবাহকে নিন্দনীয় বলে মনে করেন। কারণ জাঘি বিরহড়রা মনে করেন যে এটি প্রকৃত পক্ষে কোন বিবাহ বা বাপলা নয় বরঞ্চ মেয়েটি ছেলেটির ঘরে রক্ষীতাঁর মত বাসকরে।

৫) গলামি খেঁটে বিয়ে (Golami Khete Marriage):

বিরহড় সমাজ ছারাও কোনো কোনো আদিবাসীদের সমাজে এই বিবাহ-রীতি কথাও কথাও চালু রয়েছে। সমস্থ আদিবাসী সমাজের বিয়ের সময়ে বরকে কন্যাপণ দিতে হয়। কিছু দারিদ্র্যের কারণে বহু ক্ষেত্রে বিবাহ যোগ্য এবং বিবাহে ইচ্ছুক ছেলেটি কন্যাপণ সংগ্রহ করতে না পারার জন্য বিয়ে করতে পারেন না, সারা জীবন অবিবাহ থেকে যেতে বাধ্য হয়। এই সকল ক্ষেত্রে বিবাহ যোগ্য পুরুষ মেয়ের বাড়িতে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে গোলামি খাটে কারণ কাজ কর্ম করার টাকা মেয়ের কন্যাপণ হিসাবে শোধ হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে বিরহড় এবং অন্যান্য আদিবাসী সমাজে দারিদ্র্য কতখানি তিব্রতম।

বিরহড় সমাজে বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি অত্যন্ত বিশেষত সামাজিক প্রক্রিয়া। সাধারণত বিরহড় স্বামী-স্ত্রীরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান এবং বিশ্বাসী। কিন্তু তারমানে এই নয় যে বিরহড় সমাজে বিবাহবিচ্ছেদকে স্বীকার করেন না। যে সকল ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্য কোনো মেয়ে পুরুষের প্রতি আসক্ত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে বিরহড় সমাজ বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বীকার করেন। অন্যথায় সমাজের মধ্যে ব্যভিচার ও অবৈধ প্রেম প্রবেশ করবে এবং সমাজে স্বাভাবিক সুস্থ্য সংগঠনটি ক্ষতি গ্রস্ত হবে। ন্যায়া বা বিরহড় সমাজের গোষ্ঠীপতি সমাজের মধ্যে কোন রকম ব্যভিচার বা অন্যায় বা অবৈধ প্রেম যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেই বিষয়ে সদা

সতর্ক থাকেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই বিরহড় সমাজে বহু বিবাহ প্রথা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৫.২.১.৯ উৎসব অনুষ্ঠান (Festival Occasions):

সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং বিরহড়রা একিই আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁদের সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একি হয়। সব আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় এরাও যে কোন উৎসব, অনুষ্ঠানে পানভোজন এবং নাচ-গানে তাঁদের ঐতিহ্য উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে টানা কয়েক দিন ধরে হাঁড়িয়া খাওয়া চলে। এই সময় পুরুষরা ধামসা, মাদল ও বাঁশি বাঁজায় এবং মেয়েরা তালে তালে নাচতে নাচতে গান গাইতে থাকে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নাচ-গান এবং পানভোজন মেতে ওঠে। চরম দারিদ্র্যের কারণে সাঁওতাল এবং মুণ্ডাদের মত এদের খুব বেশি অনুষ্ঠান থাকে না। তবে অল্প যে কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠান হয় তাতে প্রতিটি টাণ্ডার বা গ্রামের সমস্থ বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষরা শতস্ফূর্তভাবে আনন্দে যোগ দেয়। উৎসব অনুষ্ঠান বিরহড়দের চুরান্ত দারিদ্র্য জনিত জীবন-যন্ত্রণাকে সাময়িক ভাবে হলেও লুঘু করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসীরা প্রধানত পাঁচ ধরনের উৎসব অনুষ্ঠান করে। বর্তমানে যদিও হিন্দুদের ন্যায় বিরহড়রা দুর্গাপূজা, কালিপুজা, চণ্ডী পূজা, শীতলা পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদি পুজাতে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন। তবে বিরহড়দের তাঁদের নিজস্ব কিছু উৎসব অনুষ্ঠান রয়েছে সেই সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

১) সস বোঙ্গা পরব (Sos Bonga Festival):

এই উৎসবটি বিরহড় আদিবাসীরা আষাঢ় মাসে পালন করেন। বিরহড়রা কোন কালেই চাষবাসের উপর নির্ভর ছিলনা, এমনকি এখন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অয্যোধ্যাতে

বসবাসকারী বিরহড়রা চাষবাসের উপর নির্ভরশীল নয় কারণ তাঁদের চাষবাসের জন্য উর্বর জমি নেই। কিন্তু অন্যান্য আদিবাসীদের জমিতে তাঁরা মজুর হিসাবে চাষবাস করতো বা নিযুক্ত ছিল। আষাঢ় মাসে 'সস বোঙ্গা' পরব হল কৃষি কাজের সাথে সম্পর্কিত। যখন নতুন শস্য পাওয়ার লক্ষে জমিতে ধান রপনের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয় যাতে ফসল ভালো হয়। এই উৎসবে কুলোতে সস গাছের (ভ্যালা গাছের) ডাল এবং মুরগির ডিম প্রকৃতির (ঈশ্বরের) উদ্দেশ্যে বিরহড়রা উৎসর্গ করেন। এই সময়ে 'দেবী মায়ের' ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২) সহরায় উৎসব (Sohoray Festival):

পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের যে কোনো এক দিন বিরহড়, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রমুখ আদিবাসীরা 'সহরায়' উৎসব পালন করে। কৃষিজীবি সমাজে সারা বছর গরু এবং মহিষকে মানুষের প্রচুর পরিমানে উপকার করে তাই তাঁরা প্রতিদান হিসাবে পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের কোনো একটি দিন গরু এবং মহিষদেরকে পূজা করা হয়। এই বিশেষ দিনে গরু মহিষ ইত্যাদি গৃহ পালিত পশুর গোয়াল বা বাসস্থান ভালোভাবে পরিষ্কার করেন। গরু এবং মহিষের পা ধুইয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের পা এবং সিং এ ভালোভাবে তেল দিয়ে ঘোষে চকচকে করে তোলা হয়, মাথায় এবং সিং এ সিন্দুর ও হলুদ মাখানো হয়। এই উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতে চলে পানভোজনের অনুষ্ঠান। এই সহরায় অনুষ্ঠানের সময় বিবাহিত মেয়ে ও জামাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তার সাথে সাথে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন বাড়িতে উপস্থিত হয়। শরৎ কালে দুর্গাপূজার পূর্বে শরৎ উৎসবের ন্যায় মেয়েরাও স্বজনের সন্নিদ্ধ লাভের জন্য আকৃতি দেখায় এবং গান গাইতে থাকে।

'আপুঞতে ক মাইরে শূকরী ক তোগেন কান

বারেঞ তে ক মাইরে পিটাকি সাসাংকান নে

লেলাং মাইরে নেওতা সেলাং কার

জম লই মাই ঞু লই জন'।

অর্থাৎ

'বাবা শুয়োর কাটছে

ভাইরা পিঠা নিবেদন করছে

আমাদের নেমতন্ন করা হবে

পানভোজনে আমাদের আনন্দ হবে'।

সহরায় উৎসবে দ্বিতীয় দিনে করা হয় গোয়াল পূজা, ঐ দিন পরিবারের মেয়েরা নানা ধরনের গান গাইতে থাকে গরুগুলিকে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়, নিমপাতা, কাঁচা হলুদ ও আনারসের কচি পাতা থেঁতো করে গরুগুলিকে খাওয়ানো হয়। যাতে তাঁদের পেট খারাপ না হয় কোন রূপ চর্ম রোগ তাঁদের মধ্যে না ছরিয়ে যায়। সহরায় অনুষ্ঠানে উভয় দিন এমনকি পরদিন বিরহড়রা নাচ-গান, পানভোজন করে এবং আনন্দের সাথে এই উৎসব ও পরব পালন করে।

৩) কারাম উৎসব (Karam Festival):

কারাম বা করম উৎসবটি হয় করম গাছের নিচে। যে সকল টাণ্ডাতে বা গ্রামে করম গাছ কাছাকাছি থাকে না তাঁরা করম গাছের ডাল পুতে দিয়ে সেখানে করম উৎসব পালন করে। ভাদ্র মাসের শেষ একাদশী তিথিতে করম ব্রত পালন করা হয়। ঐ সময় বিরহড় মেয়েরা পুকুর, নদী, হ্রদ ইত্যাদির কাছ থেকে নরম মাটি তুলে এনে ডালিতে ভোরে তাতে চলা এবং মুখকলাই ইত্যাদি দানা শস্য ছরিয়ে দেয়। বাড়ির আঙিনায় এক মাস ডালিটি রাখা হয় এবং

পুরো আঙিনা আল্পনা দিয়ে সাজানো হয়। ডালিটি যেখানে থাকে সেই স্থান টিকি ঘিরে নিয়মিত চলে নাচ-গানের অনুষ্ঠান। সাধারণত ভাদ্র মাসের চতুর্থ তিথি থেকে একাদশীড় দিন বিরহড় মেয়েরা নিকটে জঙ্গল থেকে করম গাছের ডাল সংগ্রহ করে আনে এবং ডালটি আঙিনায় পুতে দেয়, তাকে ঘিরে সাধারণত নাচ-গান চলে। ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় জন্য বিরহড় মেয়েরা করম পূজা করে। পরের দিন বিরহড় মেয়েরা করম ডালটিকে নিকটবর্তি কোন জলাশয়ে বিসর্জন দেয়। করম উৎসবকে কেন্দ্র করে বিবাহিত মেয়েরা বাবার বাড়িতে আসে এবং বাবা-মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে মিলিত হয়, এই মিলন অনেক আনন্দের। তাই সমস্ত বিবাহিত মেয়েরা এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য সারা বছর অধিক আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে ও গান করে-

“কনঅ পরবে আনেবে লেগেবে

কনঅ পরবে আনেবে গ

করিবে বিদায়?

কিয়া খিয়াবে বাবা

কিয়া পিন্দ্ধ্যাইবে গ

কিয়া দিয়ে করিবে বিদায়?

করমা পরবে বেটি আসা ব লেগে ব গ

জিতিয়া পরবে বেটি করব বিদায়

লুগুয়া পিনদ্ধ্যাইব বহিন

ঢেনু গাই দে করব বিদায়”।

কোন পরবে আনবে আমায় আর কোন পরবেই বা বিদায় দেবে ? কি খাওয়াবে কি পরাবে আর বিদায় কালেই বা কি দেবে বাবা বল? অগত্যা বাবা-ভাইকে বলতে হয়- তোকে করমা পরবে আনব আর জিতিয়া পরবে বিদায় দেব। তোকে নতুন কাপড় পরাব আর বিদায় কালে ধেনু গাই দিয়ে বিদায় করব। বাস্তবে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী বিরহড় বাবা-মা, ভাইরা মেয়েদের আসা পুরুন করতে পারেনা। এখানে মেয়েরা সপ্নের জগতে বাস করে এবং নতুন পাওয়ার আশায় আনন্দে তাঁদের মন ভোরে ওঠে। মেয়েরাও যানে তাঁরা কিছুই পাবে না। তবুও গানে গানে তাঁরা পাওয়ার স্বপ্নে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে।

৪) সারহুল উৎসব (Sarhul Festival):

এই উৎসবটি ফাল্গুন মাসে হয় যখন বনবনান্তর, সারা জঙ্গল মহুয়া ফুল ও শাল ফুলের গন্ধে আমদিত হয়ে পড়ে, প্রকৃতি দেবী ফুলের অলঙ্কারে নিজেকে সাজিয়ে নেন এবং হয়ে ওঠেন অপরূপা সুন্দরি, তখন বিরহড়রা প্রকৃতির অপরূপ সুন্দরয্য অবগাহন হয়ে সারহুল উৎসব পালন করে। এটি একটি প্রকৃতি পূজা এবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এই উৎসব পালন করা হয়। ধামসা-মাদল, নিয়ে নাচ-গান, পানভোজন ইত্যাদির মধ্যে তাঁরা আনন্দে মাতয়ারা হয়ে ওঠে। নিম্নে গানটি উপস্থাপন করলাম-

‘সারি সারজং বুট্টারিগি জাহের* তাবং

সারজং বাহা বাহাঞ

মাতকম বাহা গেলে গেলে এন

সারি সারজং বুট্টারিগি জাহের তাবং

সানাম বাহা বাহাঞ

সানাম বাহা মসরং

ইঞ চ বাহাঞ’।

অর্থাৎ

‘সত্য শাল গাছের নিচে আমাদের জাহের

শাল ফুল আমি পরি

মহুয়া ফুল আমি ধরেছে

সত্য শাল গাছের নিচে আমাদের জাহের

সমস্ত ফুল আমি পরি

সমস্ত ফুল শুকিয়ে যায়

আমি যে ফুল পরি’।

সারহুল উৎসবে যে গানগুলি গাওয়া হয় তার মধ্যে থাকে বিরহড়দের বিরুদ্ধে সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের কথা, নিজেদের মধ্যে প্রেমের কথা এবং আনন্দের কথা প্রকৃত পক্ষে সারহুল উৎসব হল নিজেদেরকে প্রকাশ করবার একটি বিশেষ মাধ্যম।

৫) গরি-সেন্দ্রা উৎসব (Gori-Sendra Festival):

বিরহড়দের কাছে বাৎসরিক শিকার একটি অত্যন্ত আনন্দের উৎসব ‘গরি-সেন্দ্রা’ অর্থাৎ বিরহড়রা হনুমান শিকার করাকে অত্যন্ত আনন্দের এবং বাহাদরি কাজ বলে মনে করে। এখনও অয্যোধ্যা পাহাড়ে পূর্ব থেকে ঘষিত নির্দিষ্ট দিনে জঙ্গল মহলের সমস্ত প্রকারের আদিবাসী পুরুষরা একত্রিত হন শিকারের উদ্দেশ্যে। শিকার পাওয়া গেল কি না এটি বর কথা নয়, বরঞ্চ দলবদ্ধ হয়ে শিকারে অংশ গ্রহণ করাই আনন্দের। এক একটি টাণ্ডার বা গ্রামের

বিরহড়রা একত্রে একটি দল তৈরি করে শিকার উৎসবে যায়। শিকারে যাবার সময় তাঁরা সঙ্গে নেয় শিকার ধরার জাল, লাঠি, বর্সা, কাঠারি এবং কুঠার ইত্যাদি। জঙ্গলে হনুমান ছারাও হরিণ, বনশূকর, বনমরগ, সজারু, খরগোশ, কাঠবিড়ালি, ইত্যাদি শিকার করে আনে। শিকারের নির্দিষ্ট দিনে 'ন্যায়া' বা 'মোড়ল' খুব ভোরে নদী, ঝর্ণা, হ্রদে স্নান করতে যান এবং ফেরার সময় ঘটি বা ভার ভর্তি করে জল আনেন। এরপর বাড়িতে আসেন ন্যায়া ও ভিজে কাপড় ছারে এবং শুকনো কাপড় পড়ে, এক মুঠো আতপ চাল এবং ভার বা ঘটি ভর্তি জল নিয়ে 'সেন্দ্রা বোঙ্গার' পীঠ স্থানে 'জিলু জাহের' এ যান ওখানে আগে থেকেই শিকারের সব সরঞ্জাম রাখা থাকে। ন্যায়া শিকারের সব সরঞ্জামগুলির উপর হাতের আতপ চাল ও ভারের জল ছিটিয়েদেন এবং শিকারের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। ন্যায়া বিভিন্ন ধরনের তুকতাক সাহায্যে জানার চেষ্টা করেন যে শিকারের দেবতা সন্তুষ্ট কি না এবং শিকারে সুফল পাওয়া যাবে কি না। দেবতাকে সন্তুষ্ট করে শিকারের উদ্দেশ্যে বের হয়। যাবার সময় শিকারিরা খুব সাবধানে বের হয় যাতে কোন সমস্যা না হয় এবং যাত্রা পথে কোন অশুভ চোখে না পড়ে। সাধারণত ন্যায়া শিকারে অংশ গ্রহণ করে না। সম্মিলিত ভাবে শিকারিরা যে প্রাণীগুলি শিকার করে আনে সেগুলির মাথা বা ঘার 'ন্যায়া' পায়। এছাড়াও বাকি মাংস টাণ্ডার সমস্ত পুরুষদের মাঝে সমান ভাগে ভাগ করা হয়। ন্যায়াও টাণ্ডার অধিবাসী হিসাবে একটি ভাগ পায় পুরুষরা শিকার থেকে ফিরে এলে মহিলারা সমস্থির ফেলেন এবং কিছু সময় পরে মাংস রান্নার জন্য তোরজোড় করেন।

৫.২.১.১০ বিরহড়দের মৃত্যু ও মৃত দেহের সৎকার (Death and Cremation of the Dead Bodies of Birhors):

কোনো হিংসা বা মারামারির কারণে অস্বাভাবিক মৃত্যু না হলে বিরহড়রা সমস্ত মৃত্যুকেই ক্ষতিকর আত্মার দ্বারা সংঘটিত বলে মনে করেন। বিরহড়রা এটাও মনেকরেন যে মানুষের দুইটি আত্মা রয়েছে, পুরুষ আত্মা এবং স্ত্রী আত্মা। মৃত্যু বলতে দেহ থেকে যে আত্মার মুক্তি তাও বিরহড়রা স্বীকার করে। কোন কোন এলাকার বিরহড়রা বিশ্বাস করেন যে একি ব্যক্তির দেহ থেকে মুক্তি হয়ে যাওয়া পুরুষ এবং মহিলা ব্যক্তির পুনর্জন্ম ঘটায়। তবে এই পুনর্জন্ম সব সময় যে বিরহড় সম্প্রদায়ের মধ্যে ডুকবে তা নাও হতে পারে। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়েও পুনর্জন্ম হতে পারে, কেউ মারা গেলে তার আত্মীয় পরিজনের মৃত দেহের মাথাকে উত্তর দিকে শুইয়ে দেয় এবং একটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। বিরহড়রা মনে করেন যে কুঁড়েতে বাক্তির মৃত্যু হলে সেই কুঁড়েঘরের পরিবেশ মৃত্যু জনিত কারণে দূষিত হয়ে যায় (Gehi-Lotom)। মৃত দেহকে কুঁড়েঘরের বাইরে আনা হয় ঐ ঘরে রাখা সমস্ত জল, রান্না করা খাবার, ছাইপোরা কাঠকয়লা, অন্যান্য জ্বালানি ইত্যাদিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তিটি যে সকল বাসন ব্যবহার করে খেতেন সেগুলিকে বিক্রি করে ছাতু বা অন্য কোন খাবার কেনা হয়। টাণ্ডার পুরুষরা মৃত দেহকে সমাধি দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সমাধি স্থানে নিয়ে গেলে পুরুষরা মাটিতে একটি পয়সা রেখে ভগবানের কাছ থেকে মৃত দেহকে সমাধি দেওয়ার জন্য কিছুটা জমি কিনে নেন। মাটি খুরে সমাধি দেওয়ার স্থান তৈরির পড়ে মৃত দেহকে তিনবার সমাধি স্থানের চারপাশে ঘুরিয়ে সমাধির মধ্যে শোয়ান হয়। সমাধি দেওয়া শেষ হলে সংগ্রহ করা চাল, মুড়ি, ছাতু ইত্যাদি খাওয়া হয় এবং তার পূর্বে সবাই স্নান করে। মৃত্যুর দশদিন পরে শ্রাদ্ধ হয়। এই সময়ের মধ্যে যে পরিবারের ব্যক্তি মারা গেছেন তাঁরা শিকার করতে পারেন কিন্তু

শিকারের মাংস খাওয়া তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ তাঁরা ঐ মাংস বিক্রি করতে পারেন। ঐ দশ দিনের মধ্যে টাণ্ডাতে নাচ-গান বন্ধ থাকে যত দিন না শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয়। শ্রাদ্ধের দিন পরিবারের পুরুষরা মাথা নেরা করে। মৃত বাক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের দিনে মুরগি কেউ উৎসর্গ করে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি লাভের জন্য সবাইকে সামর্থ অনুসারে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিরহড়রা দরিদ্র হওয়ার কারণে নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজনরা সকলে প্রায় নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী চাল, ডাল, মুড়ি নিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির বাড়িতে আসেন। মৃত্যু কালে বিরহড় ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী ও পুত্ররা মৃত প্রায় ব্যক্তির মুখে একটু করে জল দেন। ব্যক্তির মৃত্যু হলে ব্যক্তির পরিবারের এবং টাণ্ডার স্বজনরা কুঁড়েঘরের বাইরে চলে আসেন দরজা খুলে রেখে যাতে মৃত্যু ব্যক্তির আত্মা বাইরে যাওয়ার সময় কোন রূপ বাঁধার সম্মুখ না হয়। সমাধি দেওয়ার পূর্বে সমাধি স্থানে মৃত ব্যক্তিকে তেল হলুদ মাখানো হয়। মৃত ব্যক্তির মাথাকে সমাধি স্থানের উত্তর দিক করে শোয়ানো হয়। কবরটি বা সমাধি স্থানটি ছয় ফিট লম্বা ও তিন ফুট চওড়া করে খোরা হয়। কোন কোন বিরহড় সম্প্রদায়ের মৃতের মাথা দক্ষিণ দিকে করে শোয়ানো হয়। সমাধির মধ্যে মৃত দেহটি মৃত ব্যক্তির পুত্র কবর দেওয়ার কালে বাম চোখটি বন্ধ করে হাতে একটি আলো নিয়ে কবরের বা সমাধি স্থানের চারপাশে তিন বার প্রদক্ষিণ করে। এবং সামর্থ অনুযায়ী মৃতের মুখে কয়েকটি তামার পয়সা রাখে। এছাড়াও কবরের মধ্যে বা সমাধি স্থানের মধ্যে রাখা হয় একটি শিকার ধরার জাল, একটি কুঠার, জাল টাঙ্গানর দুইটি লাঠি, একটি পাতাতে অল্প পরিমান তামাক এবং চুন ও সম্ভব হলে মৃত দেহের মাথার কাছে একটি কাঁসার থালা। স্থায়ী ভাবে বসবাস কারী জাঘি বিরহড়রা কবরের মধ্যে একটি নতুন কাপড় রাখে। কবর বা সমাধি দেওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা হয় ‘তুমি কখনই আর টাণ্ডার দিকে বা গ্রামের দিকে ফিরে আসবে না। টাণ্ডার বিপরীত দিকে জঙ্গলে যাবে শিকার ধরতে’। মহিলাদের

ক্ষেত্রে কবরের মধ্যে ঝুড়ি বোনবার ‘চপ তন্তু’ রেখে দেওয়া হয়, বলা হয় যে’ তুমি কবরের মধ্যে বসে ঝুড়ি বুনবে কখনই আমাদের মধ্যে ফিরে আসবে না’। এর পর সমস্ত আত্মীয়রা মাটি দেয় এবং অ-আত্মীয়রাও মাটি দেয়। এরপর কিছু পাথরের টুকরো কবরের উপর বা সমাধির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যাতে শেয়াল বা অন্য কোন বন্য জন্তু মাটি খুরে মৃত দেহটিকে নষ্ট করতে না পারে। মৃত দেহকে কবর দিয়ে সকলে যান নিকটবর্তী নদী বা ঝর্ণায় স্নান করতে। টাণ্ডায় ফিরে এলে মহিলারা জ্বলন্ত কাঠগুলি প্রস্তুতু করেন এবং তারপরে শাল গাছের আঠা (ধুনা) ছরিয়ে দেন যাতে সমস্থ কবর স্থান যাত্রী পুরুষ গভীর শাঁস নিয়ে শালের গন্ধ গ্রহণ করতে পারেন। এরপর সমস্ত কবর যাত্রী বাম পায়ের বুড় আঙ্গুল দিয়ে আগুন স্পর্শ করেন এবং আগুনের উপর বাম হাত নারান। এরপর তাঁরা মৃত ব্যক্তির কুঁড়েঘরের দিকে যান সেখানে জলের মধ্যে একটি তামার পয়সা কিছু পাতা ডুবিয়ে রাখা থাকে এবং কবর থেকে কবর দিয়ে ফিরে আসা ব্যক্তিরা ঐ জল নিজেদের শরীরে ছিটিয়ে নেয় এরপর পুরুষরা মৃত ব্যক্তির কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করে। যে স্থানে ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন সেই স্থানটি ভালোভাবে গবর, কাদা, মাটি এবং জল দিয়ে লেপে দেওয়া হয়। ঐ স্থানের উপর পুরু করে ছায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কারণ মনে করা হয় যে মৃত বাক্তির আত্মা ফিরে এলে তার ছাপ ঐ ছায়ের উপর পরবে। এরপর সকলে মিলে ছায়ের উপর কোনো ছাপ পরেছে কি না তা দেখার চেষ্টা করেন। ছাপ যদি চিহ্নিত হয় তাহলে বোঝার চেষ্টা করা হয় এই ছাপটি মৃত ব্যক্তির ছাপ বা অন্য কোন প্রেত আত্মার ছাপ। ছাপ বোঝা গেলে মাটি ঘোষণা করেন যে আত্মার সন্তোষটি করার জন্য পশু উৎসর্গ করতে হবে। মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন থেকে নবম দিন পর্যন্ত মৃত বাক্তির ছেলে বা বিধবা স্ত্রী বা বাবা–মা নিয়মিত সন্ধ্যায় টাণ্ডার বাইরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে (Kulhi-Muri) পাতার থালায় ভাত, ডাল, সবজি, পাতার কাপে জল, পাতার তামাক এবং চুন রেখে আসেন। যে জায়গাটিতে

রাখা হয় সেটি টাণ্ডা থেকে কবর স্থানের জায়গায় পরবে। যে ব্যক্তি খাবার দিতে যান তিনি ঐ স্থানে দারিয়ে হাত জোর করে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে বলবেন এখানে খাবার, জল, তামাক এবং চুন থাকল। তুমি আনন্দের সঙ্গে এইগুলি গ্রহণ করবে এবং শান্তি থাকবে। ছোট বাচ্চা মারা গেলে তার মায়ের দুধ সংগ্রহ করে বাচ্চাটির উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে রেখে আসা হয়।

মৃত্যুর সপ্তম বা নব দিনে মৃত ব্যক্তির হার সংগ্রহ করে টাণ্ডার বাইরে গাছের তলায় একটি গর্তে রাখা হয়। এবং উপরে একটি ভারি পাথর দেওয়া হয়। কারণ মনে করা হয় যে পূর্বপুরুষের আত্মা এসে এই হার টিকে নিজস্ব গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে থাকেন।

এবার মহিলারা নক কাটবেন, পুরুষরা মাথা নেরা করেন, মহিলা বিধবা হলে নিকটে ঝর্ণাতে লোহার কাহুটি ফেলে দেবেন এবং সকলে স্নান করে আসবেন। বিধবা মহিলা হলে নতুন বিধবার কাপড় পড়বেন যাকে 'Randi-Sari', সাধারণত এই শাড়িটি বিধবার বাবা বা ভাই মহিলার জন্য নিয়ে আসেন।

দশম দিন অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দিনে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তার ঘরের মধ্যে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নির্মিত বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে এরপর থেকে অন্যান্য পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তিকে স্বরণ করা হয়, এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় উমুল-আদের (Umul-Ader)।

- মৃত দেহকে কবর দেওয়ার জন্য টাণ্ডার আদিবাসী পুরুষরা যখন কবর স্থানে নিয়ে যায় তখন সকলে হরিবল, হরিবল, হরিবল বলতে থাকেন। বিরহড়, মুণ্ডা, সাঁওতাল হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথাটি চালু রয়েছে। এখানে ঈশ্বরকে স্বরন করে মৃত দেহকে সৎ কারের উদ্দেশ্যে বহন করা হয়।

৫.২.১.১১ ধর্ম বিশ্বাস ও দেব-দেবী (Religion Belief and God-Godess):

বিরহড় সমাজে অন্যান্য ধরনের আদিবাসীদের ন্যায় ধর্ম তাঁদের জীবনের অঙ্গ, বিরহড়রা বিশ্বাস করেন যে তাঁদের যা কিছু রোগ ও সমস্যা বা বিপদ তাদের পিছুনের কারণ অতীন্দ্রিয় কিছু শক্তি বা খারাপ আত্মা। তাই বিরহড়রা সর্বদাই চিন্তার মধ্যে থাকে। কীভাবে তাঁরা খারাপ আত্মার হাত থেকে নিজেদের পরিবার সমাজ এবং পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখবে, তাই বিরহড়রা খারাপ আত্মার শক্তির হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য বিরহড়রা প্রতিটি উৎসব উপলক্ষে পশু বলি দিয়ে উৎসর্গ করে। বিরহড়দের সমগ্র জীবন অর্থনৈতিক, গ্রাহস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মের দ্বারা, সমাক্রিত হয়। বিরহড়রাও মনে করেন যে তাঁদের জীবনে সবকিছুর উপরে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন কিছু আত্মিক শক্তি। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে 'বুরু বোঙ্গাঃ' ও 'ওরাঃ বোঙ্গাঃ' তাঁদের পাহাড়ের ও জঙ্গলের দেবতা এছাড়াও তাঁরা বিশ্বাস করে যে নদী, ঝর্ণা এবং পূর্বপুরুষদের আত্মার সকলে তাঁদের কাছে খাবার এবং সেবা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন। বিরহড়রা যখনি কোন শিকার করে তখন শিকারের কিছু অংশ তারা 'বুরু বোঙ্গা'র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। 'বুরু বোঙ্গা' ও পূর্ব পুরুষদের আত্মা শান্তি লাভ করলে তারা বিরহড়দের আশীর্বাদ করেন এবং তাঁদের কোনো ক্ষতি হতে দেন না। যখন বিরহড়রা অসুস্থ্য হন এবং চিকিৎসা করেও যখন তাঁরা সুস্থ হতে পারে না তখন তাঁরা দেবতার বা পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে শিকারকে উৎসর্গ করে বা উৎসর্গ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। বিরহড়রা মনে করেন যে তাঁদের অসুস্থ্য, গার্স্থ জীবনের সমস্যা, শিকার করতে গিয়ে বিপদ, অল্প বয়সে মৃত্যু ইত্যাদি কারণ তাঁদের দেবতা ও পবিত্র আত্মা ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁদের কাছে খাবার ও পানীয় চাইছেন। তাই বিরহড়দের সমস্থ জীবনেই পবিত্র আত্মার ও দেবতার দ্বারা পরিচালিত।

বুরু বোঙ্গাঃ ছারাও ‘সিং বোঙ্গা’র বা সূর্য দেবতার আরাধনা করে। ‘সিং বোঙ্গা’ সন্তুষ্ট থাকলে তিনি বিরহড়দের জীবন শুদ্ধ এবং খাবার সংগ্রহের সঙ্গী থাকেন এবং বিরহড়দের জিবনকে শক্তিশালি করেন। উথলু বিরহড়রা নতুন অনির্দিষ্ট জীবনে অপরিচিত পাহাড় এবং জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যায়। তখন ‘Mamita-Bhut’ এর উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গ করেন। এছাড়াও উথলুরা তাঁদের পারিবারিকগত এবং গোত্র ভুতদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্ত এবং পানীয় উৎসর্গ করেন।

বুরু বোঙ্গা (সৃষ্টি কর্তা), দেবী মাঈ (পৃথিবীর দেবতা-এরা হলেন পাহাড়ের আত্মা এবং বিরহড়দের পূর্বপুরুষদের আত্মা)। বিরহড়রা কিছু পশু দেবতাকে স্বীকার করেন। যেমন- বাঘ দেবতা (Bagh-Bir), ভাল্লুক দেবতা (Hundar-Bir), ওরাং ওটাং দেবতা (Bir-Banhey), হনুমান দেবতা (Hunuman Bir), বাবুন দেবতা (Bendar Bir) ইত্যাদি।

বিরহড়দের দেবতারা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিরহড়দের রক্ষা করে এবং এর জন্য পবিত্র আত্মার নির্দিষ্ট স্থানে তাঁদের উদ্দেশ্যে খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গ করতে হয়। পবিত্র আত্মার এই নির্দিষ্ট স্থানটির নাম জাহের থান বা স্থান, এখানে খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গ করা হয়। বিরহড়রা তাঁদের শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে মনে করে বুরু বোঙ্গা, সিং বোঙ্গা এবং হাপ্রামকে। অন্যান্য দেবতারা ভূত বলে স্বীকার করে। বিরহড়দের গোত্র অনুযায়ী আলাদা বোঙ্গা থাকে। একটি গোত্রের বোঙ্গা অন্য গোত্রের কাছে ভয়েরও কারণ হয়।

‘সিং বোঙ্গা’ এবং ‘বুরু বোঙ্গা’র পূজা সমস্ত বিরহড় সমাজে প্রচলিত। ‘সিং বোঙ্গা’ হলেন সূর্য ঈশ্বর তিনি সমস্ত বিপত থেকে বিরহড়দের রক্ষা করেন। ‘সিং বোঙ্গা’র পূজার সময় বিরহড়রা পূর্ব দিকে মুখ করে সাদা মুরগি এবং ছাগলকে উৎসর্গ করেন। ‘চাঁদ বোঙ্গা’ চাঁদ

কেও বিরহড়রা দেবতা হিসাবে স্বীকার করে। যদিও প্রাস্থ 'চাঁদ বোঙ্গা'র পূজা তাঁরা করেন। 'চৌরাশি বোঙ্গা' পূজা করে সন্তান জন্ম হওয়ার পরে। 'চৌরাশি বোঙ্গা'র পূজা না করলে নবজাতক জন্ম ধাত্রি মায়ের ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করে। সন্তান জন্মানোর ছয় দিনের মাথায় 'চৌরাশি বোঙ্গা' পূজা অনুষ্ঠানকে 'মাটিহাড়ি' অনুষ্ঠান বলে। 'সেন্দ্রা বোঙ্গা' হলেন চণ্ডী অর্থাৎ শিকারের দেবতা। জঙ্গলে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রবেশের পূর্বে 'সেন্দ্রা বোঙ্গা' পূজা করে এবং তার অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে শিকার করতে। অন্যথায় তাঁরা বিশ্বাস করে যে 'সেন্দ্রা বোঙ্গা'র অভিশাপে শিকার করতে গিয়ে বিপদে পরতে পারে। এছাড়াও বিরহড়রা দেবী মাঈ, মহা মাঈ, লরহা (নদী তীরের দেবতা), কুন্দ্রি বোঙ্গা (নদী দেবতা), বনলুমাই (বন দেবী), লুগু মাঈ (ধরিত্রি দেবী), বীর বোঙ্গা, কাঙ্গি, জিলেঙ্গা, হনুমান প্রমুখদের পূজা করেন। বিরহড়রা বিশ্বাস করেন যে দেব-দেবীরা ভাল মন্দ দুই করতে পারে তাই তাঁদের উদ্দেশ্যে মুরগি, ছাগল, হাঁড়িয়া উৎসর্গ করেন।

রজঃস্বলা মেয়েরা শরীর খারাপ কালে পূজা স্থানে যেতে পারে না, কারোর বাড়িতে যেতে পারেনা, এমনকি জঙ্গলেও প্রবেশ করতে পারে না।

Reference:

Dalton, E. T. (1872). *Descriptive Ethonology of Bengal, Calcutta.* Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta.

Fobers, L. R. (1872). *Report on the Rawati Settlement of the Government Farms in Palamou.* Calcutta: Government Printing Press.

Roy, S. C. (1925). *The Birhors: a Little Know Jungle Tribe of Chotonagpur.* Ranchi: Man in India Office.

Roy, S. C. (1925). *The Birhors: a Little Know Jungle Tribe of Chotonagpur.* Ranchi: Man in India Office.pp.90-92.

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন

(Indigenous Knowledge and Sustainable Development)

৬.১ আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান (Indigenous Knowledge):

Indigenous Knowledge (IK) – কে নিয়ে বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহে চর্চা চলছে, এবং উত্তরোত্তর এর চর্চাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ হিসাবে মনে করা হয় বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাংকের অন্যতম কর্মকর্তাগণ আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গল মহলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে উপস্থিত এই জ্ঞানের চর্চার উপরে গুরত্ব দিচ্ছেন। আদিবাসী সমাজের মানুষ জঙ্গল ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার রক্ষণাবেক্ষণ, নিজেদের প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ঠ জ্ঞানী। এই জ্ঞান সবসময় তাত্ত্বিক নয়, বরঞ্চ এটি অনেক বেশি প্রায়োগিক। অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাগণ লক্ষ্য করেছেন যে জঙ্গলে বা জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা বংশ পরম্পরাগত ভাবে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাটি সমূহের যে জ্ঞান আহরণ এবং সুরক্ষিত রেখেছেন তাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করেও এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের প্রাত্যহিক চাহিদাকে পুরণ করছেন।

সামাজিক নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে ‘Indigenous People’ বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের তাঁদের জীবন ধারণের জন্য চিরাচরিত জ্ঞান বিষয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 2009) ‘Indigenous Knowledge’ বলতে বুঝিয়েছেন, “Local and Indigenous

Knowledge refers to the understanding of skills and philosophies develop by societies with long histories of interaction with their natural surroundings". Gadgil, Beaker and Folke (1993) 'Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation' নামক তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধে বলেছেন যে 'Indigenous People' বা কোন রাষ্ট্রের আদিম আদিবাসীরা পরিবেশকে সুরক্ষিত রেখে প্রাচীন কাল থেকে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছেন এবং পরবর্তীতে পূর্ণ ব্যবহার যোগ্য হিসাবে সেগুলি সুরক্ষিত থাকছে। তাঁদের এই জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মকে প্রাকৃতিক সম্পদকে সুরক্ষিত করে রাখতে সহায়তা করছে।

কোন কোন গবেষক Indigenous Knowledge বা দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান শব্দটি ব্যবহার না করে পরিবর্তে 'Folk Knowledge' বা 'লোক জ্ঞান' ও 'Traditional Knowledge' বা 'চিরাচরিত জ্ঞান' শব্দগুলি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

Brian Morris (2010) 'Folk Knowledge' শব্দের প্রয়োগে অধিক সক্রিয় ভুমিকা নিয়েছেন। তাঁর মতে Folk Knowledge, "Simply means the knowledge that ordinary people have of their local environment: environs meaning what is around us". সুতরাং Morris (2010) –এর মতে লোকজ জ্ঞান হল-

১) অবশ্যই একটি স্থানীয় / দেশীয় জ্ঞান যা একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত।

২) লোকজজ্ঞান কখনও কখনও লিঙ্গ ভিত্তিক অথবা কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যা একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

৩) লোকজজ্ঞান জনগণের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এবং প্রায়োগিক জ্ঞান।

৪) লোকজজ্ঞান হাতে কলমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উঠে এসেছে।

৫) লোকজজ্ঞান অ-প্রথাগত জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মৌখিক ভাবে একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

৬) চিরাচরিত জ্ঞানের ন্যায় লোকজজ্ঞান সুস্থিত জ্ঞান নয় বরঞ্চ একটি প্রজন্ম থেকে অন্য আর একটি প্রজন্মে সঞ্চারিত হওয়ার সময়ে এটি পরিবর্তীত হয়।

৭) লোকজজ্ঞান পরিবেশ সংরক্ষণের নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

The World Intellectual Property Organization (WIPO) 'Indigenous Knowledge' বা 'আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান' শব্দের পরিবর্তে 'Traditional Knowledge' বা 'পরম্পরাগত জ্ঞান' বা 'ঐতিহ্যগত জ্ঞান' শব্দকে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে পরম্পরাগত বা ঐতিহ্যগত জ্ঞান বলতে, "Knowledge, know-how, skill and practices that are develop, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural and spiritual identity". তবে Borthaqar and Sing (২০২০) বলেছেন যে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান বা পরম্পরাগত জ্ঞান দুইটি শব্দের যে কোন একটি শব্দকে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং উভয় শব্দের বৈশিষ্ঠ্য একই।

Karen Robarts (1996) এর মতে, "Traditional Knowledge (TK) is holistic and can't be separated from the people…traditional knowledge parallerd scientific knowledge".

তবে পরম্পরাগত জ্ঞাণ সাধারণ ভাবে অনুশীলন ভিত্তিক জ্ঞান যা মূলত কৃষিকর্ম, মাছ চাষ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, বাগান চাষ, জঙ্গল বিদ্যা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত।

Convention on Biological Diversity (CBD, 1992) পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে ও স্থিতিশীল উন্নয়নে পরম্পরাগত জ্ঞানের উপর গুরত্ব দিয়েছেন।

Marie Battiste & James Henderson (2000) তাঁদের বই 'Protecting Indigenous Knowledge and Heritage' এ বলেছেন যে, আদিবাসী গোষ্ঠীদের দেশীয় জ্ঞানের সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে "No short answer exists". কারণ তাঁরা মনে করেন এই সংজ্ঞাগুলি উপর থেকে আরোপিত, দেশীয় আদিবাসীরা এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করুক বা না করুক। তাঁরা আরও বলেছেন যে জ্ঞাণ কখনই একক ভাবে উঠে আসে না। একটি জ্ঞাণ অপর জ্ঞাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষের পরম্পরাগত জ্ঞাণ থেকে কখনই পৃথকীকৃত নয়। তাই তাঁরা বলেছেন, "Knowledge is the expression of the vibrant relationship between people of the ecosystem, and the living being and sprits they share their lands". সুতরাং দেশীয় জ্ঞান কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান নয় বরঞ্চ এটি সৃষ্টি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক জগতের সম্মিলিত রূপ। যে সমস্ত দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন এই জ্ঞান সমূহকে ব্যবহার করে তাদের থেকে এই জ্ঞানকে কোন ভাবেই পৃথক করা যায় না।

Mc Gregor (2004) অন্যদিকে 'Traditional Ecological Knowledge' (TEK) শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে Traditional Ecological Knowledge dose not mean only "a body of knowledge but what the knowledge concise of how it's transmitted…. It's the relationship with the creation: it's their way that one relates". Traditional Ecological Knowledge- দেশীয় আদিবাসী মানুষদের অধিকারের

সঙ্গে যুক্ত এবং এদের থেকে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞানকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং Indigenous Knowledge কে সুরক্ষিত রাখতে হলে দেশীয় আদিবাসীদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে জড়িত প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন।

Brian Morris (2010) বলেছেন যে বহু গবেষক Indigenous Knowledge বা Traditional Ecological Knowledge শব্দগুলি ব্যবহার না করে এই বিষয়টিকে বোঝবার জন্য পৃথক শব্দের অবতারণা করেছেন- 'Folk Knowledge', 'Folk Biology', Ethno ecology', 'Ethnobotany', 'Local Knowledge', 'Traditional Environmental Knowledge' etc. সুতরাং Indigenous Knowledge জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে এবং বিশ্বে সমস্ত জীবের খাদ্য সুরক্ষার সুনিশ্চিত করণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে (UNEP-WCMC, 2021)।UNEP (1999) জীব-বৈচিত্র্যের সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সংরক্ষণে এবং সমগ্র বিশ্বের জীব- বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরত্ব দিয়েছেন। তাই জীব এবং তার সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে জীব-বৈচিত্র্যের ধ্বংস সাধন থেকে জীব-বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। এর জন্য দেশীয় ভাষা সমূহকে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। দেশীয় ভাষা হারিয়ে গেলে নির্দিষ্ট দেশীয় ভাষাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারেরও অবক্ষয় ঘটবে। তাই বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র জীব-বৈচিত্র্যের মূল্যবোধকে তাঁদের policy-এর মধ্যে সমন্বিত করছেন। আর এই কারনে National Education Policy (2020) 'Indigenous Knowledge' বা 'দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞানকে' শিক্ষা ও গবেষণার সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার কথা বলেছেন। এর জন্য সমস্ত ধরনের জাতি ভিত্তিক বিভেদের প্রাচীরকে ধ্বংস করতে হবে। ভারত সরকারের পক্ষে MHRD তাই দেশীয় জ্ঞান এর উপর গবেষণা এবং আলোচনা বিষয়ে গুরত্ব দিয়েছেন, যা Indian Knowledge System –এর একটি অংশ।

কোন একটি রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের মধ্যে দেশজ জ্ঞানের উপস্থিতি, দেশজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দেশজ জ্ঞান ও সংস্কৃতির নিরন্তর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান থেকে জানা যায় মানুষ কি ভাবে তার পরিবেশ, প্রাণীজ সম্পদ, উদ্ভিদজাত সম্পদ, মৃত্তিকা, জল এবং বায়ুর সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কে আবদ্ধ। খুব প্রাচীণ কাল থেকেই আদিবাসী মানুষরা বুঝেছিলেন যে আমাদের প্রকৃতি এবং তার অধীন উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যকে সুরক্ষাদান বা সুরক্ষিত করতে না পারলে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটবে। তার ফলে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে প্রাচীণকাল থেকে মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞানের নিরন্তর চর্চা থেকে বোঝা যায় দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান কিভাবে যুগে যুগে মানুষকে সহায়তা করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই জ্ঞানের পর্যালোচনা জরুরী ভিত্তিকভাবে হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী কোন নির্দিষ্ট এলাকার বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষের সম্বন্ধে যেমন- অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তেমনি এই ফসল কী ভাবে দেশীয় উপায় অবলম্বন করে সুরক্ষিত রাখা যাবে সেই বিষয়েও তারা যথেষ্ট তৎপর। প্রাচীন দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান থেকেও পরম্পরাগত ভাবে আদিবাসী মানুষরা জেনে এসেছেন কোন কোন গাছের ওষধি গুণ রয়েছে, কোন কোন গাছের কোন অংশে ওষধি গুন রয়েছে ; এবং কোন রোগের চিকিৎসায় এই গাছ/ গাছের বিশেষ কোন অংশকে ব্যবহার করা যাবে। আবার একই ভাবে ওষধি বৃক্ষের জন্মানোর ধারাবাহিকতাকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, কিভাবে ওষধি গাছগুলিকে সুরক্ষিত রাখা যায় এই বিষয়ে দেশজ জ্ঞানের চর্চা নতুনভাবে আলোকপাত করে।

মূল গবেষণা সন্দর্ভে ভেষজ জ্ঞান ভিত্তিক উদ্ভিদ, প্রাণী, ওষধি গাছ, খাদ্যযোগ্য মাশরুম, পোকামাকড় এবং প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হল-যেগুলি আদিবাসী মানুষরা বংশানুক্রমে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর পরম্পরাগত জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জেনেছেন।

৬.১.১ বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান (Sacred Grouves of Forest):

একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা, ঐ অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য চেষ্টা করেন। যেকোনো জনগোষ্ঠীতেই বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রকৃতির পূজা করেন এবং অন্যভাবে বললে শ্রদ্ধা সহকারে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টাটি এমনভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আদিবাসীদের রক্তে প্রবেশ করেছে যে ধারাবাহিকভাবে আদিবাসীরা এই জ্ঞানচর্চাকে পরম্পরা বলে মেনে নিয়েছেন। 'বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান' গুলি তাই প্রকৃতি পূজার স্থান (থান) যেখানে আদিবাসীরা কিছু পবিত্র বৃক্ষকে সুরক্ষিত রাখেন এবং ওইগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ঐ পবিত্র স্থানে যে গাছগুলি রয়েছে কখনোই সেগুলিকে নষ্ট করা হয় না। এই কারণে 'Sacred Grouves' অঞ্চলে কোন মানুষ কখনো প্রবেশ করে না। স্বাভাবিকভাবে বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ রয়েছে তারা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে বংশবৃদ্ধি ও বংশ রক্ষা করে থাকে। এলাকার আদিবাসী মানুষরা প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে, আর এর মাধ্যমে আদিবাসীরা প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক উপায়ে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজনেরা প্রকৃতির সংরক্ষণ বিষয়ে চিরাচরিতভাবে ও পরম্পরাগতভাবে সমন্বিত পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন, ফলে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে আত্মিক যোগাযোগ, এই যোগাযোগের সূত্র ধরে মানুষ

পরম্পরাগতভাবে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে শিখেছে। দেশজ আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের মধ্যে ছোটবেলা থেকে এই বোধটি জাগ্রত হয়েছে যে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন, নিজেদের অস্তিত্বকে ও প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। আর এইখান থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানে নতুন জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে যাকে বলা হয় Ethnobotany, Ethno zoology। কোন কোন গবেষক এই দুইটি পরস্পর সম্পর্কিত জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রকে একটি অবিভাজ্য চর্চার ক্ষেত্র রূপে দেখতে থাকেন - এটিকে বলা হয় 'Ethno Forestry'। 'পবিত্র বনাঞ্চলের স্থান' এবং তাতে উপস্থিত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী গোষ্ঠী সমন্বয় বিভিন্ন ধরণের আদিবাসী গোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অলঙ্ঘনীয় নীতিগুলি তৈরি করেছে (Gadgil & Vartak, 1976; Khiewtam & Ramakrishnan, 1989; Chandrashekara & Sankar, 1998; Hughes & Chandrean, 1998; Kanowski, 2000)।

সুতরাং 'বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান' হল পরম্পরাগতভাবে সুরক্ষিত নির্দিষ্ট বনাঞ্চল যা প্রাকৃতিক মিউজিয়াম হিসাবে পরিচিত এবং ধর্মীয় প্রথায় যেখানে উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ সম্পদ সমূহ সুরক্ষিত থাকে। বিশ্বাস করা হয় যে হাজার হাজার বছর ধরে বনাঞ্চলের এই স্থানে কখনো কোন মানুষের পা পড়েনি, সুতরাং ঐ পবিত্র বনাঞ্চলটি কুমারী বলেই আদিবাসী সমাজে স্বীকৃত হয়ে আসছে। Gadgil and Vartak (1976) এর মতে প্রাক-বৈদিক যুগেরও বহু পূর্বে আগে থেকেই যখন মানুষ চাষবাস করতে শেখেনি, পশু শিকার এবং ফলমূল খাদ্যের সংস্থান করত, তখনও মানুষ এই পবিত্র বনাঞ্চলে তাদের পায়ের ছাপ রাখেনি। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান নিয়ে যে সমস্ত বিজ্ঞানী চর্চা করেছেন তাঁরা মনে করেন জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানের (থান) গুরুত্ব অপরিসীম (Khan, Menon, & Bawa, 1997; Kosambi, 1962; Gadgil & Vartak, 1976)। কেবল মাত্র ভারতেই এক লক্ষ থেকে দেড়

লক্ষ বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান রয়েছে (Malhotra, Gokhele, Chatterjee, & Srivastava, 2007)।

এর ফলশ্রুতিতে বহু অবলুপ্ত বা প্রায় অবলুপ্ত জীব-বৈচিত্র্যের মধ্যের উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতি এই বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানগুলিতে আজও নিজেদের টিকিয়ে রাখবার মাধ্যমে পরিবেশকে সুরক্ষিত রেখেছে। সুতরাং বর্তমানে এই বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানগুলিকে পূর্বের ন্যায় টিকিয়ে রাখা আধুনিক মানব সমাজের কাছে প্রতিস্পর্ধিতা। যখন কোন পবিত্র বনাঞ্চলের মধ্যে পাহাড় থাকে বা তার মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় তখন এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষরা ঐ পাহাড়ে কোন প্রয়োজনেই ওঠে না, এমনকি এই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে থাকা নদীতেই মানুষ স্নান করে না বা মাছ ধরে না। তাদের কাছে নদীর ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চল, পাহাড় এবং বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানে দেবদেবীরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ান। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাদের চিরাচরিত ধর্ম বিশ্বাস থেকে ওই নির্দিষ্ট এলাকায় পাহাড়, নদী, জঙ্গল, ঝর্ণা, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির জীবন যাপনকে কোনভাবেই বিশৃঙ্খল করতে চাননা। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কোন ব্যক্তি ওই পবিত্র বনাঞ্চলে প্রবেশ করলে বা গাছ কাটলে বা কোন প্রাণীকে হত্যা করলে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হবে বা কোন চিকিৎসার অযোগ্য রোগে আক্রান্ত হবে। এই ভাবেই প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা নিজেদের পরম্পরাগত সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, উৎসব ইত্যাদির জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতি এবং সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছেন এবং সুরক্ষিত রাখছেন।

৬.১.২ ওষধি গাছ সমূহ (**Medicinal plants**):

অধিকাংশ দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষদের মধ্যে ওষধি গাছ-গাছড়া সমূহ তাদের সামাজিক জীবন এবং রোগের চিকিৎসা ও রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষদের জীবনে ওষধি গাছগাছড়া এবং রোগ নিরাময়ের মধ্যে একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কোন কোন লোককথায় দেখা যায় যে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা রোগের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট ওষধিযুক্ত গাছগাছড়া ব্যবহার করছেন। প্রতিটি রাষ্ট্রে যে সকল আদিবাসীরা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই ওষধি বৃক্ষের পরিচিতি এবং ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানের এক একটি জীবন্ত প্রদর্শন শালা হিসেবে পরিচিত। বিশেষত আদিবাসী মানুষেরা এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও কিছু কিছু ওষধি গাছ চেনে এবং গাছের নির্দিষ্ট অংশের ওষধি মূল্য জানে এবং কোন ধরনের রোগ নিরাময়ে এটিকে কিভাবে ব্যবহার করা যাবে সেই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। কোন কোন ওষধি যেমন রোগের চিকিৎসায়, পুরুষদের যৌন শক্তিবর্ধক হিসাবে প্রজননের কাজে এবং নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার ব্যবহারে ব্যবহৃত হয়। তেমনি কিছু কিছু ওষধি গাছগাছড়া শিকার কালে, বিবাহ এবং বন্ধুত্ব স্থাপনে সহযোগী হয়। আবার কিছু কিছু ওষধি গাছ ব্যবহার করলে মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা কোন গাছের শুধুমাত্র শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল, এমনকি গন্ধ শুঁকে বলতে পারেন এটি কি গাছ এবং একে কিভাবে ও কোন কাজে ব্যবহার করা হয়। এখনো পর্যন্ত ‘Ethno Botanist’ বা ‘Pharmacologist’ রাও এত সহজে ওষধি গাছ-গাছড়া চিনতে পারেন না। সুতরাং আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষজনের হাতে পরম্পরাগত ভাবে থাকে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান যেটি তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহায়ক।

৬.১.৩ জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় দেশীয় জ্ঞানের ব্যবহার (Use of Indigenous Knowledge in Water Conservation and Management):

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা জানেন কিভাবে জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা করতে হয়। হিমালয় পর্বত অঞ্চলে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কিভাবে করে থাকেন সেই বিষয়ে গবেষণা করেছেন Namtak & Sharma (2018)। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে আদিবাসী মানুষরা পুকুর কেটে শাখা-প্রশাখা যুক্ত দীর্ঘ খাল কেটে জল সঞ্চয় করেছেন, বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলেও জল সংরক্ষণের জন্য পুকুর কাটা, পুকুর সংস্কার এবং খালকাটার প্রথা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বনাঞ্চলে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা পুকুর কেটে ও কুঁয়ো কেটে জল সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত রয়েছেন। কোন কোন পরিবার নিজস্ব জমিতে পুকুর কেটে মাছ চাষ করেন। অন্যরা ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করতে পারলেও মাছ ধরার অধিকার তাদের থাকে না। এই ধরনের পুকুরের চারিদিকে পাড় বরাবর বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ বসানো থাকে এবং কিছুটা জমিতে সবজির চাষ হয়। এরূপ পুকুর সংশ্লিষ্ট ফল ও সবজি বাগান যেমন পরিবারের নিকট মানুষজনের জন্য স্বাস্থ্যকর, আর্থিক ভাবে লাভজনক, তেমনি সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। যেকোনো গ্রামের পক্ষে এইভাবে জল সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬.১.৪ সম্পদের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনায় ভেষজ জ্ঞানের ব্যবহার (Use of Herbal Knowledge in the Protection and Management of Forest Resources):

বনজ সম্পদ বিষয়ে চর্চা এবং দেশীয় মানুষ পারস্পারিক ঘনিষ্ঠের সম্পর্কে আবদ্ধ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসী গোষ্ঠীর জনগণ জেনেছেন পরিবেশ এবং জীব-বৈচিত্র্যের সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীল বিকাশ (Sustainable Development) এর গুরুত্ব, তাই বনজ

সম্পদের সংগ্রহ এবং ব্যবহারের উপর বিভিন্ন সময়ে এলাকার মানুষ জন বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। যেমন মাসিক রজঃচক্র চলাকালীন বিবাহিতা মহিলা এবং অবিবাহিতা মেয়েরা জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারে না। মাসের ওই কয়েকটা দিনে মেয়ে এবং মহিলারা জঙ্গলে বনজ সম্পদ, জ্বালানি কাঠ, শালপাতা, ফলমূল, ওষধি গাছ, দড়ি তৈরির উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে না। কারণ এর মাধ্যমে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা জঙ্গলের পবিত্রতাকেই বজায় রাখেন। আবার বর্ষাকালে জঙ্গলের মধ্যে বিশেষত গভীর জঙ্গলে (Core Areas of the Forest) কোন ব্যক্তি প্রবেশের অধিকার পান না। কারণ ওই সময়ে জঙ্গলের পশুরা প্রজনন কাজে লিপ্ত থাকে। মানুষের উপস্থিতিতে তাদের প্রজননক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। এই আশঙ্কা থেকে মানুষ জঙ্গলে প্রবেশ অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন। জঙ্গল ভিত্তিক এই চিরাচরিত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দেশীয় আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় লাভ করে থাকেন। শীতকাল এবং গ্রীষ্মকালে উচ্চ ডালে লাল পিঁপড়ে বাসা বাঁধে এবং গাছের পাতাগুলিকে শরীর নিষ্কৃত আঠালো পদার্থ দিয়ে জোড়া দেয়। ঐ পত্রবেষ্ঠিত গ্রন্থর মধ্যে লাল পিঁপড়েরা ডিম পাড়ে। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা ক্ষুধার তাড়নায় গাছ থেকে লাল পিঁপড়ের ডিম সংগ্রহ করে এবং রান্না করে খায়। লাল পিঁপড়ের ডিমকে বলে ‘কুর্কুট’, পিঁপড়ের ডিম সংগ্রহ করলেও আদিবাসী মানুষরা লাল পিঁপড়েগুলির কোন ক্ষতি করে না কারণ তারা বনজ প্রকৃতির সম্পদকে সুরক্ষিত রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট। বর্ষাকালে যখন ধারা বর্ষণ চলতে থাকে তখন জঙ্গলের মধ্যে বালি মাটি এলাকায় এবং পচা পাতার উপরে খাদ্যগুণ যুক্ত ছত্রাক বা মাশরুম জন্মায়। আদিবাসী মানুষরা ওই সময়ে জঙ্গলে নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশ করে এবং মাশরুম সংগ্রহ করে। মাশরুম সংগ্রহ করলে তারা পুরো এলাকার সমস্ত মাশরুম তুলে আনেন না কিছু মাশরুম রেখে আসে যাতে তারা বংশবিস্তার করতে পারে এবং মানুষ পুনরায় পরবর্তী সময়ে ব্যবহার করতে পারে। তাই

জঙ্গল সুরক্ষিত রাখতে হলে এবং জঙ্গল ভিত্তিক জীব-বৈচিত্র্যকে বংশ পরম্পরায় বাঁচিয়ে রাখতে হলে সাধারণ মানুষদেরকে এই কাজের সাথে যুক্ত করতে হবে। এভাবে বনজ সম্পদের ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা এবং তার স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর জন্য 'Participatory Forest Management Programme'(PFMP) বিভিন্ন জঙ্গল এলাকায় শুরু হয়েছে। বর্তমানে সরকার এবং এলাকার মানুষজনের মধ্যে জঙ্গলের সম্পদ ব্যবহার নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। অবশ্য একদিকে যেমন জঙ্গল এবং তার বনজ সম্পদের দীর্ঘ স্থায়ী সংরক্ষণ প্রয়োজন তেমনি অপরদিকে জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের বনজ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। জঙ্গল এলাকায় দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন জানেন জঙ্গলকে কিভাবে ব্যবহার করলে তার স্থায়িত্ব বজায় থাকবে।

৬.১.৫ মৃত্তিকা এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ সমূহের ব্যবস্থাপনায় দেশীয় জ্ঞানের ব্যবহার (Use of Indigenous Knowledge in the Management of Soils and Related Resources)

যেকোনো আদিবাসী দেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ পরস্পর সম্পর্কে আবদ্ধ। এটি সম্ভব হয়েছে কারণ দেশীয় মানুষরা এই সম্পর্কের সুরক্ষায় যথেষ্ট যত্নবান। দেশীয় আদিবাসী মানুষদের মধ্যে বহু জন মিলে একই সম্পদকে ভাগ করে ব্যবহার করতে দেখা যায়। আদিবাসী মহিলারাও বনজ প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খাদ্য সংগ্রহ এবং পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেকোনো চাষবাসের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে সমান শ্রম দেন। মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণে এবং পরিবার ভিত্তিক সবজি বাগানে মহিলাদের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে, মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণে এবং ব্যবস্থাপনায় মহিলারা যে ভূমিকাই গ্রহণ করেন তা বংশানুক্রমে পরম্পরাগত ভাবে তাঁরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে

দেন। সরকারিভাবে জঙ্গল এলাকায় পরিবেশ এবং বনজ সম্পদকে কোন ভাবে বিভাজিত এবং উত্তেজিত না করে 'Home Stay' এবং 'Ecotourism' এর ব্যবস্থা করতে পারলে আদিবাসীদের সঙ্গে শহরের মানুষদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। জঙ্গলমহলে মানুষের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, সাধারণ মানুষ জঙ্গল, বনজ সম্পদ ইত্যাদি সৌন্দর্য অনুভব করতে এবং জঙ্গল সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন বুঝতে পারবে। সর্বোপরি আদিবাসীদের চিরাচরিত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিরল সুযোগ পাবে। সুতরাং সুস্থ Ecotourism জঙ্গল এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সম্বন্ধে সর্বসাধারণকে স্বাস্থ্য জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

৬.২ স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development):

Sustainable Development শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয় 'United Nations Conference on Human Development' (1972) দ্বারা। ১৯৭২ সালে শব্দটি প্রথম ব্যবহার হলেও প্রায় ১৫ বছর পরে ১৯৮৭ সালে 'United Nation's World Commission on Environment and Development (WCED) এর সেমিনার রিপোর্ট 'Our Common Future' এর মধ্যে বহুলভাবে ব্যবহার হয়েছে। WCED(1987) 'Brundtland Commission' নামে পরিচিত, কারণ এই কমিশন এর চেয়ারম্যান ছিলেন নরওয়ের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী Gro Brundtland তাঁর নাম অনুসারে Sustainable Development বলতে বোঝায় সেই স্থিতিশীল উন্নয়নকে যার জন্য বর্তমানের সম্পদ সমূহকে চাহিদা অনুযায়ী এমন ভাবে ব্যবহার করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁদের চাহিদা অনুসারে সম্পদকে ব্যবহার করতে পারেন। 'Development' শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। তবে মোটামটি ভাবে

‘Development’ বলতে বোঝায়, “Development is a Culturally bounded Philosophically and Politically Combind term. The meaning of ‘what is development’ is as impacted by how it is define as it’s by whom”. (Lertzman, & Vredenburg, 2005, p.252)।

Brundtland report অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে যে ভয়ংকর দিকে এগিয়ে চলেছে তার থেকে মুক্তির একমাত্র পথ অর্থনীতি (Economy) এবং পরিবেশ চর্চা (Ecology) এর মধ্যে বিবাহ দান অর্থাৎ একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই রিপোর্টে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের সরকার, রাষ্ট্র প্রধান, এবং তাদের জনগণকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব পরিবেশগত ভাবে অবনমনের মধ্যে রয়েছে। এর থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে এবং অর্থনৈতিক নীতি রচনা করতে হবে যাতে পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিবেশের সমস্যা রক্ষায় সকলে সক্রিয় হয়। সুতরাং WCED এর মতে সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে ধাপে ধাপে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে পরিবেশবিদ্যার রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অর্থনীতি ইত্যাদি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে। তাই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জরুরী ভিত্তিকভাবে প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিষয়সমূহ যেমন জীবনধারণের গুণগতমান এবং অর্থনীতির মানদন্ডে বিভিন্ন গোষ্ঠী মানুষের মধ্যে বৈষম্যগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা যাবে না বরঞ্চ সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষাপটে সমস্যাগুলিকে বিচার করতে হবে আর এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে থাকবে আন্তর্জাতিক স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আগ্রহ।

WCED এর রিপোর্টে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি যেন সক্রিয়ভাবে অংশ

গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত পদক্ষেপ সমূহ দ্রুত গ্রহণ করেন। কমিশনের মতে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র সমস্যার অংশীদার না হয়ে যেন সমাধানের অংশ হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কোন কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মধারনা এই পরিবেশ সমস্যার কাজে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছেন তারও পর্যালোচনা জরুরি।

WCED (1987) এর ভাবনাকে আরও বিস্তীর্ণ করতে ১৯৯২ সালে 'United Nations' সংঘটিত করেন 'Recode Janiro Conference on Environment and Development', এবং 1998 সালে 'Kyto Conference 'United National Framework Convention on Climate Change'।

মানব সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি হলো পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের প্রয়োজনে কিছু 'Quality of Life Asset' কে রেখে যাওয়া যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সমূহ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়। সুতরাং sustainable development এর কেন্দ্রীয় নীতিটি হল 'Inter-Generational Equity' (Turner, Doctor, & Adger, 1994) কে সুরক্ষিত রাখা। WCED (১৯৮৭) ও প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁদের মতে যত দিন যাবে ততই শিল্পায়ন সমগ্র বিশ্বে বৃদ্ধি পাবে। এর পথ ধরে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হবে। সবুজ বনাঞ্চল দূষিত হবে, পুকুর, খাল, বিল, নদী এবং সমুদ্রের জল হয়ে উঠবে জীবজগতের পক্ষে বিষাক্ত, নষ্ট হবে বাতাস তথা পরিবেশ। এর পেছনে মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিল্পায়ন ঘঠিত উন্নয়নের ঊর্ধ্বমুখী লেখচিত্র। পর্বত প্রমাণ মানুষের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে তাই

ধ্বংস হয়ে চলেছে বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, বাতাস, পরিবেশ, এমনকি আদিবাসী জনগোষ্ঠী। পৃথিবীর সকল দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে তাই প্রকৃতির ধ্বংস মানে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নের সামনে দাঁড় করানো। তারপর প্রাকৃতিক সম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের জন্য একই সঙ্গে সুরক্ষিত রেখে যাওয়া যায়। এতে করে আদিবাসী সমাজ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, কারণ আদিবাসী সমাজ জানে কিভাবে Natural Capital (Ecological Economics) এর ধারণা কে ব্যবহার করে 'Natural Income' কে সংরক্ষিত রাখা যায়। এই 'Natural Capital' হলো সমস্ত ধরনের জৈব পদার্থ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের সমাহার (Daly, H., 1994) । সুতরাং মানুষের তৈরি সম্পদ এবং প্রকৃতির দেওয়া সম্পদকে একক গোষ্ঠীবদ্ধ কিছু মানুষ বা বিশেষ কোন কোন রাষ্ট্র একাকী সবটুকু ভোগ করবেন না; সমস্ত সম্পদকে, সমস্ত মানুষ এবং জীবজগতের জন্য সমানভাবে ব্যবহার করতে দিতে হবে। কবির কথায় -

এই জগতের যাহা সম্বল,

বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল,

সুস্নিগ্ধ মাটি সুধা সমজল পাখির কণ্ঠে গান, সকলের এতে সম অধিকার,

এই তার ফরমান। ভগবান! ভগবান!

(কাজী নজরুল ইসলাম)।

Turner এবং অন্যান্যদের (1994) মতে স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর মূল উপজীব্য হল প্রকৃতির সম্পদকে সুরক্ষিত রেখে একটি প্রজন্ম থেকে

পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া। সুতরাং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) হল-

“Sustainable Development is positive socioeconomic change that does not undermine the ecological and social systems upon which communities and society are dependent. Its successful implementation requires integrated policy, planning, and social learning process; its political viability depends on the full support of the people, it affects through their government, their social institutions, and their private activities” (Rees, 1989, p.3)।

সুতরাং যে কোন আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের সুস্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে হলে পরিবেশ, সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যাতে সমস্ত মানুষের মধ্যে সাম্য সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর একটি অংশ হল ‘Social Capital’।

Berkes and Folkes (1994) স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) বিষয়ে বলতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন ‘Cultural Capital’ এর ধারণাকে। তাঁদের মতে পরিবেশ এবং অর্থনীতি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তেমনি পরিবেশ এবং অর্থনীতি নির্ভরশীল সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গেও।

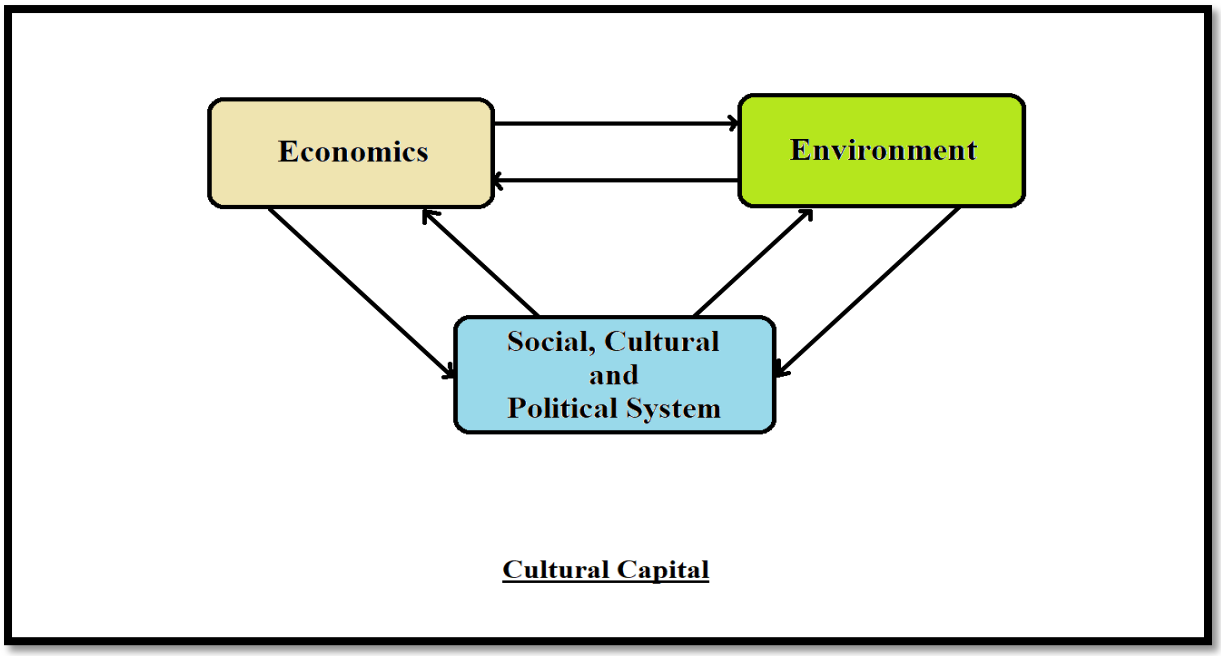

Lertzman (১৯৯৯) দেখিয়েছেন যে সাংস্কৃতিক বলতে জ্ঞান, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ রূপ সম্পদ সমূহ যার উপরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির ভিত্তি নির্ভর করে। যে বাস্তুতন্ত্রের উপর জগৎ নির্ভরশীল তাকে সুরক্ষিত রাখলে বৃদ্ধি সীমিত থাকলেও কিন্তু বিকাশ বা Development সীমিত হয়ে যাবে না। সুতরাং বিকাশ বা Development হল Sustainable এর সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু Growth বা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

৬.২.১ স্থিতিশীল উন্নয়নের নৈতিকতা (Morality of Sustainable Development):

প্রতিটি সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ তথা নৈতিকতা রয়েছে। ঐ মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার দিকগুলি তাদের সংস্কৃতির পক্ষে অবশ্যই অর্থপূর্ণ, সুতরাং প্রতিটি সংস্কৃতিরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের (Sustainable Development) প্রেক্ষাপটে। এটি নিশ্চিত যে দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের জমি, জীবিকা, জীবন উন্নয়নের নাম করে নষ্ট করা যাবে না। উন্নয়নের নামে জমি, জীবিকা এবং জীবনের কোন ধরনের ক্ষতি আদিবাসী গোষ্ঠীর সমাজের পক্ষে অভিপ্রেত নয়। আদিবাসী সমাজ যেহেতু পরম্পরাগত (TEK) ভাবে পরিবেশগত জ্ঞানকে চর্চা করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ঐ জ্ঞান তুলে দেয়, তাই

আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন কমিশনে স্বীকার করা হয়েছে যে স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর প্রয়োজনে Indigenous Knowledge, এবং Indigenous People কে সুরক্ষিত রাখতে হবে। যেমন Brundtland Commission (1987)-এর মতে, "These communities are the repositories of vast accumulations of traditional knowledge and experience that link humanity with its ancient origins. Their disappearance is a loss for the larger society which could learn a great deal from their traditional skills in sustainably managing very complex ecological systems." বিভিন্ন কমিশনের শ্বেতপত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে স্থিতিশীল বিকাশের (Sustainable Development) ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষজনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যাবে না (International Convention on Biological Diversity, Agenda 21, Guiding Principles on Forests; and the Reo-declaration on Environment and Development)। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের পরম্পরাগত জ্ঞান, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনাতে শ্বেতপত্র দাখিল হয়েছে (Battiste & James, 2000)।

দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদির কারণে একদিকে যেমন আদিবাসীদের জনজীবন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে অন্যদিকে তারা হারিয়ে ফেলছে তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের অধিকার, যেমন ভাষা, বৌদ্ধিক সম্পদ, এবং এর ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে জীব-বৈচিত্র্য পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং জীব-বৈচিত্র্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Nettle & Romaine, 2001)। পৃথিবীর ৬০% ভাষায় কথা বলে মাত্র ৪% মানুষ। এই সমস্ত অধিকাংশ ভাষা এবং ঐ ভাষাভাষী মানুষরা বর্তমানে সভ্যতার বিকাশ, শিল্পায়ন এবং দ্রুত হারে নগরায়নের ধাক্কায় প্রায় কোনঠাসা হয়ে পড়েছে অর্থাৎ, 'Bio Linguistic Diversity' আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। একটি ভাষার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য শব্দভাণ্ডারের চিরসমাধি। আর এই ভাষা ও তার শব্দভান্ডারের ধ্বংসের সাথে সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে

মানুষের যোগাযোগ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হচ্ছে। ভাষা মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় শব্দভাণ্ডার, জ্ঞানভান্ডার, পরিবেশের সাথে মানুষের বোঝাপড়ার সম্পর্ক। সুতরাং আদিবাসী মানুষদের ভাষার মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে ঐ বিশেষ ভাষাভাষী মানব গোষ্ঠীর ধ্বংসকেই আসন্ন করে তোলে। আদিম জনগোষ্ঠী তথা দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ, এবং প্রকৃতির থেকে আহরণ করেছে প্রচুর প্রায়োগিক এবং বর্ণনা মূলক জ্ঞান ভান্ডার। উপাত্তের তুলনায় এই তথ্যগুলি দীর্ঘ সময়কাল ধরে সত্য বলে প্রমাণিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালনায় এই জ্ঞান সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে। এই ভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের এবং বাস্তুতন্ত্রের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা কোন অংশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনার ব্যবস্থা থেকে কম নয়।

এই সামগ্রিক আলোচনা থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিল্পের প্রয়োজনে সম্পদকে প্রকৃতির কোল থেকে কেড়ে নিতে গিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষদের এবং তাদের সংস্কৃতিকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি, তা বিশেষভাবে অনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান করে। বরঞ্চ নৈতিকতার বিচারে আমাদেরকে এই সমস্ত মানুষদেরকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে তারা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ, প্রথা ইত্যাদিকে সংরক্ষিত করে চলতে পারে। স্থিতিশীল বিকাশের প্রেক্ষাপটে এইটুকু বলা যায় যে বাস্তুতন্ত্র, আদিম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং ভাষা ইত্যাদি একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিন্তু জটিল সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ। আর আমাদের করতে হবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধাভিত্তিক বাক্য বিনিময় যাতে বিশেষজ্ঞরা প্রবেশ করতে পারেন দেশীয়

আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ভাষার গভীরে। অন্যথায় স্থিতিশীল উন্নয়ন হারাবে নীতিবোধ এবং মূল্যবোধ।

৬.২.২ স্থিতিশীল উন্নয়নে বিরহড় আদিবাসীদের ভূমিকা (Roll of Birhor Tribe on Sustainable Development):

৬.২.২.১ বিরহড়দের মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি:

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীদের মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি ভিন্ন ও পরিবেশ বান্ধব। বিরহড় সমাজের কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর মৃতদেহকে একটি নতুন সাদা কাপড়ে জড়িয়ে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। গোরস্থানে মৃতদেহ আকারের তুলনায় একটু বেশি লম্বা এবং চওড়ায় মাটি খোঁড়া হয়। এরপর মৃতদেহকে চারপাশে তিনবার ঘুরিয়ে উত্তরদিকে মাথা করে খোঁড়া গর্তে শুইয়ে দেওয়া হয়। এরপর সকলে মিলে মৃতদেহটিকে মাটি চাপা দেয়। বিরহড়দের মৃতদেহকে সৎকার এর যে পদ্ধতি তা পরিবেশ সহযোগী অর্থাৎ এই সৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে কোন রকম পরিবেশ দূষণ হয় না। মৃতদেহটি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মাটির সাথে মিশ্রিত হয়, এর ফলে একদিকে যেমন মাটির উর্বরতাকে বাড়ায় সেইরূপ কোন রকম মাটি এবং বায়ুদূষণ হয় না। কিন্তু অন্যান্য অ-আদিবাসী মানুষজন শ্মশানে মৃতদেহকে পোড়ায়, ফলে পরিবেশে ব্যাপক বায়ু দূষণ এর সাথে সাথে পরিবেশ দূষণ হয়ে থাকে। এই দিক থেকে বলা যেতে পারে বিরহড় আদিবাসীদের পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ যে তাঁরা মৃতদেহকে আগুনে জ্বালানোর পরিবর্তে কবর দেন, যেটি পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের মৃতদেহ সৎকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

৬.২.২.২ আদিবাসীদের সারহুল এবং বাহা উৎসব (Sarhul And Baha Festival):

আদিবাসীদের বিভিন্ন উৎসব ও পরবের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল সারহুল এবং বাহা পরব। এই উৎসব বা পরবটি পালন করে আদিবাসী গোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুণ্ডা, বিরহড়, হো,

মাহালি, অসুর, প্রভৃতি গোষ্ঠী বর্গ। বিশেষত এই উৎসবটি পালন করা হয় ফাল্গুন মাসে, যখন শাল বনে শাল গাছে নতুন ফুলের আগমন ঘটে এবং মহুয়া গাছের মহুয়া ফুল দিয়ে গাছতলা ছেয়ে যায়। এছাড়া প্রায় সমস্ত গাছে নতুন পাতা গজায় এবং শাল ফুলের গন্ধে বন জঙ্গল ভরে ওঠে, তখন যেন মনে হয় যে প্রকৃতি দেবী ফুলের অলঙ্কারে সেজে আবির্ভূত হয়েছেন। এই সময় আদিবাসী গোষ্ঠীর পুরুষ, নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এবং শিশুরা আনন্দের সাথে এই উৎসব বা পরবে আদিবাসীদের প্রাচীন ঐতিহ্য বাদ্যযন্ত্র ধামসা, মাদলের তালে তালে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, প্রেম, তাঁদের নৃত্যের দ্বারা বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এভাবে জল, জঙ্গল, গাছপালা, নদী, পাহাড়কে পূজার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছেন। এই ভাবে বিরহড় আদিবাসীরাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরব উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছেন- এটি হল স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারক এবং বাহক।

৬.২.২.৩ বিরহড়দের বাদ্যযন্ত্র (Musical Instrument of Birhors):

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উৎসবে তাঁদের নিজস্ব বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করছেন যেমন - 'ধামসা', 'মাদল', 'বানাম', 'কাঁসর' বা 'ট্যায়ং', বাঁশের তৈরি বাঁশি, মোষের বা গরুর শিং এর তৈরি একধরণের বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। আদিবাসী খেরওয়াল গোষ্ঠীর মানুষজন যেমন সাঁওতাল, বিরহড়, হো, মুণ্ডা, অসুর, মাহালি, ভীল, কোড়া প্রভৃতি বহু প্রাচীনযুগে পূর্ব ও মধ্য ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলে এই সকল বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। এই বাদ্যযন্ত্রগুলি আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উৎসব, অনুষ্ঠান, বিবাহ ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

ক) ধামসা বা টামাক (Dhamsa or Tamak):

আদিবাসীদের 'ধামসা' হল একটি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র, আদিবাসীদের সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষ এই বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করেন। 'ধামসা' শব্দটির সাঁওতালি প্রতি শব্দ হল 'টামাক'। 'ধামসা' তৈরির জন্য কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। 'ধামসা' বা 'টামাক' এর গঠনটি তৈরি করা হয় লোহার পাত দিয়ে, যেটি দেখতে নারকেলের মালার মত। লোহা দিয়ে তৈরি ধামসার উপরের ভাগে অর্থাৎ বাইরের অংশটি বিভিন্ন রঙে রং করা হয় যেমন- লাল, সবুজ, নীল, সাদা, কালো, হলুদ ইত্যাদি। ধামসা বা টামাকের শব্দ অর্থাৎ আওয়াজকে আরো মধুর ও গম্ভীর করার জন্য ধুনো গুঁড়ো করে তার সাথে সরষে তেল ও মুরগির বা হাঁসের ডিম দিয়ে ভালোকরে মিশিয়ে একটা পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এরপর কিছুটা পেস্ট বা মিশ্রণটি 'ধামসা'র লোহা পাতের ভেতরে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং বাকি পেস্টটি চামড়ায় লাগানো হয়। এরপর 'টামাক' বা 'ধামসা'র উপরের অংশে অর্থাৎ যেখানে বাজানো হয় সেই স্থানে 'মোষে'র চামড়া ব্যবহার করা হয়। প্রথমে মোষের চামড়াকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন দিয়ে রোদে শুকাতে দেওয়া হয়, ভালো ভাবে শুকিয়ে গেলে চামড়া টিকে ঘষে পালিস করে নেওয়া হয়। এরপর ধামসা তৈরির জন্য প্রস্তুত করা হয়। 'ধামসা' বা 'টামাক' এর উপরি ভাগে মোষের চামড়া টিকে বেঁধে টান দেওয়ার জন্য 'গরুর' চামড়া ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় গরুর চামড়াটিকে শুকিয়ে পালিশ করে দড়ি আকারে কেটে নেওয়া হয় এবং 'ধামসা' টিকে বাধার জন্য এই গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি দড়ি দিয়ে 'ধামসা' টিকে টান দেওয়া হয়। এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে 'টামাক' বা 'ধামসা' টি সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি হয়। এই 'টামাক' বা 'ধামসা' টিকে বাজাবার জন্য পলাশ ও আঁকর গাছের শক্ত ডাল থেকে কাঠি তৈরি করা হয়। আদিবাসী মানুষরা এই পলাশ গাছের দুইটি কাঠি দিয়ে আনন্দের সাথে এই ধামসা বাজান।

ধামসা বা টামাগ

খ) মাদল বা তুমদা (Madol or Tumda):

আর একটি আদিবাসীদের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র হল 'তুমদা'। বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে তুমদাকে মাদল বলে। 'তুমদা' শব্দটি একটি সাঁওতালী শব্দ। তুমদা বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিগত শব্দের কারণে এই বাদ্যযন্ত্রের নাম রাখা হয় 'তুমদা'। এই মাদল বা তুমদাটি গোলাকার লম্বা খোলের মত দেখতে, এটি বেশির ভাগ মাটি দিয়ে তৈরি। এই মাদল বা তুমদাটির দুই প্রান্তে ছাগলের চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে এবং তার উপর মাটি দিয়ে আবরণ করা হয়। দুই প্রান্তে গোলাকার চামড়া দুইটিকে বাঁধার জন্য ও টান দেওয়ার জন্য গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি দড়ি দিয়ে টান দেওয়া হয়। যেহেতু 'তুমদা' বা 'মাদল'টি বেশির ভাগ মাটি দিয়ে তৈরি তাই সাবধানের সাথে ব্যবহার করতে হয় এবং দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাজানো হয়, কোন কাঠি বা স্টিক ব্যবহার করা হয় না। এই 'তুমদা' বা 'মাদল' দিয়ে সুর তোলা হয় এবং সাথে সাথ দেয় 'টামাক' বা 'ধামসা'। দুই বাদ্যযন্ত্রের তালে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের আনন্দের উৎসব, অনুষ্ঠানগুলির সাথে একত্ব বোধ করেন।

মাদল বা তুমদা (Madol or Tumda)

আদিবাসীদের এই বাদ্যযন্ত্রে কোন রকম দূষিত পদার্থ অর্থাৎ উপকরণ ব্যবহার করা হয় না, এই বাদ্যযন্ত্রগুলি কোন রকম শব্দ দূষণ করে না, কোন ভাবে কোন ব্যক্তির হৃদরোগের কারণ হয় না, বহু প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসীরা এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কারণে কোন রূপ পরিবেশ

দূষণ হয় নি। তাই আদিবাসীরা তাঁদের এই পরম্পরাগত ঐতিহ্যপূর্ণ বাদ্য যন্ত্র 'তুমদা' এখনও তাঁরা বংশ পরম্পরায় বহন করে চলেছেন। আধুনিক সমাজে আধুনিক বৈদ্যতিক বাদ্যযন্ত্রের কারণে যে শব্দ দূষণের ফলে পরিবেশ তথা মানব সমাজ জর্জরিত হচ্ছে, কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী সমাজ তাঁদের পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা তাঁদের সংস্কৃতির প্রকাশের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ এবং মানব সমাজকে শব্দ দূষণের হাত থেকে বাঁচাবার পথ দেখাচ্ছেন। পরিবেশকে ও মানব সমাজকে রক্ষার জন্য আদিবাসীদের এই বাদ্যযন্ত্র সাংস্কৃতিক স্থিতিশীল উন্নয়নে সহায়ক।

গ) কাঁসর বা ট্যায়ং (Kasor or Tayong):

আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা বিভিন্ন পালাপার্বণ, উৎসব, বিবাহ ইত্যাদি ঐতিহ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরম্পরাগত সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের জন্য যে সমস্ত প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন তার মধ্যে এখানে বিশেষ বাদ্যযন্ত্রটি হল 'কাঁসর' বা 'ট্যায়ং'। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরহড়, সাঁওতালরা বিশেষ ভাবে কাঁসর'কে ব্যবহার করেন। 'ট্যায়ং' শব্দটি একটি সাঁওতালী শব্দ, এর বাংলা প্রতি শব্দ হল 'কাঁসর'। এই কাঁসর বা ট্যায়ং বাদ্যযন্ত্রটি কাঁসার ধাতু দ্বারা নির্মিত। কাঁসার ধাতু ভারতবর্ষে প্রথম আদিবাসী মানুষরাই পত্তন ঘটান। আদিবাসী সমাজে কাঁসার ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়, যেমন- কাঁসার ধাতু দ্বারা নির্মিত থালা, বাটি, গ্লাস, বালতি, ঘয়রা, হাতা-চাটু ইত্যাদি। আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন প্রাচীনকাল থেকে কাঁসর বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করে চলেছেন। এই বাদ্যযন্ত্রটি আদিবাসীদের বিভিন্ন নৃত্য এবং সঙ্গীতে ছন্দ ও তালের রক্ষায় ব্যবহার হয়। বিজ্ঞান সম্মত ভাবে বলা যেতে পারে কাঁসর এর আওয়াজে একটি কম্পন তরঙ্গের সৃষ্টি হয় যেটি বাতাসে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম।

এটি মানুষের ব্যবহার যোগ্য স্থানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কাঁসর এর আওয়াজে পরিবেশে কোনো রকম শব্দ দূষণ হয় না, উপরন্তু জঙ্গলের গাছপালার পাতাতে যে সমস্ত নেতিবাচক ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস রয়েছে সেগুলিকে বিনাশ করে। লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে বর্তমানে বুদ্ধিস্টরা তাঁদের মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করার জন্য বা মনোযোগ স্থির রাখার জন্য কাঁসার তৈরি ছোট বাটির মতো অর্ধ গোলাকার পাত্রে একটি ছোট কাঠের তৈরি মোটা স্টিক দিয়ে চারপাশে ঘুরিয়ে একটি কম্পন শব্দ বা আওয়াজ বের করেন। তাই বলা যেতে পারে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা কাঁসর বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক প্রকারের স্থিতিশীল উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।

কাঁসর বা ট্যায়ং

ঘ) 'বানাম' (Banam):

আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায়দের ঐতিহ্যগত প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে 'বানাম' বাদ্যযন্ত্রটি অন্যতম। আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা গভীর জঙ্গল, পাহাড়, মালভূমি অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন সুপ্রাচীন কাল থেকে। তাঁরা প্রথম ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সংস্কৃতির বিকাশে পত্তন ঘটিয়েছেন। আদিবাসীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও উৎসবে 'বানাম' বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করেন এবং প্রত্যেক বাড়িতেই এই 'বানাম' বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহার হয়।

আদিবাসীরা বানাম বাদ্যযন্ত্রটিকে যে সমস্ত উপকরণ দিয়ে তৈরি করেন সেগুলি হল- মালেয় (নারকেলের মালাই), মৃত ছাগলের চামড়া, বাঁশের টুকরো, তাল গাছের শিরা দ্বারা নির্মিত দড়ি, ঘোড়ার ল্যাজের চুল ইত্যাদি।

'বানাম' তৈরির জন্য প্রথমে একটি গোটা নারকেলকে ছাড়িয়ে নারকেলের মালাকে মাঝখান দিয়ে সমান বরাবর কেটে নেওয়া হয়। এরপর নারকেল মালার অর্ধেক অংশ ভেতরের এবং বাইরের দিক ভালো করে পরিষ্কার করে পালিশ করে নেওয়া হয়। অন্য দিকে একটি মৃত ছাগলের চামড়া ভালকরে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে 'বানাম' তৈরির জন্য প্রস্তুত করা হয়। এরপর প্রস্তুত করা ছাগলের চামড়াটিকে নারকেলের মালার উপরের অংশে মাপ অনুযায়ী বসিয়ে বেঁধে নেওয়া হয়। তারপর গোলাকার ও লম্বাকার প্রায় ১.৫ ফুট বাঁশের টুকরো নারকেল মালার মাঝ বরাবর লাগিয়ে নেওয়া হয়। এরপর ঘোড়ার ল্যাজের চুল বা তাল গাছের শিরা দিয়ে তৈরি একধরণের দড়ি দিয়ে নারকেলের মালাটি এক প্রান্তে বাঁধা হয়, অপর একপ্রান্ত গোলাকার বাঁশের ডগায় বাঁধা থাকে। 'বানাম' কে বাজানোর জন্য একটি ধুনকের আকৃতি তৈরি করা হয়। এর উপকরণগুলি যেটি অর্ধগোলাকার অংশে থাকে পাতলা সরু বাঁশের তৈরি, এই (বাঁশের তৈরি উপকরণ ধনুক আকৃতির) দুই প্রান্তে ঐ তাল গাছের শিরা

দিয়ে বাঁধা হয় লম্বা বরাবর। ‘বানাম’ বাদ্যযন্ত্র দ্বারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা তাঁদের চিরাচরিত সংগীতের বা গানের সুরে সুর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারে পরিবেশে কোন শব্দ দূষণ হয় না, কারণ ‘বানাম’ বাদ্যযন্ত্রটির আওয়াজ বা শব্দ তীক্ষ্ণ নয়। এই বাদ্যযন্ত্রটির আওয়াজ নমনীয়তার জন্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ পরম্পরাগত ভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ‘বানাম’ ব্যবহার করে আসছেন। এইভাবে পরিবেশের সাথে স্থিতিশীল উন্নয়নে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন সহযোগিতা করছেন এবং এইভাবে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা এখনও তাঁদের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলি টিকিয়ে রেখেছেন।

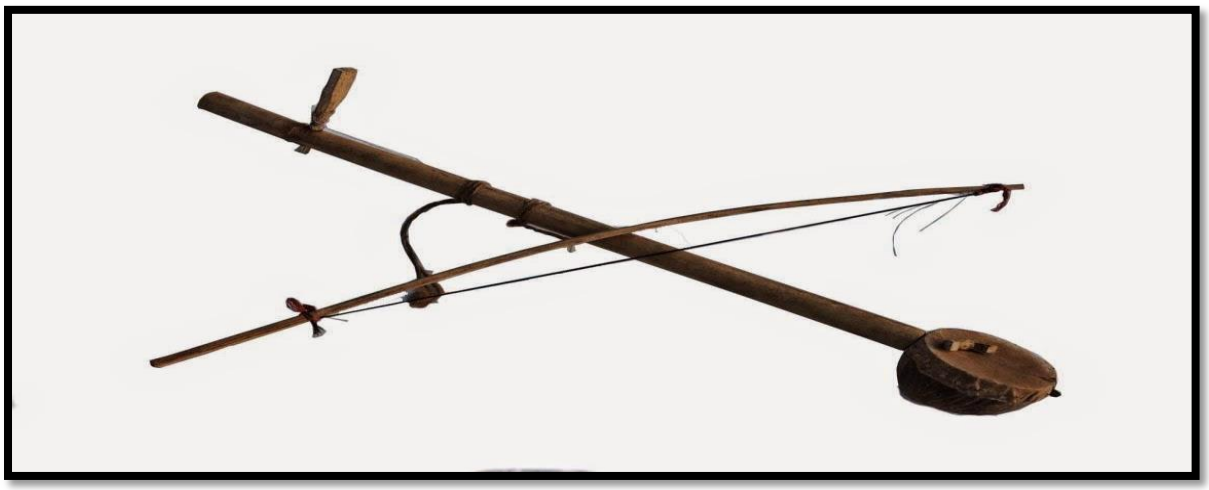

বানাম

৬.২.২.৪ জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ (Collecting Wood from Forest):

ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের একটি অংশ পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের ঢালে ও পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চলে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের জীবন নির্বাহের জন্য জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে নিকটবর্তী বাজারে বিক্রয় করেন। বিরহড়দের জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ এবং বিক্রি করা তাঁদের প্রধান অর্থনীতি। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে বিরহড় সম্প্রদায়ের আদিবাসীরা জঙ্গলের জীবন্ত গাছ কাটেন না, এবং গাছের কাঁচা শাখা-প্রশাখাগুলিও কাটেন না। তাঁরা ঘন জঙ্গলে যে সমস্ত গাছগুলি মরে গিয়ে শুকিয়ে গেছে বা অর্ধ শুকনো এবং যে গাছের শুকনো শাখাপ্রশাখা বা ঝাঁটিপাটি রয়েছে সেই ডালগুলিকেই কাটেন এবং বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যান। এছাড়াও জ্বালানি হিসাবে শুকনো ঝাঁটিপাটিগুলি সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। বিরহড়রা জঙ্গলের শুকনো পাতা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য কখনই সংগ্রহ করেন না, এর পিছনে কিছু কারণ রয়েছে। যেহেতু বিরহড়রা জঙ্গলের ঝাঁটিপাটি বা গাছের শুকনো শাখা প্রশাখা ডালগুলি ব্যবহার করেন জ্বালানি হিসাবে, তাই তাঁরা গাছের শুকনো পাতা ব্যবহার করেন না। এছাড়াও শুকনো পাতা ব্যবহার না করার বিশেষ কারণ হল- বছরের একটি বিশেষ ঋতুতে গাছের সমস্ত শুকনো পাতাগুলি ঝরে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর বর্ষার জলে শুকনো পাতাগুলি ভিজে পচে জৈব সারে রূপান্তরিত হয়, এবং মাটি উর্বর হয়। ঐ মাটিতে জঙ্গলের গাছের বীজ পড়ে নতুন গাছের জন্ম হয় ও বিভিন্ন ছোট ছোট প্রাণীর ও পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল গড়ে ওঠে। এই ভাবে জঙ্গলে স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের প্রক্রিয়া বজায় থাকে। বিরহড়রা কখনই জঙ্গলের জীবন্ত গাছকে কেটে বনজঙ্গলকে ধ্বংস করেন না। তাঁরা কখনই প্রকৃতির সম্পদকে একই বারে ব্যবহার করে শেষ করেন না। দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ও জীবন নির্বাহের জন্য

যেটুকু জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করলে তাঁদের জীবন-যাপন চলবে সেই টুকুই জঙ্গল থেকে তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করেন। কিছু কিছু বিরহড়রা শাল গাছের পাতা সংগ্রহ করলেও তাঁরা কখনই একটি গাছের সম্পূর্ণ পাতাগুলি তুলে নেন না। যে পাতাগুলি গোড়ার দিকে বর পাতা সেই পাতাগুলি তাঁরা তোলেন এবং শাল পাতার থালা তৈরি করেন। বিরহড়রা তাঁদের বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন কুড়ুল, কাঠারী, কোদালের বাঁট বা ধরার অংশ তৈরির জন্য কোন কাঁচা গাছের ডাল বা কাঁচা গাছ কাটেন না। অযোধ্যার গভীর পাহাড়ি জঙ্গলে এক ধরনের শক্ত গাছ রয়েছে, সেই গাছটি যতক্ষণ না শুকিয়ে যায় ততক্ষণ বিরহড়রা সেই শুকনো গাছের ডাল বা গাছের গুড়ি সংগ্রহ করে কোদাল, কাটারী এবং কুড়ুলের বাঁট তৈরি করেন না। বিরহড়রা প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব জীবনের সম্পদ গাছকে সম্পূর্ণ ভাবে কেটে প্রকৃতিকে ধ্বংস করেন না। এই ভাবেই পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নকে তাঁরা বজায় রাখেন নিজেদের চাহিদা পুরণের মধ্যে দিয়ে। এই ভাবে বিরহড়রা প্রকৃতিকে রক্ষা এবং বনভূমিকে সুরক্ষিত রাখার মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক বৃদ্ধির পরিবেশও নিশ্চিত করেন। বিরহড় আদিবাসীরা জঙ্গলের শুকনো পাতা জ্বালান না, ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত হয় এবং গাছের পাতা মাটিতে পড়ে পচে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ

৬.২.২.৫ মধু সংগ্রহ (Honey Collection):

পশ্চিমবঙ্গে অরণ্য কন্যা পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের মধু সংগ্রহ পদ্ধতি পরিবেশ ও প্রকৃতির স্থিতিশীল উন্নয়নে ঐতিহ্যগত পরম্পরা রক্ষা করছেন। বিরহড়রা বংশ পরম্পরায় সুউচ্চ পাহাড় এবং জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করেন। সাধারণ মানুষ মধু সংগ্রহের সময় মৌচাকের নিচে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দেয়, ধোঁয়ার জ্বালায় মৌমাছিরা মৌচাক থেকে বেরিয়ে চারিপাশে ছড়িয়ে যায় এবং কিছু মৌমাছি মাটিতে পড়ে মরে যায়। তখন মধু সংগ্রহকারী যে গাছের ডালে বা পাথরের টিলায় মৌচাকটি রয়েছে, মৌচাকটিকে কেটে বা

চেঁছে মধু সংগ্রহ করে। উড়ে যাওয়া মৌমাছিগুলি ও বেঁচে যাওয়া মৌমাছিগুলি মৌচাক এর স্থানে এলে দেখে যে তাদের মৌচাকের বাসাটি আর নেই। মৌমাছিগুলি ফুল থেকে ফুলের রস সঞ্চয় করার ঘরটি না থাকায় তৎক্ষণাৎ আর সঞ্চয় করতে পারে না। মধু সঞ্চয়ের জন্য দীর্ঘ সময় লাগে। ফলে একদিকে যেমন কিছু মৌমাছির মৃত্যু হয় এবং মৌচাক এর ক্ষতি হয়। মধু সংগ্রহকারী দীর্ঘ সময় ঐ মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ বা মধু পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং আগুন লাগানোর জন্য পরিবেশের বায়ুদূষণ হয়।

কিন্তু বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের মধু সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। বিরহড়রা তীরের সামনের ভাগ খোলা থাকে এবং পিছনের ভাগে সুতির বা লাইলন সুতো দিয়ে বাঁধে। এরপর মধু সংগ্রহের জন্য মৌচাকের স্থানে পৌঁছায় এবং দীর্ঘ গাছে বা পাহাড়ের টিলাতে অবস্থিত মৌচাকে ধোঁয়া না দিয়েই ধনুক দিয়ে তীর মারে মৌচাকের কেন্দ্র বিন্দুতে। তীরের পেছনে বাঁধা সুতো নিচ পর্যন্ত থাকে এবং বিরহড়রা ঐ সুতোর নীচে কোন একটি পাত্র রেখে দেয়। এরপর মৌচাক থেকে মধু একটু একটু করে ঐ তীরের গা দিয়ে ও সুতোর মধ্যদিয়ে নীচে রাখা পাত্রে জমা হয়। এতে বিরহড়দের মধু সংগ্রহ হয়ে যায় তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী। অপর দিকে কোন মৌমাছিকে মারার প্রয়োজন হয় না এবং মৌচাককে একেবারে ভাঙার প্রয়োজন হয় না।

এরফলে বিরহড়রা বহুদিন ধরে এই ভাবে একটি মৌচাক থেকে মধু পেয়ে থাকে এবং মৌমাছিরা জীবন্ত থাকে ফলে আগুন, ধোঁয়া না দেওয়ায় পরিবেশ দূষণও হয় না। তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিহড়রা পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে সহযোগিতা করেন এবং তাঁদের যে টুকু প্রয়োজন সেই টুকু তাঁরা জঙ্গল থেকে ও প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করেন।

৬.২.২.৬ দড়ি তৈরি (Rope Making):

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলার মোট আদিবাসী সম্প্রদায়দের মধ্যে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১ শতাংশ। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী, বলরামপুর, ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের বসবাস। বিরহড়দের প্রধান কাজগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দড়ি তৈরি করা। বিরহড়রা গভীর জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে 'চিহরলতা' গাছ থেকে চিহরলতার তন্তু বা গাছের ছাল কেটে সংগ্রহ করেন। চিহরলতা গাছের ছাল সংগ্রহের সময় বিরহড়রা কখনই সম্পূর্ণ গাছকে কেটে গাছের ছাল বা চিহরলতা তন্তু সংগ্রহ করেন না। মূল গাছের যে সমস্ত লতানো শাখা প্রশাখা রয়েছে সেইগুলি কাটেন। চিহরলতা সংগ্রহের পর লতাগুলি কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখেন এবং পরে লতাগুলিকে শুকনো হতে দেওয়া হয়। এরপর চিহরলতা তন্তু বা গাছের ছালগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি তৈরি করা হয়। এই ভাবে বিরহড়দের দড়ি তৈরির জন্য জঙ্গল থেকে প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতিক সম্পদকে একে বারে শেষ না করে তাঁরা চিহরলতা সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন দড়ি তৈরির জন্য সেটি স্থিতিশীল উন্নয়নের বিশেষ উদাহরণ। কারণ বিরহড়দের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দড়ি তৈরি করা এবং বাজারে বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করা, এতে জঙ্গলের কোন ক্ষতি হয়না এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ গাছের ক্ষতি হয় না, চিহরলতার মূল গাছটি কখনও কাটা না হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় বিরহড়রা বহু বছর ধরে 'চিহরলতা' সংগ্রহ করতে পারেন।

বর্তমানে গভীর জঙ্গলে বিরহড়দেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না অর্থাৎ ফরেস্ট অফিসাররা কোন অনুমতি না দেওয়ায় এবং সামনের জঙ্গলে 'চিহরলতা' আর ভালো না পাওয়া

যাওয়ায় চিহরলতার দড়ি তৈরি অনেক কমে গেছে। সুতুরাং সামনের জঙ্গল থেকে যে টুকু চিহরলতা সংগ্রহ করতে পারেন সেটা দিয়ে দড়ি তৈরি করেন। বর্তমানে বিরহড়রা তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা বৃদ্ধির জন্য পড়ে থাকা সিমেন্টের বস্তা থেকে প্লাস্টিক সুতো বার করেন, এবং ঐ সুতো দিয়ে দড়ি তৈরি করেন। এটি স্থিতিশীল উন্নয়নের একটা বিশেষ ব্যবস্থা। বিভিন্ন আধুনিক পাকাবাড়ি, ঢালাই রাস্তা, ইত্যাদি নির্মাণকার্যে সিমেন্ট ব্যবহারের পর প্লাস্টিক সিমেন্টের বস্তা বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে যেমন-রাস্তা, নদী, খাল-বিল, চাষযোগ্য ভূমি ইত্যাদিতে। সেখানে জল দূষণ, মাটি দূষণ এবং বস্তাগুলি জ্বালানোর পর বায়ু দূষণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় ও প্রকৃতির ক্ষতি হয়। বিরহড়রা তাঁদের পরম্পরাগত চিন্তাভাবনা এবং পরিবেশকে রক্ষার স্বার্থে সিমেন্টের বস্তাগুলি সংগ্রহ করেন। ফলে ঐ বস্তাগুলি থেকে একটা একটা করে সিমেন্ট বস্তার প্লাস্টিক সুতো বের করেন এবং তাঁদের প্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে প্লাস্টিক সুতোগুলিকে পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি তৈরি করেন। এরপর দড়ি তৈরি হয়ে গেলে বাজারে বিক্রি করেন। এই ভাবে বিরহড়রা এক দিকে তাঁদের জীবন নির্বাহের জন্য অর্থনৈতিক ভাবে সবল হচ্ছেন, এবং অপরদিকে সিমেন্টের প্লাস্টিক বস্তাগুলিকে পুনরায় ভিন্ন রূপে ব্যবহার যোগ্য করে তোলায় স্থিতিশীল উন্নয়নে সমাজ তথা পরিবেশ রক্ষার অবদান রেখে যাচ্ছেন।

৬.২.২.৭ হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া (Handi or Haria):

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের বসবাস। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের জীবন যাপন, সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি ভিন্ন। অনেকগুলি আদিবাসী গোষ্ঠীতে প্রাচীন পরম্পরার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরম্পরাগত বিষয় রয়েছে যেটি আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন

রীতিনীতিতে ব্যবহার হয় সেটি হল ‘হাণ্ডি’। ‘হাণ্ডি’ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল ‘হাঁড়িয়া’। এই ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’ খাদ্য বস্তুটি আদিবাসীদের বহু প্রাচীন একটি পরম্পরাগত পানীয়, যেখানে আদিবাসীদের জন্ম থেকে শুরু করে বিবাহ, পরব, উৎসব-অনুষ্ঠান, জাগরণ, আদিবাসী পাতা পরব, কেউ মারা গেলে, বাড়িতে কোন আত্মীয় এলে, প্রকৃতির পূজা এবং বিভিন্ন পূজার স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’ তৈরির জন্য আদিবাসীরা বিশেষ পদ্ধতি এবং স্থিতিশীল প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করেন। তাই ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’ তৈরির জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলি হল- একটি পোড়া মাটির হাঁড়ি ও ঢাকা দেওয়ার জন্য মাটির তৈরি সরা বা ঢাকনা, চাল, জল, ভেষজ গাছগাছড়া থেকে তৈরি রান বা রানু ইত্যাদি। আদিবাসীরা যে পদ্ধতিতে ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’ তৈরি করেন তা গবেষক নিজের চোখে সম্পূর্ণ দেখেছেন, পদ্ধতিটি হল- আদিবাসীরা প্রথমে মাটির হাঁড়িটিকে উনুনে চাপিয়ে দিয়ে কিছুটা গরম হলে হাঁড়িতে চাল দিয়ে দেয় এরপর কিছুক্ষণ চালটিকে ভাজতে হয়, চালের উপরের অংশ কিছুটা পুড়ে গেলে অর্থাৎ হালকা ভাবে ভাজা হলে চালটিকে একটি পাত্রে নামিয়ে রাখা হয়। এরপর মাটির হাঁড়িটিতে অর্ধেকের বেশি জল দেওয়া হয়, জল গরম হওয়ার পর ঐ ভাজা চালগুলি হাঁড়ির ফুটন্ত জলে দিয়ে দেওয়া হয়, সাথে মাটির তৈরি সরাটি হাঁড়ির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ৩০ থেকে ৪০ মিনিট চালগুলি ফোটানো হয় অর্থাৎ সেদ্ধ করা হয়। চালগুলো ভাতে রূপান্তরিত হলে এবং হাঁড়িতে জল শুকিয়ে এলে উনুন থেকে নামিয়ে রাখা হয়। এরপর হাঁড়ি থেকে ভাতগুলি বের করে পরিষ্কার কোন কাপড়ে ঢেলে চারিয়ে (অর্থাৎ ছড়িয়ে) দেওয়া হয় যাতে ঐ ভাতে কোন অতিরিক্ত জল না থাকে এবং ভাতগুলিকে ঠাণ্ডা করা হয়। সর্বশেষে বিশেষ উপকরণ মিশ্রণ করতে হয় সেটি হল ‘রানু’ বা ‘রান’, এটি হল গভীর জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা ১৫ থেকে ২০ ধরনের ভেষজ উদ্ভিদের শেকড়, কাণ্ড,

জড়িবুটি, বীজ ইত্যাদির মিশ্রণ। এই 'রানু' বা 'রান' ২ কেজি চালের জন্য প্রায় ৬-৭ টি গুটি পাউডার তৈরি করে মেলে রাখা ঐ ভাতে ভালোকরে মাখিয়ে কিছুটা সময় রেখে দিতে হয়। এরপর আদিবাসী মহিলারা ঐ মাটির হাঁড়িতে ভাতগুলিকে ভরে নেন, তারপর কিছুটা পরিমাণ জল হাঁড়ির মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয় এবং ভাত ভর্তি হাঁড়ির মধ্যে গুঁড়ো করা রান বা রানু কিছুটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, অবশেষে মাটির তৈরি সরাটি হাঁড়ির মুখে চাপিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যাতে বাইরের বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। তারপর কিছুদিন পর অর্থাৎ প্রায় ৫/৬ দিন পর দেখা হয় ভাতটি 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া'তে রূপান্তর হয়েছে কি না, যদি দেখা যায় ভাত থেকে একধরণের জলের মত তরল রস জমেছে তাহলে বোঝা যায় খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই সময় আদিবাসী পুরুষ এবং মহিলারা আর একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাঁড়িয়া খাওয়ার উপযোগী করে তোলে। সেটি হল- একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড় বা ঘন জাল জাতীয় জিনিসের উপর হাঁড়ি থেকে একবাটি ভাতটি তুলে রাখা হয় এবং দুই প্রান্তে থাকা দুই ব্যক্তি ঐ ভাত রাখা কাপড়টিকে তুলে রাখেন এরপর একজন ঠাণ্ডা জল ও শীতের সময়ে হালকা গরম জল ঐ ভাতটির উপর ঢালেন এবং অপর একজন হাত দিয়ে ভাতটিকে কাপড়টির উপর ঘষে ছাঁকেন এবং নিচে একটি পাত্র থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' বের করা হয়। আর বাকি পড়ে থাকা ভাতের অংশ মাটিতে ও গাছের গোড়ায় রেখে দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট অংশ পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ভাত থেকে তৈরি হওয়া 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' পানীয় খাদ্য হিসাবে আদিবাসী মানুষরা পান করেন।

গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে প্রায় ৫ থেকে ৬ দিন হাঁড়িতে ভাত থাকার পর যখন দেখা হয় তখন ভাতগুলি কিন্তু পচে না, ভাতের উপরের যে অংশ থাকে তা খোলা থাকে। কিন্তু আমরা দেখেছি বাড়িতে ভাত রান্না করে রেখে দিলে পরের দিন কিছু সময় পার হওয়ার পর

পচতে থাকে। কিন্তু এখানে ভাতটিকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনা এই পদ্ধতিতে কোড়া হয়।

গবেষক আদিবাসী সমাজ থেকে এবং তাঁর উপলব্ধি থেকে জানতে পেরেছেন যে আদিবাসীদের হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া তৈরির একটা বিশেষ চাহিদা এবং ইতিহাস রয়েছে, তা হল- ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে আদিবাসীরা কৃষি কাজের উন্মোচন করেন, তখন বছরের একটি সময়ে অর্থাৎ বর্ষার জলে কিছুটা ধান চাষ হত। কিন্তু বছরের নির্দিষ্ট সময়ে চাষ হলেও ফসল বেশি হত না এবং সেই সামান্য টুকু ফসল সারা বছর চালানো আদিবাসীদের কাছে একটা বিশেষ গুরুতর সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন পোকামাকড়ের প্রভাবে কিছু ফসল বছর ঘুরতে না ঘুরতে অনেকটা নষ্ট হয়ে যেত। সারা দিনরাত্রে একবেলা খেয়ে জীবন যাপন করতে হত, কখনও শিকার পাওয়া যেত কখনও পাওয়া যেত না। আদিবাসীরা একবার ভাত রান্না করলে তাঁর পরের দিন সেই ভাত ভালো থাকতো না, গ্রীষ্ম কালে সকালে রান্না করলে দুপুরের পরে ভাত নষ্ট হয়ে যেত, কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার পর কাজ থেকে বিকালে ফিরে এলে খাবার না থাকায় খালি পেটেই থাকতে হত। একদিকে পরিবারের সংখ্যা বেশি থাকায় যত টুকু শস্য থাকতো অনেকটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চালাতে হত। খেরওয়াল গোষ্ঠীর আদিবাসীরা তাঁদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তাভাবনা করে পানীয় খাদ্য 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' প্রস্তুত করেন। তাঁরা দেখেন ১ কিলো চালের ভাত ৫ থেকে ৬ জন পর্যন্ত খেতে পারেন, এবং এই ভাত পেটে বেশিক্ষণ স্থায়ী নয়। কিন্তু অপরদিকে ১ কিলো চালের 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' ১০ থেকে ১৫ জন পান করে সারাদিন থাকতে পারেন ও শরীরে শক্তি থাকে এবং দিন যাপন করা যাবে, এমনকি প্রায় এক সপ্তাহেরও বেশি দিন এর স্থায়িত্ব। এভাবে সঞ্চয় করা শস্য অনেক বেশি দিন পর্যন্ত চালানো সম্ভব।

তবে এই ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’ যেহেতু ভেষজ গাছগাছড়া ও চাল দিয়ে তৈরি তাই এটি পান করলে শরীর ঠাণ্ডা এবং বিভিন্ন প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাই আদিবাসীরা গ্রীষ্ম কালে যখন চাষ হতনা তখন গরমের সময় তাঁরা এই ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’ বেশি পান করতেন। অপরদিকে বর্ষার সময়ে চাষ হত এবং শীতকালে হাঁড়িয়া পান কম করতেন। এই ভাবে আদিবাসীদের জীবন নির্বাহের জন্য ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়ার’ ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই যুগ যুগ ধরে আদিবাসীদের বিভিন্ন পালাপার্বণ, উৎসব, অনুষ্ঠান, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজার স্থান ইত্যাদি সমস্ত স্থানে ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’র ব্যবহার সর্বত্র। বহু বছর ধরে আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রেখে ছিল এই পানীয় খাদ্য।

এই ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’ স্থিতিশীল উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে, সেটি হল- গবেষক উপলব্ধি করেন যে ‘হাণ্ডি’ তৈরি হয় প্রাকৃতিক শস্য চাল এবং প্রায় ১৫-২০ টির বেশি ভেষজ গাছগাছড়া দিয়ে, যেটি বিভিন্ন রোগনিরাময়ের বিশেষ উপাদান। যখন ‘হাণ্ডি’ বা ‘হাঁড়িয়া’র অবশিষ্ট ভাতের অংশটি মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় ও কোন গাছের গোড়ায় দেওয়া হয় তখন সেটি মাটির সাথে মিশে গিয়ে জৈব সারে পরিণত হয় এবং মাটির গুনাগুন অনেকাংশে বেড়ে যায়, কারণ তার মধ্যে ১৫ থেকে ২০ ধরনের ভেষজ ওষধি গাছের শেকড়, কাণ্ড, বীজ, ফল ইত্যাদি আছে। এছাড়াও ‘হাণ্ডি’র বাকি অংশ ভাতটি পুকুরের জলে ফেলা হয়, ফলে পুকুরের যত ছোট উদ্ভিদ, ছোট প্রাণী রয়েছে তাদের বিকাশ হয় কারণ পুকুরের মাটি উর্বর হয় এবং পুকুরের বাস্তুতন্ত্র স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে। এছাড়া প্রকৃতির কোন ক্ষতি হয়না এবং মানুষেরও কোন ক্ষতি হয়না।

তবে বর্তমানে হাণ্ডি বা হাঁড়িয়ার ব্যবহার সিমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন রয়েছে। একটা সময় এই হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখার ও জীবনের স্থিতিশীল উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহারে আদিবাসী যুবক সমাজ উন্নয়নের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরছে। যেমন- জল আমাদের জীবন দেয় কিন্তু সেই একই জল বন্যার রূপ নিলে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত ধ্বংস হয়।

References:

UNESCO. (2009). *Learning and Knowing in Indigenous Societies Today*. Paris: UNESCO.

Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation. *Ambio*, 22(2/3), 151-156.

Morris, Brian (2010). Indigenous knowledge. *The society of Malawi Journal*, 63(1), 1-9.

Borthaqur, A., & Singh, P. (2020). Indigenous Knowledge Systems in Sustainable Water Conservation and Management. *Water Conservation and Wastewater Treatment in BRICS Nations.* pp.321-326. http://dx.doi.org/10.1016/8978-0-12-818339-7.000 16-3

Roberts, K. (1996). *Circumpolar Aboriginal People and Co-Management Practice: Current Issues in Co-Management and Environmental Assessment*. Arctic Institute of North America, University of Calgary, 115.

Convention on Biological Diversity (1992). Details not found.

Battiste, M., James, Henderson. (2000). *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage*. Purich, Skatoon.

Mc Gregon, D. (2004). Indigenous Knowledge, Environment, and Our Future. *American Indian Quarterly*, 28 (3/4), Special Issue: The Recovery of Indigenous Knowledge, 385-410. University of Nebraska Press.

Morris, Brian (2010). Indigenous knowledge. *The Society of Malawi Journal*, 63(1), 1-9.

UNEP-WCMC (2021). Details not found.

UNEP (1999). Details not found.

National Education Policy-2020, Ministry of Education, Government of India.

Gadgil, M., & Vartak, V. D. (1976). The Sacred Groves of Western Ghats in India. *Economic Botany*, 30 (2), 152-160.

Khiewtam, R. S., & Ramakrishnan, P. S. (1989). Socio-Cultural Studies at the Sacred Groves at Cherrapunji and Adjoining areas in North-Eastern India. *Man in India*, 69, 64-71.

Chandrashekara, U. M., & Sankar, S. (1998). Ecology and Management of Sacred Groves in Kerala, India. *Forest Ecology and Management*, 112(1), 165-177.

Hughes, J. D., & Chandran, M. D. S. (1998). Sacred Groves around the Earth: an overview. In, Ramakrishnan, P.S., Saxena, K. G., and Chandrashekara, U. M. (Eds.), *Conserving the Sacred Grouves for Biodiversity Management*. Oxford and IBH publ. Co. Pvt.Ltd. New Delhi, India. pp. 69-86.

Kanowski, P. J. (2000). Politics, Policies and the Conservation of Forest Genetic diversity. In Young, A., Boshier, D., and Boyle, T. (Eds), *Forest conservation genetics: principle and practice.* CSIRO publishing. Collingwood, Victoria, Australia. pp. 275-287.

Gadgil, M., & Vartak, V. D. (1976). The Sacred Groves of Western Ghats in India. *Economic Botany*, 30 (2), 152-160.

Khan, M. L., Menon, S., & Bawa, K. S. (1997). Effectiveness of Protected Area Network in Biodiversity Conservation in North-East India: A Case Study of Meghalaya State. *Biodiversity and Conservation*, 6(6), 853-868.

Kosambi, M. D. (1962). *Myth and Reality*. Ramdas Bhatkal Popular Prakasan pvt. Ltd, Mumbai.

Gadgil, M., & Vartak, V. D. (1976). The Sacred Groves of Western Ghats in India. *Economic Botany*, 30 (2), 152-160.

Malhotra, K. C., Gokhele, Y., Chatterjee, S., & Srivastava, S. (2007). *Sacred Groves in India.* Aryan Books International Aryan.

Namtak, S., & Sharma, R. C. (2018). Traditional Knowledge and Innovative Practices for Water Management and Conservation in India: Cold Desert, Leh Ladakh. *Indian Journal of Ecology*, 45 (4), 737-744.

United Nations Conference on the Human Environment (1972). Stockholm, 5-16 June.

Report of the World on Environment and Development (WCED) (1987). Our Common Future/Brundtland Commission Report. Oxford: Oxford University Press.

Lertzman, D. A., & Vredenburg, H. (2005). Indigenous Peoples, Resource Extraction and Sustainable Development: an Ethical Approach. *Journal of Bussness Ethics*, 56 (3), 239-254.

Report of the World on Environment and development (WCED) (1987). Our Common Future/Brundtland Commission Report. Oxford: Oxford University Press.

Brundland Commission (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York. 4 August.

Turner, R. K., Doctor, P., & Adger, N. (1994). Sea-Level Rise & Coastal Wetlands in the U.K.: Mitigation Strategies for Sustainable Development. In Jannson, A.M., Hammer, M., Folke, C., and Costanza, R. (eds.), *Investing in Natural Capital: The Ecological Eco-nomics Approach to Sustainability*. Island Press, Washington, D.C.

Report of the World on Environment and Development (WCED) (1987). Our Common Future/Brundtland Commission Report. Oxford: Oxford University Press.

Daly, H. (1994). 'Operation Uzing Sustainable Development by Investing in Natural Capital'. In A.M. Jannson, M. Hammer, C. Folke, and R. Costanza (eds.), *Investing in Natural Capital: The Ecological Economics Approach to Sustainability*. Island Press, Washington, D.C.

Turner, R. K., Doctor, P., & Adger, N. (1994). Sea-Level Rise & Coastal Wetlands in the U.K.: Mitigation Strategies for Sustainable Development. In Jannson, A.M., Hammer, M., Folke, C., and Costanza, R. (eds.), *Investing In Natural Capital: The Ecological Eco-nomics Approach to Sustainability*. Island Press, Washington, D.C.

Rees, W. (1989). *Defining 'Sustainable Development'*. UBC Centre for Human Settlements, CHS Research Bulletin, and University of British Columbia.

Berkes, F., & Folkes, C. (1994). Investing in Cultural Capital for Sustainable Use of Natural Capital. In A.M. Jannson, M. Hammer, Carl Folke, and Robert Costanza (eds.), *Investing in Natural Capital: The Ecological Economics Approach to Sustainability*. Island Press, Washington, D.C.

Lertzman, D. A. (1999). Planning Between Cultural Paradigms: Traditional Knowledge and the Transition to Ecological Sustainability. Unpublished Doctoral Dissertation, School of Community and Regional Planning, University of British Columbia, Vancouver.

Brundtland Commission (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, New York. 4 August.

Battiste, M., James, Henderson. (2000). *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage*. Purich, Skatoon.

Nettle, D., & Romaine, S. (2001). *Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages.* Oxford University Press, New York.

Pandey, D. N. (1998). *Ethnoforestry, Local Knowledge for Sustainable Forestry and Livelihood Security.* Himanshu Publication. Udaipur, India. pp. 1-91

UNESCO. (2009). *Learning and Knowing in Indigenous Societies Today*. Paris: UNESCO.

Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation. *Ambio*, 22(2/3), 151-156.

Morris, Brian (2010). Indigenous knowledge. *The society of Malawi Journal*, 63(1), 1-9.

Borthaqur, A., & Singh, P. (2020). Indigenous Knowledge Systems in Sustainable Water Conservation and Management. *Water Conservation and Wastewater Treatment in BRICS Nations.* pp.321-326. http://dx.doi.org/10.1016/8978-0-12-818339-7.000 16-3

Roberts, K. (1996). *Circumpolar Aboriginal People and Co-Management Practice: Current Issues in Co-Management and Environmental Assessment*. Arctic Institute of North America, University of Calgary, 115.

Convention on Biological Diversity (1992). Details not found.

Battiste, M., James, Henderson. (2000). *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage.* Purich, Skatoon.

Mc Gregon, D. (2004). Indigenous Knowledge, Environment, and Our Future. *American Indian Quarterly*, 28 (3/4), Special Issue: The Recovery of Indigenous Knowledge, 385-410. University of Nebraska Press.

Morris, Brian (2010). Indigenous knowledge. *The Society of Malawi Journal*, 63(1), 1-9.

UNEP-WCMC (2021). Details not found.

UNEP (1999). Details not found.

National Education Policy-2020, Ministry of Education, Government of India.

Gadgil, M., & Vartak, V. D. (1976). The Sacred Groves of Western Ghats in India. *Economic Botany*, 30 (2), 152-160.

Khiewtam, R. S., & Ramakrishnan, P. S. (1989). Socio-Cultural Studies at the Sacred Groves at Cherrapunji and Adjoining areas in North-Eastern India. *Man in India*, 69, 64-71.

Chandrashekara, U. M., & Sankar, S. (1998). Ecology and Management of Sacred Groves in Kerala, India. *Forest Ecology and Management*, 112(1), 165-177.

Hughes, J. D., & Chandran, M. D. S. (1998). Sacred Groves around the Earth: an overview. In, Ramakrishnan, P.S., Saxena, K. G., and Chandrashekara, U. M. (Eds.), *Conserving the Sacred Grouves for Biodiversity Management*. Oxford and IBH publ. Co. Pvt.Ltd. New Delhi, India. pp. 69-86.

Kanowski, P. J. (2000). Politics, Policies and the Conservation of Forest Genetic diversity. In Young, A., Boshier, D., and Boyle, T. (Eds), *Forest conservation genetics: principle and practice.* CSIRO publishing. Collingwood, Victoria, Australia. pp. 275-287.

Gadgil, M., & Vartak, V. D. (1976). The Sacred Groves of Western Ghats in India. *Economic Botany*, 30 (2), 152-160.

Khan, M. L., Menon, S., & Bawa, K. S. (1997). Effectiveness of Protected Area Network in Biodiversity Conservation in North-East India: A Case Study of Meghalaya State. *Biodiversity and Conservation*, 6(6), 853-868.

Kosambi, M. D. (1962). *Myth and Reality*. Ramdas Bhatkal Popular Prakasan pvt. Ltd, Mumbai.

Gadgil, M., & Vartak, V. D. (1976). The Sacred Groves of Western Ghats in India. *Economic Botany*, 30 (2), 152-160.

Malhotra, K. C., Gokhele, Y., Chatterjee, S., & Srivastava, S. (2007). *Sacred Groves in India.* Aryan Books International Aryan.

Namtak, S., & Sharma, R. C. (2018). Traditional Knowledge and Innovative Practices for Water Management and Conservation in India: Cold Desert, Leh Ladakh. *Indian Journal of Ecology*, 45 (4), 737-744.

United Nations Conference on the Human Environment (1972). Stockholm, 5-16 June.

Report of the World on Environment and Development **(WCED) (1987).** Our Common Future/Brundtland Commission Report. Oxford: Oxford University Press.

Lertzman, D. A., & Vredenburg, H. (2005). Indigenous Peoples, Resource Extraction and Sustainable Development: an Ethical Approach. *Journal of Bussness Ethics*, 56 (3), 239-254.

Report of the World on Environment and development (WCED) (1987). Our Common Future/Brundtland Commission Report. Oxford: Oxford University Press.

Brundland Commission (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York. 4 August.

Turner, R. K., Doctor, P., & Adger, N. (1994). Sea-Level Rise & Coastal Wetlands in the U.K.: Mitigation Strategies for Sustainable Development. In Jannson, A.M., Hammer, M., Folke, C., and Costanza, R. (eds.), *Investing in Natural Capital: The Ecological Eco-nomics Approach to Sustainability.* Island Press, Washington, D.C.

Report of the World on Environment and Development (WCED) (1987). Our Common Future/Brundtland Commission Report. Oxford: Oxford University Press.

Daly, H. (1994). 'Operation Uzing Sustainable Development by Investing in Natural Capital'. In A.M. Jannson, M. Hammer, C. Folke, and R. Costanza (eds.), *Investing in Natural Capital: The Ecological Economics Approach to Sustainability*. Island Press, Washington, D.C.

Turner, R. K., Doctor, P., & Adger, N. (1994). Sea-Level Rise & Coastal Wetlands in the U.K.: Mitigation Strategies for Sustainable Development. In Jannson, A.M., Hammer, M., Folke, C., and Costanza, R. (eds.), *Investing In Natural Capital: The Ecological Eco-nomics Approach to Sustainability.* Island Press, Washington, D.C.

Rees, W. (1989). *Defining 'Sustainable Development'*. UBC Centre for Human Settlements, CHS Research Bulletin, and University of British Columbia.

Berkes, F., & Folkes, C. (1994). Investing in Cultural Capital for Sustainable Use of Natural Capital. In A.M. Jannson, M. Hammer, Carl Folke, and Robert Costanza (eds.), *Investing in Natural Capital: The Ecological Economics Approach to Sustainability.* Island Press, Washington, D.C.

Lertzman, D. A. (1999). Planning Between Cultural Paradigms: Traditional Knowledge and the Transition to Ecological Sustainability. Unpublished Doctoral Dissertation, School of Community and Regional Planning, University of British **Columbia, Vancouver.**

Brundtland Commission (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, New York. 4 August.

Battiste, M., & James, Henderson. (2000). *Protecting Indigenous Knowledge and Heritage.* Purich, Skatoon.

Nettle, D., & Romaine, S. (2001). *Vanishing Voices: The Extinction of the World's Languages.* Oxford University Press, New York.

Pandey, D. N. (1998). *Ethnoforestry, Local Knowledge for Sustainable Forestry and Livelihood Security.* Himanshu Publication. Udaipur, India. pp. 1-9

সপ্তম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল এবং আলোচনা

(The Findings and Discussion)

৭.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল: (The Findings in Research)

গবেষক গুণগত মান ভিত্তিক গবেষণা থেকে যে ফলাফলগুলি প্রাপ্ত হয়েছেন সেগুলি হল-

১) বিরহড়রা প্রথম ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত পালামৌ এবং হাজারীবাগ অঞ্চলকে এদের আদিম বসবাসের স্থান হিসেবে গ্রাহ্য করে।

২) প্রকৃতিগত ভাবে বন্য স্বভাবের হলেও এরা অন্য কোনো জাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

৩) উচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের শিরাগুলিতে এবং পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে এরা বাস করতে পচ্ছন্দ করে, যদিও পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের উচ্চ এলাকা থেকে এদেরকে নামিয়ে এনে পাহাড়ের পাদদেশে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

৪) শিক্ষার দিক থেকে বিরহড় ছেলে মেয়েরা খুব কম সংখ্যকই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছেন। একটি মাত্র গ্রামে দুইটি মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন। এবং একটি মেয়ে নিকটবর্তী ঝাড়খণ্ডের কলেজে B.A পড়ছেন।

৫) বিরহড়দের নিকটবর্তী লোকালয়ে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। তাই প্রাথমিক স্তরেই বিরহড় ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলছুট হয়ে যায়।

৬) কোন বিরহড় গ্রামেই প্রথাবহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি হয়নি।

৭) মহিলা মঙ্গল সমিতিও কোনো বিরহড় গ্রামে তৈরি হয়নি। এবিষয়ে সরকারী বা বেসরকারি ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগও চোখে পড়েনি।

৮) সমস্ত বিরহড় গ্রামেই বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাও স্কুলে যেতে অনাগ্রহী যদিও স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন আহার পাওয়া যায়।

৯) বাবা মায়ের দূরদর্শিতার অভাব, চরম দারিদ্র্য, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদির কারণে অভিভাবকরাও ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য সক্রিয় হতে পারেন না।

১০) কোনো বিরহড় গ্রামেই যুবক-যুবতী বা বয়স্কদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

১১) ২০২৫ সালে বাঘমুণ্ডি ব্লকের অধীনে প্রথম বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন একসাথে চারজন বিরহড় মেয়ে।

১২) বিরহড়রা প্রকৃতিগতভাবে লাজুক স্বভাবের, তাই বাইরের লোকজনের সামনে মুখ ঢেকে রাখতে পছন্দ করেন।

১৩) বিরহড়দের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। এরা নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। কোনো অবস্থাতেই নিজস্ব সমাজ এবং সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়া এরা পছন্দ করেন না।

১৪) বিরহড়রা তাঁদের নিজস্ব 'বিরহড়' ভাষায় কথা বলেন। বিরহড় ভাষার সঙ্গে সাঁওতাল, হো ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিরহড় ভাষা খেরওয়াল ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

১৫) বিরহড়দের মোটামুটি পাঁচ ধরনের বিবাহ রয়েছে।

১৬) বিরহড়দের বিবাহ পদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে মিললেও কিছুটা ক্ষেত্রে এদের বিবাহ পদ্ধতি পৃথক।

১৭) বিবাহের পূর্বে বিবাহ যোগ্য পুরুষরা 'টাণ্ডা' বা পাড়ার বাইরে সামান্য দূরত্বে একটি ঘরে ঘুমায়। একইভাবে বিবাহের পূর্বে বিবাহ যোগ্যা মেয়েরা টাণ্ডা থেকে সামান্য দূরত্বে একটি ঘরে ঘুমায় এবং মেয়েদের সঙ্গে থাকে একজন বিধবা বৃদ্ধা।

১৮) বিভিন্ন টাণ্ডাতে বসবাসকারী বিরহড়দের সামাজিক জীবনের প্রথা এবং ধর্মীয় রীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১৯) শিকারের ক্ষেত্রে এরা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে যা অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না। দলবদ্ধ শিকারে যা পাওয়া যায় তা 'টাণ্ডার' প্রতিটি পরিবারের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়।

২০) বিরহড়দের পাঁচ প্রকারের উৎসব রয়েছে যেমন- বাহা, করম, সারহুল, সেন্দ্রা অর্থাৎ শিকার উৎসব, সহরায় প্রভৃতি।

২১) সারহুল এবং বাহা উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিরহড় নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতীরা সকলেই জল, জঙ্গল, গাছপালা, নদী, পাহাড়কে পূজা করে এবং এর মাধ্যমে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখে।

২২) টামাক বা ধামসা, তুমদা বা মাদল, ট্যাঁয়ং বা কাঁসর, বানাম বা একতারা, তিরীও বা বাঁশের তৈরি বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এরা ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান কালে গান, বাজনা ও নাচের সঙ্গে। এই যন্ত্রগুলি এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে এবং দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে তৈরি হয় যে, যন্ত্র তৈরির উপাদানগুলি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে প্রকৃতিকে বিষাক্ত

করে তুলবে না। এমনকি এই সকল বাদ্যযন্ত্রের শব্দ মানুষ বা প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনো ভাবেই ক্ষতিকারক নয়।

২৩) সমস্ত বিরহড় গ্রামেই সরকারী অর্থে বিশেষ ভাবে বিরহড়দের ব্যবহারের জন্য নিজস্ব সম্প্রদায় হল (Community Hall) রয়েছে।

২৪) প্রায় বেশীরভাগ বিরহড় গ্রামের পুরুষ এবং মহিলারা তাদের দেশীয় পানীয় খাদ্য হাঁড়িয়া পান করেন, তাঁদের প্রায় সমস্ত উৎসব, অনুষ্ঠানে হাঁড়িয়া খাওয়া এঁদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এছাড়া মহুল বা মহুয়া ফুল রান্না করে তরকারী হিসাবে খান।

২৫) বিরহড়রা নিজস্ব বিরহড় সমাজেই বিয়ে করেন। বিয়ে করার জন্য ছেলে বা মেয়ে না পাওয়া গেলেও এরা অন্য আদিবাসী বা অ-আদিবাসীকে বিয়ে করেন না। বিরহড় সমাজের বাইরে কাউকে বিয়ে করলে পরিবার/ছেলে/মেয়েকে জরিমানা হিসাবে সমাজকে দিতে হয় তিনটি মোরগ, ছাগল এবং ৪-৫ হাজার টাকা।

২৬) এখনো পর্যন্ত এরা চাষের কাজে বিশেষ আগ্রহী নয়।

২৭) এখনো এরা অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করতে পচ্ছন্দ করেন।

২৮) বিরহড়রা জীবিকা হিসাবে জঙ্গল থেকে বিভিন্ন বনজ সম্পদ যেমন- শালপাতা, চিহরলতা, জ্বালানি কাঠ, মধু এবং মোম সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। অনেক ক্ষেত্রে বানর ধরে তাকে পোষ মানান এবং লোকালয়ে বানরের খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করেন।

২৯) সমস্ত বিরহড় পরিবারই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। জঙ্গল থেকে যে বনজ সম্পদ বিরহড়রা সংগ্রহ করেন তা তাঁদের পেট ভরানোর পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় এঁরা অন্যের জমিতে দৈনিক মজুর এবং বাড়ি তৈরির কাজে দৈনিক মজুর হিসাবে কাজ করেন।

৩০) চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে বিরহড়দের পরিবারে প্রায় কোনো আসবাবপত্রই নেই। রান্না খাওয়ার জন্য এ্যালুমনিয়ম, স্টিল, কাঁসার, ও লোহার তৈরি থালা-বাসন, কড়া, খুন্তি, চাটু ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া টিনের কিছু উপকরণমাত্র রয়েছে।

৩১) অর্থের অভাবে কোনো কোনো গ্রামে বিবাহ যোগ্য বিরহড় যুবকরা বিয়ে করতে পারেনি। ফলে ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের পরিবার সংখ্যা এবং জনসংখ্যা দ্রুতহারে হ্রাস পেয়েছে।

৩২) প্রায় সমস্ত বিরহড় পরিবারেই গবাদি পশু রয়েছে। আর্থিক প্রয়োজনে পরিবারগুলি এই গবাদি পশুকে বিক্রি করে দৈনন্দিন সংসার চালান।

৩৩) পুরুলিয়া জেলায় প্রতিটি বিরহড় গ্রামেই দ্রুততার সাথে ক্রমশ বিরহড় জনসংখ্যা কমছে।

৩৪) অনেক বিরহড় ছেলে গ্রামে এবং স্থানীয় অঞ্চলে উপযুক্ত কাজ না পাওয়ার কারণে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

৩৫) বিরহড়দের মধ্যে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এরা তাঁদের প্রাচীন জ্ঞানকে আজও শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলে যা তাদের স্থিতিশীল উন্নয়নের সহায়ক। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিরহড় সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা তাদের দেশীয় জ্ঞানকে আজও ব্যবহার করে চলেছে। যেমন-

ক) বিভিন্ন প্রজাতির গাছ এবং প্রাণীকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনে এরা বনাঞ্চলের মধ্যে নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান চিহ্নিত করে যেখানে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধি কোনো মানুষের স্পর্শ পড়েনি। এর মধ্যে দিয়ে তারা স্থিতিশীল উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করছে।

খ) বিরহড়রা গভীর জঙ্গলে বসবাস করে এবং জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো ওষধি গাছকে ব্যবহার করে এরা নিজেদের এবং টাণ্ডার সমস্ত মানুষদের চিকিৎসা করে। এই ওষধি গাছগুলি

রোগীর শরীরের উপর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া করে না। এছাড়াও এরা জঙ্গল থেকে যখন ওষধি গাছ সংগ্রহ করে তখন একটি এলাকার সমস্ত গাছ এরা তুলে নেয় না। স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে এরা কিছু গাছ সংগ্রহ করে মাত্র। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো ওষধি গাছের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হবে এমন অংশ টুকু মাত্র সংগ্রহ করে। এতে করে কোনো এলাকায় ওষধি গাছের অভাব হয় না।

গ) জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাচীন কাল থেকে বিরহড় আদিবাসীরা তাদের বসবাসের স্থানে ছোট ছোট পুকুর বা কুঁয়ো কেটে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

ঘ) বনজ সম্পদ সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার কাজে এদের দ্বারা ব্যবহৃত ভেষজ উদ্ভিদ আজও আধুনিক সমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাঁরা জানেন কিভাবে জঙ্গলকে ব্যবহার করলে তার স্থায়িত্বকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

ঙ) তাঁদের দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে এঁরা মৃত্তিকা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সম্পদ সমূহকে সুরক্ষিত করছেন-'Homestay', 'Ecotourism' এবং 'Participatory Forest Management' এর অন্যতম প্রধান উদাহরণ।

৩৬) লক্ষণীয় যে বিরহড়রা কখনই জঙ্গল থেকে কাঁচা বা জীবন্ত গাছ কাটেন না। জঙ্গলে যে গাছগুলি শুকিয়ে গেছে সেইগুলি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছের সরু শাখা প্রশাখা সংগ্রহ করেন এবং জ্বালানি হিসাবে বাজারে বিক্রি করেন।

৩৭) স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বিরহড় আদিবাসী মানুষরা মৃতদেহকে সৎকার করেন নির্দিষ্ট স্থানে সমাধি দিয়ে। কারণ এরা মনে করেন যে মৃতদেহকে দাহ করলে পরিবেশ দূষিত হবে।

৩৮) বিরহড় মহিলারা হাত, হাঁটু এবং বুকে ট্যাটু করে, কিন্তু কখনই মুখে ট্যাটু করে না।

৩৯) এরা নিজেদেরকে হিন্দু বা সিন্ধু বলে পরিচয় দেন। এরা প্রকৃতিকে মানেন। মারাংবুরু, জাহের আয়ঃ, সিং বোঙ্গা এবং বিভিন্ন দেব-দেবী ও ঈশ্বরকে পূজা করেন। এছাড়া ভূত-প্রেত, মহামায়া প্রভৃতি অশুভ শক্তির অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন। বহু পূর্বে বিরহড়দের ঘরগুলি ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন- ৮-১০ ফুট লম্বা, ৬ ফুট চওড়া, ৬ ফুট উচ্চতা, দরজার উচ্চতা ২ ফুট এবং প্রস্থ ১.৫ ফুট।

৪০) বিরহড়দের পূজার নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে যা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে খাপ খায় না। এদের পূজার জন্য একটি নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান থাকে – অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

৪১) বিরহড়দের পূজার পবিত্র স্থানকে জাহের থান বা জিলু জাহের বলে। তাঁরা মনে করেন সেন্দ্রা বোঙ্গা এই পবিত্র স্থানে বাস করেন। তাই শিকারে যাওয়ার পূর্বে শিকারের জাল এবং অস্ত্রকে এই স্থানে রাখে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে মোরগ উৎসর্গ করে।

৪২) সাধারণত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তাদের গোত্র স্থির হয়। বিরহড়দের গোত্র লিঙ্গ ভিত্তিক নয়।

৪৩) মৃত্যুর পর বিরহড়রা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, এরা আত্মার লিঙ্গভেদ মানে। এদের মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতিও অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় পৃথক। মৃতদেহকে তারা দাহ করে না, তারা কবর বা সমাধি দেয়।

৪৪) পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী বিরহড়রা প্রায় সকলেই স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। গর্ভবতী মহিলারা স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সন্তান প্রসব করেন।

৪৫) বিরহড়দের সাপে কামড়ালে তারা ওঝা বা গুনিনের কাছে না গিয়ে সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

৪৬) পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী বিরহড়দের কারুরই নিজস্ব কোনো চাষযোগ্য জমি বা বসবাসের জমি নেই। সরকার থেকে দেওয়া খাস জমিতেই এদের জন্য পরিবার পিছু দুই কামরার বাড়ি সরকার থেকে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সরকারী পুনর্বাসন প্রাপ্ত বিরহড়রা যে এলাকায় থাকেন সেখানে পানীয় এবং স্নানের জলের খুবই অভাব রয়েছে। বসবাসের জমি অত্যন্ত রুক্ষ এবং পাথুরে, তাই সামান্য কিছু সব্জি চাষও অসম্ভব।

৪৭) রাজনীতির সঙ্গে বিরহড় যুবক-যুবতীরা কোনো ভাবেই যুক্ত নয়। রাজনীতি বিষয়ে এদের কোনো আগ্রহ নেই।

৪৮) পুরুলিয়া জেলায় প্রাপ্ত বয়স্ক বিরহড় আদিবাসীদের ভোটার কার্ড থাকলেও এদের বেশির ভাগ জনের আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জব কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, এস টি শংসাপত্র নেই। কিছু জনের এই বিষয়ে আগ্রহ নেই, তবে বেশির ভাগ বিরহড়রা স্থানীয় সদস্য এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন।

৪৯) বিরহড় আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মহিলা ব্যাতিরেকে বেশিরভাগ মহিলারা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ এবং ‘বিধবা ভাতা’ পান না।

৫০) সরকার থেকে বিরহড়দের বাড়ি করে দিলেও তারা নিজেদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিছন্ন রাখে না। কারণ ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা এরা এখনো বোঝে না।

৫১) বেড়সা গ্রামে পাহাড়ের ঢালে বিরহড়রা বসবাস করেন, যেখানে বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই জলের কষ্ট। তাই সরকার থেকে সৌর চালিত সাবমারসাল জলের ট্যাঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে। ডাকাই গ্রামে পঞ্চায়েত থেকে একটি নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যদিও কয়েক দিনের মধ্যেই নলকূপটি নষ্ট হয়ে যায়। পঞ্চায়েত বা সরকার থেকে বহুবার বলা সত্ত্বেও নলকূপটিকে ঠিক করা হয়নি। ফলে শীত এবং গ্রীষ্ম কালে পাহাড় থেকে চুঁইয়ে আসা জল সংগ্রহ করে এদের পানীয়, এবং রান্নার কাজ চলছে।

৭.২ আলোচনা (Discussion):

যে কোনো স্থায়ী সুসংগঠিত সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট সমাজ তাত্ত্বিক অধ্যাপক সরোকিন বলেছেন যে, জনগনের পর্যায়ক্রমিক বিভাগকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের দুই বিপরীত মেরুতে রয়েছে যথাক্রমে উচ্চতর শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণী। আবার সামাজিক স্তরবিন্যাসের একদিকে ধনী শ্রেণী ও অপর দিকে দরিদ্র শ্রেণী থাকে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক ক্ষেত্রে অসাম্যের একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। বটোমোর মনে করেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস হল সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ও শ্রেণিতে সমাজের বিভাজন। এই সমাজ বিভাজনের ভিত্তিতে সমাজে তৈরি হয় ক্ষমতা ও মর্যাদার ক্রম উচ্চ বিন্যাস কিংবা ক্রম নিম্ন বিন্যাস।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আদিবাসী বা অনার্যদের আমরা দেখতে পাই। এই আদিবাসীরা ভারতীয় সংবিধানে ৩৩৬(২৫) নং ধারায় এবং ৩৪২ (১) নং ধারায়

তপশীলি উপজাতি হিসাবে আলোচিত হয়েছেন। এরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিছিন্ন, প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এমনকি ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তপশীলি উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য সংবিধানের ১৫, ১৬ (৪), ৩২০ (৪), ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ১৯ (৫), ৪৬, ৩৪২, ৩৩৯ (২), ১৬৪, ৩৩৮, ২২৪ এবং ২৭৫ (১) নং ধারায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করেছেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার কাকা কার্লেকার- এর নেতৃত্বে 'Backward Classes Commission' (1953-55) স্থাপন করেন এবং কমিশনকে দায়িত্বদেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি জানার এবং কীভাবে সমস্যা সমূহের সমাধান সম্ভব তার রূপরেখা তৈরি করার। ভারত সরকার পুনরায় ১৯৫৪-১৯৫৯ সালে গঠন করেন 'The Study Team of Social Welfare of Backward Classes'. এর নেতৃত্বে ছিলেন রেনুকা রায়। উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক উন্নয়ন সাধন। প্রথম Backward Classess Commission (১৯৫৩-১৯৫৫) গঠিত হওয়ার প্রায় চব্বিশ বছর পর B. P. Mondal -এর নেতৃত্বে ভারত সরকার গঠন করেন Second Backward Classess Commission (১৯৭৯-১৯৮০)। সুতরাং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। বিভিন্ন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

আদিবাসী সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে জানলেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্যাকে অনুধাবন করা সম্ভব। গুহ এবং ইসমাইল (২০১৫) এর গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমান গবেষকও বিরহড় সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ সময় বাস করে এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে। বর্তমান গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে বিরহড় আদিবাসীরা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এবং নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির বাইরে বের হতে পারে না। সরেন (২০১৩) লক্ষ্য করেছেন যে, আদিবাসী যুবক-যুবতীরা নিজ এলাকায় অর্থ উপার্জনের সুযোগ না পাওয়ায় বাধ্য হন পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতে কাজ করতে যেতে। এখনো উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে কর্মরত সমস্ত শ্রমিকই আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং তারা দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। বর্তমান গবেষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্য পেয়েছেন তার থেকে জানা গেছে যে, বিরহড় সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা অল্প ক্ষেত্রে হলেও পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ ভারতে কাজে গিয়েছেন। পরিযায়ী প্রকৃতির কারণে এরা নিজ সমাজে বসবাস করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ফলে নিজস্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সংস্কৃতিতে যুক্ত থাকতে পারেন না।

বাইরের অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের বেশভূষা, আদবকায়দা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনচর্চা প্রভৃতির প্রভাব পরেছে এদের উপর। চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে এরা জঙ্গল থেকে ওষধি গাছ সংগ্রহের সুযোগ পান না। ফলে আধুনিক আলোপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ নিতে এরা বাধ্য হয়। এর ফলশ্রুতিতে এদের অনভ্যস্ত শরীরে আলোপ্যাথি চিকিৎসার যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে তাতে এদের মৃত্যুও ঘটছে। সুতরাং চিরাচরিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিরহড়রা মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে খুব ভালো নেই একথা বলা যায়।

বিরহড় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার আলোক আজও প্রায় পৌঁছায়নি। বর্তমান গবেষক পুরুলিয়া জেলার সমস্ত বিরহড়দের গ্রাম ঘুরে একটি মাত্র মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন যে ঝাড়খণ্ডের একটি কলেজে হিন্দীকে প্রধান বিষয় নিয়ে স্নাতক স্তরে পাঠরত। বাঘমুণ্ডি ব্লকের অধীনে ভূপতিপল্লী এবং বাড়েরিয়া গ্রাম থেকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে বিরহড় গোষ্ঠীর চারজন মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছে। বহুধরণের সমস্যার মধ্যে থেকেও বিরহড় মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি আদিবাসী সমাজকে উদ্দীপিত করেছে। ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষার পরে অর্থ উপার্জনের জন্য আর লেখাপড়া করে না। পরিবারের বরদের সঙ্গে জঙ্গলে যায় বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে। মেয়েরা ছোট সংসারের দায়িত্ব নেয়। প্রাথমিক স্তরে মাত্র ২৮% শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ঘোষ (২০১৮) এর গবেষণা বর্তমান গবেষকের গবেষণাকে মেনে নিচ্ছে। ভারত সরকারের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের ১৭.০৯.২০১৯ তারিখ এর অর্ডার (নং F.No. 11011/01/2019-EMRS/PVTG) অনুসারে (যা ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষ থেকে কার্যকর হয়েছে) সমস্ত Particular Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) এর শিশুরা SSA/RMSA এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নোলিখিত সুযোগ সুবিধা সমূহ পাবে-

ক) PVTGs দলের সমস্ত মানুষের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিদ্যালয়গামী বয়সের সমস্ত শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) অকালে স্কুলছুট হবার হারকে দ্রুত যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

গ) PVTGs দের বাসস্থানের নিকটে SSA/RMSA থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও এদের জন্য (বর্তমান গবেষণায় বিরহড় শিক্ষার্থীদের জন্য) আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) বিরহড়দের এলাকাগুলিতে ঘন ঘন জন সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করে সমস্ত বিরহড় শিশুকে বিদ্যালয় মুখী করতে হবে ; বিদ্যালয়ে তাঁদের নিয়মিত উপস্থিতিকে নিশ্চিত করতে হবে এবং স্কুলছুট হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে নির্মূল করতে হবে।

ঙ) স্থানীয় এলাকার শিক্ষিত মানুষদেরকে এদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ দিতে হবে। এর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পৃথক প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন তাঁদের জন্য পৃথক আর্থিক বা অন্যান্য ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) এদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

ছ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার, যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা (শৌচাগারে), উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম এবং দশম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর মুখে বিরহড় এবং অন্যান্য PVTGs রা যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলির অপসারণ করতে হবে এবং এদের জন্য পৃথক কোচিং ক্লাস এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) স্থানীয় মানুষদের চাহিদা এবং আদিবাসীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির প্রতি শ্রদ্ধাজানিয়ে ঐ সময়গুলিতে বিদ্যালয়ে ছুটি দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতে পারে। বিদ্যালয়গুলিকেও ঐ অনুষ্ঠানগুলিতে যুক্ত করা যেতে পারে।

ঞ) স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ট) স্থানীয় ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আদিবাসীদের ভাষাকে সম্মান জানিয়ে ঐ সমস্ত ভাষার ব্যবহার এবং উন্নয়নের সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঠ) আবাসিক এবং অনাবাসিক সমস্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ড) শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পুরণের জন্য বিদ্যালয়ে সব্জি চাষ করতে হবে। এই কাজে শিক্ষার্থীদের ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে সব্জি চাষের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির পাঠ পাবে।

নেমো (২০২৪) এর গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব ভারতের একলব্য স্কুলগুলির মধ্যে কেবল মাত্র 'রামকৃষ্ণ মিশন' পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে গুণগত মানের উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু সরকার পরিচালিত একলব্য স্কুলগুলির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। মনে রাখতে হবে যে, একলব্য স্কুলগুলিতে বিরহড় শিক্ষার্থীদেরও আবাসিক ব্যবস্থায় পঠন পাঠনের সুযোগ রয়েছে। মুখার্জী (২০১৪) র গবেষণাতে উঠে এসেছে যে, বিরহড় সম্প্রদায় ভুক্ত মেয়েদের জন্য সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার নীতি থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সচেতনতার অভাব রয়েছে। কম বয়সে বিরহড় মেয়েদের বিয়ে, দারিদ্র্য, পারিবারিক নিরক্ষরতা, বিদ্যালয় থেকে পরিবারের দূরত্ব ইত্যাদির কারণে এরা বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাটুকুও সম্পূর্ণ করতে পারে না। সেনগুপ্ত ও ঘোষ (২০১২), গৌদাম ও সেখ (২০১৪) এর গবেষণার ফলাফলও বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের অনুসারী।

পুরুলিয়া জেলার বিরহড় সম্প্রদায়ের কোনো গ্রামেই প্রথা বহির্ভূত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র নেই। স্বাভাবিক ভাবে বয়স্ক বিরহড় সদস্যদের এমনকি স্কুলছুট যুবক-যুবতীদের জন্য সাক্ষরতার এবং সাক্ষরতা পরবর্তী পাঠগ্রহণের কোনো ব্যবস্থা আজও হয়নি।

বিরহড় গোষ্ঠীর কোনো গ্রামেই 'মহিলা মঙ্গল সমিতি' নেই। অন্যান্য আদিবাসী মহিলারা 'Self-Help Group' এর সদস্য হলেও বিরহড় মহিলারা এই দলের সদস্য নন। স্বাভাবিক ভাবে বিরহড় মহিলারা বনজ সম্পদ সংগ্রহের বাইরে কোনো অর্থ উপার্জনের পথ জানেন না। বিরহড় মেয়ে এবং মহিলাদের উন্নয়নের জন্য তাই 'Self-Help Group' এবং 'মহিলা মঙ্গল সমিতিতে' এদের যুক্ত করা আশু প্রয়োজন।

ভারত তথা বহির্বিশ্বের সমস্ত আদিবাসী সমাজ পাহাড়-জঙ্গল-ঝর্ণা-নদী ভিত্তিক জীবন আজও পছন্দ করেন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাহিত পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞানকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন, এই জ্ঞান সঞ্জাত জীবন যাপন তাঁদেরকে দেখিয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের দিশা। প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত অপূর্ব ভাণ্ডারকে নষ্ট না করেও যে প্রকৃতির সম্পদের উপর নির্ভরশীল থেকে জীবন যাপন করা যায়, প্রকৃতিকে তার নিজস্ব সম্পদে মহিমান্বিত করে রাখা যায় তার প্রমান পাই আদিবাসীদের জীবন চর্চায়। আদিবাসী গোষ্ঠীর 'harmonious relationship between human nature, universe and notions of equality and complementarity' তে (Ibanez, 2010; Gudynas, 2011b)। সুস্থ থাকার মৌলিক শর্তগুলি হল – পুষ্টিকর খাদ্য এবং পানযোগ্য পানীয় জলের ছেদহীন যোগান, বাসস্থান, পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসা যুক্ত পরিবার এবং প্রতিবেশীদের মধ্যের বন্ধন, সুস্বাস্থ্য, স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য, সুস্থিত সমাজ এবং

সংস্কৃতি, ধর্মাচরণে স্বাধীনতা, দূষণমুক্ত এবং সুরক্ষিত পরিবেশে জীবন যাপনের সুযোগ এবং জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা (UNPFII, 2010).

আদিবাসী মানুষরা তাদের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের সহায়তায় সুন্দর জীবন যাপনে সমর্থ যা একই সঙ্গে স্থিতিশীল উন্নয়নকে ধরে রাখতে সহায়তা করে। আদিবাসী মানুষদের দীর্ঘ প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে পাওয়া জীবন অভিজ্ঞতা তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকার পাঠ দিয়েছে (Gudynas, 2011a; Mollo, 2011; Cunningham, 2010a) ।

পুরুলিয়া জেলার বিরহড় সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়নকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বিরহড়রা-

ক) আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে সুস্থ জীবন চর্চায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা সুস্থ জীবনের প্রত্যাশী প্রকৃতি এবং বিশ্বকে সুরক্ষিত রেখে। বলিভিয়া, ইকুয়েডর, পানামা প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকা ভুক্ত দেশগুলির আঞ্চলিক আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য (Gudynas, 2011b)। নিকারাগুয়াতে Miskitu আদিবাসী সম্প্রদায় ‘laman laka’ নামে যে ধারণা পোষণ করে তাতে বলা হয়েছে যে সম্প্রদায়ের সকলে মিলে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে একত্রে বাস করবে, যে জমিটুকু চাষের জন্য ব্যবহার যোগ্য তাকে সবাই মিলে ভোগ করবে, নিজেদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে মত বিনিময় করবে, এবং লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে সকলে পরিবার ও সমাজে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন করবে (Cunningham, 2010a, 2010b). ল্যাটিন আমেরিকার বাইরে ফিলিপিন্স –এ Cordillera region এর Kemkanaey Igorot উপজাতির সম্প্রদায়ের মানুষরাও ‘gawis ay biag’ এর কথা বলে, যার অর্থ হোল সকলের সম্মিলিত সুস্থ সুন্দর জীবন (UNPF11, 2010) পানামা,

কুয়েতে আদিবাসীরা যে ‘balu wala’ –র ধারণা পোষণ করে তাঁর অর্থ হল মাতৃভূমি এবং মানুষের মধ্যের সুস্থ সম্পর্ক, যেখানে মানুষ মাতৃভূমি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

গবেষণায় বর্তমান গবেষক দেখেছেন যে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত জ্ঞান বা দেশীয় জ্ঞান বংশপরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় অপ্রথাগত ভাবে – যা প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যক্রম নয়, জীবন ব্যাপী শিখন, কাজের মধ্যে দিয়ে শিখন, নিরন্তর পর্যবেক্ষণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া- বয়স্ক মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে (UNESCO, 2009) ইত্যাদি আদিবাসী মানুষদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের একজন হিসাবে গড়ে তোলে। বই পড়ে বা কোন কোর্স করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করা যাবে না, কারণ এই জ্ঞান হল “living process to be absorbed and understood” (Battiste, 2002) আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেশীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ সমূহ বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সঞ্চারিত হয়। গল্পকথা, পৌরাণিক কাহিনী, গান, নাচ, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে মুখে মুখে এই জ্ঞান ভাণ্ডার, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় (Marika et.al., 2009; Battiste, 2002)। সুতরাং আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভাষা বাঁচলে বেঁচে যাবে সংস্কৃতি, সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমূহ, ধর্মীয় রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা, প্রতীক এবং শিল্পকলা (Sillitoe, 1998; Battiste, 2002) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেশীয় জ্ঞান প্রবাহিত হয় বংশ পরম্পরায়। দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালন সমান ভাবে ঘটেনা; লিঙ্গ, বয়স, অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, পেশা ইত্যাদির কারনে দেশীয় জ্ঞান একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন হারে সঞ্চারিত হয়। এমনকি দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালনের গুণগত এবং পরিমাণগত মানও ভিন্ন ভিন্ন হয় (Briggs, 2005; Grenier, 1998)।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালনে যদিও নারী এবং পুরুষের ভূমিকা সমান, তবুও এই বিষয়ে নারী এবং বয়স্ক সদস্যদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে (Tebtebba/ Foundation, 2009)। পুরুলিয়া জেলায় বাসকারী বিরহড়দের মধ্যে দেশীয় জ্ঞান ধারার সঞ্চালনে ভালো ভাবে নারী এবং পুরুষদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝা যায়। এর কারণ পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষদের কর্মবিভাজন এবং দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য। পুরুষরা জঙ্গল থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহ, শিকার, অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে অর্থ উপার্জন, সমাজের সদস্য হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকে। অন্যদিকে মহিলারা জঙ্গল থেকে পাতা ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, সংসারের কাজ, শিশু এবং বয়স্কদের লালন-পালনে যুক্ত থাকে। ওষধি গাছ সংগ্রহ করার প্রধান ভূমিকা পালন করে পুরুষরা।

আদিবাসী সমাজে মহিলারা মাতৃভূমি রূপে সংজ্ঞায়িত হন। কারণ প্রকৃতি তথা পৃথিবীর ন্যায় মহিলারাও সৃষ্টি করেন প্রাণ। তাই মহিলারা আদিবাসী বিরহড় সমাজে কেবলমাত্র পরিবার তথা সমাজের 'সেবাদাত্রী' নন, একই সঙ্গে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান, সংস্কৃতি, জীব বৈচিত্র্য ইত্যাদির ধারক ও বাহক। অপ্রথাগত শিখনের মাধ্যমে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান, সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি মহিলারাই সন্তান তথা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সঞ্চারিত করেন (Howell, 2003)। প্রকৃতি তথা জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে এই জ্ঞানকে ব্যবহার করা যায়। জঙ্গলে কোথায় কি গাছ রয়েছে, ঐ গাছ থেকে খাবার কি ভাবে সংগ্রহ করা যাবে, বর্ষাকালে যখন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করা যাবে না তখনকার খাবারের সংস্থান পূর্ব থেকে টাণ্ডার মধ্যে জমা করে রাখার ন্যায় কাজের দায়িত্ব বিরহড় মহিলাদের উপর বর্ত্তায়। আফ্রিকাতেও আদিবাসী মহিলারা একই রকম দায়িত্ব পালন করেন (Ramphele, 2004)। সুতরাং ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য

রাষ্ট্রে আদিবাসী মহিলারা স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে আদিবাসী সমাজের অভ্যাস, প্রথা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সঞ্চারিত করেন। জঙ্গলকে বাঁচাতে এবং জঙ্গলের জীব বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখতে আদিবাসী মহিলাদের বিশেষত বিরহড় সম্প্রদায়ের মহিলাদের অবদান সর্বাধিক - যেহেতু তাঁরা জানেন জঙ্গলের কোন গাছ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কোন সময়ে গাছটির কোন অংশ এবং কতটাকে সংগ্রহ করা যাবে, যাতে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও জঙ্গলের জীব-বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা যাবে (Pradhan et.al., 2011)।

পরিবারের উন্নয়নে আদিবাসী মহিলা ও পুরুষদের দায়িত্ব প্রায় সমান সমান থাকায় আদিবাসী মহিলারা নিজেদেরকে মূল্যহীন বা পৃথক বলে চিহ্নিত করেন না। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় উঠে এসেছে ভিন্ন তথ্য। যেমন সামাজিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা সভায় আজও বিরহড় সমাজের মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় অনুপস্থিত। তাদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানভাণ্ডার সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবার কমই সুযোগ পায় (Rocheleau, 1991), তাঁদের কাজ যথেষ্ট মূল্য পায় না (Gururani, 2002), সর্বসমক্ষে তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। শুধু বিরহড় সমাজে নয়, অন্যান্য আদিবাসী সমাজেও মহিলাদের অভিজ্ঞতা প্রায় একই প্রকারের। আদিবাসী সমাজে মহিলাদের ক্রমহ্রাসমান গুরুত্ব তাঁদের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানকে নষ্ট হতে দেয় - যা আদিবাসী সমাজ এবং আধুনিক সমাজের পক্ষে বিপদ সংকেত আনছে সন্দেহ নেই। কোন কোন গবেষক এর কারণ হিসাবে আদিবাসী মহিলাদের প্রথাগত শিক্ষার অভাব এবং সমাজের একজন সম্মানিত সদস্য হিসাবে অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন (Schmink & Gomez-Garcia, 2015)। নারী এবং পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশীয় জ্ঞান এবং

উত্তরাধিকারকে বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত করা অসম্ভব- ফলে পর্যায়ক্রমে ঘটবে দেশীয় জ্ঞানের ধ্বংস সাধন। তাই আদিবাসী মহিলাদের ও সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্ত কাজকর্মে যথেষ্ট সম্মান এবং গুরুত্ব সহকারে যুক্ত করতে হবে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের ন্যায় স্থিতিশীল উন্নয়নে দেশীয় জ্ঞান বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনে বয়স্কদের গুরুত্বও অপরিসীম (Dweba & Mearns, 2011)। বয়স্ক বিরহড়রা পূর্বপুরুষদের থেকে বংশপরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং নিজস্ব অর্জিত অভিজ্ঞতাকে একত্রে সংশ্লেষণ করে উত্তরপুরুষদের হাতে সঞ্চারিত করেন। গল্প, কথকতা, গান-ছড়া, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে বয়স্ক বিরহড় সদস্যরা তাঁদের অর্জিত দেশীয় জ্ঞানের উত্তরাধিকারকে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেন। চিরাচরিত ভাবে এই প্রথা থাকলেও বর্তমান নতুন প্রজন্মের বিরহড়রা পূর্বপুরুষ এবং বয়স্ক সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের আহরণে এবং তার প্রয়োগে অনীহা প্রকাশ করছেন।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণাতেও এই একই অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে (Posey, 1990 ; Ohmagori & Berkes 1997 in Canada ; Rocheleau, 1991 in Kenya)। এবং অন্যান্য গবেষকরা (Rocheleau, 1991 ; Odora Hoppers, 2001) লক্ষ্য করেছেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথাগত বিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তনের কারণে নতুন প্রজন্মের মধ্যে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের প্রতি অবহেলা এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং দেশীয় জ্ঞানের গুরুত্ব বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার অনেকাংশে সমাধান সম্ভব।

৭.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য (Significance of present Research in Education):

সমগ্র বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম বিশ্বাস, চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান এবং তার ব্যবহার, স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে। UNESCO (2009) এর মতে প্রতিষ্ঠানিক প্রথাগত শিক্ষা আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি সহায়কও বটে। আদিবাসী ছেলে মেয়েরা অপ্রথাগত পদ্ধতিতে পরিবার এবং পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি লাভ করে- যা তাদেরকে আদিবাসী সমাজ ও পরিবেশে উপযুক্ত ভাবে মানিয়ে চলতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রবেশ করে আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীরা ভুলে যাচ্ছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা এবং মূল্যবোধকে। তাদের কাছে গুরুত্ব হারাচ্ছে মা এবং প্রকৃতিরূপী মা। চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান তাদের কাছে অশিক্ষিতদের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। স্থিতিশীল উন্নয়নের বদলে তারা স্বপ্ন দেখে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থিতিশীলতার। প্রতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তারা নিজের গ্রামে ফিরে যায় না, নিজস্ব পরব এবং সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেনা বা যোগ দিতে তাদের মন চায়না। ধীরে ধীরে নিজস্ব মাতৃভাষাও এই সব পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতরা ভুলতে থাকে। এই সব ছেলে মেয়েরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে গিয়েও অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চজাতির সঙ্গেও বিয়ে করে।

প্রথাগত শিক্ষায় আদিবাসীরা প্রবেশ করার পর সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের ভাষা এবং দেশীয় জ্ঞান দ্রুত হারে নষ্ট হয়ে চলেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় বসবাসকারী অধিকাংশ অসুর গ্রামের মানুষজন তাদের

নিজস্ব ভাষা আসুরী ভাষা একেবারেই ভুলে গেছে-কেউ আর আসুরী ভাষায় কথা বলে না। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী কোড়া উপজাতির অধিকাংশ গ্রামে কেউ আর কোড়া ভাষায় কথা বলে না।

প্রথাগত শিক্ষার নাগপাশে বন্দী হয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে আবাসিক বিদ্যালয়ের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা (Ohmagari & Berkes, 1997) বোডিং স্কুলের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা (Reyhner & Eder, 2015) অথবা মেসবাড়ি থেকে লেখাপড়া করা (Armitage, 1995) আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীরা তাঁদের সম্প্রদায়ের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়েছে ; এবং সঙ্গে হারিয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ বন্ধন, রীতিনীতি, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য। আদিবাসীরা নিজস্ব ভাষা হারালে হারিয়ে যায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং দেশীয় জ্ঞান। কারণ দেশীয় জ্ঞান ধরা রয়েছে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায়। একথা আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সমাজ যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। এই প্রসঙ্গে Stavenhagen (2015) এর বক্তব্যটি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য – আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের তাঁদের পরিবার, পরিবেশ এবং সংস্কৃতি থেকে পৃথকীকৃত করলে তা সৃষ্টি করবে "irreparable harm to the survival of indigenous cultures and societies" (p.255)।

Stavenhagen (2015) এর কথা মনে রাখলে ভারতে প্রতিষ্ঠিত একলব্য স্কুল, বনবাসী আশ্রমিক স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াবে।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের একীভূত বা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের একই সঙ্গে পাঠদান করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আদিবাসীদের জ্ঞান এবং তার প্রয়োগকে প্রথাগত শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গীভূত করা হচ্ছে, যাতে আদিবাসীদের অর্জিত চিরাচরিত পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞান ভাণ্ডার নষ্ট না হয়ে সুরক্ষিত থাকে এবং এই বিষয়ে নিরন্তর জ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এই একই কথা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। নিরন্তর চর্চার মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিকে। আদিবাসী ভাষা, সংস্কৃতি, চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানকে কোন অবস্থাতেই ছোট করা যাবে না। শিক্ষক শিক্ষিকাদের ও এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অন্যথায় আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান, মূল্যবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে শিক্ষকরা ইতিবাচক মনোভাব সহকারে বিশ্লেষণ এবং গ্রহণ করতে পারবেননা (Radoll, 2015 ; Nakashima et.al., 2012)। অন্যদিকে Odora Hoppers, (2001, p.18) এর ভাষায়, “every time a child enters the gates of the school, the spontaneous process of that symbolic fumigation, cosmological cleansing, and mandated acculturation begins”.

চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের চর্চা হ্রাস পেলে বা ধ্বংস হলে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরার হার কম হবে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মানের অবনতি ঘটবে অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায়। প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত এই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। অস্ট্রেলিয়াতে দেখা গেছে, অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা গনিত, বিজ্ঞান এবং পঠনের ক্ষেত্রে অন্তত ২.৫ বৎসর পিছিয়ে থাকে (Dreise & Thomson, 2014)। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পেরুতেও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সমবয়সী অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় গনিত এবং বানানে পিছিয়ে থাকতে (Arteaga & Glewwe, 2014) দেখা যায়।

শিক্ষক, পাঠক্রম প্রণেতা এবং পলিসি রচনাকারীদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। আদিবাসী ছেলে মেয়েদের অর্থপূর্ণ এবং কার্যকারী পাঠদান করতে হলে আদিবাসী সমাজ থেকে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় এবং পলিসি রচনায় সক্রিয় ভাবে যুক্ত করতে হবে।

প্রতিটি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আদিবাসী চর্চাকেন্দ্র' স্থাপন করে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এবং পেশাদার ব্যক্তিদের এই কেন্দ্রের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নিরন্তর গবেষণা এবং আদিবাসী চর্চাকে প্রথাগত শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এছাড়াও আদিবাসীদের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা ভিত্তিক বই প্রকাশ করতে হবে যাতে সাধারণের মধ্যে আদিবাসীদের সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি হয় এবং আদিবাসীদের প্রতি সর্বসাধারণের মনোভাব ইতিবাচক হয়।

একই সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আদিবাসী চর্চাকে একটি পূর্ণাঙ্গ অবশ্য পাঠ্যপত্র হিসাবে যুক্ত করতে হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.৪ পরবর্তী গবেষণার সুযোগ (Opportunities of Further Research):

১) বর্তমানের বিশ্বায়ন, পাশ্চাত্তীকরণ আধুনিকীকরণ ইত্যাদির প্রবল ধাক্কায় চিরাচরিত জীবনে খুশি থাকা আদিবাসীরা কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তার থেকে আশু ও দীর্ঘস্থায়ী মুক্তির পথ খুঁজে বার করা।

২) বনবাসী আবাসিক আশ্রম বিদ্যালয়, একলব্য স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও মিশন পরিচালিত আদিবাসীদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন, ছুটির সময় তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

৩) আদিবাসী চর্চা কেন্দ্রগুলির গবেষণার আশু এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করা।

৪) আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষার সুযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভাষা ও লিপি বিষয়ে গবেষণা করা।

৫) আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৭.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Research):

১) বর্তমান গবেষণায় গবেষক কেবলমাত্র বিরহড় সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করেছেন।

২) PVTGs এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় ছাড়াও লোধা এবং টোটো উপজাতি রয়েছে, গবেষক দক্ষিণবঙ্গের লোধাদের সঙ্গে বিরহড়দের তুলনামূলক আলোচনা করেননি।

৩) বিরহড়দের উপর গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমিতে বাসকারী বিরহড়দের গবেষণায় যুক্ত করা হয়নি।

৪) বিরহড় সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে কোন পি.এইচ.ডি./এম.ফিল. স্তরের গবেষণা বর্তমান গবেষকের নজরে আসেনি। যথেষ্ট গবেষণা পত্র ও প্রকাশিত হয়নি। তাই গবেষক খুব বেশি সংখ্যক গবেষণা পত্রের পর্যালোচনার সুবিধা পাননি।

৫) উপযুক্ত সহায়ক ব্যবস্থার অভাবে গবেষক যথেষ্ট সংখ্যক চিত্র এবং ভিডিও তুলে ধরতে পারেননি।

References:

Guha, S., & Ismail, M. D. (2015). Socio-Cultural Change of Tribes and their Impacts on Environment with Special Reference to Santal In West Bengal. *GJISS*, 4(3), 148-156.

Saren, G. (2013). Impact of Globalization on the Santals: A Study on Migration in West Bengal, India. *IJHSSI*, 2(7), 29-33.

Ghosh, S. (2018). Impact of Different Development Programmes on the Scheduled Tribe People in West Bengal- Case Study on Birhor Community. *Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika*, 5(11), 182-185.

Nemo, P. (2024). Tribal Education in Eastern India with Special Reference to Eklavya Model Residential Schools. Ph. D. Thesis (unpublished) in Educational Studies, University of Calcutta.

Mukherjee, (2014). Status of Female Education among Santal, Kheria, Sabar and Birhor Tribal Communities of Purulia District, West Bengal, India. *Transactions Indian Geographers*, 36 (2), 271-278.

Sengupta, S., & Ghosh, S. (2012). Problems of Education among the Scheduled Tribes in India: Finding a Balance. *Geo-Analyst*, 2(1).

Goudam, S., & Sekh, T. V. (2014). Factors Leading to School Drop-Outs in India: an Analysis of National Family Health Survey-3 Data. *Journal of Research & Method in Education*, 4, 2320-7388. November–December. www.iosrjournals.org

Ibanez, A. (2010). Un Acercamiento al buen vivir. Producto Del Taller "La educacion popular en la lucha por el buen vivir", San Salvador. *Consejo de Educacion de Adultos de America Latina.*

Gudynas, E. (2011b). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *America Latina en Movimiento*, 462, 1-20.

UNPFII (April, 2010). Ninth Session E/C.19/2010/CRP.425. The Human Development Framework and Indigenous Peoples' Self-Determined Development with Culture and Identity. 19-30 April, 2010. New York: United States.

Gudynas, E. (2011a). Buen vivir: today's tomorrow. *Development*, 54 (4), 441-447.

Mollo, E. C. (2011). El vivir bien, una propuesta de los pueblos indigenas a la discusion sobre el desarrollo. *OBETS, Revista de Ciencias Sociales*, 1(6), 19-34.

Cunningham, M. (2010 a). Acerca de la vision del "buen vivir" de los pueblos indigenas en latinoamerica. *ASUNTOS INDIGENAS*, 1-2 (10), 52-55.

Gudynas, E. (2011 b). Buen vivir: Germinado alternativas al desarrollo. *America Latina en Movimiento*, 462, 1-20.

Cunningham, M. (2010 a). Acerca de la vision del "buen vivir" de los pueblos indigenas en latinoamerica. *ASUNTOS INDIGENAS*, 1-2 (10), 52-55.

Cunningham, M. (2010 b). Laman laka: Our Indigenous Path to Self-Determined Development. In Tauli-Corpuz, V., Enwike-Abayao, L., & de Chavez, R. (Eds.) *Towards an Alternative Development Paradigm: Indigenous Peoples' Self-Determined Development.* Philippines, Tebtebba Foundation.

UNPFII (April, 2010). Ninth Session E/C.19/2010/CRP.425. The Human Development Framework and Indigenous Peoples' Self-Determined Development with Culture and Identity. 19-30 April, 2010. New York: United States.

UNPFII (April, 2010). Ninth Session E/C.19/2010/CRP.425. The Human Development Framework and Indigenous Peoples' Self-Determined Development with Culture and Identity. 19-30 April, 2010. New York: United States.

UNESCO. (2009). *Learning and Knowing in Indigenous Societies Today.* Paris: UNESCO.

Battiste, M. (2002). *Indigenous Knowledge and Pedagogy in First Nations Education:* A Literature Review with Recommendations. Ottawa: Apamuwek Institute.

Marika, R., Yunupingu, Y., Marika-Mununggiritj, R., & Muller, S. (2009). Leaching the poison-the importance of process and partnership in working with Yolngu. *Journal of Rural Studies*, 25 (4), 404-413.

Battiste, M. (2002). *Indigenous Knowledge and Pedagogy in First Nations Education:* A Literature Review with Recommendations. Ottawa: Apamuwek Institute.

Sillitoe, P. (1998). The development of indigenous knowledge: a new applied anthropology. *Current Anthropology*, 39 (2), 223-252.

Battiste, M. (2002). *Indigenous Knowledge and Pedagogy in First Nations Education:* A Literature Review with Recommendations. Ottawa: Apamuwek Institute.

Briggs, J. (2005). The use of indigenous knowledge in development: problems and challenges. *Progress in Development Studies*, 5(2), 99-114. Available at: http://eprints.gla.ac.uk/1094/1/JBriggs_eprint1094.pdf

Grenier, L. (1998). *Working with indigenous knowledge: A guide for researchers.* Ottawa: International Development Research Center.

Tebtebba Foundation. (2009). *Asia Summit on Climate Change and Indigenous Peoples.* 24-27 February 2009. Bali: Indonesia. 5-27.

Howell, P. (2003). *Indigenous early warning indicators of cyclones: potential application in coastal Bangladesh.* London: Benfield Greig Hazard Research Centre. Available at: http://www.unisdr.org/files/1529_workingpaper6.pdf

Ramphele, M. (2004). Women's indigenous knowledge: Building bridges between the traditional and modern. In The World Bank. (Ed). *Indigenous Knowledge: Local Pathways to Global Development. Knowledge and Learning Group.* Washington D.C.: The World Bank.

Pradhan, S., Mishra, S., & Mohapatra, S. C. (2011). Food practices among the adivasi women of selected district, Western Orissa. *Indian Journal of Preventive and Social Medicine,* 42(3), 226-230.

Rocheleau, D. E. (1991). Gender, ecology, and the science of survival: Stories and lessons from Kenya. *Agriculture and Human Values,* 8(1-2), 156-165.

Gururani, S. (2002). Le savoir des femmes du tiers monde le discours sur le development, *Revue international des sciences sociales,* 54(173), 353-363. Available at: www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2002-3-page-353.htm.

Schmink, M., & Gomez-Garcia, M. A. (2015). Under The Canopy: Gender and Forests in Amazonia. *Center for International Forestry Research (CIFOR),* Occasional Paper No. 121.

Dweba, T. P., & Mearns, M. A. (2011). Conserving indigenous knowledge as the key to the current and future of traditional vegetables. *International Journal of Information Management,* 31(6), 564-571.

Posey, D. (1990). Intellectual property rights: and just compensation for indigenous knowledge. *Anthropology Today*, 13-16.

Ohmagari, K., & Berkes, F. (1997). Transmission of indigenous knowledge and bush skills among the Western James Bay Cree women of subarctic Canada. *Human Ecology*, 25(2), 197-222.

Rocheleau, D. E. (1991). Gender, ecology, and the science of survival: Stories and lessons from Kenya. *Agriculture and Human Values*, 8(1-2), 156-165.

UNESCO. (2009). *Learning and Knowing in Indigenous Societies Today*. Paris: UNESCO.

Rocheleau, D. E. (1991). Gender, ecology, and the science of survival: Stories and lessons from Kenya. *Agriculture and Human Values*, 8(1-2), 156-165.

Odora Hoppers, C. A. (2001). Indigenous knowledge systems and academic institutions in South Africa. *Perspective in Education*, 19(1), 73-85.

UNESCO. (2009). *Learning and Knowing in Indigenous Societies Today*. Paris: UNESCO.

Ohmagari, K., & Berkes, F. (1997). Transmission of indigenous knowledge and bush skills among the Western James Bay Cree women of subarctic Canada. *Human Ecology*, 25(2), 197-222.

Reyher, J., & Eder, J. (2015). *American Indian Education: A History*. Oklahoma: University Of Oklahoma Press.

Armitage, A. (1995). *Comparing the Policy of Aboriginal Assimilation: Australia, Canada, and New Zealand*. Vancouver: University of British Columbia Press. Available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED403094.pdf

Stavenhagen, R. (2015). Indigenous Peoples' Rights to Education. *European Journal of Education,* 50(3), 254-257.

Stavenhagen, R. (2015). Indigenous Peoples' Rights to Education. *European Journal of Education,* 50(3), 254-257.

Radoll, P. (2015). Aboriginal peoples, education and information and communication technologies in Australia. In Bidwell, N. J., & Winschiers-Theophilus, H. (eds). *At the intersection of indigenous and traditional knowledge and technology design.* Santa Rosa: Informing Science Press.

Nakashima, D. J., Galloway McLean, K., Thulstrup, H. D., Ramos Castillo, A., & Rubis, J.T. (2012). *Weathering uncertainty: traditional knowledge for climate change assessment and adaptation*. Paris UNESCO and Darwin: UNU.

Odora Hoppers, C. A. (2001). Indigenous knowledge systems and academic institutions in South Africa. *Perspective in Education*, 19(1), 73-85.

Arteaga, I., & Glewwe, P. (2014). Achievement Gap between Indigenous and Non-Indigenous Children in Peru: An analysis of Young Lives Survey Data. *Young Lives Working Paper 130.* at:http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/Younglives/wp130_arteaga_learning-gaps.pdf

Dreise & Thomson (2014). Details not found.

গ্রন্থপঞ্জী

(BIBLIOGRAPHY)

About the Region-Damodar Basin, Ministry of Environments and Forests. (http://envfor.nic.in/divisions/cltech/damodar/1.1.htm). 2007-09-27. Retrieved 2008-05-25.

Archived from the original on 7 January 2013, Retrieved 2 April 2012 (https://web.archive.org/web/20130107202215/http://www.tribalzone.net/people/jaipalsingh.htm).

Archived from the original. (http://www.cityofmine.in/history-tradition-culture-heritage-tourism-festivals-of-purulia). On 4rth November 2012. Retrived 17 January 2013.

Armitage, A. (1995). *Comparing the Policy of Aboriginal Assimilation: Australia, Canada, and New Zealand*. Vancouver: University of British Columbia Press. Available at: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED403094.pdf

Arteaga, I., & Glewwe, P. (2014). Achievement Gap between Indigenous and Non-Indigenous Children in Peru: An analysis of Young Lives Survey Data. *Young Lives Working Paper 130.* at:http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/outputs/Younglives/wp130_arteaga_learning-gaps.pdf

Bahadur, K. P. (1977). *Bengal, Bihar and Orisha: Casete, Tribes, and Culture of India.* Vol-III. Ess ess publication, Delhi. pp.13-14

Battiste, M. (2002). *Indigenous Knowledge and Pedagogy in First Nations Education:* A Literature Review with Recommendations. Ottawa: Apamuwek Institute.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006). *Research in Education*.Tenth Edition, Pearson Education, Inc.

Briggs, J. (2005). The use of indigenous knowledge in development: problems and challenges. *Progress in Development Studies*, 5(2), 99-114. Available at: http://eprints.gla.ac.uk/1094/1/JBriggs_eprint1094.pdf

Brim, J. A., & Spain, D. M. (1974). *Research Design in Anthropology: Paradigms and Pragmatics in the Testing of Hypotheses.* New York: Holt, Rinehart & Winston.

Carruthers, I., & Chambers, R. (1981). Rapid Appraisal for Rural Development. *Agricultural Administration*, 8(6), pp.407-422.

Census of 1951, Government of India.

Census of 2011, Government of India.

Census report 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, British Government of India.

Census Report 2001, Government of India.

Census Report 2011, Government of India.

Chambers, R. (1980). "Rapid rural appraisal: Rationale and repertoire", *IDS Discussion Paper*, No. 155 Brighton: IDS. University of Sussex. September.

Chambers, R. (1993). *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development.* London: Intermediate technology Publication.

Chattopadhyay, A. Bardhaman Jelar Litihas O Loke Snaskriti (History and Folk Lore of Bardhaman District.) (In Bengali), pp. 21-26, ISBN 81-85459-36-3.

Concise Oxford English Dictionary, (2007).

Conway, G. (1985). "Agroecosystem analysis". *Agricultural Administration,* Vol. 20, pp.31-35.

Conway, G. (1986). *Agroecosystem Analysis for Research and Development* (India: Winrock International Institute for Agricultural Development).

Conway, G. (1987). "Rapid rural appraisal and agroecosystem analysis: A case study from Northern Pakistan", in KKU, *Proceedings of the 1985 International Conference on Rapid Rural Appraisal.* System research and Farming Systems Research Projects. Khon Kaen, Thailand: University of Khon Kaen, pp.228-254.

Creswell. J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions.* London: Sage.

Cunningham, M. (2010 a). Acerca de la vision del "buen vivir" de los pueblos indigenas en latinoamerica. *ASUNTOS INDIGENAS*, 1-2 (10), 52-55.

Cunningham, M. (2010 b). Laman laka: Our Indigenous Path to Self-Determined Development. In Tauli-Corpuz, V., Enwike-Abayao, L., & de Chavez, R. (Eds.) *Towards an Alternative Development Paradigm: Indigenous Peoples' Self-Determined Development.* Philippines, Tebtebba Foundation.

Dalton, E. T. (1872). *Descriptive Ethnology of Bengal.* Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta. p.208

Dalton, E. T. (1872). *Descriptive Ethonology of Bengal, Calcutta.* Office of the Superintendent of Government Printing, Calcutta.

Damoder Valley (https://web.archive.org/web/20070927182506).

Das Basu, D., Roy, S. R., Nandi, A.K., & Sen Gupta, S. P. (2007). *Case Book on India Constitutional Law.* Kamal Law House, Kolkata. P. 961.

District Census Handbook Puruliya, Census of India 2011, Series 20, Part XII A. *Table 33: Distribution of Workers by Sex in Four Categories of Economic Activity in Sub-district 2011. Directorate of Census Operations, West Bengal.*

District Census Handbook: Purulia. General and Census Commissioner of India. 2011.

Dreise & Thomson (2014). Details not found.

Dweba, T. P., & Mearns, M. A. (2011). Conserving indigenous knowledge as the key to the current and future of traditional vegetables. *International Journal of Information Management,* 31(6), 564-571.

Fobers, L. R. (1872). *Report on the Rawati Settlement of the Government Farms in Palamou.* Calcutta: Government Printing Press.

Freire, P. (1968). *Pedagogy of the Oppressed.* New York: The Seabury Press.

Fuchs, S. (1973). *The Aboriginal Tribes of India.* The Macmillian Company of India Ltd, New Delhi, p.172

Ghosh, S. (2018). Impact of Different Development Programmes on the Scheduled Tribe People in West Bengal- Case Study on Birhor Community. *Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika,* 5(11), 182-185.

Gilbert, E. H., Norman, D. W., & Winch, F. E. (1980). *Farming Systems Research: A Critical Appraisal.* MSU Rural Development Paper No. 6, East Lansing: Department of Agricultural Economics, Michigan State University.

Goudam, S., & Sekh, T. V. (2014). Factors Leading to School Drop-Outs in India: an Analysis of National Family Health Survey-3 Data. *Journal of*

Research & Method in Education, 4, 2320-7388. November–December. www.iosrjournals.org

Grenier, L. (1998). *Working with indigenous knowledge: A guide for researchers.* Ottawa: International Development Research Center.

Gudynas, E. (2011b). Buen vivir: Germinado alternativas al desarrollo. *America Latina en Movimiento*, 462, 1-20.

Gudynas, E. (2011a). Buen vivir: today's tomorrow. *Development,* 54 (4), 441-447.

Gudynas, E. (2011b). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *America Latina en Movimiento,* 462, 1-20.

Guha, R. (2008). *India after Gandhi: the History of the World's Largeste Democracy.* ISBN: 978-006095858-9.

Guha, S., & Ismail, M. D. (2015). Socio-Cultural Change of Tribes and their Impacts on Environment with Special Reference to Santal In West Bengal. *GJISS*, 4(3), 148-156.

Gururani, S. (2002). Le savoir des femmes du tiers monde le discours sur le development, *Revue international des sciences sociales,* 54(173), 353-363. Available at: www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2002-3-page-353.htm.

Gypmantasiri et al., (1980). *An Interdisciplinary Perspective of Cropping System in the Chiang Mai Valley: Key Questions for Research.* Thailand: Multiple-Cropping project. Faculty of Agriculture, University of Chiang Mai.

History of Purulia, Bharatonline.com. Retrived 17Th January 2013 (http://www.bharatonline.com/west-bengal/travel/purulia/history.html).

History, Tradition, Culture, Heritage, Tourism & Festivals of Purulia (https://web.archive.org/web/20121104150746/).

Howell, P. (2003). *Indigenous early warning indicators of cyclones: potential application in coastal Bangladesh.* London: Benfield Greig Hazard Research Centre. Available at: http://www.unisdr.org/files/1529_workingpaper6.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/baghmundi

https://en.wikipedia.org/wiki/Balarampur,_Purulia_(community_development_block)

https://en.wikipedia.org/wiki/jhalda_I

Hunter W.W. (1997). A statistical account of Bengal. West Bengal District Gazetters. W.B. Government, pp.9,133,134.

Hunter, W.W. (1876). *A Statistical Account of Bengal*. Vol-VII. District of Maldah, Rangpur and Dinajpur, Trubner & co, London, Pp381-382.

Ibanez, A. (2010). Un Acercamiento al buen vivir. Producto Del Taller "La educacion popular en la lucha por el buen vivir", San Salvador. *Consejo de Educacion de Adultos de America Latina.*

Khubchandani, L. M. (1992). *Tribal Identity-A Language and Communications Perspective.* Indian Institude of Advance Study, Shimla. p.350

Lokur Committee (1965). Department of Social Security, Government of India, p7.

Longhurst, R. (1981). Rapid Rural Appraisal. *IDS Bulletin,* 12(4).

Marika, R., Yunupingu, Y., Marika-Mununggiritj, R., & Muller, S. (2009). Leaching the Poison-The Importance of Process and Partnership in Working with Yolngu. *Journal of Rural Studies*, 25 (4), 404-413.

McMillan, J. H., & Schumaches, S. S. (1997). *Research in Education: A Conceptual Indroduction*. Longman, New York. p.469.

Ministry of Tribal Affairs, Government of India, 2014.

Ministry of Tribal Affairs, Government of India, 2014.

Mollo, E. C. (2011). El vivir bien, una propuesta de los pueblos indigenas a la discusion sobre el desarrollo. *OBETS, Revista de Ciencias Sociales*, 1(6), 19-34.

Mukherjee, (2014). Status of Female Education among Santal, Kheria, Sabar and Birhor Tribal Communities of Purulia District, West Bengal, India. *Transactions Indian Geographers,* 36 (2), 271-278.

Mukhopadhyay, L. (2002). *Tribal Women Development.* Publication Divisions, Ministry of Informative and Broadcasting Government of India, New Delhi. P.133

Mukhopadhyay, L. (2002). *Tribal Women in Development.* Publication Divisions, Ministry of Informative and Broadcasting, Government of India, New Delhi. p.133

Nakashima, D. J., Galloway McLean, K., Thulstrup, H. D., Ramos Castillo, A., & Rubis, J.T. (2012)**.** *Weathering uncertainty: traditional knowledge for climate change assessment and adaptation*. Paris UNESCO and Darwin: UNU.

Nemo, P. (2024). Tribal Education in Eastern India with Special Reference to Eklavya Model Residential Schools. Ph. D. Thesis (unpublished) in Educational Studies, University of Calcutta.

Odora Hoppers, C. A. (2001). Indigenous Knowledge Systems and Academic Institutions in South Africa. *Perspective in Education*, 19(1), 73-85.

Ohmagari, K., & Berkes, F. (1997). Transmission of indigenous knowledge and bush skills among the Western James Bay Cree women of subarctic Canada. *Human Ecology*, 25(2), 197-222.

Posey, D. (1990). Intellectual property rights: and just compensation for indigenous knowledge. *Anthropology Today*, 13-16.

Pradhan, S., Mishra, S., & Mohapatra, S. C. (2011). Food practices among the adivasi women of selected district, Western Orissa. *Indian Journal of Preventive and Social Medicine,* 42(3), 226-230.

Radoll, P. (2015). Aboriginal peoples, education and information and communication technologies in Australia. In Bidwell, N. J., & Winschiers-Theophilus, H. (eds). *At the intersection of indigenous and traditional knowledge and technology design.* Santa Rosa: Informing Science Press.

Ramphele, M. (2004). Women's indigenous knowledge: Building bridges between the traditional and modern. In The World Bank. (Ed). *Indigenous Knowledge: Local Pathways to Global Development. Knowledge and Learning Group.* Washington D.C.: The World Bank.

Reyher, J., & Eder, J. (2015). *American Indian Education: A History*. Oklahoma: University Of Oklahoma Press.

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-Ii. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. p. 232.

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-II. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. pp. 224-225

Risley, H. H. (1892). *The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary.* Vol-II. The Bengal Secretariat Press, Calcutta. pp.68-70

Rocheleau, D. E. (1991). Gender, ecology, and the science of survival: Stories and lessons from Kenya. *Agriculture and Human Values*, 8(1-2), 156-165.

Roy, S. C. (1925). *The Birhors: a Little Know Jungle Tribe of Chotonagpur*. Ranchi: Man in India Office.

Roy, S. C. (1925). *The Birhors: a Little Know Jungle Tribe of Chotonagpur.* Ranchi: Man in India Office.pp.90-92.

Sabharwal, L. R., I. F.S., Conservator of Forests, Bihar, notes as part of appendix IV to report of the Damodar flood enquiry committee (1943). Republished in Rivers of Bengal, a compilation, 2002, p. 236, West Bengal District Gazeteers, Government of West Bengal.

Saren, G. (2013). Impact of Globalization on the Santals: A Study on Migration in West Bengal, India. *IJHSSI*, 2(7), 29-33.

Schmink, M., & Gomez-Garcia, M. A. (2015). Under The Canopy: Gender and Forests in Amazonia. *Center for International Forestry Research (CIFOR),* Occasional Paper No. 121.

Sen Singh, D (2018). The Indian Rivers: Scientific and Socio-Economic Aspects. *Singapore: Springer Hydrogeology. P.259.*

Sengupta, S., & Ghosh, S. (2012). Problems of Education among the Scheduled Tribes in India: Finding a Balance. *Geo-Analyst,* 2(1).

Sengupta. J. C. (1965). *West Bengal District Gazetteer, West Dinajpur.* Sree Swaraswaty Press Ltd., Calcutta, p.69

Shaner, W. W., Philipp, P. F., & Schmehl, W. R. (1982). *Farming System Research and Development: Guidelings for Developing Countries.* Boulder, CO: Westview Press.

Sillitoe, P. (1998). The development of indigenous knowledge: a new applied anthropology. *Current Anthropology*, 39 (2), 223-252.

Sing, K.S. (2012). *The Scheduled Tribes.* Oxford University Press, New Delhi, Pp.104-106.

Sing, K.S. (2012). *The Scheduled Tribes.* Oxford University Press, New Delhi, pp.714-716

Singh, A. K. (2006). Metal Working Fluids from Vegetable Fluids. *Journal of Synthetic Lubrication*, 123, 167-176. http://dx.doi.org/10.1002/jsl.19

Stavenhagen, R. (2015). Indigenous Peoples' Rights to Education. *European Journal of Education,* 50(3), 254-257.

Stavenhagen, R. (2015). Indigenous Peoples' Rights to Education. *European Journal of Education,* 50(3), 254-257.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory. Procedures and Techniques.* Thousand Oaks, CA: Sage.

Tebtebba Foundation. (2009). *Asia Summit on Climate Change and Indigenous Peoples.* 24-27 February 2009. Bali: Indonesia. 5-27.

Troisi, J. (1979). *Tribal Religion, Religious Beliefs and Practices among the Santals.* Monohar Publications, New Delhi. p.26

UNESCO. (2009). *Learning and Knowing in Indigenous Societies Today.* Paris: UNESCO.

UNPFII (April, 2010). Ninth Session E/C.19/2010/CRP.425. The Human Development Framework and Indigenous Peoples' Self-Determined Development with Culture and Identity. 19-30 April, 2010. New York: United States.

Vidyarthi, L.P., & Rai, B. K. (1985). *The Tribal Culture of India.* New Delhi: Concept Publishing Company.

West Bengal Summary. *Rural Household Survey 2005. Department of Panchayat & Rural Development, Government of West Bengal. Archived from* the original *on 13 January 2020.*

West Bengal: Poverty, Growth and Inequality, *World Bank Group. Retrieved 11* January 2020.

Xaxa, V. (2008). *State, Society and Tribes-Issues in Post Colonial India-Pearson.* Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd. Pearson Education in South Asia.

পরিমল ভট্টাচার্য (২০১৯)। সত্যি রূপকথা / *সভ্যতা উন্নয়ন ও উড়িষ্যার এক উপজাতির জীবন সংগ্রাম।* অবভাস (তৃতীয় মুদ্রণ), প্রিস্থা.৭৯-৮০ ।বিবর্ণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুশ্রী. *ভারতবর্ষের আত্ম পরিচয় (পূর্ব).* ভারত চিন্তাঃ ভারতের স্বরূপ সন্ধান। পৃষ্ঠা ১৮-১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান. (২০১২). *প্রসঙ্গ আদিবাসী.* Concept Publishing Company Private Limited, New Delhi.

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ. (১৯৮৭). *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (প্রথম খণ্ড).* প্রকাশনায় শ্রীমতী রিঙ্কি বাস্কে, শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৯), *'আরণ্যক'।* কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা, পৃষ্ঠা.১৭৫।

সলিল সেন (১৯৫৩)। *নতুন ইহুদি।* ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৬৫।

সুবোধ ঘোষ (১৯৪৮), *ভারতের আদিবাসী।* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা.৩১১।

সারাংশ

(SUMMARY)

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা (INTRODUCTION)

১.১ আদিবাসী জীবনের প্রেক্ষাপট (Background of Indigenous Life):

ভারতবর্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। আর এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বহুত্তের ধারণা। এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ, গাছপালা, এবং পশুপাখি বসবাস করে যাদের প্রকৃতিও পরস্পর থেকে ভিন্ন। ভারতের এই বহুত্ব ও ভিন্নতা বর্ণময় হয়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠীর উপস্থিতিতে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রায় ৬৬৫ ধরনের আদিবাসী মানুষ ভারত ভূমিতে বসবাস করেন। আবার কারো কারো মতে ভারতবর্ষে প্রায় ৭০৫ রকমের আদিবাসী মানুষ রয়েছে (Ministry of Tribal Affairs, 2014, p.34)। বিশাল দেশ ভারতবর্ষে এক ঘেয়ে জনজীবনের মধ্যে উদ্দীপনা দানকারী নতুন ধরনের ছোঁয়া লেগেছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী মানুষদের উপস্থিতির জন্য। সকল ধরনের আদিবাসী মানুষের ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, জীবনর্চচা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য – যা একটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে অন্য একটি আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। বিভিন্ন ধরনের আদিবাসীরা ভারত ভূমির বিভিন্ন পরিবেশে আধুনিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করেন। ভারত ভূমিতে আদিবাসীরা অ-আদিবাসী সমাজ থেকে এক পৃথক সত্ত্বা বিশিষ্ট সম্প্রদায়। ২০১১ সালে আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে আদিবাসীদের জনসংখ্যা প্রায় ১০,৪২,৮১,০৩৪ জন যা ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ %। এই বিশাল সংখ্যক আদিবাসী মানুষজনের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন প্রায় ৯,৩৪,১১,১৬২ জন এবং শহর এলাকায় বসবাস করেন প্রায় ১,০৪,৬১,৮৭২ জন। গ্রামীণ মোট জনসংখ্যায় ১১.৩% হলেন বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী মানুষ এবং শহর অঞ্চলে এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২.৮%। ভারতবর্ষে প্রতি ১০০০ জন আদিবাসী পুরুষ পিছু আদিবাসী মহিলার সংখ্যা ৯৯০ জন। আজও পর্যন্ত শুধু ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পৃথিবীতেই আদিবাসী মানুষরা অ-আদিবাসী মানুষজনের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। আদিবাসী মানুষ জনের এই পশ্চাৎপদতা তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিতে অধিক। অপেক্ষাকৃত উন্নত রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়াতেও আদিবাসীরা তাঁদের

শিক্ষা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ইত্যাদির নিরিখে সাধারণ মানুষদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন এবং যে কোন রাষ্ট্রের দরিদ্রদের মধ্যেও এরা দরিদ্র। ভারতবর্ষে আদিবাসীরা এখনও প্রান্তিক জনজাতি বলেই স্বীকৃত (Ministry of Tribal Affairs, 2014, p.25), এমনকি একবিংশ শতাব্দীতেও ভারতের আদিবাসীদের একটি বড় অংশ দিনে তিন বেলা খাবার টুকুও সংগ্রহ করতে পারেননা।

যীশুখ্রিস্টের জন্মের ২৪০-২৪২ বছর পূর্বে ল্যাটিন শব্দ 'ট্রাইবাস' ('Tribus') বলতে বোঝাতো তিনটি গ্রামীণ আদিবাসী গোষ্ঠী- 'টাইটেস', 'র‍্যাম্নেস' এবং 'লুসেরস'। এই গোষ্ঠীর মানুষরা রোম শহরের বাইরে বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করতেন। তাই মনে করা হয় যে এই তিনটি গোষ্ঠী অর্থাৎ 'ট্রাই' থেকে 'ট্রাইবাস' শব্দের উৎপত্তি। কোন কোন নৃতাত্ত্বিক মনে করেন যে 'ট্রাইব' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Phule' অথবা 'Trifu' শব্দ থেকে (Mitra, 2008, p.17)।

ভারতীয় সংবিধানে Article-366(25) - এ আদিবাসীদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে "Scheduled Tribe means such tribes or tribal communities as parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article-342, to be Scheduled Tribes for the purpose of this Constitution" (Das Basu, Ray, Nandi, & Sen Gupta, 2007, p.961)।

ড: রিভার্স (Dr. Rivers) বলেছেন- "তারা সমাজের এমন একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনের জটিলতা নেই যারা এখনো একই ভাষায় কথা বলে, মনের ভাব প্রকাশ করে, যাদের আকৃতি বা সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য আছে, নিজেদের নিয়ম-কানুন রক্ষার জন্য যাদের পঞ্চায়েত আছে এবং প্রয়োজন হলে যারা গোষ্ঠী সচেতন মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রাম করে থাকে তারাই আদিবাসী"।

বিখ্যাত নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এর মতে, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর মানুষরা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে এক ভয়ানক অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতে আদিবাসী, দলিত ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীরা সাধারণ মানুষদের তুলনায় আরো খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

১.২ আদিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Tribes):

প্রতিটি আদিবাসী শ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রথা, সামাজিক গঠন, ধর্ম, এবং ভাষা রয়েছে। তাই কোন দুইটি আদিবাসী শ্রেণি হুবহু এক নয়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাই আদিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এই প্রেক্ষাপট গুলি হল- ভৌগোলিক বিন্যাস, ভাষাগত অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতির প্রকারভেদ, অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং সমন্বয়নের স্তর ইত্যাদি।

বিশিষ্ট সামাজিক নৃতাত্ত্বিক বিদ্যার্থী এবং রায় (১৯৮৫) ভৌগোলিক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে আদিবাসী সমাজকে পাঁচটি প্রধান দলে ভাগ করেছেন এইগুলি হলো-

ক) দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল

খ) পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চল

গ) মধ্য ভারত অঞ্চল

ঘ) হিমালয় এবং হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চল

ঙ) দ্বীপ অঞ্চল

১.৩ আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিক অধিকার (Constitutional Rights for Indigenous People or Tribes)

স্বাধীন ভারতে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আদিবাসী গোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এরা এখনো দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন। তাই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নের জন্য ভারতের সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে ১৫ নং, ১৬(৪), ৩২০(৪), ৩৩৫, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ১৯ (৫), ৩৩৮, ৩৩৯ (২), ২৭৫ (১), ১৬৪, ৪৬, ২২৪, ৩৪২ প্রভৃতি ধারায় আইনানুগ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১.৪ বিভিন্ন কমিশন এবং কমিটির সুপারিশ (Recommendation of Different Commission and Committee)

ক) হান্টার কমিশন (Hunter Commission, 1882):

খ) রাধাকৃষনান কমিশন (Radhakrisnan Commission, 1948):

গ) মুদালিয়ার কমিশন (Mudaliur Commission, 1952-53):

ঘ) কোঠারি কমিশন (Kothari Commission, 1964-66):

ঙ) ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন (National Policy of Education, 1986):

ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP-2020):

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গঠিত হয়েছে ২০২০ সালে ভারতের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে, মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, বৈষম্যহীন সমাজের অগ্রগতির জন্য, উচ্চ গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য, শিক্ষাদান ও শিক্ষা পদ্ধতির গুণগত দিক বৃদ্ধি এবং সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে। ভারতের পূর্বতন জাতীয় শিক্ষা নীতিগুলি বিশেষভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও শিক্ষাগতভাবে প্রাচীনকাল থেকে পিছিয়ে রয়েছে। তাছাড়া SEDG (Socially and Economically Disadvantaged Groups) এবং তপশিলি আদিবাসীদের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (২০২০) আদিবাসীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলি হল –

১) বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন।

২) আদিবাসীরা প্রথাগত শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষাকে আজও বিদেশি হিসেবে মনে করে, এবং তাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে তাই এদের উন্নয়নের জন্য একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

৩) সরকারী তরফ থেকে সাংবিধানিক যে সুবিধা বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা আদিবাসীদের কাছে যাতে পৌঁছায় তার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) স্কুল শিক্ষায় যে সামাজিক বৈষম্য রয়েছে তার দূরীকরণ করতে হবে এবং সামাজিকভাবে শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শিশুদের সমান শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

৫) আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ আদিবাসী শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিশেষভাবে মহিলাদের ছাত্রী আবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে ছাত্রী আবাসে থাকাকালীন মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬) অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে বা অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষাগতমান উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত নবোদয় বিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

৭) এস.ই.ডি.জি (SEDG-Socially and Economically Disadvantaged Groups) এর অন্তর্গত বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে ও শিক্ষা বিকাশে বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। যথার্থ মনোযোগ সহকারে এবং SEDG দের মধ্যে থেকে প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে বিশেষ ছাত্রাবাসে ব্রিজ কোর্স এর টাকা মুকুব ও বৃত্তিদানের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করতে হবে মাধ্যমিক স্তরে, যাতে তারা পরবর্তী স্তরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১.৫ পুরুলিয়া জেলা হিসাবে সৃষ্টি হওয়া ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট (Historical Background of Purulia District's Formation)

ভারতের পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবস্থিত ২৩ টি জেলার মধ্যে পুরুলিয়া একটি অন্যতম জেলা। পুরুলিয়া শহর পুরুলিয়া জেলার প্রধান প্রাণকেন্দ্র এবং এখানেই রয়েছে জেলার 'ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের' অফিস। পুরুলিয়া জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলি হল ঝালদা, রঘুনাথপুর, আদ্রা, বলরামপুর প্রভৃতি।

জৈন ভগবতি সুত্র অনুসারে ১৬ টি মহাজনপদের মধ্যে বর্তমান পুরুলিয়া জেলা প্রাচীন বঙ্গের অধীনে ছিল (History, Tradition, Culture, Heritage, Tourism & Festival of Purulia, 2012)।

১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানি বাংলা, বিহার, ও ওড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলে বর্তমান পুরুলিয়া অঞ্চলটি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন থেকে মানভূম জেলার নামে ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে এই অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ১৮০৫ সালে রেগুলেশন XVIX অনুসারে জঙ্গলমহল জেলার মধ্যে ২৩ টি পরগনা এবং মহলকে একত্রিত

করে যে জেলা তৈরি হয় তার মধ্যে পুরুলিয়া অঞ্চলটি ছিল। ১৮৩৩ সালে রেগুলেশন XIII অনুসারে জঙ্গলমহল জেলাকে ভেঙে দিয়ে মানভূম জেলা তৈরি করা হয় যার প্রধান কেন্দ্র ছিল মানবাজার। মানভূম জেলাটি আয়তনে প্রকাণ্ড ছিল এবং এর মধ্যে ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার কিছু অংশ এবং বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদ, ধলভুম, সরাইখোলা ইত্যাদি অঞ্চল। ১৮৩৮ সালে মানভূম জেলা পরিচালনা অফিসটি মানবাজার শহর থেকে বর্তমান পুরুলিয়া শহরে নিয়ে আসা হয়। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৬ সালে মানভূম জেলাকে ভাগ করে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় রাজ্য স্থাপন করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১ লা নভেম্বর থেকে পুরুলিয়া জেলার জন্ম হয়।

১.৬ পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট (Geographical Background of Purulia District)

পুরুলিয়া জেলা হলো পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এবং জঙ্গলমহল জেলাগুলির মধ্যে একটি। পুরুলিয়া জেলার ২২.৬০ ডিগ্রী এবং ২৩.৫০ ডিগ্রী নর্থ ল্যাটিটিউ এবং ৮৫.৭৫ ডিগ্রি ও ৮৬.৬৫ ডিগ্রি ইস্ট লঙ্গিটিউড এর মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং পুরুলিয়া জেলা উত্তর থেকে পূর্ব ভাগে বিস্তৃত একটি জেলা। এটি মেদিনীপুর ডিভিশনের অন্তর্গত। পুরুলিয়া জেলার ভৌগোলিক সীমানা ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার (2417 Sq KM)। পুরুলিয়া জেলার পূর্বদিকে রয়েছে বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, উত্তরে রয়েছে বর্ধমান জেলা এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের ধানবাদ জেলা। পশ্চিমে রয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের বোকারো ও রাঁচি জেলা এবং দক্ষিণ ভাগে রয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পশ্চিম সিংভূম এবং পূর্ব সিংভূম জেলা। সুতরাং পুরুলিয়া জেলার পূর্বদিকে এবং উত্তর দিকে কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সাথে সীমানা ভাগ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম ভাগে শেষ জেলা পুরুলিয়া এবং এর অবস্থান ট্রপিক্যাল। এটি অনেকটাই যেন ফানেল আকৃতির। বঙ্গোপসাগর থেকে মৌসুমী বায়ুকে পুরুলিয়া জেলার উপর দিয়ে বয়ে যেতে হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। অন্যদিকে পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের মধ্যে প্রবেশদ্বার হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

১.৭ পুরুলিয়া জেলার উৎসব সমূহ (Festivals of Purulia District):

যেহেতু পুরুলিয়া জেলা প্রকৃতির কোলে অবস্থিত এবং তার চারিদিকে রয়েছে পাহাড় ও সবুজ অরণ্য তাই জঙ্গল এবং জঙ্গলে পশু পাখিদের সঙ্গে পুরুলিয়াবাসির রয়েছে এক আন্তরিক সম্পর্ক। তাই প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জেলা ব্যাপী সাংস্কৃতিক নিত্য নতুন উৎসব শুরু হয়। প্রতিটি ঋতুতে এবং প্রত্যেক ঋতুভিত্তিক উৎসবে এখানে চলে নাচ, গান এবং আনন্দের উৎসব। পুরুলিয়া জেলাতে বিভিন্ন ধরনের উৎসব রয়েছে যেমন –

১) শিবের গাজন, ২) দিসম সেন্দ্রাঃ, ৩) ধর্ম ঠাকুরের পূজাও মেলা, ৪) রোহিণী উৎসব, ৫) ইরোকসিম বা বাতুয়ালি, ৬) মনসা পূজা ৭) কারাম পরব, ৮) ছাতা পরব, ৯) ভাদু, ১০) জিতা অষ্টম, ১১) বাঁদনা পরব, ১২) জাথেল উৎসব, ১৩) রাস মেলা, ১৪) টুস, ১৫) বানসিং পূজা ও পরব, ১৬) আখ্যান যাত্রা বা পূজা, ১৭) চন্ডী পূজা বা খেলাই চণ্ডী, ১৮) মাঘসিম, ১৯) বাহা পরব বা উৎসব, ২০) ভেজা বেন্দা ইত্যাদি।

১.৮ পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা এবং সাক্ষরতার হার (Education & Literacy Rates of Purulia District):

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পুরুলিয়া জেলায় সাক্ষরতার হার ছিল ৬৪.৪৮%, যেখানে পুরুষদের সাক্ষরতার হার ছিল ৬৬.৯৪% এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৩.৪৬%। বিশেষ ভাবে তপসিলি জাতি এবং আদিবাসিদের সাক্ষরতার হার ছিল ১৯.৩৭% এবং ১৮.৪৫%। এই জেলায় নিরক্ষর শ্রেণীর মানুষদের সংখ্যা ছিল ১৩০৫২১০ জন । যেখানে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৪৯৪৯৩৮ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৮১০২৭২ জন। পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী-

১) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র

ক. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ২৫১২

খ. আই. সি. ডি. এস. এর অধীনে প্রাক বিদ্যালয় -২৩৯২

গ. প্রাইভেট ম্যানেজড ও প্রি-স্কুল- ১৭

ঘ. শিশু শিক্ষা কেন্দ্র-১৯২

২) প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

ক. অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২৯৯৮

খ. পিএস কার্যকারিতা ২৯৭১

গ. শিক্ষক সংখ্যা-৬০৪২ (পুরুষ-৪৮২২ ও মহিলা- ১২২০)

ঘ. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা-৩৬১৬(পুরুষ-৩১৪০ ও মহিলা ৪৭৬)

ঙ. শিক্ষার্থী ভর্তি- ২৫৮৫৯৬(বালক- ৪৪০০৬০ ও বালিকা- ১১১৫৩৬)

চ. বিদ্যালয় ভবনের সংখ্যা- ৮০

ছ. ছাদ বিল্ডিং স্কুল-৩৩৬

এছাড়া এই পুরুলিয়া জেলায় মোট ১১ টি ডিগ্রী কলেজ, একটি বি.এড কলেজ, একটি শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়।

১.৯ পুরুলিয়া জেলার ভাষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস (Language & Religion of Purulia District):

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলায় ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলা ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ৮০.৫৬%, ও সাঁওতালি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ১১.১৭%, কুরমালি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ৫.০৪% এবং হিন্দি ভাষায় কথাবলা জনসংখ্যা হল ১.৯৩%।

পুরুলিয়া জেলা একটি আদিবাসী সংস্কৃতি জেলা। এই জেলায় আদিবাসীরা প্রাকৃতিক সাস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে এই জেলাতে হিন্দু ধর্মের মোট জনসংখ্যা হল ৮০.৯৯%, ও তপশীলি জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীদের জনসংখ্যা ১০.৫৫%, ইসলামের ধর্মাবলম্বি মোট জনসংখ্যা ৭.৭৬% এবং অন্যান্য ধর্মের মোট জনসংখ্যা ০.৭০%।

১.১০ পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় (Adibasi or Tribal Community of Purulia District)

পুরুলিয়া জেলাটি হল আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা। এখানে ২০১১ সালের জনগণনা আনুসারে মোট জনসংখ্যা হল ২৯৩০১১৫ জন, একটি বড় অংশ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ এখানে রয়েছেন। পুরুলিয়া জেলার সাথে ঝাড়খণ্ডের মানভূম জেলার সীমানা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলটি একদিকে যেমন খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ তেমনি ওই অঞ্চলটিতে যথেষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে খাদ্য এবং বাসস্থানের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় উপস্থিত হন এবং এখানেই তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তবে কিছু কিছু নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং আদিবাসীদের মতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া হল ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ, তাই পূর্ব-পুরুষ থেকে বংশ পরম্পরায় এই অঞ্চল গুলিতেই গভীর জঙ্গলে এবং পাহাড়ের উপর আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই বসতি স্থাপন করছেন। পুরুলিয়া জেলায় আয়ো:দা বুরু অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড় এবং তার সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমিতে বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ গভীর জঙ্গল রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলটি আদিবাসীদের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত। পুরুলিয়া জেলায় ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় রয়েছে, যেমন- সাঁওতাল, মুণ্ডা, মুড়া, মাহালি, হো, ভূমিজ, বিরহড়, খারিয়া, ওঁরাও, কোড়া, বেদীয়া, মাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সাহিত্য সম্পর্কিত পর্যালোচনা (Review and Related Literature)

২.১ পর্যালোচনা এবং সাহিত্য (Review and Literature):

জয়িতা সিনহা এবং ডঃ সুরেশ চন্দ্র মুর্মু (২০২০) বিরহড় আদিবাসীদের ধর্মীয় সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি গবেষণাধর্মী পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম হল "**Religious Transformation of the Birhor Tribe: An Anthropological Analysis".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিরহড় আদিবাসীদের ধর্মীয় রূপান্তর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং আদিবাসীদের জীবনে ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রভাব।

সাগর চৌধুরি, হাবিবুর রহমান চৌধুরি এবং হরিশ সিং (২০১৬) ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষের নৃতাত্ত্বিক ব্যবহার সম্পর্কে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণার শিরোনাম হল **"Some Ethno Zoological uses of Birhor Tribe of West Bengal, India".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা ২৯ টি গৃহ পালিত এবং বন্য প্রাণীর উপর তাঁদের নিজস্ব যে নৃতাত্ত্বিক জ্ঞান রয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা।

জিতেন্দ্র কুমার প্রেমি এবং অরুন কুমার (২০১৮) ছত্রিশগড় রাজ্যের বিপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী বিরহড় আদিবাসীদের উন্নয়ন এবং সামাজিক অসমতা সম্পর্কিত একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল "**Development and Social Inequality Among Birhor: A Particularly Vulnerable Tribal Groups of Chhattisgarh, India".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল ছত্রিশগড় রাজ্যের বিরহড় আদিবাসীর বিভিন্ন উন্নয়নের দিক অধ্যয়ন করা। এই রাজ্যের বিরহড় আদিবাসীদের সামাজিক বৈষম্যের প্রাদুর্ভাব চিহ্নিতকরণ। তৎকালীন উপলব্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের সম্ভবনাগুলি কল্পনা করা।

শুভাশিস ভট্টাচার্য ও গিয়াসউদ্দিন সিদ্দিকী (২০১৬). পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল অঞ্চলের আদিবাসী আবাস বনভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে একটি গবেষণা সম্পর্কিত পত্র প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম হল-**"Significance of forested in the tribal Habitation of Jungle Mahal area in West Bengal".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণায় গবেষক আদিবাসী এলাকায় বন কোর চিহ্নিত করতে, উপজাতি ঘনত্ব অঞ্চল পরিমাপ করতে এবং বন ও উপজাতিদের বসতি উভয় ধীরে ধীরে পাতলা হওয়ার মাত্রা পরিমাপ করতে এই গবেষণাটি করা হয়েছিল।

সমিতা মান্না এবং রিমি সরকার, (২০১৫) একবিংশ শতাব্দীতে বিরহড়দের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় কয়েকটি গ্রামে একটি মাইক্রো স্টাডি করেন। এই গবেষণা

পত্রের শিরোনাম টি হল- **"The Birhor Ways of Life in 21st Century: A Micro Study in a Few Villeges of Hazaribag District, Jharkhand".**

উদ্দেশ্য: ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগ জেলায় একবিংশ শতাব্দীতে বিরহড়দের জীবনযাত্রা অধ্যয়ন ও কয়েকটি গ্রামে একটি মাইক্রো স্টাডি।

প্রসেনজিৎ দেববর্মণ (২০১৫) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি সার্বিক বিষয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"Birhor of West Bengal: an Overview on A Tribe in Transition".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান, জেলায় বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জনসংখ্যা এবং বিরহড়দের সম্পর্কে পণ্ডিতদের লেখা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যয়ন করা এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

সোমনাথ মুখার্জি (২০১৪) পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতাল, খেড়ীয়া শবর ও বিরহড় মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল-"**Status of Female Education among Santal, Kheria Sabar and Birhor Tribal Communities of Purulia District, West Bengal, India".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণায় বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার দশটি অ-জাতিগত এবং দশটি বহুজাতিক গ্রামে বসবাসকারী তিনটি প্রধান উপজাতি সম্প্রদায় যথা সাঁওতাল, খেরিয়া-শবর এবং বিরহড় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী শিক্ষার স্তর বিশ্লেষণ করা।

মারি লোলেন (২০১২). অরুণাচল প্রদেশের মাউন্টেন হ্যাবিট্যাটে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থা ও মেম্বাদের জীবিকা নির্বাহের ধরণ সম্পর্কিত একটি গবেষণা করেছিলেন। এই গবেষণা পত্রের শিরোনাম হল- **"Utilization and Conservation of Natural Resources in Mountain Habitat: A Study on Livelihood Pattern and Indigenous Knowledge System of The Memba of Arunachal Pradesh".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মেম্বা কীভাবে তাদের দেশীয় আদিবাসীও জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করে তা বোঝা এবং

নথিভুক্ত করা। এছাড়া এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মেম্বারা তাঁদের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু, ঐতিহ্যবাহী পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা যা সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রথাগত আইনকে যুগযুগ ধরে টিকিয়ে রাখা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম কাউন্সিলের ভূমিকা খুঁজে বের করা।

এস কে কোলে (১৯৯৭) বিরহড়দের সম্ভাবনা এবং সমস্যা নিয়ে একটি মূল্যায়ন সম্পর্কিত গবেষণা ধর্মী পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রটির শিরোনাম হল-**"Prospects and Problems of Birhor: an Evaluation".**

উদ্দেশ্য: গবেষক তাঁর গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিরহড় উপজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মাইক্রো লেভেল মূল্যায়নমূলক অধ্যয়নের চেষ্টা এবং বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা অন্বেষণ করা।

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯২) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি গবেষণা চালান। তাঁর গবেষণার শিরোনাম হল "**Poorest of the Poor "Birhor"- a Primitive Tribe of West Bengal".**

উদ্দেশ্য: এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার আধা-যাযাবর উপজাতি বিরহড়দের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিশেষ উল্লেখ সহ আদিমতার মাত্রা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

ভবেশ চক্রবর্তী (১৯৮০) পশ্চিমবঙ্গের বিরহড় আদিবাসীদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল- **"The Birhors of West Bengal and the Rehabilitation Scheme: A Case Study".**

উদ্দেশ্য: এই গবেষণা পত্রটির উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সালে বাঘমুন্ডি ও ঝালদা থানার অন্তর্গত দুটি স্থানে পরিকল্পিতভাবে নির্বাচিত পুনর্বাসন ও বিরহড়দের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং এই পত্রটির উদ্দেশ্য হল কার্যকর হওয়া প্রকল্পগুলির প্রভাব মূল্যায়ন করা।

২.২ জ্ঞানের ব্যবধান (Knowledge Gap):

আদিবাসীদের শিক্ষা এবং উন্নয়নে সমাজবিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে চলেছেন। ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮৮ সালে M. B. Buch-এর তত্ত্বাবধানে

আদিবাসী বিষয়ে ভারতে সংগঠিত বিভিন্ন গবেষণার সংকলন 'Survey of Research in Education' -এর তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। NCERT (NEW Delhi)-এর তত্ত্বাবধানে চতুর্থ খন্ডে আদিবাসীদের বিষয়ে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা হয়েছে---

১) আদিবাসী এলাকায় বিদ্যালয় গঠন এবং বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ।

২) আশ্রমিক বিদ্যালয়, বনবাসী আশ্রম বিদ্যালয় ইত্যাদি আদিবাসীদের দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান এবং পরিবেশ।

৩) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, বোধ মূলক সামর্থ্য, পরিবেশ এবং সহ পাঠক্রমের সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতা, সমাজ তাত্ত্বিক, বিজ্ঞান বিষয়ে মনোভাব ইত্যাদি।

৪) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের অসময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়া ও ফেল করে বছরের পর বছর থেকে যাওয়া এবং সম্পদের অপচয়।

৫) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক প্রয়োজন সমূহ।

৬) আদিবাসী পরিবার গুলির গঠন, আদিবাসী মা-বাবাদের আচরণ। শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সংরক্ষণ।

৭) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা এবং আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা এবং সমাজ পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণ বিষয়ে গবেষণা।

'Fifth Survey of Educational Research' (১৯৮৮-১৯৯২)-এ ধরা পড়েছে যে তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত এবং তথ্য নির্ভর উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তপশিলি উপজাতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উন্নয়নে যে অসংখ্য সামাজিক, মানসিক বাধা রয়েছে সেই বিষয়েও গবেষণায় যথেষ্ট আলোকপাত হয়নি। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ সময়কালে যে ১৪ টি Ph.D. স্তরে গবেষণা হয়েছে তার কোনটিতে আদিবাসী সমাজ কিভাবে চিরাচরিত ধ্যান ধারণাকে বজায় রেখে আজও নিজেদেরকে টিকিয়ে নিয়ে চলেছে এই বিষয়ে কোন আলোকপাত ছিল না। এই সময়কালে যে গবেষণাগুলি সংঘটিত হয়েছে তাদের মূল ক্ষেত্র ছিল—

১) বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্যার সমূহ।

২) আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা, শিক্ষার সুযোগ সুবিধা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং আদিবাসীদের শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক আগ্রহ।

৩) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ।

৪) আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন বিষয়ে গবেষণা।

১৯৮৮ থেকে ৯২ এই পর্যায়েও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ভাষাগত সমস্যা নিয়ে কোন গবেষণায চোখে পড়েনি। এছাড়াও আদিবাসীরা কিভাবে বিভিন্ন ধরনের ঔষধি গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে নিজেদের সুস্থ এবং সবল রেখেছেন সেই বিষয়েও কোন গবেষণা বর্তমান গবেষকের চোখে পড়েনি।

'Sixth Survey of Educational Research' (1993-2000) এই সময় কালে আদিবাসীদের শিক্ষা বিষয়ে একটি D.Litt- স্তরে গবেষণা হয়েছে এবং সাতটি Ph.D. স্তরে গবেষণা হয়েছে এছাড়া এই সময়কালে NCERT (NEW Delhi) এই বিষয়ে দুইটি গবেষণা করেছেন, NIEPA (New Delhi) একটি গবেষণা করেছেন, ERIC সাহায্য পুষ্ট দুইটি গবেষণা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে আদিবাসীদের শিশু লালন-পালন বিধি শিক্ষা ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠী এবং বিদ্যালয় গত শর্ত সমূহ, আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবৈজ্ঞানিক শর্ত সমূহ, আদিবাসী শিক্ষকদের শিক্ষকতা চলাকালীন প্রশিক্ষণ, 'Tribal Area Sub-Plan'-এর আদিবাসীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, আদিবাসী বিদ্যালয়গুলির জেলার সামগ্রিক বিকাশে ভূমিকা, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, আদিম আদিবাসী গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আদিবাসী যুবক যুবতীদের শিক্ষামূলক কৃতিত্ব অর্জনের মনোসামাজিক শর্ত সমূহ, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের অকালে পাঠ শেষ না করে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের যৌনতা এবং নৈতিকতা বিষয়ে বিচার বিবেচনা, বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় বিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা, আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হয়েছে সুতরাং এই সময় কালে স্বল্প পরিসরে হলেও আদিবাসী সমাজের শিক্ষা গত উন্নয়নে ভাষাগত

সমস্যা বিষয়ে একটি গবেষণা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছর সমূহের গবেষণাগুলিতে সংগঠিত হয়নি।

২০০০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে আদিবাসীদের শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে যে সকল গবেষণা হয়েছে তাতে খুব কম ক্ষেত্রে 'Indigenous Knowledge System' কিভাবে আদিবাসীদের Sustainable Development এ ভূমিকা নিয়েছে এই বিষয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে।

২.৩ গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions):

১) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার কত?

২) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষাগত অবস্থা কি?

৩) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের অবস্থা কি?

৪) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবস্থা কি?

৫) বিরহড়রা আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বনজ সম্পদ ব্যবহার করে এবং জীবিকা নির্বাহে তাঁদের অর্থনৈতিক স্থিতি কিরূপ?

৬) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণের জন্য তাঁদের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু এবং দেশীয় পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা কি কি?

৭) পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারি উভয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী সমূহ কি কি?

৮) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে আদিবাসী দেশীয় জ্ঞান ব্যবস্থা প্রয়োগের পরামর্শ কিরূপ?

২.৪ উদ্দেশ্য সমূহ (Objectives):

১) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড়দের সাক্ষরতা হার অধ্যয়ন করা।

২) পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষাগত অবস্থা অধ্যয়ন করা।

৩) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড় আদিবাসীদের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সামাজিক, সংস্কৃতিক কার্যক্রম অধ্যয়ন করা।

৪) পুরুলিয়া জেলায় বিরহড় আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে অধ্যয়ন করা।

৫) বিরহড়দের আদিবাসী জ্ঞান ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বনজ সম্পদের ব্যবহার এবং জীবিকা নির্বাহে অর্থনৈতিক জীবনের ধরণ অধ্যয়ন করা।

৬) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিরহড়দের বিভিন্ন বিশ্বাস, সামাজিক-ধর্মীয় রীতিনীতি, ট্যাবু, আদিবাসী পরিবেশগত জ্ঞান ব্যবস্থা অধ্যয়ন করা।

৭) পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারি উভয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গুলি অধ্যয়ন করা।

৮) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে পরিবেশবান্ধব গবেষণার দ্বারা আদিবাসী দেশীয় জ্ঞান পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য পরামর্শ প্রদান করা।

২.৫ অধ্যয়নের সীমাবদ্ধতা (Delimitations of the Study):

১) বর্তমানে গবেষণাটি কেবলমাত্র বিরহড় সম্প্রদায়ের উপর করা হয়েছে।

২) কেবলমাত্র পুরুলিয়া জেলায় বাসকারী বিরহড় জনগোষ্ঠীদের সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

৩) কেবলমাত্র গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪) এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি ব্লক নির্বাচন করা হয়েছে।

৫) এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনটি ব্লকের অধীনে চারটি গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

৩.১ গুণগত এবং নৃতাত্ত্বিকগত গবেষণার নকশা (Qualitative and Ethnographic Research Design)

গুনগত গবেষণার (Qualitative Research) সুস্পষ্ট এবং যথার্থরূপ বিংশ শতকে সমাজ বিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ প্রমুখদের গবেষণায় প্রথম প্রামাণ্যরূপ লাভ করেছে। যদিও

গুনগত গবেষণার যথার্থতা প্রমানিত, কিন্তু এর পদ্ধতিগত স্পষ্টতা নিয়ে এখনও গবেষকরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। গুনগত গবেষণা এমন একটি পদ্ধতি যা কোনো সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনাকে পুরোপুরি ভাবে এবং ব্যাখ্যামূলক ভাবে দেখার চেষ্টা করে। সাধারণত কোনো সামাজিক বা মানবিক গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির সামগ্রিক চেহারাটিকে উন্মোচিত করার জন্য গুণগত গবেষণা ব্যবহৃত হয়। গুণগত গবেষণা সংগঠিত হয় পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নকরা, প্রশ্ন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা, আরোহি পদ্ধতিতে উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট থেকে সাধারণীকরনের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়।

গবেষক তার বর্তমান গবেষণাটি বিরহড় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নে ভারতে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ব্যবস্থার অবদান বিষয়ে ‘Ethnography’ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ ৩ বছর ছয় মাস পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গবেষক বিরহড়দের সাথে গভীরভাবে মেলামেশার মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন- অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন, ফোকাস দল আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার, ডাইরি লিখন, ছবি সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যবহার করে গভীরভাবে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.২ পর্যবেক্ষণ (Observation):

সমাজ বিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে সাধারণভাবে গবেষকরা প্রশ্নগুচ্ছ বা Questionnaire ব্যবহার করে উত্তরদাতার নিকট থেকে তাঁদের ভাবনা চিন্তা এবং কর্মধারার একটি চিত্র লাভ করার চেষ্টা করেন। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে ইতিবাচক পরিবেশে কথোপকথন চলে এবং এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহীতা সাক্ষাৎকার দাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। সাক্ষাৎকার কালে উভয় পক্ষই পরস্পরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পরস্পরের ভাব, মানসিকতা, মানবভাব, সংস্কৃতি, ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস ইত্যাদি জানার চেষ্টা করেন। তাই পর্যবেক্ষণ কে নমুনা দলের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রথম পদ্ধতি বলে স্বীকার করা হয়।

বর্তমান গবেষণায় গবেষক চারটি বিরহড় আদিবাসী গ্রামে সুসংগঠিত ও অসংগঠিত উভয়প্রকারের তথ্য গ্রহণ কালে তথ্য দাতাদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন ও বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.৩ অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (Participatory Rural Appraisal):

সমাজবিজ্ঞানে, নৃতত্ত্বে, শিক্ষাবিজ্ঞানে এবং সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় Participatory Rural Appraisal (PRA) বা অংশগ্রহণ ভিত্তিক গ্রামের সম্পদের মূল্যায়ন পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আধুনিক কালে পরিবেশ বিজ্ঞানের গবেষণায় অংশগ্রহণ ভিত্তিক গ্রামীণ সম্পদের মূল্যায়ন বা PRA এর ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

PRA পদ্ধতিতে একটি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্থানের মানুষের সম্পদের স্থান নির্ণয় করণ সম্পদের পরিমাপন এবং সম্পদের স্থানান্তরিত করনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ মানুষের আয় বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক কৃষি কাজের মডেল তৈরি করেন। প্রাতিষ্ঠানিক নকশা গড়ে তোলেন এবং চিরাচরিত ধারা এবং পরিবর্তন কে বিশ্লেষণ করেন এবং মডেলে গৃহীত নকশা বিশ্লেষণ করেন। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচালনার ক্ষেত্রে মৃত্তিকা এবং জল সংরক্ষণে বনজ সম্পদ, মৎস্য চাষ, বনজ প্রাণীর সম্পদের সংরক্ষণে গ্রামীণ মানুষের ভূমিকা এই পদ্ধতিতে স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া PRA ব্যবহার করে কৃষিকাজ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রভৃতির মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা হয়।

গবেষক প্রথমে বিরহড়দের গ্রামে পৌঁছে গ্রামের মোড়ল এবং ন্যায়কে কে সবিস্তারে জানান আসার কারণ। বিরহড় গ্রামের প্রায় সকলকেই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানান। গবেষক গবেষণার উদ্দেশ্য সকলকে বলেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। গবেষক তথ্য সংগ্রহের জন্য সাদা আর্ট পেপার, পেন্সিল ও রঙিন স্কেচপেন কম বয়সী বিরহড় যুবক যুবতীদের হাতে ধরিয়ে দেন। এরপর গবেষক আর্ট পেপারে গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করতে বলেন এবং গ্রামের চতুর্থ দিকে কি কি আছে তা স্পষ্ট লিখতে ও অঙ্কন করতে বলেন। যেমন গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রধান পাকা পিচযুক্ত রাস্তা, কংক্রিট ঢালায় রাস্তা, কাচা মাটির রাস্তা আঁকতে বলেন। এরপর রাস্তার কোন দিকে কটি বাড়ি, পুকুর, কুঁয়ো, নলকূপ, চাষ যোগ্য জমি, ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার, গাছপালা, ইত্যাদি গুলিকে অঙ্কন ও চিহ্নিত করতে বলেন। গ্রামে মোট

বিরহড়দের বাড়ির সংখ্যা, বিদ্যালয়, সম্প্রদায় হল, নদী, খাল, মন্দির, পাহাড়, জঙ্গল, অন্যান্য দোকানের স্থান ইত্যাদি গুলিকে বিভিন্ন বর্ণের স্কেচপেন ব্যবহার করতে অঙ্কনকারীকে উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর গবেষক বিরহড়দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবারগুলির আর্থিক উপার্জনের উৎস, বিরহড় যুবক যুবতীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান থেকে অকালে ঝরে পড়ার প্রবণতা, উচ্চশিক্ষা লাভের সমস্যা দারিদ্র্য দূরীকরণে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, জমির উৎপাদন চিত্র, পানীয় জলের সমস্যা, শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিপ্রাহরিক ব্যবস্থা এবং শিক্ষিত পুরুষ নারীর সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষক বিষয় এবং সমস্যার সমাধান বিষয়ে আলোচনাকালে কোন কোন বিরহড় গ্রামবাসী নমনীয়তার সাথে বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কাদের ভাবনার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে ও সৃজনশীলতা কাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে স্পষ্ট তা গবেষক জানার চেষ্টা করেন।

৩.৪ ফোকাস দল আলোচনা (Focus Group Discussion):

ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাসন (FGD) একটি গুণগত মান ভিত্তিক গবেষণাকে সূচিত করে। এটি একদিকে যেমন গবেষণা পদ্ধতি তেমনি অপরদিকে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের একটি টেকনিকও বটে। এই পদ্ধতিতে একই ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা এবং একই ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করা, কিছু মানুষকে একত্রিত করে গবেষক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং গভীরতর ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু তথ্য বা অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। সাধারণত যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটিতে ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সদস্যের আগ্রহ থাকে। এই পদ্ধতিতে এমনভাবে গবেষক বা পেশাদার ব্যক্তি আলোচনায় যান এবং প্রশ্ন তোলেন যেখানে অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট সমস্যা বিষয়ে ধারণা, মনোভাব, বিশ্বাস, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, মতামত ইত্যাদি উঠে আসে। পারস্পরিক আলোচনা কালে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের মতামত এবং অভিজ্ঞতাকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেন। এটি ধরে নেওয়া হয় যে PRA দলের আলোচনা কালে PRA দলে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, মতামত, মনোভাব, নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য সকলেই সচেষ্ট হন।

গবেষক বিরহড় আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ভূমিকা মূল আলোচ্য বিষয় তাই গবেষক বিরহড়দের চারটি গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং বিরহড়দেরকে প্রথমেই গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে গবেষক তাঁর পূর্বতন অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণকে ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের আলোচনা পর্বটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এই পর্যায়ে গবেষক তথ্যদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফোকাস দল আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণে আহ্বান করেন। গবেষক বিরহড় পুরুষ এবং মহিলাদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলার জন্য নিবেদন করেন। এরপর দীর্ঘসময় ধরে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে গবেষক যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

৩.৫ উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার (Open Interview):

গবেষক প্রথমেই চারটি গ্রামের বিরহড় ন্যায়কে বা মাঝি এর সাথে দেখা করেন এবং গবেষক কীসের জন্য এসেছেন তা বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে বিস্তারিত ভাবে জানান এবং বিরহড় ন্যায়কে বা মাঝির কাছে আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জন করেন। চারটি গ্রামের ৪ জন ন্যায়কে বা মাঝির কাছ থেকে দীর্ঘসময় ধরে উন্মুক্ত বা অসংগটিত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বিরহড় ন্যায়কে বা মাঝি তাদের সামাজিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, দায়দায়িত্ব, প্রথা, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে গবেষককে তথ্য দিয়েছেন। গবেষক উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

৩.৬ পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকের অধীনে চারটি গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile of four Villages at under the Three Blocks in Purulia District):

পুরুলিয়া জেলায় ২০ টি ব্লকের মধ্যে মুলত তিনটি ব্লকে বেশিরভাগ বিরহড় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করে। এই ব্লকগুলি হল- বাঘমুণ্ডী, ঝালদা-১, এবং বলরামপুর ব্লক। এছাড়াও হুড়া ব্লকেও কিছু বিরহড় আদিবাসীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই তিনটি ব্লকের চারটি বিরহড় গ্রাম (ভুপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা এবং ডাকাই) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১) ভুপতিপল্লী গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile of Bhupotipolly Village):

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকে ভূপতিপল্লী নামে একটি বিশেষ গ্রাম রয়েছে যে গ্রামটির অপর নাম মাটিয়ালা। এই মাটিয়ালা বা ভূপতিপল্লী গ্রামটি বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েতের অধীনে অন্তর্গত। এই গ্রামটির জেএল নাম্বার হল ৯৯। গ্রামটি থেকে বাঘমুণ্ডি ব্লক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব ৪.৫ কিলোমিটার।

ভূপতিপল্লী গ্রামটিতে প্রথম বিরহড় আদিবাসীদের বসবাস শুরু হয়েছিল, এই গ্রামটিতে কেবলমাত্র বিরহড়দের উন্নয়নের জন্য বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। এই গ্রামটিতে প্রায় ৭০ টিরও বেশি বিরহড় পরিবারের বসবাস এবং সাথে সাথে বিরহড় বিকাশের জন্য তাঁদের গ্রামেই একটি 'সম্প্রদায় হল' বা কমিউনিটি হল রয়েছে। সম্পূর্ণ জেলায় এই ভূপতিপল্লী গ্রামে প্রথম বিরহড়দের পুনর্বাসন করা হয় পাহাড় থেকে তাদেরকে নামিয়ে এনে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রামে একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে, এই গ্রামে কোন উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রী কলেজ নেই। এই গ্রাম থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ের দূরত্ব ৫.২ কিলোমিটার তাই বিরহড় শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা উচ্চ প্রাথমিকের শিক্ষা শেষ করার পর তাদেরকে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনের জন্য ৫.২ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। এর ফলে বিরহড় আদিবাসী ছেলে মেয়েরা খুব বেশি শিক্ষালাভের সুযোগ পায়না। প্রথমত নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে বিরহড় গোষ্ঠীভুক্ত কোন শিক্ষক/ শিক্ষিকা/ শিক্ষা কর্মী নেই। তাই বিরহড় আদিবাসী ছেলে মেয়েরা স্কুলে গিয়ে তাদের সংস্কৃতির কোন ছাপ দেখতে পায় না। ফলে এরা নিজেদেরকে ব্রাত্য বলে মনে করে। তাই একদিকে দূরত্ব এবং অন্য দিকে সংস্কৃতিগত দূরত্বের কারণে বিরহড় ছেলে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ নিতে পারে না।

২) বাড়েরিয়া গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile Of Bareria Village):

বাড়েরিয়া গ্রামটি ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লক ও বাঘমুণ্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত। ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী বাড়েরিয়া গ্রামটির কোড নাম্বার হল ৩৩১৬১৬১২। এই গ্রামটি জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়া থেকে ৬৩.৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সাব-ডিসট্রিক সদর দপ্তর 'পাথার ডিহি' থেকে ১.৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাড়েরিয়া গ্রামের মোট ভৌগোলিক এলাকা হল ১৭০৮.৫৯ হেক্টর। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী

এই গ্রামের মোট জনসংখ্যা হল ৩৯৮২ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ২০৪৬ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ১৯৩৬ জন। তপশীলি জাতির জনসংখ্যা ছিল ৫৯৯ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৩০১ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ২৯৮ জন। বাড়েরিয়া গ্রামে আদিবাসীদের জনসংখ্যা ছিল ৭৩৮ জন, যার মধ্যে পুরুষদের জনসংখ্যা ছিল ৩৭৬ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ছিল ৩৬২ জন। বাড়েরিয়া গ্রামের সাক্ষরতার হার ছিল ৪৮.৫৪%, যার মধ্যে ৬০.৩১% পুরুষ এবং ৩৬.১১% মহিলা। বাড়েরিয়া গ্রামে মোট জনসংখ্যার নিরক্ষরতার সংখ্যা ছিল ২০৪৯ জন, যার মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৮১২ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ১২৩৭ জন। এছাড়া শিশুদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৮২ জন, যার মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা ৩৫৬ জন এবং মেয়ের সংখ্যা ৩২৬ জন। এই গ্রামে বসবাসের বাড়ির সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৩৭ টি। বাড়েরিয়া গ্রামটি থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে বলরামপুর ব্লকটি অবস্থিত, এটি হল সবথেকে কাছের শহর এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্থান। বাড়েরিয়া গ্রাম থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে সরকারি ও বেসরকারি বাস স্টপেজ রয়েছে এবং প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। বাড়েরিয়া গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামগুলি হল শ্রাবন্দি, টানটান, অযোধ্যা, মাতিয়ালা, রাঙ্গা, গসায়ডি, বাঘমুণ্ডি, কুচিররাখা প্রভৃতি। এই গ্রামে একটি বাড়েরিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে এবং একটি সরকারি বাঘমুণ্ডি পলিটেকনিক কলেজ, ১৩২ কেভি বাঘমুণ্ডি এস.এস.টি.এন (WBSETCL), PPSP 11 KV সাবস্টেশন (WBSEDCL) রয়েছে। এই গ্রামটি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করে তাই এখানে আপার ড্যাম ও লোয়ার ড্যাম রয়েছে, বছরের একটা সময় পর্যটকের আগমন ঘটে।

৩) বেড়সা গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile of Bersa Village):

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্লকের গেনরুয়া পঞ্চায়েতের অধীনে বেড়সা গ্রামটি অবস্থিত। ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী বেড়সা গ্রামের কোড নাম্বার হল ৩৩১৬৭৪। বেড়সা গ্রামটির সদর দপ্তর বলরামপুর থেকে প্রায় ১২.১ কিলোমিটার এবং জেলা সদর দপ্তর পুরুলিয়া থেকে প্রায় ৪৪.১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বেড়সা গ্রামটির ভৌগোলিক সীমা হল ৫২৪.০৭ হেক্টর। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী বেড়সা গ্রামের মোট জনসংখ্যা ছিল ৯০০ জন পুরুষদের জনসংখ্যা ৪৫৮ জন এবং মহিলাদের জনসংখ্যা ৪৪২ জন। বেড়সা গ্রামে শিশুদের (০-৬ বৎসর) মোট জনসংখ্যা ছিল ১৩১ জন, এর মধ্যে ছেলে শিশুদের জনসংখ্যা ছিল ৫৭

এবং মেয়ে শিশুদের জনসংখ্যা ছিল ৭৪ জন। এছাড়া এই গ্রামে আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৩২ জন, এর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ছিল ২১৫ এবং মহিলাদের সংখ্যা ছিল ২১৭ জন। বেড়সা গ্রামে মোট সাক্ষরতার হার ৪০.৩৩ %, এর মধ্যে পুরুষদের ৫৭.২১% এবং ২২.৮৫% মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল। বেড়সা গ্রামে নিরক্ষর জনসংখ্যা ছিল ৫৩৮ জন, এর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ১৯৬ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ৩৪১ জন। বেড়সা গ্রাম থেকে সরকারি এবং বেসরকারি বাস স্টপেজ যথাক্রমে ৫ কিলোমিটার এবং ১০ কিলোমিটার। রেলওয়ে স্টেশনের দূরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার। বেড়সা গ্রামে নিকটবর্তী গ্রামগুলি হল গিটিং, জুগিদি, কর্মফল, ডান্ডুডি, সিরিঙ্গি, উলিদি, কানা, আড়রুহাসা, লাহার, কাশিদি, নামশোল, কেরায়া প্রভৃতি। এই গ্রামে একটি বিদ্যালয় আছে, কোন উচ্চবিদ্যালয় নেয়। এছাড়া গ্রামে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেয়।

৪) ডাকাই গ্রামের পার্শ্বচিত্র (Profile of Dakai Village):

ডাকাই গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের মাথারি-খামাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত। এই গ্রামটি ঝালদা ব্লক থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে এবং খামাড় হাই স্কুল থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মাথারি-খামাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রায় ২১ টি গ্রাম রয়েছে, গ্রামগুলি হল- ছোট ফুহরা, মাথার, ডাকাই, আকাশার, পাল্মা, বড় ফুহরা, কোতিয়া, উহাতু, পরমুরা, দুল্লা, অর্দানা, অলগাড়া, কাসিদি, হুরলং, জজুহাতু, খামার, লক্ষদী, আদালদি, পাঞ্জরি, বাঙ্গাসুর, পোকহরিয়া। ডাকাই গ্রামের তিন দিকে রয়েছে ঘন জঙ্গলে ভরা অযোধ্যা পাহাড়। ডাকাই গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ডাকাই গ্রামের শিশুদের ৫-৬ কিলোমিটার দূরে খামার উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতে হয়। বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা ভালো নয়। নির্জন পাহাড়ি চড়াই উৎরাই পথ। মাঝে মাঝে ছোট জঙ্গল আছে। হাতি পালের ভয় রয়েছে। দূরত্ব এবং চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে ডাকাই গ্রামের আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী ছেলে মেয়েরা স্কুল ছুট হয়ে যায়। এই গ্রামে প্রায় গোপ, মুড়া এবং বিরহড় পরিবার মিলিয়ে প্রায় ৯০ থেকে ১০০ টি পরিবার রয়েছে। ডাকাই গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই।

চতুর্থ অধ্যায়: সংগৃহীত গুণগত তথ্য এবং বিশ্লেষণ (Collection of Qualitative Data and its Interpretation)

৪.০ সংগৃহীত গুণগত তথ্য এবং বিশ্লেষণ:

এই অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA), ফোকাস দল আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করে দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকে অর্থাৎ বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর, ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে চারটি গ্রামে (ভূপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা এবং ডাকাই) বিরহড় আদিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং তথ্যগুলিকে উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা হল।

গবেষক ভূপতিপল্লী গ্রামের বিরহড়দের কাছ থেকে অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন (PRA), ফোকাস দল আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন যে সমস্ত তথ্য পেয়েছেন সেগুলি হল-

১) ভূপতিপল্লী গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য: (Information Gained from Bhupotipolly Village)

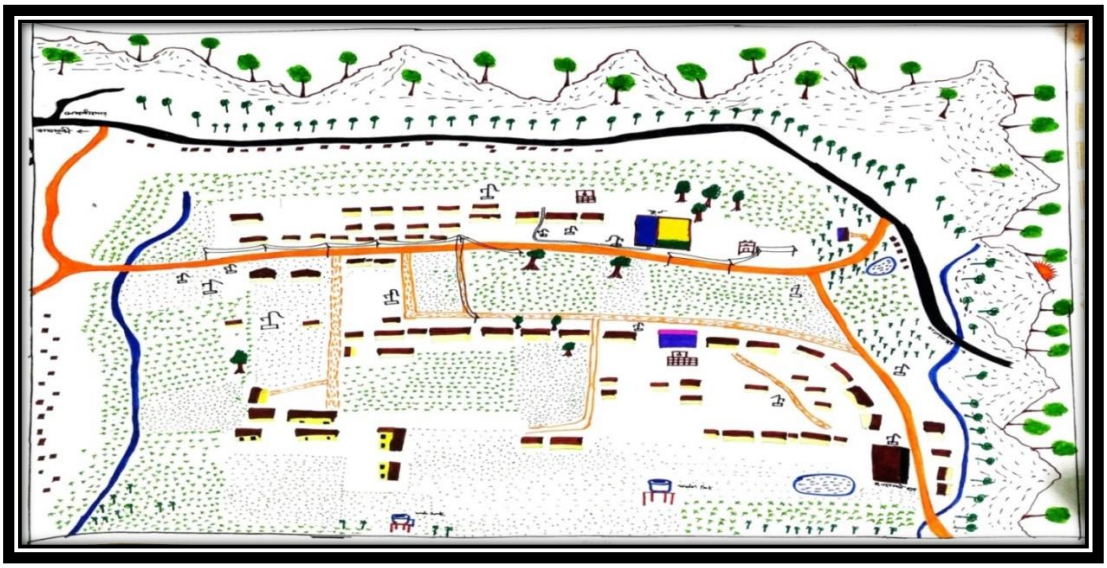

ভূপতিপল্লী

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী ব্লকের ভূপতিপল্লী গ্রামটি প্রধানত আদিবাসী গ্রাম এবং এখানে প্রায় ৭৫ টি বিরহড় গোষ্ঠীর পরিবারের বসবাস করেন। গভীর অরণ্যে উঁচু পাহাড়ে এরা চাষবাস করতেন না কারণ পাহাড়ের রুক্ষ মাটি চাষযোগ্য ছিল না। জীবন নির্বাহের জন্য তাঁরা মূলত শিকার এবং বনজ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডী থানার অধীনে একটি পল্লীর পত্তন ঘটান। এই সময়ে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার এর নামঅনুসারে পল্লীর নাম রাখা হয় 'ভূপতিপল্লী'। এই ভূপতিপল্লীতেই প্রথম বিরহড় আদিবাসীদেরকে সুউচ্চ পাহাড় (আয়ঃ দ্যা) থেকে প্রায় ৬/৭ কিলোমিটার দূরে ডুয়ার্স অঞ্চলে নামিয়ে এনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ২৯ টি বিরহড় পরিবারকে মাটির বাড়ি, কিছু গৃহপালিত পশু, এবং চাষের জমি দেওয়া হয়। তবে বিরহড়দেরকে চাষের জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছিল তা অনুর্বর জমি ছিল। তাই এই গ্রামে কিছু কিছু বিরহড়রা তাঁদের জমিতে চাষ করলেও ভালো ফসল ফলাতে তাঁরা অক্ষম। তাই বাধ্য হয়ে এই গ্রামের যুবক যুবতীরা শ্রমসাধ্য কাজ করার জন্য পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দূর দুরান্তে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এই গ্রামটির মাঝবরাবর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে একটি কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা রয়েছে। পশ্চিমদিকে যাওয়া রাস্তাটির একটি শাখা বাঘমুণ্ডী ও বলরামপুর পিচ রোডের অযোধ্যা মোড়ের কাছে যুক্ত হয়েছে। এই কংক্রিট ঢালাই রাস্তাটির আর একটি শাখা অর্থাৎ ঢালাই রাস্তা গ্রামের পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে ভূপতিপল্লী গ্রামে জলের জন্য প্রায় ১৪ টি নলকূপের ব্যবস্থা করে দিলেও বেশির ভাগ নলকূপ থেকে ভূ-গর্ভের জল বের হয় না। এই নলকূপগুলি নাম মাত্রই রয়েছে। এছাড়া এই গ্রামের উত্তর দিকে একটি এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি বহু পুরনো কুঁয়ো রয়েছে, যেটি ব্যবহার যোগ্য। বিরহড় আদিবাসীরা ভূপতিপল্লী গ্রামের উত্তর দিকে, মধ্য ভাগে, পশ্চিমে ও পূর্বে ঢালু স্থানে অনুর্বর জমিতে চাষ করেন বর্ষার একটি সময়ে। তবে চাষ করলেও ফসল ভালো হয় না। গ্রামের উত্তর-পূর্ব স্থানে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬২ সালে বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি ভূপতিপল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা এই বিদ্যালয়কে জুনিয়ার হাই স্কুলে রূপান্তর করা হয়। এই বিদ্যালয়ে বিরহড় আদিবাসী শিশুরা ছাড়াও সাঁওতাল, মুণ্ডা আদিবাসী শিশুরা পড়াশোনা করেন। এই গ্রামের বিরহড় পরিবার গুলির মধ্যে ২/৩ তিন জন যুবক ও যুবতী বিরহড় শিশুদের সকাল এবং বিকালে পড়াশোনা করান। গ্রামে পূর্ব দিকে

একটি ভূপতিপল্লী বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষানিকেতন বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টি ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখন বিদ্যালয়টি অর্ধভগ্নাঙ্গ অবস্থায় বন্ধ আছে, কোন লেখাপড়া হয় না। পরিবারের বাবা-মা বা অভিভাবকরা দৈনন্দিন কাজের জন্য ও কাঠ সংগ্রহের জন্য ১০-১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অযোধ্যা পাহাড়ে, জঙ্গলে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে যান। বাড়িতে শিশুগুলিকে বলার মত কেউ না থাকায় তারা গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় খেলাধুলা করে ও ঘুরে বেড়ায়। এই কারণের জন্য ভূপতিপল্লী গ্রামে বিদ্যালয় থাকতেও বিরহড় শিশুরা স্কুল ছুট হচ্ছে। এই গ্রামে বেশির ভাগ বাড়িগুলি সরকারের দ্বারা ইটের তৈরি এবং এজবেস্টর ছাউনি দিয়ে বাড়ি। তবে কিছু মাটির তৈরি দেওয়াল দেওয়া বাড়ি রয়েছে। গবেষক লক্ষ্য করেন বাঘমুণ্ডী ব্লকের তত্ত্বাবধানে 'উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের' অর্থ থেকে ২০১৮-১৯ বর্ষে এই গ্রামে নতুন বাড়িগুলি তৈরি করে দিয়েছে এবং কিছু পুরনো ইঁটের বাড়ি রয়েছে। বিরহড়দের কিছু পরিবার তাঁরা গবাদি পশু হিসাবে গরু, শূকর, ছাগল, মুরগি, হাঁস পোষে। তবে সব পরিবারে এই গবাদি পশু নেই। যখন প্রয়োজন হয় তখন এই গবাদি পশুগুলিকে বিক্রি করে তাঁরা দৈনন্দিন সংসার চালান। কিছু মহিলা এবং পুরুষ প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা অতিক্রম করে অযোধ্যা পাহাড়ে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করেন, এই শুকনো কাঠকে মাথায় করে বয়ে এনে বাজারে বিক্রি করে এবং বিক্রয় মূল্য হিসাবে ১৫০-২০০ টাকা তাঁরা পান। কিছু জন অন্যান্য কাজে তাঁরা জেলার বাইরে কাজের জন্য গিয়েছেন। বয়স্ক বিরহড়রা গ্রামের মধ্যে চিহরলতার দড়ি তৈরি ও সিমেন্ট বস্তার দড়ি তৈরি করেন। কিছু যুবক ছেলেরা ট্র্যাক্টর চালায় এবং পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন দোকানে শ্রমিকের কাজ করেন। এই গ্রামে বছরের একটি সময় বাঁধের জল দিয়ে ধান চাষ করা হয়। তবে যথেষ্ট পরিমানে উর্বর জমি না হওয়ার কারণে ভালো ফসল হয় না। ভূপতিপল্লী গ্রামে রুক্ষ মাটির কারণে সবজি চাষ ভালো হয় না এবং মাছ চাষের জন্য ভালো ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। ভূপতিপল্লী গ্রামে যে সমস্ত উৎসব পালিত হয় সেগুলি হল- 'সস বোঙ্গা' পরব, এটি আষাঢ় মাসে ধান রোপণের পরই ফসল যাতে ভালো হয় তার জন্য প্রকৃতি পূজা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে 'সস বোঙ্গা' উৎসব পালিত হয়। পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে যে কোন দিন বিরহড় আদিবাসীরা 'সহরায়' উৎসব পালন করে, এই উৎসবে গরু, মোষকে তাঁরা সযত্নে লালন পালন করেন। ভূপতিপল্লী গ্রামে বিরহড়দের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, উৎসব অনুষ্ঠান, বিবাহ, সামাজিক অন্যায় থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব মোড়লের উপর বা মাঝির উপর, বিরহড়দের ভাষায় একে 'ন্যায়া' বলে। ন্যায়া বলেন এই

গ্রামে তিনিই ব্যবস্থাপনা করেন, যেমন গ্রামের ভালো, মন্দ তিনি দেখেন এবং গ্রামের বিকাশ থেকে শুরু করে অনেক কিছু। তবে সরকার চাষযোগ্য জমি দেয়নি, এছাড়া বসবাসের জন্য কোন ফাঁকা জায়গা দেয়নি। যাতে বিরহড় পরিবাররা বাড়ি তৈরি করে ভালোভাবে বসবাস করতে পারেন। সময়ের সাথে সাথে বিরহড় পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু জায়গার পরিমান বাড়েনি।গবেষক বিরহড় যুবক ও ন্যায়াকে জিজ্ঞাসা করেন আপনাদের পূর্ব পুরুষরা কোথায় ছিল? গবেষক উত্তরে জবাব পান যে বিরহড়দের পূর্ব পুরুষরা অযোধ্যা পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বসবাস করতো। তবে পুনর্বাসনের ফলে তাঁদের সাথে অন্যায় হয়েছে কারণ তাঁদের অরণ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।বিরহড় ন্যায়া ও যুবক বলেন যে গ্রামে কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই, চিকিৎসার জন্য বাঘমুণ্ডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। তবে বেশিরভাগ তাঁদের প্রাচীন পরম্পরাগত ভেষজ ওষধি গাছ গাছড়া থেকে তাঁরা তাঁদের রোগের চিকিৎসা করেন। তবে এখন ধীরে ধীরে তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

২) বাড়েরিয়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য: (Information Gained from Bareria Village):

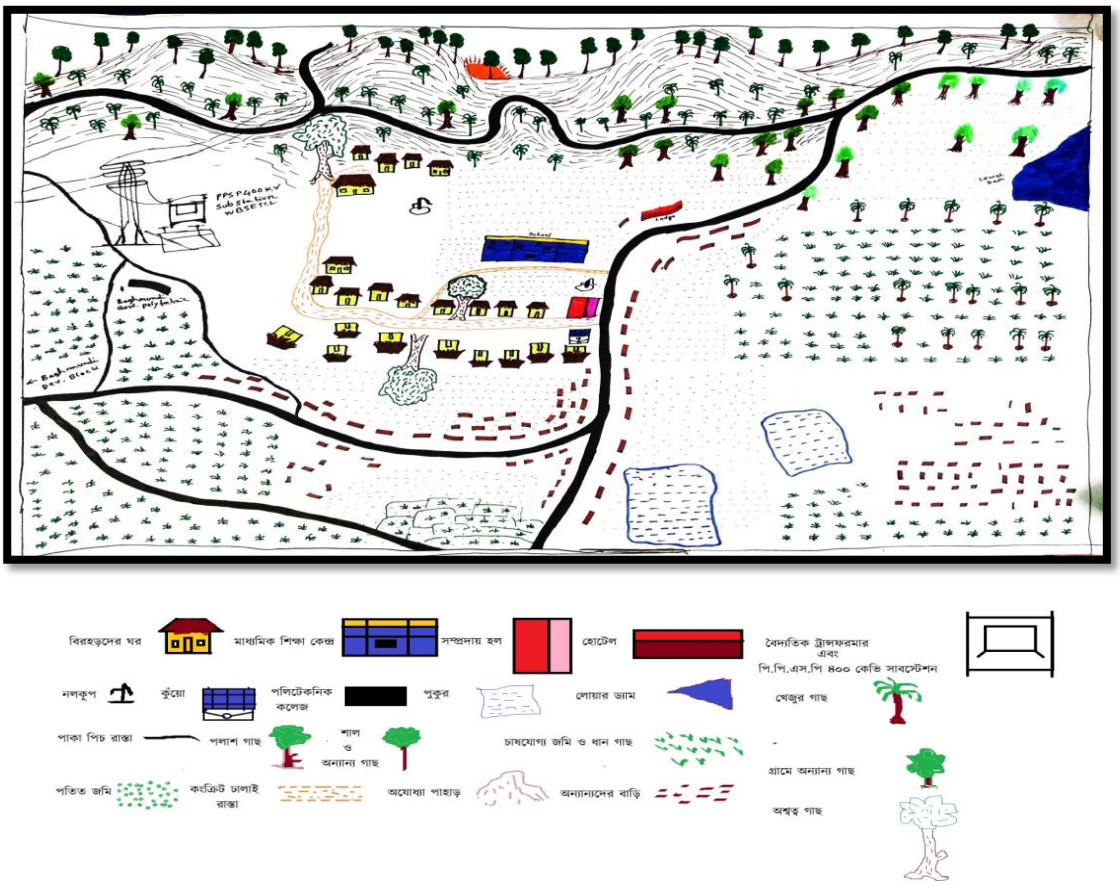

বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় কলোনি

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের অধীনে অযোধ্যা পাহাড়ের ঢালে বা শিরায় বাড়েরিয়া গ্রামটি অবস্থিত। বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসীদের ১৮ টি পরিবার বসবাস করেন। এই গ্রামে বিরহড়দের গ্রামের দক্ষিণে একটি পাকা পিচ রাস্তা রয়েছে, এটির একটি অংশ পূর্ব-দক্ষিণে লোয়ার ড্যাম হয়ে অযোধ্যা পাহাড়ে চলে গেছে, আর একটি অংশ পশ্চিম দিকে কিছুটা গিয়ে উত্তর দিক হয়ে বাঘমুণ্ডী ব্লকের দিকে চলে গেছে। বাড়েরিয়া গ্রামের পশ্চিমে অন্যান্য কিছু আদিবাসী এবং সাধারণ মানুষ জন বসবাস করেন। এই গ্রামের বিরহড়দের সাথে কিছু 'মুড়া' (মুণ্ডা) পরিবারও বসবাস করেন। বিরহড় আদিবাসীদের গ্রামের পানীয় জলের জন্য দুইটি কুঁয়ো রয়েছে, তবে একটি কুঁয়ো নিস্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ শুকিয়ে গিয়েছে। এছাড়া দুইটি নলকূপ রয়েছে তবে গ্রীষ্ম কালে জলের স্তর একে বারে নিচে চলে যায়। বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি জুনিয়র হাই স্কুল রয়েছে।

বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য একটি সম্প্রদায় হল বা কমিউনিটি হল (Community Hall) রয়েছে। বিরহড় আদিবাসীদের কমিউনিটি হলের পাশ দিয়ে বিরহড় আদিবাসীদের দুই দিকের বাড়ির মাঝ বরাবর (কুলহি) বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের তত্ত্বাবধানে পিভিটিজি গ্রুপ (PVTG) এর তহবিল থেকে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। বিরহড়দের বাড়িগুলি পূর্বে মাটির ছিল তবে বাঘমুণ্ডী উন্নয়ন ব্লকের তত্ত্বাবধানে ২০১৫-১৬, ২০১৮-১৯ বর্ষে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের (BCW) তহবিল থেকে ইট দিয়ে তৈরি পাকা দেওয়াল বাড়ি এবং এ্যাজবেস্টর দিয়ে ছাউনি রয়েছে। তবে এখনও মাটির দেওয়াল এবং টালি দিয়ে ছাউনি ঘর বিরহড়দের রয়েছে সাথে কিছু মুড়া পরিবারদেরও একই ব্যবস্থা। এই বাড়েরিয়া গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছালেও বিরহড়দের ঘরে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। বিরহড় আদিবাসীরা পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই সমান ভাবে পরিশ্রম করেন। তাঁরা কঠিন সূউচ্চ পাহাড় পায়ে হেঁটে পার করে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করেন। এরপর তাঁরা জঙ্গল থেকে এনে বাজারে বিক্রি করেন, বিক্রয় মূল্য হিসাবে ১৫০-২০০ টাকা পান। বিরহড়রা কখনও কাঁচা বা জীবন্ত গাছ কাটেন না, জঙ্গলে যে গাছগুলি মারা গিয়ে শুকিয়ে গেছে ও গাছের শাখা প্রশাখা রয়েছে সেগুলি তাঁরা কেটে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

বিরহড়রা জঙ্গল থেকে চিহরলতা, মধু, মোম, কাজু বাদাম, কাঠ বাদাম, মহুয়া, টক জাতিয় ফল, শাল পাতা, ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। বর্তমানে ব্যবহৃত সিমেন্টের বস্তা থেকে প্লাস্টিক সুতো

বার করে দড়ি তৈরি করেন, যেটি স্থিতিশীল উন্নয়নে একটি বিশেষ নিদর্শন। এছাড়া জঙ্গল থেকে বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড়দের বসতির কাছাকাছি শাল, পলাশ, নিম, খেজুর, বেল, বাঁশ, হরিতকী, কন্দ, বট, কূল, কাঠ বাদাম, অশ্বথ, মেহগিনি ইত্যাদি গাছ রয়েছে। জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ ছাড়াও জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁরা শিকার করতে যান, শিকার হিসাবে শূকর, বুনো বিড়াল, সজারু, কাঠবিড়ালি, মেঠো ইঁদুর, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি শিকার করেন। গভীর জঙ্গলে হরিণ রয়েছে কিন্তু বিরহড়রা হরিণ শিকার করে না। বিরহড়দের নিজস্ব কোন চাষ যোগ্য জমি না থাকার জন্য তাঁরা চাষ করতে পারেন না। তবে কিছু বিরহড় মহিলারা ১৫০-২০০ টাকার মূল্যে অন্যান্যদের জমিতে ক্ষেতমজুর হিসাবে কাজ করেন। বছরের একটি সময়ে যখন অরণ্যকন্যা অযোধ্যা পাহাড়ে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পর্যটকের আগমন ঘটে তখন বাড়েরিয়া গ্রামের সাধারণ মানুষদের কিছু আমদানি হলেও বিরহড়দের কোন অর্থ উপার্জন হয় না। বাড়েরিয়া গ্রামে ও পাশের পর্যটন কেন্দ্রের স্থানে ছোট খাটো মেলা, খাবারের ও অন্যান্য দোকান বসে। সেই পর্যটন কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সাধারণ মানুষরা বিরহড়দের কোন রকম দোকান দিতে বা পর্যটকদের পাহাড় ঘোরানোর কাজ করতে দেয় না। অযোধ্যা পাহাড়, জঙ্গল ও প্রকৃতিকে জঙ্গল মাফিয়া, পুঁজিপতি কোম্পানি, সরকারের দালালরা জঙ্গল, পাহাড় ধ্বংস করে প্রাকৃতিক সম্পদকে লুঠ করার ষড়যন্ত্র করছে এবং অযোধ্যা পাহাড়ে বার বার আঘাত করার চেষ্টা করছে, তাঁদের বিরুদ্ধে বাড়েরিয়া গ্রামের সকল বিরহড় আদিবাসী মানুষরা মাঝিদের অর্থাৎ সাঁওতালদের সঙ্গ দিয়ে প্রকৃতিকে ও প্রকৃতির সম্পদকে, জীবজগতকে রক্ষার জন্য বহুবার লড়াই ও বিক্ষোভ সমাবেশে যোগদান করেছেন। বাড়েরিয়া গ্রামে একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল এবং একটি পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে। এই স্কুলে পঠন পাঠন হিসাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া হয়। বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন। এই বিদ্যালয়টির নাম হল গয়াসুর মাহাত স্মৃতি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, স্থাপিত হয়েছে ২০০৮ সালে। বিরহড় পরিবার থেকে কেবলমাত্র দুইটি মেয়ে বাঘমুণ্ডী বালিকা বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক) লেখাপড়া করেন। বাড়েরিয়া গ্রামে একটি মাত্র বিরহড় পরিবার থেকে একটি মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের 'মানভুম মহাবিদ্যালয়ে' লেখাপড়া করেন। বাড়েরিয়া গ্রামের বিরহড় আদিবাসীদের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটার কার্ড থাকলেও বেশির ভাগ বিরহড়দের আধার কার্ড, জব কার্ড, রেশন কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংক বই নেই। বাড়েরিয়া গ্রামে বিরহড় আদিবাসী পরিবারে সাংবিধানিক অধিকার শংসাপত্র

(Scheduled Tribe Certificate) একটি পরিবারে পায়। এছাড়া আর কোনো পরিবারে নেই। বিরহড় ভাষাটি খেরওয়াল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডাশাখা ভাষা গোষ্ঠীর অংশ। বিরহড় ভাষার সাথে অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষার মিল দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি হল সাঁওতাল, হো এবং মুণ্ডা আদিবাসী ভাষা। তবে সাঁওতালদের অনেকটা কাছের বিরহড় ভাষা, তাই সাঁওতালদের সাথে গোত্রগত মিল দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের বিরহড়দের কিছু শারীরিক সমস্যা হলে বর্তমানে তাঁরা বাঘমুণ্ডীর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। তবে এই গ্রামের কিছু বয়স্ক বিরহড় মানুষরা জঙ্গল থেকে ওষধি গাছ গাছড়ার মূল, ফুল-ফল, বীজ, পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন, তাঁরা পরম্পরাগত প্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে ওষধি উপকরণ তৈরি করেন এবং রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করেন। বাড়েরিরা গ্রামে বিরহড়দের সাপে কামড়ালে তাঁরা ওঝা, বা গুনিনের কাছে না গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এক দিক থেকে তাঁরা বর্তমান সময়ের চিকিৎসা বিদ্যাকে গ্রহণ করেছেন সাথে সাথে তাঁদের প্রাচীন সংস্কৃতিকেও টিকিয়ে রেখেছেন। বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের কিছু নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠান রয়েছে তবে বিশেষ উৎসব পরবগুলি হল সারহুল, বাহা, কারাম ইত্যাদি।

৩) ডাকাই গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য: (Information Gained from Dakai Village):

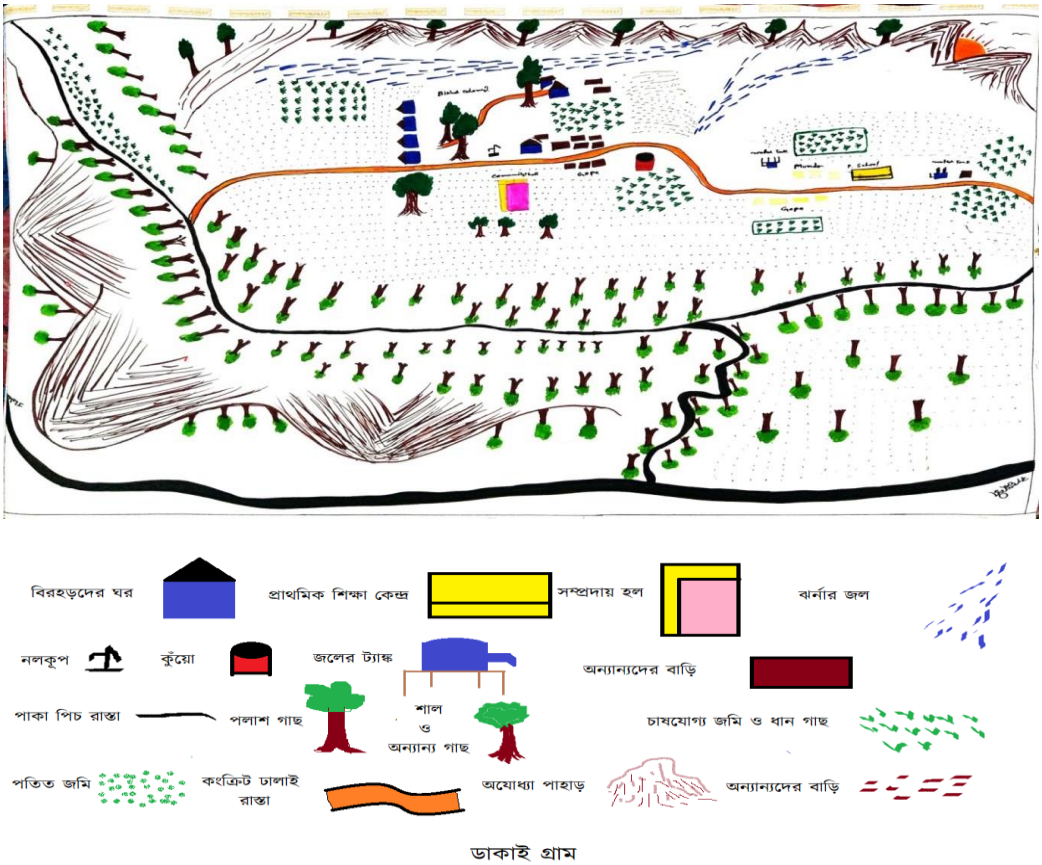

ডাকাই গ্রাম

ডাকাই গ্রামটি পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের অধীনে খামার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। এই গ্রামে তিনটি বিরহড় আদিবাসী পরিবারের বসবাস। যদিও দুইটি পরিবার একটি করে মাত্র পুরুষকে নিয়ে গঠিত। ঐ দুইটি পরিবারে কোন মহিলা বা শিশু নেই। অন্য পরিবারে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা প্রাপ্ত বয়স্ক আর চারটি সন্তান রয়েছে। চারটি সন্তানের মধ্যে তিনটি সন্তান কন্যা সন্তান আর একটি পুরুষ সন্তান রয়েছে। একটি মাত্র পরিবারের একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা রয়েছেন যিনি সরকারের থেকে কোন অর্থ পান না। তাঁরা রেশন পান না কারণ তাঁদের রেশন কার্ড নেই। সরকার সকলের জন্য জব কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, সম্প্রদায় শংসাপত্র, প্যান কার্ড ইত্যাদি তৈরি করে দেননি। পরিবারের দুই পুরুষ ৩০-৩৫ বছর বয়স হলেও এখনও তাঁরা বিয়ে করেননি চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে ও তাঁদের গ্রামে কোন বিবাহ যোগ্য বিরহড় মেয়ে নেই বলে। তাছাড়া বিয়ের জন্য যেমন ব্যয় রয়েছে এবং ভাবি স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার ও লালন পালন করার জন্য সামর্থ্য তাঁদের নেই, তাই বিয়ের স্বপ্ন তাঁদের কাছে অধরা থেকে গেছে। বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে কিছুটা পূর্ব দিকে 'মুড়া' আদিবাসী এবং গোপ বা গোয়ালাদের বাড়ি রয়েছে। ডাকাই গ্রামে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২০০ জন। বিরহড়দের সরকারের পক্ষ থেকে পাঁচটি ইটের দেওয়াল যুক্ত এজবেস্টর ছাউনি সহ পাকা ঘর করে দেওয়া হয়েছে। ডাকাই গ্রামে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিবারের কোন চাষযোগ্য জমি নেই এবং সরকারের থেকে কোন চাষযোগ্য জমি তাঁদের দেওয়া হয়নি। তাঁরা বর্ষার সময়ে কিছু সবজি ও ধান চাষ করেন। পাহাড়ের উপর এবং সংলগ্ন জমি হওয়ায় বর্ষাকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে জলের অভাবে চাষ করা যায়না। পুরুলিয়া জেলা গ্রীষ্ম ঋতুতে রুক্ষ প্রকৃতির, এই সময় ঝালদা সমেত ডাকাই গ্রামেও পানীয় জলের সমস্যা প্রখর হয়ে ওঠে। ডাকাই গ্রামে জলের সমস্যা একটি বড় সমস্যা, তাই গ্রামবাসী এখানে ভালোভাবে চাষবাস ও হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরু, লালন পালন করতে পারেন না। এই গ্রামের মানুষদেরকে তাই জীবন ও জীবিকার জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভর করতে হয়। জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে এবং জ্বালানির জন্য জঙ্গল থেকে বিরহড় এবং মুড়ারা শুকনো ঝাটি পাটি সংগ্রহ করে। এই গ্রামে পলাশ, অশ্বত্থ, বাঁশ, বেল, নিম, কদম, কন্দ, শাল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। তবে কাঁচা গাছ বা জীবন্ত গাছ এরা কাঠেন না। ডাকাই গ্রামের উত্তর-পূর্বে যে পাহাড় এবং ঘন জঙ্গল রয়েছে সেখানে ভেষজ গুনযুক্ত ওষধি গাছগাছড়া রয়েছে। তবে বর্তমানে

ভেষজ গাছগাছড়া গুলির সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কিছুটা দূরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র রয়েছে। ডাকাই গ্রাম থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি প্রায় ৬-৭ কিলোমিটার দূরে খামার গ্রাম পঞ্চায়েত এর কাছে অবস্থিত। বিরহড় পরিবারের পুরুষ এবং মহিলারা কেউই প্রাথমিক শিক্ষা পায়নি। একটি পরিবারে চারটি শিশুর মধ্যে একজন পঞ্চম শ্রেণিতে (ছেলে), একজন তৃতীয় শ্রেণিতে (মেয়ে), একজন প্রথম শ্রেণিতে (মেয়ে), আর একজন অঙ্গনওয়ারীতে (মেয়ে) লেখাপড়া করে। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও হাই স্কুল খামার গ্রামে হওয়ার জন্য অনেক গোপ এবং মুড়া পরিবারের শিশুরা স্কুল ছুট হয়েছে। কারণ হাই স্কুল এ যাওয়ার পথটি চড়াই উতরাইতে অর্থাৎ পাহাড়ি পথ হওয়ায় তারা বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ্রহ হারায় এবং দরিদ্রতা একটি অন্যতম কারণ। বিরহড়রা বহু বছর পূর্বে ডাকাই গ্রামের জঙ্গলে ওষধি গাছপালা দিয়ে তাঁদের পরম্পরাগত পদ্ধতিতে রোগনিরাময়ের জন্য চিকিৎসা করতেন। বর্তমানে পুরোটাই তাঁরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। তবে এই গ্রামে কেউ কুষ্ঠ রোগে এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়নি। গবেষক বিরহড়দের বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেন যে বিরহড়রা তাঁদের জিনিস পত্রগুলি চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। আসবার পত্রের মধ্যে স্টিল গ্লাস, বাটি, থালা, খুন্তি, চামচ এছাড়া অ্যালুমনিওমের থালা, মাঝারি বড় বাটি, বালতি, হাড়ি, ও মাটির হাড়ি, কলসি ইত্যাদি রান্নার জিনিস পত্র রয়েছে। রয়েছে শিকার ধরার জাল, মাছ ধরার জাল, তীর-ধনুক, বাটুল, কোদাল, কুড়ুল, কাটারি, শাবল ইত্যাদি।

গবেষক আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন তা হল এই গ্রামটি কেউ জানত না অর্থাৎ পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মধ্যে এতোগুলো পরিবারের বসবাস তা সরকারের কাছে কোন রেকর্ড ছিল না। মাওবাদীদের আন্দোলনের চাপে এই গ্রামের পরিচিতি এবং কিছুটা বিকাশ হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ সংযোগ, জল, রাস্তা, সরকারী বাড়ি, পানীয় জলের জন্য নলকূপ ইত্যাদি সরকার থেকে তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের দ্বারা কোন রকম কর্ম সংস্থান করে দেওয়া হয়নি।

৪) বেড়সা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত তথ্য: (Information Gained from Bersa Village):

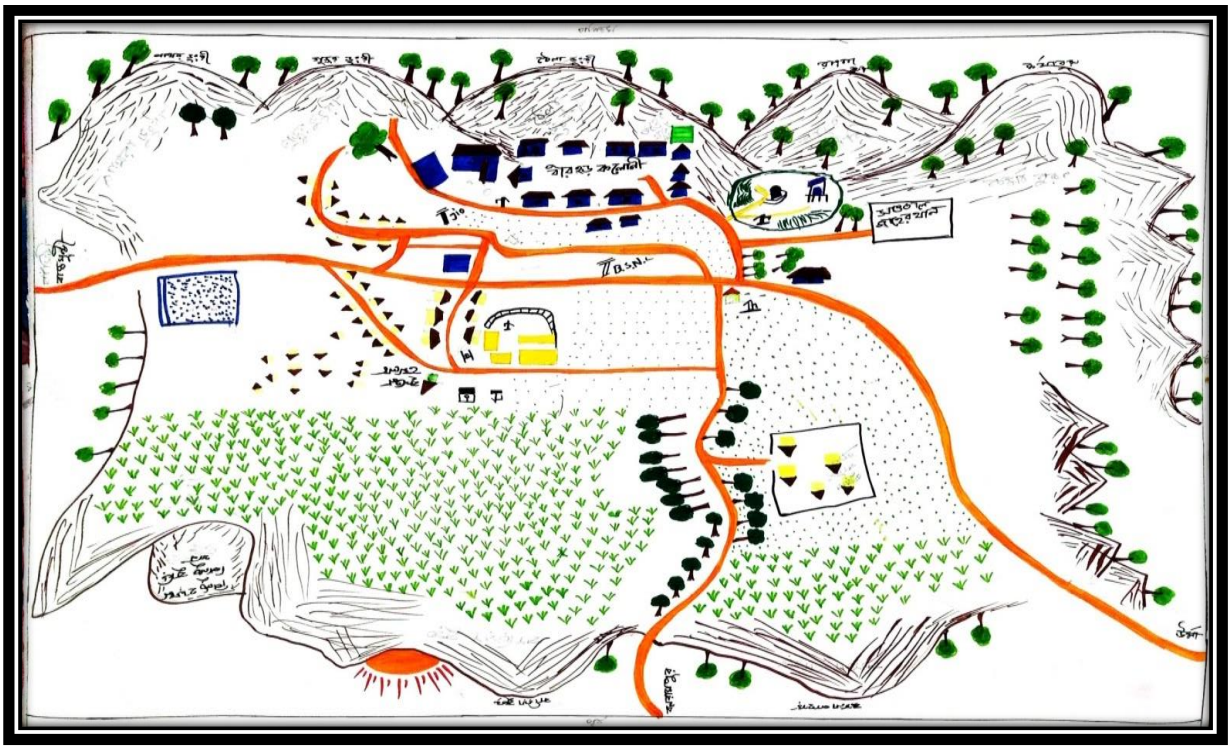

বেড়সা গ্রাম

পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর উন্নয়ন ব্লকে বেড়সা গ্রামটি রয়েছে। বলরামপুর মহকুমা থেকে বেড়সা গ্রামটির দূরত্ব প্রায় ১২-১৩ কিলোমিটার। বেড়সা গ্রামটির চারপাশ সুউচ্চ পাহাড় দ্বারা ঘেরা এবং এই গ্রামটির কিছু অংশ পশ্চিম দিকে পাহাড়ি ঢাল ও পাহাড়ের শিরায় জনবসতি। বহু পূর্ব কাল থেকে বিরহড়দের পূর্বপুরুষরা ছোটনাগপুর মালভূমির অংশ অযোধ্যার গভীর জঙ্গলে ও পাহাড়ে বসবাস করতেন, বর্তমানে বিরহড়রা পাহাড়ের ঢালে বসতি স্থাপন করেছেন। এই গ্রামটির পূর্ব দিকে একটি রাস্তা উঁচু পাহাড়ের (কানা পাহাড়) পাশ দিয়ে বলরামপুর ব্লকে বা মহকুমায় চলে গেছে। কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অর্থাৎ উর্মা থেকে পাহাড়ের গা দিয়ে বেড়সা গ্রামে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে 'পাথরা ডুংরি' পাহাড়ের ঢাল হয়ে বাঘমুণ্ডী ব্লকের দিকে চলে গেছে। বেড়সা গ্রামটির পশ্চিম দিকে 'ঢেলা ডুংরি' পাহাড়ের ঢালে ও

শিরায় বিরহড়দের কলোনি রয়েছে অর্থাৎ ঘরবাড়িগুলি রয়েছে। বিরহড়দের বাড়িগুলি থেকে ঠিক উত্তর দিকে 'ঠেলা ডুংরির' ঢালে বিরহড়দের 'জাহের থান' রয়েছে। এবং কিছুটা দূরে নিচের দিকে উত্তরে সাঁওতালদের 'জাহের থান' রয়েছে। বেড়সা গ্রামের পূর্ব দিকে ও উত্তর-পূর্বে বর্ষাকালে ধান চাষ হয়। তবে এই অঞ্চলটি অনেকটা পাথর মাটি হওয়ার জন্য এখানে গ্রীষ্মকালে জলের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। তাই নলকূপ থেকে জল ওঠে না। বিরহড়দের কলোনির দক্ষিণে একটি প্রায় ২০-৩০ ফুট গর্ত পুকুর খনন করা হয়েছে বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্য এবং মাছ চাষ করার জন্য যাতে বিরহড়রা মাছ চাষ করে অর্থনৈতিক ভাবে সবল হতে পারেন। এই পাহাড়ে শাল, নিম, অশ্বত্থ, ইত্যাদি গাছ রয়েছে। এই গ্রামে ঢালাই রাস্তা বরাবর দুই দিকে আকাশমণি, শিরিশ, পলাশ, নিম ইত্যাদি গাছ রয়েছে। গবেষক জানতে পারেন বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের মূল অর্থনীতি এবং পেশা হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা। বিরহড়রা শুকনো কাঠগুলিকে মাথায় করে খাড়া পাহাড় পার হয়ে প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার পথ হেঁটে বলরামপুর বাজারে কাঠ বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। এছাড়া মধু সংগ্রহ করেন এবং চিহরলতা থেকে দড়ি তৈরি করেন, এছাড়া বর্তমানে সিমেন্ট বস্তা থেকে দড়ি তৈরি করেন। এই গ্রামে বিরহড়রা অতি দরিদ্রের কারণে কিছু বিরহড় পুরুষরা বলরামপুর, পুরুলিয়া বাজারে বিভিন্ন দোকানে মজুর হিসাবে কাজ করেন এবং কিছু পুরুষরা জেলার বাইরে মজুর হিসাবে কাজে গেছেন। তাই গ্রামে বিরহড়দের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, বর্তমানে বেড়সা গ্রামে ৯-১০ টি বিরহড় পরিবার রয়েছে। বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে বলরামপুর ব্লকের তত্ত্বাবধানে ইটের বাড়ি, নলকূপ তৈরির সাথে সাথে বর্তমানে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে বিরহড়রা তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতীয় আদিবাসী সংস্কৃতিকে চর্চার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। বেড়সা গ্রামে বিরহড়দের সাংস্কৃতিক হল রয়েছে যেখানে তাঁরা প্রাচীন আদিবাসী বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সুসজ্জিত রেখেছেন এবং যাতে বাদ্যযন্ত্রগুলির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বিরহড় সংস্কৃতিকে পরম্পরাগত ভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে শিখিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থাও করেছেন।

এই গ্রামে একটি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় (চতুর্থ শ্রেণী) রয়েছে, গ্রামে কোন উচ্চবিদ্যালয় নেই। উচ্চবিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য গ্রামের সকল শিশুদের বা শিক্ষার্থীদেরকে প্রায় ১০ কিলোমিটার

পাহাড়, জঙ্গল ও নির্জন পথ অতিক্রম করে বলরামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে যেতে হয়। এছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁদের কাছে একটা স্বপ্ন। বিরহড় কলোনিতে একটি বেসরকারি ছোট 'অলচিকি' শিক্ষানিকেতন রয়েছে অর্থাৎ বিরহড়দেরকে 'অলচিকি' শেখানো হয়। ২/৩ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা তাঁদের নিজেদের প্রচেষ্টায় বিরহড় আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আসেন। গবেষক জানতে পারেন যে এখনও পর্যন্ত বিরহড়রা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি। অতি দারিদ্র্যের কারণে স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছে। বহু পূর্বে এই গ্রামে বিরহড়রা পদবি হিসাবে 'শিকারি' পদবি ব্যবহার করতেন। কারণ বিরহড় মানুষেরা শিকার করতেন বলে তাঁদেরকে শিকারি হিসাবে ডাকার ফলে সরকারি শংসাপত্রে শিকারি পদবি লিখে দিত সরকারি কর্মচারীরা, তবে বর্তমানে বিরহড়রা এই পদবীর বিরোধিতা করেছেন। সরকারকে বলেছেন যে তাঁদের পদবী যাতে 'বিরহড়' লেখা হয়। গবেষক বিরহড়দের সাথে কথোপকথনে জানতে পারেন যে কেউ যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তাকে বলরামপুর বা বাঘমুণ্ডী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হবে। তবে বিরহড়দের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, তাঁরা গভীর জঙ্গল থেকে ভেষজ ওষধি গাছগাছড়া দিয়ে তাঁদের রোগ নিরাময় করেন যেমন- জর, সর্দি, কাশি, চামড়ার কোন রোগ, চুলকানি, অ্যালার্জি, পেটে ব্যাথা, শরীরে ব্যাথা/ যন্ত্রণা, ইত্যাদি। তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতির সহায়তায় প্রাচীন কাল থেকে পরম্পরাগত ভাবে গভীর জঙ্গলে ও পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁদের জীবনধারা অতিবাহিত করে চলেছেন। তবে বিরহড়রা গবেষককে জানিয়েছেন যে বর্তমানে ফরেস্ট অফিসাররা তাঁদেরকে গভীর জঙ্গলে যেতে দেননা এবং অনুমতি না পাওয়ার জন্য সামনের পাহাড়, জঙ্গলে ভেষজ উদ্ভিদ না পেয়ে তাঁদের চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে অসমর্থ হচ্ছেন। বিরহড়রা গবেষককে জানান যে বিভিন্ন জঙ্গল মাফিয়া, পুঁজিপতি, এমনকি ফরেস্ট অফিসাররাও এই জঙ্গল/ অরণ্যকে ধ্বংসের জন্য ও জঙ্গলের সম্পদকে লুঠ করার জন্য অনেক বার চেষ্টা করেছিল এবং অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে শেষ করেছে। তবে বিরহড়, সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিবাসী সংগঠন জঙ্গল এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য জঙ্গল মাফিয়াদের সাথে লড়াই করেছেন, এমনকি বহুবার আন্দোলন করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়: বিরহড়দের ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background of Birhors)

৫.১ ভারতে বিরহড়দের সম্বন্ধে একটি সাধারণ ঐতিহাসিক পটভূমি (A General Historical Background of the Birhors):

ভারতের মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার, ছত্রিশগড় এবং পশ্চিমবঙ্গে আদিম অধিবাসী বিরহড় আদিবাসীকে পাওয়া যায়। এই সবকটি রাজ্যেই বিরহড়রা Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র পুরুলিয়া জেলায় বিরহড়রা বসবাস করেন। 'বির' শব্দটির অর্থ 'জঙ্গল' এবং 'হড়' শব্দটির অর্থ 'মানুষ'। সুতরাং 'বিরহড়' শব্দটির অর্থ হল 'জঙ্গলের মানুষ' বা 'বন্য সন্তান'। বিরহড়রা পূর্বে যাযাবর গোষ্ঠী ভুক্ত ছিলেন - এদের কোন স্থায়ী ঘরবাড়ি, বাসস্থান ছিল না এবং দল বেঁধে জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। জঙ্গলে কোন এক প্রান্তে তাঁরা জঙ্গলের লতাপাতা দিয়ে সাময়িক ছাউনি করে তার মধ্যে বসবাস করতেন।

ইংরেজ আমলে এবং তারও পূর্ব থেকে ঝাড়খণ্ডে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে বিরহড়রা যাযাবরের ন্যায় জঙ্গলে বাস করত। ঐ সময় কালে বিরহড়রা নরমাংস খেত (Dalton, 1872) [১৮৫৭-১৮৭৫ সাল পর্যন্ত Dalton ছোটনাগপুর মালভূমি ডিভিশনে কমিশনার পদে ছিলেন।] Dalton লিখেছেন, "With murch trouble some Birhors were caught and brought to me. They were wretched-looking objects, but had more the appeared of the most abject on of one of those degraded castes of the Hindus, the dones or pariahs, to who must flesh in food, them of hill people. Assuring me that they had themselves given up the practice, they admitted that they are fathers were in the habit of disposing of the dead in the mamer indicated, viz., by feasting on the bodies: but they declared they never shortened life to provide such feast. And shank with horror at the idea of any bodies but those of their own blood-relations being surved upto them!" ঐ সময়ে যশপুরের রাজাও ডালটনকে বলেছিলেন যে তিনি শুনেছেন, যখন কোন বয়স্ক বিরহড় ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না, মৃত্যু আসন্ন, তখন তিনি তাঁর নিকট রক্ত সম্পর্কের বিরহড়দের আহ্বান করতেন যে তাঁরা যেন তাকে হত্যা করে তাঁর মাংস খায় এবং তাঁদের ক্ষুধার নৃবৃত্তি ঘটায়। যদিও

যশপুরের রাজা একথাও বলেছিলেন যে তাঁর কাছে যে সকল বিরহড়কে আনা হয়েছিল তাঁরা কেউ নরমাংস খাওয়ার কথা স্বীকার করেনি।

১৮২৪ সাল থেকে ১৮২৫ সালে Mr. Henry Paddington যখন পালামৌর দক্ষিণ অঞ্চলে কফির চারা বসানোর কাজে সরকারের থেকে দায়িত্ব পেয়েছিলেন সেই সময়ে তিনি দু'জন বিরহড় যাযাবর গোষ্ঠীকে পান। তাঁর কাছে কাজ করতে আসা ওঁরাও (ধাঙ্গর) এবং মুণ্ডাভাষী (কোল) শ্রমিকরা দু'জন বিরহড়কে এনেছিলেন এবং পরিচয় দিয়েছিলেন 'Monkey People' অর্থাৎ 'Bandarlok' বলে। ঐ সময়ে ঐ স্থানে থাকা অন্যান্য আদিবাসীরা দল বেঁধে ঐ দু'জন বিরহড়কে দেখতে আসতো। তাঁদেরকে দেখতে অনেকটা বড় আকৃতির বানর বলে Paddington এর মনে হয়েছিল।

১৮৬৮ সালে Captian Deprec যখন ছোটনাগপুর অঞ্চলে ভূ-সংস্থানগত সমীক্ষা করেছিলেন তখন লক্ষ্য করেন যে কিছু বিরহড় মানুষ ছোটনাগপুর জঙ্গল ছেড়ে আসামের চা বাগানে কাজ পাবার আসায় স্বপরিবারে স্থায়ী ভাবে চলে গেছে। ১৮৭২ সালে L.R. Forbes (I.C.S) ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের পালামৌ মহকুমাই Settlement Officer এবং অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার হিসাবে কার্যরত থাকা কালে বিরহড়দের সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন। Forbes-এর কথায় বিরহড়রা আসলেই মুণ্ডা গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী মুণ্ডারি এবং সাঁওতালী এই দুইটি ভাষা মিশ্রণে বিরহড়দের নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়েছে, যদিও তাঁরা উল্লিখিত দুইটি ভাষা থেকে পৃথক। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্যতম আদিম আদিবাসী বিরহড়রা যদিও পালামৌ এবং হাজারীবাগ জঙ্গলে এদেরকে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। প্রকৃতগত ভাবে বন্য স্বভাবের হলেও এরা ক্ষতিকারক নয় বা কারোর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। উচ্চ পাহাড়ে এবং পাহাড়ের শিরাগুলিতে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে এরা বসবাস করে। চাষবাস তাঁরা জানত না, এরা লাঙলে হাত দেয়না এবং কেও লাঙ্গল স্পর্শ করলে নিজেদের থেকে গোষ্ঠীচূত করেন। বাণিজ্য সম্পদ যেমন গাছের ডাল, শাকপাতা, ফলমূল, পাখি এবং বানরের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকতেন, এরা অনেকেই বানর ধরে পোষ মানায় এবং বানরকে নাচতে শেখায়, এরা বিভিন্ন পরবে কোল আদিবাসীদের ন্যায় বাঁশি, বানাম, ঢোলগ ও ধামসা-মাদল বাজায়। এদের গায়ের রং অত্যন্ত কালো, বেঁটে চেহারা, পুরুষ এবং মহিলাদের মাথায় বড় চুল যা প্রায়শ মুখকে ঢেকে রাখে

অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের কারনে এরা অন্য কোন মানুষকে দেখলে সেই স্থান ত্যাগ করে, যেন ভয়াত্ব হরিণ। জঙ্গলে তাঁদের পছন্দের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা অন্য জঙ্গলে যায় না। সাধারণত তিন-চারটি পরিবার একত্রে একটি পাহাড় বা শৈলশিরাতে বসবাস করেন। বাঁশ এবং জঙ্গলের গাছের পাতা দিয়ে তৈরি ছাউনি ঘরে এরা বসবাস করেন, এই ছোট কুঁড়ে ঘরগুলিতে মাত্র একজোড়া দম্পত্তি বসবাস করে, সাথে বড় ছেলে মেয়েগুলি নিকট অন্য কুঁড়ে ঘরে থাকে। ছেলে এবং মেয়েরা বিয়ের আগে একটি ঘরে থাকে এবং সমস্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে বিয়ের ব্যাপারে সংযত অর্থাৎ বিরহড় ছাড়া অন্য গোষ্ঠীকে বিয়ে করে না। যখন একজোড়া ছেলে মেয়ে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন উভয় পরিবারের বড়রা তাঁদের সমস্ত খাবার একত্রিত করে আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। ঘরে ঢোকার দিক সবসময় পূর্ব দিক থাকে, এছাড়াও ছাউনি এতটা বড় থাকে যে ঘরের মধ্যে জল পরেনা ঘরগুলি মাটি থেকে দুই ফুট উচ্চতা, এবং ঘরগুলি মোটামটি ছয় বর্গফুট আয়তনের হয়। খেঁজুর পাতার চাটাইতে এরা ঘুমায়। এদের বাড়িগুলিকে বলে 'টাণ্ডা' এবং গ্রামগুলিকে বলে 'জাঘি'।

বিরহড়দের পরিবারে কোন সদস্য মারা গেলে মৃত দেহকে এরা পুড়ায়। এরা অশৌচ পালন করে, এরা ১০ দিন এই সময় কেও চুলদারি কাটে না। অশৌচ শেষ হলে এরা ছোট অনুষ্ঠান করে প্রতিবেশী সকলে খাওয়া দাওয়া করে। এরা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় দেবদেবীর পূজা করে এদের মতে দেবতাদের তুলনায় দেবী এবং তাঁর কন্যাদের স্থান অনেক উপরে।

৫.২ বিরহড়দের আদি বাসস্থান(Native Abode of the Birhors):

ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড় এবং জঙ্গল ঘেরা উচ্চস্থান গুলিতে বিরহড়দের আদিবাসস্থান বলে জানা গেছে, এরা যদিও মূলত আধা যাযাবর প্রকৃতির কিন্তু এদের মধ্যে কোন কোন দল অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী ও সর্বসাধারনের কাছাকাছি থাকার ফলে যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে আধুনিক মানুষদের ন্যায় চাষবাসে সমসংযোগ করেছে। জঙ্গলে বসবাসকারী বিরহড়রা অত্যন্ত দরিদ্র। জঙ্গলের পাতা, গাছের ডাল ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের কুঁড়েঘর গুলি তৈরি করত। এদের ঘরগুলি লম্বা ৮-১০ ফুট, চওড়া ৬ ফুট এবং উচ্চতা ৬ ফুট, দরজার উচ্চতা ২ ফুট প্রস্থে ১.৫ ফুট, ঘরগুলি প্রায় গোলাকারে তৈরি হয় এবং দরজা বৃত্তের ভেতরে দিকে থাকে। এর রূপ গোলাকারে থাকা অনেক গুলি ঘরে কেন্দ্রিও স্থানটি উপযুক্ত বা খোলা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন

থাকে। জঙ্গল থেকে এরা দড়ি তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের লতা, মধু, রেশম ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। কাঠের তৈরি পাত্রে এরা বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখে। এদের প্রধান বাসস্থান দামোদর নদীর উত্তর দিকের হাজারীবাগ জেলার উত্তর দিকের মালভূমির জঙ্গলে। এদের মধ্যে কিছু জন পূর্ব দিকে মানভূম জেলার এবং পশ্চিম দিকে সিংভূম জেলার দক্ষিণে ছড়িয়ে রয়েছে। আর কিছু কিছু বিরহড় গোষ্ঠী উত্তর এবং উত্তর পশ্চিমে রাঁচি জেলায় এবং পালামৌ জেলার পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে রয়েছে ।

৫.৩ বিরহড়দের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Birhors):

একত্রে কয়েকটি পরিবার নিয়ে বিরহড়দের যে জনপথ তৈরি হয় তাকে 'টাণ্ডা' (Tanda) বলে। প্রতিটি টাণ্ডার একটি করে প্রধান বা মাঝি থাকে, টাণ্ডার পরিবারগুলি তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান হিসাবে নির্বাচন করেন। বিরহড়রা তাঁদের এই নির্বাচিত প্রধানকে বলে 'ন্যায়া'বা 'ন্যায়কে' (Naya or nayke)। ন্যায়া বা টাণ্ডার প্রধান টাণ্ডার সকল ধর্ম কর্মের পুরুহিতের ভূমিকা গ্রহন করে, যদিও বিরহড়রা মনে করেন যে তাঁদের প্রধান একজন ধর্ম নিরপেক্ষ নেতা। বিরহড় আদিবাসী মানুষরা গভীর জঙ্গলে শিকারের উপর জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। যদিও শিকার তাঁদের প্রধান জীবিকা তবুও তাঁদের জীবিকার পরিবর্তনের কারণে তাঁদেরকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। (১) যাযাবর (Uthlus or Bhuliyas) (২) স্থায়ী বাসিন্দা (Jaghis or Thanias) । বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বাকি সময় গুলিতে যাযাবর প্রকৃতির বিরহড়রা ছোট ছোট দলে তাঁদের পরিবার, অল্প জিনিসপত্র ইত্যাদিকে ঝুড়িতে চাপিয়ে নিয়ে খাবারের সন্ধানে এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। এরা জাল দিয়ে এবং ছোট কুঠার দিয়ে শিকার করেন তাই ঝুড়িতে থাকে শিকার ধরার জাল এবং কুঠার। পুরুষ এবং মহিলা উভয় তাঁদের ঝুড়িতে শুকনো মহুয়া ফুল, বিভিন্ন শস্যদানা ইত্যাদি বহন করে। মেয়েরা মাটির হাড়ি (রান্নার কাজে ব্যবহৃত) এবং মাটির কলশি (জল আনতে এবং সঞ্চয় করে রাখতে) বহন করে। কেবলমাত্র বর্ষার সময় (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস) তারা একটি স্থানে টাণ্ডাতে থাকতে বাধ্য হয়। বাকি সারাবছর তাঁরা এক একটি স্থানে এক থেকে দুই সপ্তাহ বসবাস করে নিকটবর্তী জঙ্গলে শিকার করে এবং উদ্ভিদ জাতিও খাদ্য সংগ্রহ করে।

স্থায়ী বাসিন্দারা এই ভাবে ঘুরে বেড়াতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন তাই তাঁরা উচ্চপাহাড়ে অথবা গভীর জঙ্গলে অথবা পাহাড় শিরায় স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করেন। এই ধরনের বিরহড়রা জঙ্গলের কোন একটি স্থানকে বা পাহাড়ে কোন সমতল ভূমিকে পরিষ্কার করে চাষযোগ্য জমিতে রুপান্তর করে চাষাবাদ করেন। তবে এদের বেশির ভাগই জমি থাকে না, তাই পশু শিকার, মধু সংগ্রহ, মৌচাকের মোম সংগ্রহ, উদ্ভিদজ খাবার সংগ্রহ, জঙ্গলে লতা থেকে দড়ি তৈরি ও বিক্রি করে ইত্যাদি উপর জীবন এবং জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। স্থানীয় ভূ-স্বামী, জমিদারের খারাপ ব্যবহার বা অত্যাচার, নিকট গ্রামের অন্যান্য আদিবাসী এবং অ-আদিবাসীদের সঙ্গে বিবাদ এমনকি নিকটে জঙ্গলে প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব, দড়ি তৈরির লতার অভাব হলে এরা বসতি ত্যাগ করে অন্যত্রে দূরের কোন জঙ্গলে চলে যায়। স্থায়ী বসতি কোন কোন বিরহড় পরিবার তাঁদের কুঁড়ে ঘড়ে মাটির দেওয়াল দিয়ে থাকে এমনকি একটি ভিন্ন কুঁড়েতে ছাগল, মোরগ ইত্যাদি রাখার ব্যবস্থা এদেরই কোন কোন দলের মধ্যে একটি পৃথক ছোট কুঁড়েঘর থাকে একে বলে 'চুকুম্বা' (Chu'kumba) এটি আত্মার কুঁড়েঘর 'বোঙ্গা-কুম্ভা' (Bonga-Kumba) নামে পরিচিত। প্রতিটি স্থায়ী বিরহড়দের 'বনাঞ্চলের একটি পবিত্র স্থান' (Secreat Groves) বা বিরহড়দের ভাষায় 'Jaher' বা জাহের বা জিলু জাহের থাকে যেখানে কিছু গাছ ও পাহাড়ের খণ্ড থাকে। এই স্থানে 'সিন্দ্রা বোঙ্গা' (Sendra Bongas) বা Spirit বা আত্মা বাস করেন। বিরহড়রা শিকারে যাবার পূর্বে এখানে তাঁদের শিকার জাল এবং শিকারের অস্ত্র রাখে এবং দেবতার উদ্দেশ্যে মোরগ উৎসর্গ করেন।

৫.৪ বিরহড়দের প্রাত্যহিক জীবন (Daily Life of the Birhors):

ভোরে মোরগ ডাকার সাথে সাথে বিরহড় পুরুষরা বিছানা ছেড়ে বাইরে আসে, জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা গাছের ছাল (Bohunia Seandens) এবং 'চিহরলতা' ইত্যাদি দিয়ে জলে ভিজিয়ে পাকদিয়ে দড়ি তৈরি করে। 'ছুটিলি' নামক এক প্রকার লাঠি দিয়ে দড়িতে পাকদেয় এবং দড়িকে শক্ত করে। মহিলারা কিছুক্ষণ পরে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে ওঠে আসে এবং পুরুষদের দড়ি তৈরিতে সহযোগিতা করেন। এরপর পুরুষরা ঐ দড়ি দিয়ে জিনিসপত্র ঝুলিয়ে রাখার জিনিস, শিকার করার দড়ি এবং গরু, মোষ, ছাগল ইত্যাদি বাঁধার জন্য বিশেষ ধরনের দড়ি তৈরি করেন। সকালে সকলে মিলে সেদ্ধ ভাত, পান্তা ভাত অথবা মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে

খায়। সকালে খাবারের পর পুরুষরা জঙ্গলে যায় শুকনো কাঠ, জ্বালানি কাঠ, এবং দড়ি তৈরির জন্য গাছের ছাল ও লতা আনতে। শুকনো কাঠগুলিকে বাজারে বিক্রি করেন। মহিলারাও জঙ্গলে যায় মহুয়া ফুল, শাকপাতা, কন্দ, ফলমূল ইত্যাদি সংগ্রহ করতে। যেদিন পুরুষ শিকারে ব্যর্থ হয় বা মহিলা দড়ি তৈরি ও বিক্রি করে খাবার আনতে পারেন না সে দিন জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা কন্দ বা মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খায়। বিরহড়রা সামান্য কিছু হাতের কাজ করতে পারেন যেমন- কাঠ দিয়ে তৈরি বাসন, দড়ি দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র ইত্যাদি। বেঁচে থাকার জন্য ঐগুলিকে বিক্রি করে এরা লোহার যন্ত্র পাতি, টিনের গয়না, কুঠার, মাটির হাড়ি, কলসি, লবন ইত্যাদি সংগ্রহ করে। অল্পক্ষেত্রে বর্ষাকালে বিরহড় মহিলারা পাশাপাশি গ্রামের জমিতে অন্যান্য আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে কাজ করেন।

৫.৫ বিরহড়দের সংস্কৃতি (The Culture of Birhors):

সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং বিরহড়রা একিই আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁদের সামাজিক অনুষ্ঠান প্রায় একি হয়। সব আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় এরাও যে কোন উৎসব, অনুষ্ঠানে পানভোজন এবং নাচ-গানে তাঁদের ঐতিহ্য উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে পুরুষরা ধামসা, মাদল ও বাঁশি বাঁজায় এবং মেয়েরা তালে তালে নাচতে নাচতে গান গাইতে থাকে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নাচ-গান এবং পানভোজন মেতে ওঠে। চরম দারিদ্র্যের কারণে সাঁওতাল এবং মুণ্ডাদের মত এদের খুব বেশি অনুষ্ঠান থাকে না। তবে অল্প যে কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠান হয় তাতে প্রতিটি টাণ্ডার বা গ্রামের সমস্থ বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষরা শতস্ফূর্ত ভাবে আনন্দে যোগ দেয়। উৎসব অনুষ্ঠান বিরহড়দের চুরান্ত দারিদ্র্য জনিত জীবন যন্ত্রণাকে সাময়িক ভাবে হলেও লুঘু করে।

পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় আদিবাসীদের নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠানগুলি হল সহরায়, বাহা, কারাম, সস বোঙ্গা পরব, পাতা, ছাতা, সেন্দ্রা, দাঁশায়, প্রভৃতি। বর্তমানে হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানে দুর্গাপূজা, কালিপুজা, চণ্ডী পূজা, শীতলা পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদি পুজাতে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন।

বিরহড় আদিবাসী সমাজে বিবাহ হল সংস্কৃতির একটি অংশ। বিয়ে করার পর একজন পুরুষ এবং মহিলা বিরহড় সমাজে পুর্নাঙ্গ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। সাধারণত কোন স্থানে স্থায়ী ভাবে বাসকারী (জাঘি) বিরহড়রা ১১-১২ বছর বয়সে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬-১৭ বছর

বয়সে বিয়ে দিতে পারেন কিন্তু সাধারণত যুবক যুবতী মেয়েদের মধ্যে দেওয়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রীতি। এ ক্ষেত্রে ১৬-১৭ বছরে মেয়ের সঙ্গে ২০-২১ বছর বয়সের একটি ছেলের বিয়ে দেওয়া হয় বিয়েতে ছেলে এবং মেয়ের পরিবারের প্রধানরা বিয়ের ব্যাপারে সব রকমের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। বিরহড়রা তাঁদের বিবাহকে বলে 'বাপলা' অর্থাৎ বিবাহ। পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ রকমের বিবাহ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল- সদর বাপলা, বোলো বাপলা, অপরতাপ্পি বাপলা, উরাউরি বাপলা এবং গুলামি খেটে বাপলা।

বিরহড় আদিবাসী সমাজের মানুষ প্রকৃতিকে বিশ্বাস করেন এবং পূজা করেন। মারাং বুরু, জাহের আয়োঃ, সিং বোঙ্গা, চাঁদ বোঙ্গা, হারাম-হাপ্রাম প্রভৃতি ঈশ্বর এবং পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস করেন। বিরহড়দের ঈশ্বর বা ভগবান গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিরহড়দের রক্ষা করে এবং এর জন্য পবিত্র আত্মার নির্দিষ্ট স্থানে তাঁদের উদ্দেশ্যে খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গ করতে হয়। পবিত্র আত্মার এই নির্দিষ্ট স্থানটির নাম জাহের থান বা স্থান, এখানে খাদ্য এবং পানীয় উৎসর্গ করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়: আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Indigenous Knowledge and Sustainable Development)

৬.১ আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান (Indigenous Knowledge):

Indigenous Knowledge (IK) – কে নিয়ে বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহে চর্চা চলছে, এবং উত্তরোত্তর এর চর্চাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ হিসাবে মনে করা হয় বেশ কিছু অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাংকের অন্যতম কর্মকর্তাগ আদিবাসী সমাজ ও জঙ্গল মহলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে উপস্থিত এই জ্ঞানের চর্চার উপরে গুরত্ব দিচ্ছেন। আদিবাসী সমাজের মানুষ জঙ্গল ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, তার রক্ষণাবেক্ষণ, নিজেদের প্রয়োজনে তাদের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ঠ জ্ঞানী। এই জ্ঞান সবসময় তাত্ত্বিক নয়, বরঞ্চ এটি অনেক বেশি প্রায়োগিক। অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাগণ লক্ষ্য করেছেন যে জঙ্গলে বা জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা বংশ পরম্পরাগত ভাবে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাটি সমূহের যে জ্ঞান আহরণ এবং সুরক্ষিত রেখেছেন

তাতে পরিবেশের কোন ক্ষতি না করেও এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা নিজেদের প্রাত্যহিক চাহিদাকে পুরণ করছেন।

সামাজিক নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে 'Indigenous People' বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনের তাঁদের জীবন ধারণের জন্য চিরাচরিত জ্ঞান বিষয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 'Indigenous Knowledge' বলতে বুঝিয়েছেন, "Local and Indigenous Knowledge refers to the understanding of skills and philosophies develop by societies with long histories of interaction with their natural surroundings".

কোন কোন গবেষক Indigenous Knowledge বা দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান শব্দটি ব্যবহার না করে পরিবর্তে 'Folk Knowledge' বা 'লোক জ্ঞান' ও 'Traditional Knowledge' বা 'চিরাচরিত জ্ঞান' শব্দগুলি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

Brian Morris (2010) 'Folk Knowledge' শব্দের প্রয়োগে অধিক সক্রিয় ভুমিকা নিয়েছেন। তাঁর মতে Folk Knowledge, "Simply means the knowledge that ordinary people have of their local environment: environs meaning what is around us".

Morris (2010) –এর মতে লোকজ জ্ঞান হল-

১) অবশ্যই একটি স্থানীয় / দেশীয় জ্ঞান যা একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় আদিবাসী গোষ্ঠী সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত।

২) লোকজজ্ঞান কখনও কখনও লিঙ্গ ভিত্তিক অথবা কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত যা একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

৩) লোকজজ্ঞান জনগণের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এবং প্রায়োগিক জ্ঞান।

৪) লোকজজ্ঞান হাতে কলমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উঠে এসেছে।

৫) লোকজজ্ঞান অ-প্রথাগত জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মৌখিক ভাবে একটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়।

৬) চিরাচরিত জ্ঞানের ন্যায় লোকজজ্ঞান সুস্থিত জ্ঞান নয় বরঞ্চ একটি প্রজন্ম থেকে অন্য আর একটি প্রজন্মে সঞ্চারিত হওয়ার সময়ে এটি পরিবর্তীত হয়।

৭) লোকজজ্ঞান পরিবেশ সংরক্ষণের নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

The World Intellectual Property Organization (WIPO) 'Indigenous Knowledge' বা 'আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান' শব্দের পরিবর্তে 'Traditional Knowledge' বা 'পরম্পরাগত জ্ঞান' বা 'ঐতিহ্যগত জ্ঞান' শব্দকে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে পরম্পরাগত বা ঐতিহ্যগত জ্ঞান বলতে, "Knowledge, know-how, skill and practices that are develop, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural and spiritual identity". তবে Borthaqar and Sing (2010) বলেছেন যে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান বা পরম্পরাগত জ্ঞান দুইটি শব্দের যে কোন একটি শব্দকে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং উভয় শব্দের বৈশিষ্ঠ্য একই।

Karen Robarts (1996) এর মতে, "Traditional Knowledge (TK) is holistic and can't be separated from the people…traditional knowledge parallerd scientific knowledge".

তবে পরম্পরাগত জ্ঞান সাধারণ ভাবে অনুশীলন ভিত্তিক জ্ঞান যা মূলত কৃষিকর্ম, মাছ চাষ, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, বাগান চাষ, জঙ্গল বিদ্যা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত।

Convention on Biological Diversity (CBD, 1992) পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে ও স্থিতিশীল উন্নয়নে পরম্পরাগত জ্ঞানের উপর গুরত্ব দিয়েছেন।

Marie Battiste & James Henderson (2000) তাঁদের বই 'Protecting Indigenous Knowledge and Heritage' এ বলেছেন যে, আদিবাসী গোষ্ঠীদের দেশীয় জ্ঞানের সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে "No short answer exists". কারণ তাঁরা মনে করেন এই সংজ্ঞাগুলি উপর থেকে আরোপিত, দেশীয় আদিবাসীরা এই সংজ্ঞাকে গ্রহন করুক বা না করুক। তাঁরা আরও বলেছেন যে জ্ঞান কখনই একক ভাবে উঠে আসে না। একটি জ্ঞান অপর জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মানুষের পরম্পরাগত জ্ঞান থেকে কখনই পৃথকীকৃত নয়। তাই তাঁরা বলেছেন,

“Knowledge is the expression of the vibrant relationship between people of the ecosystem, and the living being and sprits they share their lands”. সুতরাং দেশীয় জ্ঞান কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান নয় বরঞ্চ এটি সৃষ্টি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক জগতের সম্মিলিত রূপ। যে সমস্ত দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন এই জ্ঞান সমূহকে ব্যবহার করে তাদের থেকে এই জ্ঞানকে কোন ভাবেই পৃথক করা যায় না।

UNEP (1999) জীব-বৈচিত্র্যের সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সংরক্ষণে এবং সমগ্র বিশ্বের জীব- বৈচিত্র্যের সংরক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরত্ব দিয়েছেন। তাই জীব এবং তার সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে পারলে জীব-বৈচিত্র্যের ধ্বংস সাধন থেকে জীব-বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। এর জন্য দেশীয় ভাষা সমূহকে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। দেশীয় ভাষা হারিয়ে গেলে নির্দিষ্ট দেশীয় ভাষাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারেরও অবক্ষয় ঘটবে। তাই বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র জীব-বৈচিত্র্যের মূল্য বোধকে তাঁদের policy-এর মধ্যে সমন্বিত করছেন। আর এই কারনে National Education Policy (2020) ‘Indigenous Knowledge’ বা ‘দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞানকে’ শিক্ষা ও গবেষণার সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার কথা বলেছেন। এর জন্য সমস্ত ধরনের জাতি ভিত্তিক বিভেদের প্রাচীরকে ধ্বংস করতে হবে। ভারত সরকারের পক্ষে MHRD তাই দেশীয় জ্ঞান এর উপর গবেষণা এবং আলোচনা বিষয়ে গুরত্ব দিয়েছেন, যা Indian Knowledge System –এর একটি অংশ।

কোন একটি রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের মধ্যে দেশজ জ্ঞানের উপস্থিতি, দেশজ সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং দেশজ জ্ঞান ও সংস্কৃতির নিরন্তর চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান থেকে জানা যায় মানুষ কি ভাবে তার পরিবেশ, প্রাণীজ সম্পদ, উদ্ভিজ্জ সম্পদ, মৃত্তিকা, জল এবং বায়ুর সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কে আবদ্ধ। খুব প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসী মানুষরা বুঝেছিলেন যে আমাদের প্রকৃতি এবং তার অধীন উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যকে সুরক্ষাদান বা সুরক্ষিত করতে না পারলে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটবে। তার ফলে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে প্রাচীনকাল থেকে মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞানের নিরন্তর

চর্চা থেকে বোঝা যায় দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান কিভাবে যুগে যুগে মানুষকে সহায়তা করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই জ্ঞানের পর্যালোচনা জরুরী ভিত্তিকভাবে হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী কোন নির্দিষ্ট এলাকার বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষের সম্বন্ধে যেমন- অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তেমনি এই ফসল কী ভাবে দেশীয় উপায় অবলম্বন করে সুরক্ষিত রাখা যাবে সেই বিষয়েও তারা যথেষ্ট তৎপর। প্রাচীন দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান থেকেও পরম্পরাগত ভাবে আদিবাসী মানুষরা জেনে এসেছেন কোন কোন গাছের ওষধি গুণ রয়েছে, কোন কোন গাছের কোন অংশে ওষধি গুন রয়েছে ; এবং কোন রোগের চিকিৎসায় এই গাছ/ গাছের বিশেষ কোন অংশকে ব্যবহার করা যাবে। আবার একই ভাবে ওষধি বৃক্ষের জন্মানোর ধারাবাহিকতাকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, কিভাবে ওষধি গাছগুলিকে সুরক্ষিত রাখা যায় এই বিষয়ে দেশজ জ্ঞানের চর্চা নতুনভাবে আলোকপাত করে।

মূল গবেষণা সন্দর্ভে কিছু ভেষজ জ্ঞান ভিত্তিক উদ্ভিদ, প্রাণী, ওষধি গাছ, খাদ্যযোগ্য মাশরুম, পোকামাকড় এবং প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হল-যেগুলি আদিবাসী মানুষরা বংশানুক্রমে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর পরম্পরাগত জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে জেনেছেন।

৬.১.১ বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান (Sacred Grouves of Forest):

একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা, ঐ অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য চেষ্টা করেন। যেকোনো জনগোষ্ঠীতেই বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রকৃতির পূজা করেন এবং অন্যভাবে বললে শ্রদ্ধা সহকারে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখবার চেষ্টা করেন। 'বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান' গুলি তাই প্রকৃতি পূজার স্থান (থান) যেখানে আদিবাসীরা কিছু পবিত্র বৃক্ষকে সুরক্ষিত রাখেন এবং ওইগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ঐ পবিত্র স্থানে যে গাছগুলি রয়েছে কখনোই সেগুলিকে নষ্ট করা হয় না। এই কারণে 'Sacred Grouves' অঞ্চলে কোন মানুষ কখনো প্রবেশ করে না। স্বাভাবিকভাবে বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানে যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিজ সম্পদ রয়েছে তারা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে বংশবৃদ্ধি ও বংশ রক্ষা করে থাকে। এলাকার আদিবাসী মানুষরা প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে, আর এর মাধ্যমে আদিবাসীরা প্রকৃতিকে

প্রাকৃতিক উপায়ে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। (Gadgil & Vartak, 1976; Khiewtam & Ramakrishnan, 1989; Chandrashekara & Sankar, 1998; Hughes & Chandrean, 1998; Kanowski, 2000)।

সুতরাং 'বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান' হল পরম্পরাগতভাবে সুরক্ষিত নির্দিষ্ট বনাঞ্চল যা প্রাকৃতিক মিউজিয়াম হিসাবে পরিচিত এবং ধর্মীয় প্রথায় যেখানে উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ সম্পদ সমূহ সুরক্ষিত থাকে। বিশ্বাস করা হয় যে হাজার হাজার বছর ধরে বনাঞ্চলের এই স্থানে কখনো কোন মানুষের পা পড়েনি, সুতরাং ঐ পবিত্র বনাঞ্চলটি কুমারী বলেই আদিবাসী সমাজে স্বীকৃত হয়ে আসছে। Gadgil and Vartak (1976) এর মতে প্রাক-বৈদিক যুগেরও বহু পূর্বে আগে থেকেই যখন মানুষ চাষবাস করতে শেখেনি, পশু শিকার এবং ফলমূল খাদ্যের সংস্থান করত, তখনও মানুষ এই পবিত্র বনাঞ্চলে তাদের পায়ের ছাপ রাখেনি। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান নিয়ে যে সমস্ত বিজ্ঞানী চর্চা করেছেন তাঁরা মনে করেন জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে বনাঞ্চলের পবিত্র স্থানের (থান) গুরুত্ব অপরিসীম (Khan, Menon, & Bawa, 1997; Haridasan, & Raw, 1985; Kosambi, 1962; Gadgil & Vartak, 1976)। কেবল মাত্র ভারতেই এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ বনাঞ্চলের পবিত্র স্থান রয়েছে (Malhotra, Gokhele, Chatterjee, & Srivastava, 2007)।

দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাদের চিরাচরিত ধর্ম বিশ্বাস থেকে ওই নির্দিষ্ট এলাকায় পাহাড়, নদী, জঙ্গল, ঝর্ণা, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির জীবন যাপনকে কোনভাবেই বিশৃঙ্খল করতে চাননা। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কোন ব্যক্তি ওই পবিত্র বনাঞ্চলে প্রবেশ করলে বা গাছ কাটলে বা কোন প্রাণীকে হত্যা করলে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হবে বা কোন চিকিৎসার অযোগ্য রোগে আক্রান্ত হবে। এই ভাবেই প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা নিজেদের পরম্পরাগত সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, উৎসব ইত্যাদির জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতি এবং সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছেন এবং সুরক্ষিত রাখছেন।

৬.১.২ ওষধি গাছ সমূহ (**Medicinal plants**):

অধিকাংশ দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষদের মধ্যে ঔষধি গাছ-গাছড়া সমূহ তাদের সামাজিক জীবন এবং রোগের চিকিৎসা ও রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ

করে চলেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষদের জীবনে ঔষধি গাছগাছড়া এবং রোগ নিরাময়ের মধ্যে একটি ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। কোন কোন লোককথায় দেখা যায় যে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা রোগের চিকিৎসায় নির্দিষ্ট ওষধিযুক্ত গাছগাছড়া ব্যবহার করছেন। প্রতিটি রাষ্ট্রে যে সকল আদিবাসীরা রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই ঔষধি বৃক্ষের পরিচিতি এবং ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানের এক একটি জীবন্ত প্রদর্শন শালা হিসেবে পরিচিত। বিশেষত আদিবাসী মানুষেরা এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও কিছু কিছু ঔষধি গাছ চেনে এবং গাছের নির্দিষ্ট অংশের ওষধি মূল্য জানে এবং কোন ধরনের রোগ নিরাময়ে এটিকে কিভাবে ব্যবহার করা যাবে সেই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। কোন কোন ওষধি যেমন রোগের চিকিৎসায়, পুরুষদের যৌন শক্তিবর্ধক হিসাবে প্রজননের কাজে এবং নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচার ব্যবহারে ব্যবহৃত হয়। তেমনি কিছু কিছু ঔষধি গাছগাছড়া, শিকার কালে, বিবাহ এবং বন্ধুত্ব স্থাপনে সহযোগী হয়। আবার কিছু কিছু ওষধি গাছ ব্যবহার করলে মানুষের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা কোন গাছের শুধুমাত্র শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল, এমনকি গন্ধ শুঁকে বলতে পারেন এটি কি গাছ এবং একে কিভাবে ও কোন কাজে ব্যবহার করা হয়। এখনো পর্যন্ত 'Ethno Botanist' বা 'Pharmacologist' রাও এত সহজে ওষধি গাছ-গাছড়া চিনতে পারেন না। সুতরাং আদিবাসী সম্প্রদায় মানুষজনের হাতে পরম্পরা গত ভাবে থাকে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর জ্ঞান যেটি তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহায়ক।

৬.১.৩ জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় দেশীয় জ্ঞানের ব্যবহার (Use of Indigenous Knowledge in Water Conservation and Management):

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা জানেন কিভাবে জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা করতে হয়। হিমালয় পর্বত অঞ্চলে দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা জল সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা কিভাবে করে থাকেন সেই বিষয়ে গবেষণা করেছেন Namtak & Sharma (2018)। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে আদিবাসী মানুষরা পুকুর কেটে শাখা-প্রশাখা যুক্ত দীর্ঘ খাল কেটে জল সঞ্চয় করেছেন, বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলেও জল সংরক্ষণের জন্য পুকুর কাটা, পুকুর সংস্কার এবং খালকাটার প্রথা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বনাঞ্চলে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা পুকুর কেটে ও কুঁয়ো কেটে জল সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় যুক্ত রয়েছেন। কোন কোন

পরিবার নিজস্ব জমিতে পুকুর কেটে মাছ চাষ করেন। অন্যরা ঐ পুকুরের জল ব্যবহার করতে পারলেও মাছ ধরার অধিকার তাদের থাকে না। এই ধরনের পুকুরের চারিদিকে পাড় বরাবর বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ বসানো থাকে এবং কিছুটা জমিতে সবজির চাষ হয়।

৬.২ স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development):

Sustainable Development শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয় 'United Nations Conference on Human Development' (1972) দ্বারা। ১৯৭২ সালে শব্দটি প্রথম ব্যবহার হলেও প্রায় ১৫ বছর পরে ১৯৮৭ সালে 'United Nation's World Commission on Environment and Development (WCED) এর সেমিনার রিপোর্ট 'Our Common Future' এর মধ্যে বহুলভাবে ব্যবহার হয়েছে। WCED(1987) 'Brundtland Commission' নামে পরিচিত, কারণ এই কমিশন এর চেয়ারম্যান ছিলেন নরওয়ের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী Gro Brundtland তাঁর নাম অনুসারে Sustainable Development বলতে বোঝায় সেই স্থিতিশীল উন্নয়নকে যার জন্য বর্তমানের সম্পদ সমূহকে চাহিদা অনুযায়ী এমন ভাবে ব্যবহার করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাঁদের চাহিদা অনুসারে সম্পদকে ব্যবহার করতে পারেন। 'Development' শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন। তবে মোটামটি ভাবে 'Development' বলতে বোঝায়, "Development is a Culturally bounded Philosophically and Politically Combind term. The meaning of 'what is development' is as impacted by how it is define as it's by whom". (Lertzman, & Vredenburg, 2005, p.252)।

Brundtland report অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে যে ভয়ংকর দিকে এগিয়ে চলেছে তার থেকে মুক্তির একমাত্র পথ অর্থনীতি (Economy) এবং পরিবেশ চর্চা (Ecology) এর মধ্যে বিবাহ দান অর্থাৎ একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই রিপোর্টে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের সরকার, রাষ্ট্র প্রধান, এবং তাদের জনগণকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব পরিবেশগত ভাবে অবনমনের মধ্যে রয়েছে। এর থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে এবং অর্থনৈতিক নীতি রচনা করতে হবে যাতে পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিবেশের সমস্যা রক্ষায় সকলে সক্রিয় হয়। সুতরাং WCED এর মতে সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে ধাপে ধাপে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে পরিবেশবিদ্যার রাজনৈতিক পরিবেশ

এবং অর্থনীতি ইত্যাদি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে। তাই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জরুরী ভিত্তিকভাবে প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিষয়সমূহ যেমন জীবনধারণের গুণগতমান এবং অর্থনীতির মানদন্ডে বিভিন্ন গোষ্ঠী মানুষের মধ্যে বৈষম্যগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা যাবে না বরঞ্চ সমগ্র বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষাপটে সমস্যাগুলিকে বিচার করতে হবে আর এর সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে থাকবে আন্তর্জাতিক স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আগ্রহ।

WCED (1987) এর ভাবনাকে আরও বিস্তীর্ণ করতে ১৯৯২ সালে 'United Nations' সংঘটিত করেন 'Recode Janiro Conference on Environment and Development', এবং 1998 সালে 'Kyto Conference 'United National Framework Convention on Climate Change'।

মানব সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি হলো পরবর্তী প্রজন্ম সমূহের প্রয়োজনে কিছু 'Quality of Life Asset' কে রেখে যাওয়া যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সমূহ চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়। সুতরাং sustainable development এর কেন্দ্রীয় নীতিটি হল 'Inter-Generational Equity' (Turner, Doctor, & Adger, 1994) কে সুরক্ষিত রাখা। WCED (১৯৮৭) ও প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁদের মতে যত দিন যাবে ততই শিল্পায়ন সমগ্র বিশ্বে বৃদ্ধি পাবে। এর পথ ধরে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হবে। সবুজ বনাঞ্চল দূষিত হবে, পুকুর, খাল, বিল, নদী এবং সমুদ্রের জল হয়ে উঠবে জীবজগতের পক্ষে বিষাক্ত, নষ্ট হবে বাতাস তথা পরিবেশ। এর পেছনে মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিল্পায়ন ঘঠিত উন্নয়নের ঊর্ধ্বমুখী লেখচিত্র। পর্বত প্রমাণ মানুষের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে তাই ধ্বংস হয়ে চলেছে বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, বাতাস, পরিবেশ, এমনকি আদিবাসী জনগোষ্ঠী। পৃথিবীর সকল দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে তাই প্রকৃতির ধ্বংস মানে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নের সামনে দাঁড় করানো। তারপর প্রাকৃতিক সম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের জন্য একই সঙ্গে সুরক্ষিত রেখে যাওয়া যায়। এতে করে আদিবাসী সমাজ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, কারণ আদিবাসী সমাজ জানে কিভাবে Natural

Capital (Ecological Economics) এর ধারণা কে ব্যবহার করে 'Natural Income' কে সংরক্ষিত রাখা যায়। এই 'Natural Capital' হলো সমস্ত ধরনের জৈব পদার্থ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের সমাহার (Daly, H., 1994) । সুতরাং মানুষের তৈরি সম্পদ এবং প্রকৃতির দেওয়া সম্পদকে একক গোষ্ঠীবদ্ধ কিছু মানুষ বা বিশেষ কোন কোন রাষ্ট্র একাকী সবটুকু ভোগ করবেন না; সমস্ত সম্পদকে, সমস্ত মানুষ এবং জীবজগতের জন্য সমানভাবে ব্যবহার করতে দিতে হবে। কবির কথায় -

এই জগতের যাহা সম্বল,
বাসে ভরা ফুল রসে ভরা ফল,
সুস্নিগ্ধ মাটি সুধা সমজল পাখির কণ্ঠে গান, সকলের এতে সম অধিকার,
এই তার ফরমান। ভগবান! ভগবান!

(কাজী নজরুল ইসলাম)।

Turner এবং অন্যান্যদের (1994) মতে স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর মূল উপজীব্য হল প্রকৃতির সম্পদকে সুরক্ষিত রেখে একটি প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া। সুতরাং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) হল-

"Sustainable Development is positive socioeconomic change that does not undermine the ecological and social systems upon which communities and society are dependent. Its successful implementation requires integrated policy, planning, and social learning process; its political viability depends on the full support of the people, it affects through their government, their social institutions, and their private activities" (Rees, 1989, p.3)। সুতরাং যে কোন আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের সুস্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখতে হলে পরিবেশ, সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে যাতে সমস্ত মানুষের মধ্যে সাম্য সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর একটি অংশ হল 'Social Capital'।

Berkes and Folkes (1994) স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) বিষয়ে বলতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন 'Cultural Capital' এর ধারণাকে। তাঁদের মতে পরিবেশ এবং

অর্থনীতি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তেমনি পরিবেশ এবং অর্থনীতি নির্ভরশীল সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গেও।

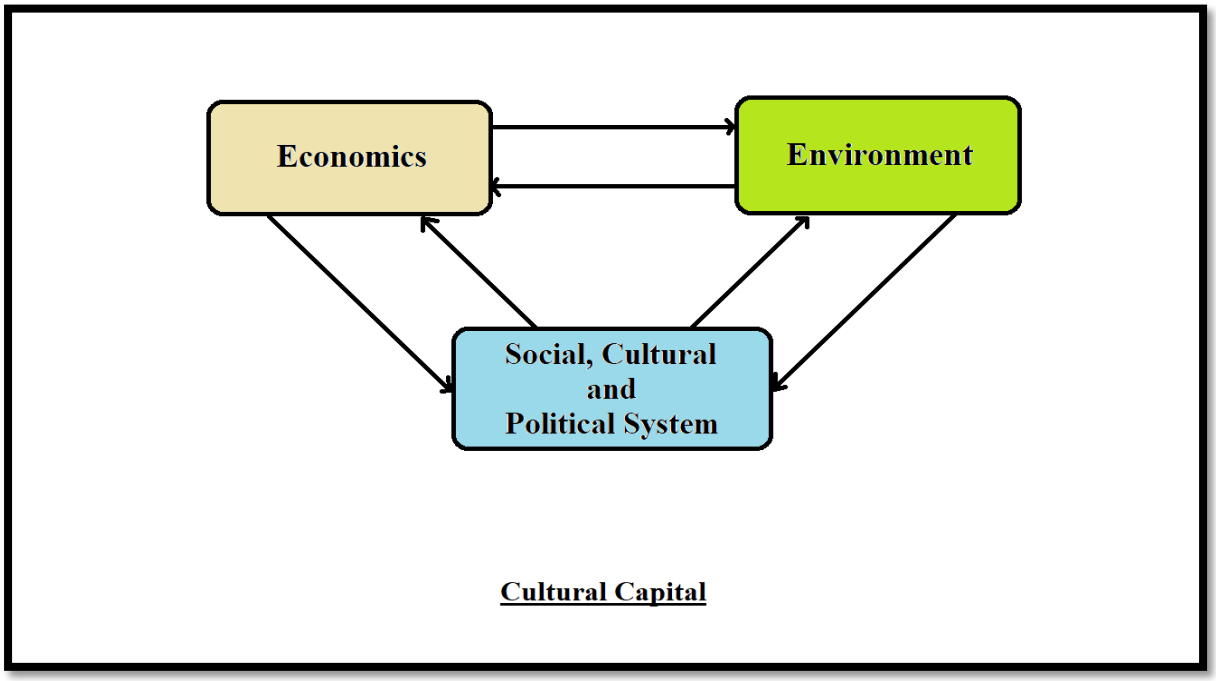

Lertzman (১৯৯৯) দেখিয়েছেন যে সাংস্কৃতিক বলতে জ্ঞান, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ রূপ সম্পদ সমূহ যার উপরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির ভিত্তি নির্ভর করে। যে বাস্তুতন্ত্রের উপর জগৎ নির্ভরশীল তাকে সুরক্ষিত রাখলে বৃদ্ধি সীমিত থাকলেও কিন্তু বিকাশ বা Development সীমিত হয়ে যাবে না। সুতরাং বিকাশ বা Development হল Sustainable এর সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু Growth বা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

৬.৩ স্থিতিশীল উন্নয়নের নৈতিকতা (Morality of Sustainable Development):

প্রতিটি সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ তথা নৈতিকতা রয়েছে। ঐ মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার দিকগুলি তাদের সংস্কৃতির পক্ষে অবশ্যই অর্থপূর্ণ, সুতরাং প্রতিটি সংস্কৃতিরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের (Sustainable Development) প্রেক্ষাপটে। এটি নিশ্চিত যে দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের জমি, জীবিকা, জীবন উন্নয়নের নাম করে নষ্ট করা যাবে না। উন্নয়নের নামে জমি, জীবিকা এবং জীবনের কোন ধরনের ক্ষতি আদিবাসী গোষ্ঠীর সমাজের পক্ষে অভিপ্রেত নয়। আদিবাসী সমাজ যেহেতু পরম্পরাগত (TEK) ভাবে পরিবেশগত জ্ঞানকে চর্চা করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ঐ জ্ঞান তুলে দেয়, তাই

আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন কমিশনে স্বীকার করা হয়েছে যে স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) এর প্রয়োজনে Indigenous Knowledge, এবং Indigenous People কে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

বিভিন্ন কমিশনের শ্বেতপত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে স্থিতিশীল বিকাশের (Sustainable Development) ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠী মানুষজনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যাবে না (International Convention on Biological Diversity, Agenda 21, Guiding Principles on Forests; and the Reo-declaration on Environment and Development)। দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের পরম্পরাগত জ্ঞান, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনাতে শ্বেতপত্র দাখিল হয়েছে (Battiste & James, 2000)।

দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদির কারণে একদিকে যেমন আদিবাসীদের জনজীবন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে অন্যদিকে তারা হারিয়ে ফেলছে তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের অধিকার, যেমন ভাষা, বৌদ্ধিক সম্পদ, এবং এর ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে জীব-বৈচিত্র্য পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং জীব-বৈচিত্র্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Nettle & Romaine, 2001)। পৃথিবীর ৬০% ভাষায় কথা বলে মাত্র ৪% মানুষ। এই সমস্ত অধিকাংশ ভাষা এবং ঐ ভাষাভাষী মানুষরা বর্তমানে সভ্যতার বিকাশ, শিল্পায়ন এবং দ্রুত হারে নগরায়নের ধাক্কায় প্রায় কোনঠাসা হয়ে পড়েছে অর্থাৎ, ‘Bio Linguistic Diversity’ আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। একটি ভাষার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য শব্দভাণ্ডারের চিরসমাধি। আর এই ভাষা ও তার শব্দভান্ডারের ধ্বংসের সাথে সাথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে মানুষের যোগাযোগ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হচ্ছে। ভাষা মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় শব্দভাণ্ডার, জ্ঞানভান্ডার, পরিবেশের সাথে মানুষের বোঝাপড়ার সম্পর্ক। সুতরাং আদিবাসী মানুষদের ভাষার মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে ঐ বিশেষ ভাষাভাষী মানব গোষ্ঠীর ধ্বংসকেই আসন্ন করে তোলে।

এই সামগ্রিক আলোচনা থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিল্পের প্রয়োজনে সম্পদকে প্রকৃতির কোল থেকে কেড়ে নিতে গিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষদের এবং তাদের সংস্কৃতিকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছি, তা বিশেষভাবে অনৈতিক

ও মানবিক মূল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান করে। বরঞ্চ নৈতিকতার বিচারে আমাদেরকে এই সমস্ত মানুষদেরকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে তারা তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, আচার-আচরণ, প্রথা ইত্যাদিকে সংরক্ষিত করে চলতে পারে। স্থিতিশীল বিকাশের প্রেক্ষাপটে এইটুকু বলা যায় যে বাস্তুতন্ত্র, আদিম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং ভাষা ইত্যাদি একটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিন্তু জটিল সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ। আর আমাদের করতে হবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধাভিত্তিক বাক্য বিনিময় যাতে বিশেষজ্ঞরা প্রবেশ করতে পারেন দেশীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং ভাষার গভীরে। অন্যথায় স্থিতিশীল উন্নয়ন হারাবে নীতিবোধ এবং মূল্যবোধ।

৬.৪ স্থিতিশীল উন্নয়নে বিরহড় আদিবাসীদের ভূমিকা (Roll of Birhor Tribe on Sustainable Development):

৬.৪.১ বিরহড়দের মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি:

বিরহড় সমাজের কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর মৃতদেহকে একটি নতুন সাদা কাপড়ে জড়িয়ে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। গোরস্থানে মৃতদেহ আকারের তুলনায় একটু বেশি লম্বা এবং চওড়ায় মাটি খোঁড়া হয়। এরপর মৃতদেহকে চারপাশে তিনবার ঘুরিয়ে উত্তরদিকে মাথা করে খোঁড়া গর্তে শুইয়ে দেওয়া হয়। এরপর সকলে মিলে মৃতদেহটিকে মাটি চাপা দেয়। বিরহড়দের মৃতদেহকে সৎকার যে পদ্ধতি তা পরিবেশ সহযোগী অর্থাৎ এই সৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে কোন রকম পরিবেশ দূষণ হয় না। মৃতদেহটি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া দ্বারা মাটির সাথে মিশ্রিত হয়, এর ফলে একদিকে যেমন মাটির উর্বরতাকে বাড়ায় সেইরুপ কোন রকম মাটি এবং বায়ুদূষণ হয় না। এই দিক থেকে বলা যেতে পারে বিরহড় আদিবাসীদের পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ যে তাঁরা মৃতদেহকে আগুনে জ্বালানোর পরিবর্তে কবর দেন, যেটি পরিবেশে স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের মৃতদেহ সৎকার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

৬.৪.২ আদিবাসীদের সারহুল এবং বাহা উৎসব (Sarhul And Baha Festival):

আদিবাসীদের বিভিন্ন উৎসব ও পরবের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল সারহুল এবং বাহা পরব। এই উৎসব বা পরবটি পালন করে আদিবাসী গোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুণ্ডা, বিরহড়, হো,

মাহালি, অসুর, প্রভৃতি গোষ্ঠী বর্গ। বিশেষত এই উৎসবটি পালন করা হয় ফাল্গুন মাসে, যখন শাল বনে শাল গাছে নতুন ফুলের আগমন ঘটে এবং মহুয়া গাছের মহুয়া ফুল দিয়ে গাছতলা ছেয়ে যায়। এছাড়া প্রায় সমস্ত গাছে নতুন পাতা গজায় এবং শাল ফুলের গন্ধে বন জঙ্গল ভরে ওঠে, তখন যেন মনে হয় যে প্রকৃতি দেবী ফুলের অলঙ্কারে সেজে আবির্ভূত হয়েছেন। এই সময় আদিবাসী গোষ্ঠীর পুরুষ, নারী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এবং শিশুরা আনন্দের সাথে এই উৎসব বা পরবে আদিবাসীদের প্রাচীন ঐতিহ্য বাদ্যযন্ত্র ধামসা, মাদলের তালে তালে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, প্রেম, তাঁদের নৃত্যের দ্বারা বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এভাবে জল, জঙ্গল, গাছপালা, নদী, পাহাড়কে পূজার মাধ্যমে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছেন।

৬.৪.৩ বিরহড়দের বাদ্যযন্ত্র (Musical Instrument of Birhors):

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উৎসবে তাঁদের নিজস্ব বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করছেন যেমন -'ধামসা', 'মাদল', 'বানাম', 'কাঁসর' বা 'ট্যায়ং', বাঁশের তৈরি বাঁশি, মোষের বা গরুর শিং এর তৈরি একধরণের বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। আদিবাসী খেরওয়াল গোষ্ঠীর মানুষজন যেমন সাঁওতাল, বিরহড়, হো, মুণ্ডা, অসুর, মাহালি, ভীল, কোড়া প্রভৃতি বহু প্রাচীনযুগে পূর্ব ও মধ্য ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলে এই সকল বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। এই বাদ্যযন্ত্রগুলি আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক উৎসব, অনুষ্ঠান, বিবাহ ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়।

আদিবাসীদের এই বাদ্যযন্ত্রে কোন রকম দূষিত পদার্থ অর্থাৎ উপকরণ ব্যবহার করা হয় না, এই বাদ্যযন্ত্রগুলি কোন রকম শব্দ দূষণ করে না, কোন ভাবে কোন ব্যক্তির হৃদরোগের কারণ হয় না, বহু প্রাচীন কাল থেকে আদিবাসীরা এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কারণে কোন রূপ পরিবেশ দূষণ হয় নি। তাই আদিবাসীরা তাঁদের এই পরম্পরাগত ঐতিহ্যপূর্ণ বাদ্য যন্ত্র বংশ পরম্পরায় বহন করে চলেছেন। পরিবেশকে ও মানব সমাজকে রক্ষার জন্য আদিবাসীদের এই বাদ্যযন্ত্র সাংস্কৃতিক স্থিতিশীল উন্নয়নে সহায়ক।

৬.২.২.৪ জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ (Collecting Wood from Forest):

ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের একটি অংশ পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের ঢালে ও পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চলে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের জীবন

নির্বাহের জন্য জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে নিকটবর্তী বাজারে বিক্রয় করেন। বিরহড়দের জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ এবং বিক্রি করা তাঁদের প্রধান অর্থনীতি। তাঁরা ঘন জঙ্গলে যে সমস্ত গাছগুলি মরে গিয়ে শুকিয়ে গেছে বা অর্ধ শুকনো এবং যে গাছের শুকনো শাখাপ্রশাখা বা ঝাঁটিপাটি রয়েছে সেই ডালগুলিকেই কাটেন এবং বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যান। এছাড়াও জ্বালানি হিসাবে শুকনো ঝাঁটিপাটিগুলি সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এছাড়াও শুকনো পাতা ব্যবহার না করার বিশেষ কারণ হল- বছরের একটি বিশেষ ঋতুতে গাছের সমস্ত শুকনো পাতাগুলি ঝরে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর বর্ষার জলে শুকনো পাতাগুলি ভিজে পচে জৈব সারে রূপান্তরিত হয়, এবং মাটি উর্বর হয়। ঐ মাটিতে জঙ্গলের গাছের বীজ পড়ে নতুন গাছের জন্ম হয় ও বিভিন্ন ছোট ছোট প্রাণীর ও পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল গড়ে ওঠে। এই ভাবে জঙ্গলে স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের প্রক্রিয়া বজায় থাকে। বিরহড়রা কখনই জঙ্গলের জীবন্ত গাছকে কেটে বনজঙ্গলকে ধ্বংস করেন না। দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার জন্য ও জীবন নির্বাহের জন্য যেটুকু জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করলে তাঁদের জীবন-যাপন চলবে সেই টুকুই জঙ্গল থেকে তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করেন।

৬.২.২.৫ মধু সংগ্রহ (Honey Collection):

পশ্চিমবঙ্গে অরণ্য কন্যা পুরুলিয়া জেলার বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের মধু সংগ্রহ পদ্ধতি পরিবেশ ও প্রকৃতির স্থিতিশীল উন্নয়নে ঐতিহ্যগত পরম্পরা রক্ষা করছেন। বিরহড়রা বংশ পরম্পরায় সুউচ্চ পাহাড় এবং জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করেন।

বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের মধু সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। বিরহড়রা তীরের সামনের ভাগ খোলা থাকে এবং পিছনের ভাগে সুতির বা লাইলন সুতো দিয়ে বাঁধে। এরপর মধু সংগ্রহের জন্য মৌচাকের স্থানে পৌঁছায় এবং দীর্ঘ গাছে বা পাহাড়ের টিলাতে অবস্থিত মৌচাকে ধোঁয়া না দিয়েই ধনুক দিয়ে তীর মারে মৌচাকের কেন্দ্র বিন্দুতে। তীরের পেছনে বাঁধা সুতো নিচ পর্যন্ত থাকে এবং বিরহড়রা ঐ সুতোর নীচে কোন একটি পাত্র রেখে দেয়। এরপর মৌচাক থেকে মধু একটু একটু করে ঐ তীরের গা দিয়ে ও সুতোর মধ্যদিয়ে নীচে রাখা পাত্রে জমা হয়। এতে বিরহড়দের মধু সংগ্রহ হয়ে যায় তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী। অপর দিকে কোন মৌমাছিকে মারার প্রয়োজন হয় না এবং মৌচাককে একেবারে ভাঙার প্রয়োজন

হয় না। এরফলে বিরহড়রা বহুদিন ধরে এই ভাবে একটি মৌচাক থেকে মধু পেয়ে থাকে এবং মৌমাছিরা জীবন্ত থাকে ফলে আগুন, ধোঁয়া না দেওয়ায় পরিবেশ দূষণও হয় না। তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বিহড়রা পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে সহযোগিতা করেন এবং তাঁদের যে টুকু প্রয়োজন সেই টুকু তাঁরা জঙ্গল থেকে ও প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করেন।

৬.৪.৬ দড়ি তৈরি (Rope Making):

বিরহড়দের প্রধান কাজগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দড়ি তৈরি করা। বিরহড়রা গভীর জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে 'চিহরলতা' গাছ থেকে চিহরলতার তন্তু বা গাছের ছাল কেটে সংগ্রহ করেন। চিহরলতা গাছের ছাল সংগ্রহের সময় বিরহড়রা কখনই সম্পূর্ণ গাছকে কেটে গাছের ছাল বা চিহরলতা তন্তু সংগ্রহ করেন না। মূল গাছের যে সমস্ত লতানো শাখা প্রশাখা রয়েছে সেই গুলি কাটেন। এই ভাবে বিরহড়দের দড়ি তৈরির জন্য জঙ্গল থেকে প্রকৃতিকে ও প্রাকৃতিক সম্পদকে একে বারে শেষ না করে তাঁরা চিহরলতা সংগ্রহ করার মধ্যে দিয়ে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন দড়ি তৈরির জন্য সেটি স্থিতিশীল উন্নয়নের বিশেষ উদাহরণ। কারণ চিহরলতার মূল গাছটি কখনও কাটা না হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় বিরহড়রা বহু বছর ধরে 'চিহরলতা' সংগ্রহ করতে পারেন।

বর্তমানে গভীর জঙ্গলে বিরহড়দেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না অর্থাৎ ফরেস্ট অফিসাররা কোন অনুমতি না দেওয়ায় এবং সামনের জঙ্গলে 'চিহরলতা' আর ভালো না পাওয়ায় চিহরলতার দড়ি তৈরি অনেক কমে গেছে। বর্তমানে বিরহড়রা তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা বৃদ্ধির জন্য পড়ে থাকা সিমেন্টের বস্তা থেকে প্লাস্টিক সুতো বার করেন, এবং ঐ সুতো দিয়ে দড়ি তৈরি করেন। এটি স্থিতিশীল উন্নয়নের একটা বিশেষ ব্যবস্থা। বর্তমানে বিভিন্ন আধুনিক পাকাবাড়ি, ঢালাই রাস্তা, ইত্যাদি নির্মাণকার্যে সিমেন্ট ব্যবহারের পর প্লাস্টিক সিমেন্টের বস্তা বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে যেমন-রাস্তা, নদী, খাল-বিল, চাষযোগ্য ভূমি ইত্যাদিতে। সেখানে জল দূষণ, মাটি দূষণ এবং বস্তাগুলি জ্বালানোর পর বায়ু দূষণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় ও প্রকৃতির ক্ষতি হয়। বিরহড়রা তাঁদের পরম্পরাগত চিন্তাভাবনা এবং পরিবেশকে রক্ষার স্বার্থে সিমেন্টের বস্তাগুলি সংগ্রহ করেন। ফলে ঐ বস্তাগুলি থেকে একটা একটা করে সিমেন্ট

বস্তার প্লাস্টিক সুতো বের করেন এবং তাঁদের প্রাচীন পদ্ধতির মাধ্যমে প্লাস্টিক সুতোগুলিকে পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি তৈরি করেন।

৬.২.২.৭ হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া (Handi or Haria):

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী গোষ্ঠী মানুষদের বসবাস। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষদের জীবন যাপন, সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি ভিন্ন। অনেকগুলি আদিবাসী গোষ্ঠীতে প্রাচীন পরম্পরার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরম্পরাগত বিষয় রয়েছে যেটি আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতিতে ব্যবহার হয় সেটি হল 'হাণ্ডি'। 'হাণ্ডি' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'হাঁড়িয়া'। এই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' খাদ্য বস্তুটি আদিবাসীদের বহু প্রাচীন একটি পরম্পরাগত পানীয়, যেখানে আদিবাসীদের জন্ম থেকে শুরু করে বিবাহ, পরব, উৎসব-অনুষ্ঠান, জাগরণ, আদিবাসী পাতা পরব, কেউ মারা গেলে, বাড়িতে কোন আত্মীয় এলে, প্রকৃতির পূজা এবং বিভিন্ন পূজার স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া ব্যবহার করা হয়। সুতরাং 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' তৈরির জন্য আদিবাসীরা বিশেষ পদ্ধতি এবং স্থিতিশীল প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করেন। তাই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' তৈরির জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলি হল- একটি পোড়া মাটির হাঁড়ি ও ঢাকা দেওয়ার জন্য মাটির তৈরি সরা বা ঢাকনা, চাল, জল, ভেষজ গাছগাছড়া থেকে তৈরি রান বা রানু ইত্যাদি।

তবে এই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' যেহেতু ভেষজ গাছগাছড়া ও চাল দিয়ে তৈরি তাই এটি পান করলে শরীর ঠাণ্ডা এবং বিভিন্ন প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাই আদিবাসীরা গ্রীষ্ম কালে যখন চাষ হতনা তখন গরমের সময় তাঁরা এই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' বেশি পান করতেন। অপরদিকে বর্ষার সময়ে চাষ হত এবং শীতকালে হাঁড়িয়া পান কম করতেন। এই ভাবে আদিবাসীদের জীবন নির্বাহের জন্য 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়ার' ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই যুগ যুগ ধরে আদিবাসীদের বিভিন্ন পালাপার্বণ, উৎসব, অনুষ্ঠান, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজার স্থান ইত্যাদি সমস্ত স্থানে 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া'র ব্যবহার সর্বত্র। বহু বছর ধরে আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রেখে ছিল এই পানীয় খাদ্য।

এই 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া' স্থিতিশীল উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে, সেটি হল- গবেষক উপলব্ধি করেন যে 'হাণ্ডি' তৈরি হয় প্রাকৃতিক শস্য চাল এবং প্রায় ১৫-২০ টির বেশি ভেষজ

গাছগাছড়া দিয়ে, যেটি বিভিন্ন রোগনিরাময়ের বিশেষ উপাদান। যখন 'হাণ্ডি' বা 'হাঁড়িয়া'র অবশিষ্ট ভাতের অংশটি মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় ও কোন গাছের গোড়ায় দেওয়া হয় তখন সেটি মাটির সাথে মিশে গিয়ে জৈব সারে পরিণত হয় এবং মাটির গুনাগুন অনেকাংশে বেড়ে যায়, কারণ তার মধ্যে ১৫ থেকে ২০ ধরনের ভেষজ ওষধি গাছের শেকড়, কাণ্ড, বীজ, ফল ইত্যাদি আছে। এছাড়াও 'হাণ্ডি'র বাকি অংশ ভাতটি পুকুরের জলে ফেলা হয়, ফলে পুকুরের যত ছোট উদ্ভিদ, ছোট প্রাণী রয়েছে তাদের বিকাশ হয় কারণ পুকুরের মাটি উর্বর হয় এবং পুকুরের বাস্তুতন্ত্র স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলে। এছাড়া প্রকৃতির কোন ক্ষতি হয়না এবং মানুষেরও কোন ক্ষতি হয়না।

তবে বর্তমানে হাণ্ডি বা হাঁড়িয়ার ব্যবহার সিমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন রয়েছে। একটা সময় এই হাণ্ডি বা হাঁড়িয়া আদিবাসীদের বাঁচিয়ে রাখার ও জীবনের স্থিতিশীল উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে। কিন্তু বর্তমানে নিয়ন্ত্রনহীন ব্যবহারে আদিবাসী যুবক সমাজ উন্নয়নের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরছে। যেমন- জল আমাদের জীবন দেয় কিন্তু সেই একই জল বন্যার রূপ নিলে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত ধ্বংস হয়।

সপ্তম অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল এবং আলোচনা (The Findings and Discussion)

৭.১ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল (The Findings in Research):

গবেষক গুণগত মান ভিত্তিক গবেষণা থেকে যে ফলাফলগুলি প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলি হল-

১) বিরহড়রা প্রথম ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত পালামৌ এবং হাজারীবাগ অঞ্চলকে এদের আদিম বসবাসের স্থান হিসেবে গ্রাহ্য করে।

২) প্রকৃতিগত ভাবে বন্য স্বভাবের হলেও এরা অন্য কোনো জাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

৩) উচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের শিরাগুলিতে এবং পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে এরা বাস করতে পচ্ছন্দ করে, যদিও পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ের উচ্চ এলাকা থেকে এদেরকে নামিয়ে এনে পাহাড়ের পাদদেশে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

৪) শিক্ষার দিক থেকে বিরহড় ছেলে মেয়েরা খুব কম সংখ্যকই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছেন। একটি মাত্র গ্রামে দুইটি মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন। এবং একটি মেয়ে নিকটবর্তী ঝাড়খণ্ডের কলেজে B.A পড়ছেন।

৫) বিরহড়দের নিকটবর্তী লোকালয়ে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। তাই প্রাথমিক স্তরেই বিরহড় ছাত্র–ছাত্রীরা স্কুলছুট হয়ে যায়।

৬) কোন বিরহড় গ্রামেই প্রথাবহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি হয়নি।

৭) মহিলা মঙ্গল সমিতিও কোনো বিরহড় গ্রামে তৈরি হয়নি। এবিষয়ে সরকারী বা বেসরকারি ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগও চোখে পড়েনি।

৮) সমস্ত বিরহড় গ্রামেই বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাও স্কুলে যেতে অনাগ্রহী যদিও স্কুলে মধ্যাহ্নকালীন আহার পাওয়া যায়।

৯) বাবা মায়ের দূরদর্শিতার অভাব, চরম দারিদ্র্য, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদির কারণে অভিভাবকরাও ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য সক্রিয় হতে পারেন না।

১০) কোনো বিরহড় গ্রামেই যুবক-যুবতী বা বয়স্কদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

১১) ২০২৫ সালে বাঘমুণ্ডি ব্লকের অধীনে প্রথম বার মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন একসাথে চারজন বিরহড় মেয়ে।

১২) বিরহড়রা প্রকৃতিগতভাবে লাজুক স্বভাবের, তাই বাইরের লোকজনের সামনে মুখ ঢেকে রাখতে পছন্দ করেন।

১৩) বিরহড়দের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। এরা নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। কোনো অবস্থাতেই নিজস্ব সমাজ এবং সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হওয়া এরা পছন্দ করেন না।

১৪) বিরহড়রা তাঁদের নিজস্ব ‘বিরহড়’ ভাষায় কথা বলেন। বিরহড় ভাষার সঙ্গে সাঁওতাল, হো ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিরহড় ভাষা খেরওয়াল ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

১৫) বিরহড়দের মোটামুটি পাঁচ ধরনের বিবাহ রয়েছে।

১৬) বিরহড়দের বিবাহ পদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে মিললেও কিছুটা ক্ষেত্রে এদের বিবাহ পদ্ধতি পৃথক।

১৭) বিবাহের পূর্বে বিবাহ যোগ্য পুরুষরা 'টাণ্ডা' বা পাড়ার বাইরে সামান্য দূরত্বে একটি ঘরে ঘুমায়। একইভাবে বিবাহের পূর্বে বিবাহ যোগ্যা মেয়েরা টাণ্ডা থেকে সামান্য দূরত্বে একটি ঘরে ঘুমায় এবং মেয়েদের সঙ্গে থাকে একজন বিধবা বৃদ্ধা।

১৮) বিভিন্ন টাণ্ডাতে বসবাসকারী বিরহড়দের সামাজিক জীবনের প্রথা এবং ধর্মীয় রীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

১৯) শিকারের ক্ষেত্রে এরা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে যা অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় না। দলবদ্ধ শিকারে যা পাওয়া যায় তা 'টাণ্ডার' প্রতিটি পরিবারের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়।

২০) বিরহড়দের পাঁচ প্রকারের উৎসব রয়েছে যেমন- বাহা, করম, সারহুল, সেন্দ্রা অর্থাৎ শিকার উৎসব, সহরায় প্রভৃতি।

২১) সারহুল এবং বাহা উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিরহড় নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতীরা সকলেই জল, জঙ্গল, গাছপালা, নদী, পাহাড়কে পূজা করে এবং এর মাধ্যমে পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখে।

২২) টামাক বা ধামসা, তুমদা বা মাদল, ট্যাঁয়ং বা কাঁসর, বানাম বা একতারা, তিরীও বা বাঁশের তৈরি বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এরা ব্যবহার করে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান কালে গান, বাজনা ও নাচের সঙ্গে। এই যন্ত্রগুলি এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে এবং দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে তৈরি হয় যে, যন্ত্র তৈরির উপাদানগুলি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে প্রকৃতিকে বিষাক্ত করে তুলবে না। এমনকি এই সকল বাদ্যযন্ত্রের শব্দ মানুষ বা প্রাণীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনো ভাবেই ক্ষতিকারক নয়।

২৩) সমস্ত বিরহড় গ্রামেই সরকারী অর্থে বিশেষ ভাবে বিরহড়দের ব্যবহারের জন্য নিজস্ব সম্প্রদায় হল (Community Hall) রয়েছে।

২৪) প্রায় বেশীরভাগ বিরহড় গ্রামের পুরুষ এবং মহিলারা তাদের দেশীয় পানীয় খাদ্য হাঁড়িয়া পান করেন, তাঁদের প্রায় সমস্ত উৎসব, অনুষ্ঠানে হাঁড়িয়া খাওয়া এঁদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এছাড়া মহুল বা মহুয়া ফুল রান্না করে তরকারী হিসাবে খান।

২৫) বিরহড়রা নিজস্ব বিরহড় সমাজেই বিয়ে করেন। বিয়ে করার জন্য ছেলে বা মেয়ে না পাওয়া গেলেও এরা অন্য আদিবাসী বা অ-আদিবাসীকে বিয়ে করেন না। বিরহড় সমাজের বাইরে কাউকে বিয়ে করলে পরিবার/ছেলে/মেয়েকে জরিমানা হিসাবে সমাজকে দিতে হয় তিনটি মোরগ, ছাগল এবং ৪-৫ হাজার টাকা।

২৬) এখনো পর্যন্ত এরা চাষের কাজে বিশেষ আগ্রহী নয়।

২৭) এখনো এরা অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করতে পচ্ছন্দ করেন।

২৮) বিরহড়রা জীবিকা হিসাবে জঙ্গল থেকে বিভিন্ন বনজ সম্পদ যেমন- শালপাতা, চিহরলতা, জ্বালানি কাঠ, মধু এবং মোম সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। অনেক ক্ষেত্রে বানর ধরে তাকে পোষ মানান এবং লোকালয়ে বানরের খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করেন।

২৯) সমস্ত বিরহড় পরিবারই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। জঙ্গল থেকে যে বনজ সম্পদ বিরহড়রা সংগ্রহ করেন তা তাঁদের পেট ভরানোর পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় এঁরা অন্যের জমিতে দৈনিক মজুর এবং বাড়ি তৈরির কাজে দৈনিক মজুর হিসাবে কাজ করেন।

৩০) চূড়ান্ত দারিদ্র্যের কারণে বিরহড়দের পরিবারে প্রায় কোনো আসবাবপত্রই নেই। রান্না খাওয়ার জন্য এ্যালুমনিয়ম, স্টিল, কাঁসার, ও লোহার তৈরি থালা-বাসন, কড়া, খুন্তি, চাটু ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া টিনের কিছু উপকরণমাত্র রয়েছে।

৩১) অর্থের অভাবে কোনো কোনো গ্রামে বিবাহ যোগ্য বিরহড় যুবকরা বিয়ে করতে পারেনি। ফলে ডাকাই গ্রামে বিরহড়দের পরিবার সংখ্যা এবং জনসংখ্যা দ্রুতহারে হ্রাস পেয়েছে।

৩২) প্রায় সমস্ত বিরহড় পরিবারেই গবাদি পশু রয়েছে। আর্থিক প্রয়োজনে পরিবারগুলি এই গবাদি পশুকে বিক্রি করে দৈনন্দিন সংসার চালান।

৩৩) পুরুলিয়া জেলায় প্রতিটি বিরহড় গ্রামেই দ্রুততার সাথে ক্রমশ বিরহড় জনসংখ্যা কমছে।

৩৪) অনেক বিরহড় ছেলে গ্রামে এবং স্থানীয় অঞ্চলে উপযুক্ত কাজ না পাওয়ার কারণে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

৩৫) বিরহড়দের মধ্যে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এরা তাঁদের প্রাচীন জ্ঞানকে আজও শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলে যা তাদের স্থিতিশীল উন্নয়নের সহায়ক। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে বিরহড় সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা তাদের দেশীয় জ্ঞানকে আজও ব্যবহার করে চলেছে। যেমন-

ক) বিভিন্ন প্রজাতির গাছ এবং প্রাণীকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনে এরা বনাঞ্চলের মধ্যে নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান চিহ্নিত করে যেখানে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যবধি কোনো মানুষের স্পর্শ পড়েনি। এর মধ্যে দিয়ে তারা স্থিতিশীল উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করছে।

খ) বিরহড়রা গভীর জঙ্গলে বসবাস করে এবং জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো ওষধি গাছকে ব্যবহার করে এরা নিজেদের এবং টাণ্ডার সমস্ত মানুষদের চিকিৎসা করে। এই ওষধি গাছগুলি রোগীর শরীরের উপর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া করে না। এছাড়াও এরা জঙ্গল থেকে যখন ওষধি গাছ সংগ্রহ করে তখন একটি এলাকার সমস্ত গাছ এরা তুলে নেয় না। স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে এরা কিছু গাছ সংগ্রহ করে মাত্র। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কোনো ওষধি গাছের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হবে এমন অংশ টুকু মাত্র সংগ্রহ করে। এতে করে কোনো এলাকায় ওষধি গাছের অভাব হয় না।

৩৬) লক্ষণীয় যে বিরহড়রা কখনই জঙ্গল থেকে কাঁচা বা জীবন্ত গাছ কাটেন না। জঙ্গলে যে গাছগুলি শুকিয়ে গেছে সেইগুলি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাছের সরু শাখা প্রশাখা সংগ্রহ করেন এবং জ্বালানি হিসাবে বাজারে বিক্রি করেন।

৩৭) স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বিরহড় আদিবাসী মানুষরা মৃতদেহকে সৎকার করেন নির্দিষ্ট স্থানে সমাধি দিয়ে। কারণ এরা মনে করেন যে মৃতদেহকে দাহ করলে পরিবেশ দূষিত হবে।

৩৮) বিরহড় মহিলারা হাত, হাঁটু এবং বুকে ট্যাটু করে, কিন্তু কখনই মুখে ট্যাটু করে না।

৩৯) এরা নিজেদেরকে হিন্দু বা সিন্ধু বলে পরিচয় দেন। এরা প্রকৃতিকে মানেন। মারাংবুরু, জাহের আয়ঃ, সিং বোঙ্গা এবং বিভিন্ন দেব-দেবী ও ঈশ্বরকে পূজা করেন। এছাড়া ভূত-প্রেত,

মহামায়া প্রভৃতি অশুভ শক্তির অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন। বহু পূর্বে বিরহড়দের ঘরগুলি ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন- ৮-১০ ফুট লম্বা, ৬ ফুট চওড়া, ৬ ফুট উচ্চতা, দরজার উচ্চতা ২ ফুট এবং প্রস্থ ১.৫ ফুট।

৪০) বিরহড়দের পূজার নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে যা অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে খাপ খায় না। এদের পূজার জন্য একটি নির্দিষ্ট পবিত্র স্থান থাকে – অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

৪১) বিরহড়দের পূজার পবিত্র স্থানকে জাহের থান বা জিলু জাহের বলে। তাঁরা মনে করেন সেন্দ্রা বোঙ্গা এই পবিত্র স্থানে বাস করেন। তাই শিকারে যাওয়ার পূর্বে শিকারের জাল এবং অস্ত্রকে এই স্থানে রাখে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে মোরগ উৎসর্গ করে।

৪২) সাধারণত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তাদের গোত্র স্থির হয়। বিরহড়দের গোত্র লিঙ্গ ভিত্তিক নয়।

৪৩) মৃত্যুর পর বিরহড়রা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী, এরা আত্মার লিঙ্গভেদ মানে। এদের মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতিও অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় পৃথক। মৃতদেহকে তারা দাহ করে না, তারা কবর বা সমাধি দেয়।

৪৪) পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী বিরহড়রা প্রায় সকলেই স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। গর্ভবতী মহিলারা স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সন্তান প্রসব করেন।

৪৫) বিরহড়দের সাপে কামড়ালে তারা ওঝা বা গুনিনের কাছে না গিয়ে সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

৪৬) পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী বিরহড়দের কারুরই নিজস্ব কোনো চাষযোগ্য জমি বা বসবাসের জমি নেই। সরকার থেকে দেওয়া খাস জমিতেই এদের জন্য পরিবার পিছু দুই কামরার বাড়ি সরকার থেকে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সরকারী পুনর্বাসন প্রাপ্ত বিরহড়রা যে এলাকায় থাকেন সেখানে পানীয় এবং স্নানের জলের খুবই অভাব রয়েছে। বসবাসের জমি অত্যন্ত রুক্ষ এবং পাথুরে, তাই সামান্য কিছু সব্জি চাষও অসম্ভব।

৪৭) রাজনীতির সঙ্গে বিরহড় যুবক-যুবতীরা কোনো ভাবেই যুক্ত নয়। রাজনীতি বিষয়ে এদের কোনো আগ্রহ নেই।

৪৮) পুরুলিয়া জেলায় প্রাপ্ত বয়স্ক বিরহড় আদিবাসীদের ভোটার কার্ড থাকলেও এদের বেশির ভাগ জনের আধার কার্ড, রেশন কার্ড, জব কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, এস টি শংসাপত্র নেই। কিছু জনের এই বিষয়ে আগ্রহ নেই, তবে বেশির ভাগ বিরহড়রা স্থানীয় সদস্য এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন।

৪৯) বিরহড় আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মহিলা ব্যাতিরেকে বেশিরভাগ মহিলারা 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এবং 'বিধবা ভাতা' পান না।

৫০) সরকার থেকে বিরহড়দের বাড়ি করে দিলেও তারা নিজেদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার পরিছন্ন রাখে না। কারণ ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা এরা এখনো বোঝে না।

৫১) বেড়সা গ্রামে পাহাড়ের ঢালে বিরহড়রা বসবাস করেন, যেখানে বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরই জলের কষ্ট। তাই সরকার থেকে সৌর চালিত সাবমারসাল জলের ট্যাঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে। ডাকাই গ্রামে পঞ্চায়েত থেকে একটি নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যদিও কয়েক দিনের মধ্যেই নলকূপটি নষ্ট হয়ে যায়। পঞ্চায়েত বা সরকার থেকে বহুবার বলা সত্ত্বেও নলকূপটিকে ঠিক করা হয়নি। ফলে শীত এবং গ্রীষ্ম কালে পাহাড় থেকে চুঁইয়ে আসা জল সংগ্রহ করে এদের পানীয়, এবং রান্নার কাজ চলেছে।

৭.২ আলোচনা (Discussion):

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আদিবাসী বা অনার্যদের আমরা দেখতে পাই। এই আদিবাসীরা ভারতীয় সংবিধানে ৩৩৬(২৫) নং ধারায় এবং ৩৪২ (১) নং ধারায় তপশীলি উপজাতি হিসাবে আলোচিত হয়েছেন। এরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিছিন্ন, প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এমনকি ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অসমর্থ।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তপশীলি উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য সংবিধানের ১৫, ১৬ (৪),

৩২০ (৪), ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ১৯ (৫), ৪৬, ৩৪২, ৩৩৯ (২), ১৬৪, ৩৩৮, ২২৪ এবং ২৭৫ (১) নং ধারায় আদিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করেছেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার কাকা কার্লেকার- এর নেতৃত্বে 'Backward Classes Commission' (1953-55) স্থাপন করেন এবং কমিশনকে দায়িত্বদেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি জানার এবং কীভাবে সমস্যা সমূহের সমাধান সম্ভব তার রূপরেখা তৈরি করার। ভারত সরকার পুনরায় ১৯৫৪-১৯৫৯ সালে গঠন করেন 'The Study Team of Social Welfare of Backward Classes'. এর নেতৃত্বে ছিলেন রেনুকা রায়। উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক উন্নয়ন সাধন। প্রথম Backward Classess Commission (১৯৫৩-১৯৫৫) গঠিত হওয়ার প্রায় চব্বিশ বছর পর B. P. Mondal -এর নেতৃত্বে ভারত সরকার গঠন করেন Second Backward Classess Commission (১৯৭৯-১৯৮০)। সুতরাং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। বিভিন্ন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

আদিবাসী সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে জানলেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্যাকে অনুধাবন করা সম্ভব। গুহ এবং ইসমাইল (২০১৫) এর গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমান গবেষকও বিরহড় সম্প্রদায়ের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ সময় বাস করে এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করে। বর্তমান গবেষক লক্ষ্য করেছেন যে বিরহড় আদিবাসীরা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির এবং নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতির বাইরে বের হতে পারে না। সরেন (২০১৩) লক্ষ্য করেছেন যে, আদিবাসী যুবক-যুবতীরা নিজ এলাকায় অর্থ উপার্জনের সুযোগ না পাওয়ায় বাধ্য হন পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতে কাজ করতে যেতে। এখনো উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে কর্মরত সমস্ত শ্রমিকই আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং তারা দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। বর্তমান গবেষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্য পেয়েছেন তার থেকে জানা গেছে যে, বিরহড় সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীরা অল্প ক্ষেত্রে হলেও পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দক্ষিণ ভারতে কাজে গিয়েছেন। পরিযায়ী প্রকৃতির কারণে এরা নিজ সমাজে

বসবাস করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ফলে নিজস্ব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংস্কৃতিতে যুক্ত থাকতে পারেন না।

বাইরের অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের বেশভূষা, আদবকায়দা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনচর্চা প্রভৃতির প্রভাব পড়ে এদের উপর। চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে এরা জঙ্গল থেকে ওষধি গাছ সংগ্রহের সুযোগ পান না। ফলে আধুনিক আলোপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ নিতে এরা বাধ্য হয়। এর ফলশ্রুতিতে এদের অনভ্যস্ত শরীরে আলোপ্যাথি চিকিৎসার যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে তাতে এদের মৃত্যুও ঘটছে। সুতরাং চিরাচরিত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বিরহড়রা মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে খুব ভালো নেই একথা বলা যায়।

বিরহড় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার আলোক আজও প্রায় পৌঁছায়নি। বর্তমান গবেষক পুরুলিয়া জেলার সমস্ত বিরহড়দের গ্রাম ঘুরে একটি মাত্র মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন যে ঝাড়খণ্ডের একটি কলেজে হিন্দীকে প্রধান বিষয় নিয়ে স্নাতক স্তরে পাঠরত। বাঘমুণ্ডি ব্লকের অধীনে ভূপতিপল্লী এবং বাড়েরিয়া গ্রাম থেকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে বিরহড় গোষ্ঠীর চারজন মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেছে। বহুধরণের সমস্যার মধ্যে থেকেও বিরহড় মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি আদিবাসী সমাজকে উদ্দীপিত করেছে। ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষার পরে অর্থ উপার্জনের জন্য তারা আর লেখাপড়া করে না। পরিবারের বড়দের সঙ্গে জঙ্গলে যায় বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে। মেয়েরা ছোট সংসারের দায়িত্ব নেয়। প্রাথমিক স্তরে মাত্র ২৮% শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ঘোষ (২০১৮) এর গবেষণা বর্তমান গবেষকের গবেষণাকে মেনে নিচ্ছে। ভারত সরকারের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের ১৭.০৯.২০১৯ তারিখ এর অর্ডার (নং F.No. 11011/01/2019-EMRS/PVTG) অনুসারে (যা ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষ থেকে কার্যকর হয়েছে) সমস্ত Particular Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) এর শিশুরা SSA/RMSA এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নোলিখিত সুযোগ সুবিধা সমূহ পাবে-

ক) PVTGs দলের সমস্ত মানুষের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিদ্যালয়গামী বয়সের সমস্ত শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) অকালে স্কুলছুট হবার হারকে দ্রুত যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে।

গ) PVTGs দের বাসস্থানের নিকটে SSA/RMSA থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও এদের জন্য (বর্তমান গবেষণায় বিরহড় শিক্ষার্থীদের জন্য) আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) বিরহড়দের এলাকাগুলিতে ঘন ঘন জন সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করে সমস্ত বিরহড় শিশুকে বিদ্যালয় মুখী করতে হবে ; বিদ্যালয়ে তাঁদের নিয়মিত উপস্থিতিকে নিশ্চিত করতে হবে এবং স্কুলছুট হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে নির্মূল করতে হবে।

ঙ) স্থানীয় এলাকার শিক্ষিত মানুষদেরকে এদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ দিতে হবে। এর জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পৃথক প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন তাঁদের জন্য পৃথক আর্থিক বা অন্যান্য ধরনের পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) এদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো গত উন্নয়ন করতে হবে।

ছ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার, যথেষ্ট জলের ব্যবস্থা (শৌচাগারে), উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জ) পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম এবং দশম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর মুখে বিরহড় এবং অন্যান্য PVTGs রা যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয় সেগুলির অপসারণ করতে হবে এবং এদের জন্য পৃথক কোচিং ক্লাস এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) স্থানীয় মানুষদের চাহিদা এবং আদিবাসীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির প্রতি শ্রদ্ধাজানিয়ে ঐ সমস্তগুলিতে বিদ্যালয়ে ছুটি দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিতে পারে। বিদ্যালয়গুলিকেও ঐ অনুষ্ঠানগুলিতে যুক্ত করা যেতে পারে।

ঞ) স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ট) স্থানীয় ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আদিবাসীদের ভাষাকে সম্মান জানিয়ে ঐ সমস্ত ভাষার ব্যবহার এবং উন্নয়নের সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঠ) আবাসিক এবং অনাবাসিক সমস্ত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ড) শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পুরনের জন্য বিদ্যালয়ে সব্জি চাষ করতে হবে। এই কাজে শিক্ষার্থীদের ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে সব্জি চাষের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির পাঠ পাবে।

পুরুলিয়া জেলার বিরহড় সম্প্রদায়ের কোনো গ্রামেই প্রথা বহির্ভূত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র নেই। স্বাভাবিক ভাবে বয়স্ক বিরহড় সদস্যদের এমনকি স্কুলছুট যুবক-যুবতীদের জন্য সাক্ষরতার এবং সাক্ষরতা পরবর্তী পাঠগ্রহনের কোনো ব্যবস্থা আজও হয়নি।

বিরহড় গোষ্ঠীর কোনো গ্রামেই 'মহিলা মঙ্গল সমিতি' নেই। অন্যান্য আদিবাসী মহিলারা 'Self-Help Group' এর সদস্য হলেও বিরহড় মহিলারা এই দলের সদস্য নন। স্বাভাবিক ভাবে বিরহড় মহিলারা বনজ সম্পদ সংগ্রহের বাইরে কোনো অর্থ উপার্জনের পথ জানেন না। বিরহড় মেয়ে এবং মহিলাদের উন্নয়নের জন্য তাই 'Self-Help Group' এবং 'মহিলা মঙ্গল সমিতিতে' এদের যুক্ত করা আশু প্রয়োজন।

ভারত তথা বহির্বিশ্বের সমস্ত আদিবাসী সমাজ-পাহাড়-জঙ্গল-ঝর্ণা-নদী ভিত্তিক জীবন আজও পছন্দ করেন। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাহিত পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞানকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন, এই জ্ঞান সঞ্জাত জীবন যাপন তাঁদেরকে দেখিয়েছে স্থিতিশীল উন্নয়নের দিশা। প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত অপূর্ব ভাণ্ডারকে নষ্ট না করেও যে প্রকৃতির সম্পদের উপর নির্ভরশীল থেকে জীবন যাপন করা যায়, প্রকৃতিকে তার নিজস্ব সম্পদে মহিমান্বিত করে রাখা যায় তার প্রমান পাই আদিবাসীদের জীবন চর্চায়। আদিবাসী গোষ্ঠীর 'harmonious relationship between human nature universe and notions of equality and complementarity' তে (Ibanez, 2010; Gudynas, 2011b). সুস্থ থাকার মৌলিক শর্তগুলি হল – পুষ্টিকর খাদ্য এবং পানযোগ্য পানীয় জলের ছেদহীন যোগান, বাসস্থান, পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসা যুক্ত পরিবার এবং প্রতিবেশীদের মধ্যের বন্ধন, সুস্বাস্থ্য, স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন এবং নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য, সুস্থিত সমাজ এবং সংস্কৃতি, ধর্মাচরণে স্বাধীনতা, দূষণমুক্ত এবং সুরক্ষিত পরিবেশে জীবন যাপনের সুযোগ এবং জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা (UNPFII, 2010).

আদিবাসী মানুষরা তাদের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের সহায়তায় সুন্দর জীবন যাপনে সমর্থ যা একই সঙ্গে স্থিতিশীল উন্নয়নকে ধরে রাখতে সহায়তা করে। আদিবাসী মানুষদের দীর্ঘ প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে পাওয়া জীবন অভিজ্ঞতা তাদেরকে শারীরিক ও মানুসিক ভাবে সুস্থ থাকার পাঠ দিয়েছে (Gudynas, 2011a; Mollo, 2011; Cunningham, 2010a)।

পুরুলিয়া জেলার বিরহড় সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়নকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বিরহড়রা-

ক) আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্তরে সুস্থ জীবন চর্চায় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা সুস্থ জীবনের প্রত্যাশী প্রকৃতি এবং বিশ্বকে সুরক্ষিত রেখে। বলিভিয়া, ইকুয়েডর, পানামা প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকা ভুক্ত দেশগুলির আঞ্চলিক আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য (Gudynas, 2011b). নিকারাগুয়াতে Miskitu আদিবাসী সম্প্রদায় ‘laman laka’ নামে যে ধারণা পোষণ করে তাতে বলা হয়েছে যে সম্প্রদায়ের সকলে মিলে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে একত্রে বাস করবে, যে জমিটুকু চাষের জন্য ব্যবহার যোগ্য তাকে সবাই মিলে ভোগ করবে, নিজেদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে মত বিনিময় করবে, এবং লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে সকলে পরিবার ও সমাজে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সুস্থ জীবন যাপন করবে (Cunningham, 2010a ; 2010b). ল্যাটিন আমেরিকার বাইরে ফিলিপিন্স –এ Cordillera region এর Kemkanaey Igorot উপজাতির সম্প্রদায়ের মানুষরাও ‘gawis ay biag’ এর কথা বলে, যার অর্থ হোল সকলের সম্মিলিত সুস্থ সুন্দর জীবন (UNPF11, 2010). পানামা, কুয়াতে আদিবাসীরা যে ‘balu wala’ –র ধারণা পোষণ করে তাঁর অর্থ হল মাতৃভূমি এবং মানুষের মধ্যের সুস্থ সম্পর্ক, যেখানে মানুষ মাতৃভূমি প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

গবেষণায় বর্তমান গবেষক দেখেছেন যে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত জ্ঞান বা দেশীয় জ্ঞান বংশপরম্পরায় এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় অপ্রথাগত ভাবে –যা প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যক্রম নয়, জীবন ব্যাপী শিখন, কাজের মধ্যে দিয়ে শিখন, নিরন্তর পর্যবেক্ষণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া- বয়স্ক মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে (UNESCO, 2009) ইত্যাদি আদিবাসী মানুষদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের একজন হিসাবে গড়ে তোলে। বই পড়ে বা কোন কোর্স করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানকে

আয়ত্ত্ব করা যাবে না, কারণ এই জ্ঞান হল "living process to be absorbed and understood" (Battiste, 2002). আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেশীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ সমূহ বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সঞ্চারিত হয়। গল্পকথা, পৌরানিক কাহিনী, জ্ঞান, নাচ, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে মুখে মুখে এই জ্ঞান ভাণ্ডার, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। (Marika et.al., 2009; Battiste, 2002). সুতরাং আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ভাষা বাঁচলে বেঁচে যাবে সংস্কৃতি, সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমূহ, ধর্মীয় রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা, প্রতীক এবং শিল্পকলা (Sillitoe, 1998; Battiste, 2002). অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেশীয় জ্ঞান প্রবাহিত হয় বংশ পরম্পরায়। দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালন সমান ভাবে ঘটেনা; লিঙ্গ, বয়স, অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, পেশা ইত্যাদির কারনে দেশীয় জ্ঞান একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন হারে সঞ্চারিত হয়। এমনকি দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালনের গুণগত এবং পরিমাণগত মানও ভিন্ন ভিন্ন হয় (Briggs, 2005; Grenier, 1998)।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের সঞ্চালনে যদিও নারী এবং পুরুষের ভূমিকা সমান, তবুও এই বিষয়ে নারী এবং বয়স্ক সদস্যদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে (Tebtebba, 2009)। পুরুলিয়া জেলায় বাসকারী বিরহড়দের মধ্যে দেশীয় জ্ঞান ধারার সঞ্চালনে ভালো ভাবে নারী এবং পুরুষদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝা যায়। এর কারন পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষদের কর্মবিভাজন এবং দায়িত্বের মধ্যে পার্থক্য। পুরুষরা জঙ্গল থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহ, শিকার, অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে অর্থ উপার্জন, সমাজের সদস্য হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকে। অন্যদিকে মহিলারা জঙ্গল থেকে পাতা ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, সংসারের কাজ, শিশু এবং বয়স্কদের লালন-পালনে যুক্ত থাকে। ওষধি গাছ সংগ্রহ করার প্রধান ভূমিকা পালন করে পুরুষরা।

আদিবাসী সমাজে মহিলারা মাতৃভূমি রূপে সংজ্ঞায়িত হন। কারণ প্রকৃতি তথা পৃথিবীর ন্যায় মহিলারাও সৃষ্টি করেন প্রাণ। তাই মহিলারা আদিবাসী বিরহড় সমাজে কেবলমাত্র পরিবার তথা সমাজের 'সেবাদাত্রী' নন, একই সঙ্গে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান, সংস্কৃতি, জীব বৈচিত্র্য ইত্যাদির ধারক ও বাহক। অপ্রথাগত শিখনের মাধ্যমে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান, সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞা ইত্যাদি

মহিলারাই সন্তান তথা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সঞ্চারিত করেন (Howell, 2003)। প্রকৃতি তথা জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে এই জ্ঞানকে ব্যবহার করা যায়। জঙ্গলে কোথায় কি গাছ রয়েছে, ঐ গাছ থেকে খাবার কি ভাবে সংগ্রহ করা যাবে, বর্ষাকালে যখন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করা যাবে না তখনকার খাবারের সংস্থান পূর্ব থেকে টাণ্ডার মধ্যে করে রাখার ন্যায় কাজের দায়িত্ব বিরহড় মহিলাদের উপর বর্ত্তায়। আফ্রিকাতেও আদিবাসী মহিলারা একই রকম দায়িত্ব পালন করেন (Ramphele, 2004)। সুতরাং ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে আদিবাসী মহিলারা স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে আদিবাসী সমাজের অভ্যাস, প্রথা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে সঞ্চারিত করেন। জঙ্গলকে বাঁচাতে এবং জঙ্গলের জীব বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখতে আদিবাসী মহিলাদের বিশেষত বিরহড় সম্প্রদায়ের মহিলাদের অবদান সর্বাধিক - যেহেতু তাঁরা জানেন জঙ্গলের কোন গাছ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কোন সময়ে গাছটির কোন অংশ এবং কতটাকে সংগ্রহ করা যাবে, যাতে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও জঙ্গলের জীব-বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা যাবে (Pradhan et.al. 2011)।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের ন্যায় স্থিতিশীল উন্নয়নে দেশীয় জ্ঞান বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনে বয়স্কদের গুরুত্বও অপরিসীম (Dweba & Mearns, 2011)। বয়স্ক বিরহড়রা পূর্বপুরুষদের থেকে বংশপরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং নিজস্ব অর্জিত অভিজ্ঞতাকে একত্রে সংশ্লেষণ করে উত্তরপুরুষদের হাতে সঞ্চারিত করেন। গল্প, কথকতা, গান-ছড়া, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে বয়স্ক বিরহড় সদস্যরা তাঁদের অর্জিত দেশীয় জ্ঞানের উত্তরাধিকারকে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দেন। চিরাচরিত ভাবে এই প্রথা থাকলেও বর্তমান নতুন প্রজন্মের বিরহড়রা পূর্বপুরুষ এবং বয়স্ক সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের আহরণে এবং তার প্রয়োগে অনীহা প্রকাশ করছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণাতেও এই একই অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে (Posey, 1990 ; Ohmagori & Berkes 1997 in Canada ; Rocheleau, 1991 in Kenya)। এবং অন্যান্য গবেষকরা (Rocheleau, 1991 ; Odora Hoppers, 2001) লক্ষ্য করেছেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথাগত বিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তনের কারণে নতুন প্রজন্মের মধ্যে চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের প্রতি অবহেলা এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং

দেশীয় জ্ঞানের গুরুত্ব বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার অনেকাংশে সমাধান সম্ভব।

৭.৩ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য (Significant of present Research in Education):

সমগ্র বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ধর্ম বিশ্বাস, চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান এবং তার ব্যবহার, স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে। UNESCO (2009) এর মতে প্রতিষ্ঠানিক প্রথাগত শিক্ষা আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি সহায়কও বটে। আদিবাসী ছেলে মেয়েরা অপ্রথাগত পদ্ধতিতে পরিবার এবং পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি লাভ করে - যা তাদেরকে আদিবাসী সমাজ ও পরিবেশে উপযুক্ত ভাবে মানিয়ে চলতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রবেশ করে আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীরা ভুলে যাচ্ছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা এবং মূল্যবোধকে। তাদের কাছে গুরুত্ব হারাচ্ছে মা এবং প্রকৃতিরূপী মা। চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান তাদের কাছে অশিক্ষিতদের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। স্থিতিশীল উন্নয়নের বদলে তারা স্বপ্ন দেখে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থিতিশীলতার। প্রতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তারা নিজের গ্রামে ফিরে যায় না, নিজস্ব পরব এবং সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেনা বা যোগ দিতে তাদের মন চায়না। ধীরে ধীরে নিজস্ব মাতৃভাষাও এই সব পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতরা ভুলতে থাকে। এই সব ছেলে মেয়েরা নিজেদের সম্প্রদায়ের বাইরে গিয়েও অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চজাতির সঙ্গেও বিয়ে করে।

প্রথাগত শিক্ষায় আদিবাসীরা প্রবেশ করার পর সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের ভাষা এবং দেশীয় জ্ঞান দ্রুত হারে নষ্ট হয়ে চলেছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুর দুয়ার জেলায় বসবাসকারী অধিকাংশ অসুর গ্রামের মানুষজন তাদের নিজস্ব ভাষা আসুরী ভাষা একেবারেই ভুলে গেছে-কেউ আর আসুরী ভাষায় কথা বলে না। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী কোড়া উপজাতির অধিকাংশ গ্রামে কেউ আর কোড়া ভাষায় কথা বলে না।

প্রথাগত শিক্ষার নাগপাশে বন্দী হয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে আবাসিক বিদ্যালয়ের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা (Ohmagari & Berkes, 1997) বোডিং স্কুলের আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা (Reyhner & Eder, 2015) অথবা মেসবাড়ি থেকে লেখাপড়া করা (Armitage, 1995) আদিবাসী ছাত্র ছাত্রীরা তাঁদের সম্প্রদায়ের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়েছে ; এবং সঙ্গে হারিয়েছে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ বন্ধন, রীতিনীতি, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য। আদিবাসীরা নিজস্ব ভাষা হারালে হারিয়ে যায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং দেশীয় জ্ঞান। কারণ দেশীয় জ্ঞান ধরা রয়েছে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায়। একথা আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী সমাজ যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই সারা বিশ্বের ভবিষ্যতের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। এই প্রসঙ্গে Stavenhagen (2015) এর বক্তব্যটি বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য – আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের তাঁদের পরিবার, পরিবেশ এবং সংস্কৃতি থেকে পৃথকীকৃত করলে তা সৃষ্টি করবে "irreparable harm to the survival of indigenous cultures and societies" (p.255)।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের একীভূত বা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের একই সঙ্গে পাঠদান করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আদিবাসীদের জ্ঞান এবং তার প্রয়োগকে প্রথাগত শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অঙ্গীভূত করা হচ্ছে, যাতে আদিবাসীদের অর্জিত চিরাচরিত পরম্পরাগত দেশীয় জ্ঞান ভাণ্ডার নষ্ট না হয়ে সুরক্ষিত থাকে এবং এই বিষয়ে নিরন্তর জ্ঞানচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এই একই কথা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। নিরন্তর চর্চার মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিকে। আদিবাসী ভাষা, সংস্কৃতি, চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানকে কোন অবস্থাতেই ছোট করা যাবে না। শিক্ষক শিক্ষিকাদের ও এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অন্যথায় আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান, মূল্যবোধ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে শিক্ষকরা ইতিবাচক মনোভাব সহকারে বিশ্লেষণ এবং গ্রহণ করতে পারবেননা (Radoll, 2015 ; Nakashima et.al., 2012)। অন্যদিকে Odora Hoppers, (2001, p.18) এর ভাষায়, "every time a child enters the gates of the school, the spontaneous process of that symbolic fumigation, cosmological cleansing, and mandated acculturation begins".

চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞানের চর্চা হ্রাস পেলে বা ধ্বংস হলে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরার হার কম হবে, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত মানের অবনতি ঘটবে অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায়। প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত এই কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। অস্ট্রেলিয়াতে দেখা গেছে, অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা গনিত, বিজ্ঞান এবং পঠনের ক্ষেত্রে অন্তত ২.৫ বৎসর পিছিয়ে থাকে (Dreise & Thomson, 2014)। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পেরুতেও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সমবয়সী অ-আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় গনিত এবং বানানে পিছিয়ে থাকতে (Arteaga & Glewwe, 2014) দেখা যায়।

শিক্ষক, পাঠক্রম প্রণেতা এবং পলিসি রচনাকারীদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। আদিবাসী ছেলে মেয়েদের অর্থপূর্ণ এবং কার্যকারী পাঠদান করতে হলে আদিবাসী সমাজ থেকে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় এবং পলিসি রচনায় সক্রিয় ভাবে যুক্ত করতে হবে।

প্রতিটি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আদিবাসী চর্চাকেন্দ্র' স্থাপন করে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এবং পেশাদার ব্যক্তিদের এই কেন্দ্রের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নিরন্তর গবেষণা এবং আদিবাসী চর্চাকে প্রথাগত শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এছাড়াও আদিবাসীদের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা ভিত্তিক বই প্রকাশ করতে হবে যাতে সাধারণের মধ্যে আদিবাসীদের সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি হয় এবং আদিবাসীদের প্রতি সর্বসাধারণের মনোভাব ইতিবাচক হয়।

একই সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আদিবাসী চর্চাকে একটি পূর্ণাঙ্গ অবশ্য পাঠ্যপত্র হিসাবে যুক্ত করতে হবে এবং উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.৪ পরবর্তী গবেষণার সুযোগ (Opportunities for Further Research):

১) বর্তমানের বিশ্বায়ন, পাশ্চাত্তীকরণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির প্রবল ধাক্কায় চিরাচরিত জীবনে খুশি থাকা আদিবাসীরা কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তার থেকে আশু ও দীর্ঘস্থায়ী মুক্তির পথ খুঁজে বার করা।

২) বনবাসী আবাসিক আশ্রম বিদ্যালয়, একলব্য স্কুল, নবোদয় বিদ্যালয়, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও মিশন পরিচালিত আদিবাসীদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন, ছুটির সময় তালিকা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা।

৩) আদিবাসী চর্চা কেন্দ্রগুলির গবেষণার আশু এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করা।

৪) আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষার সুযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ভাষা ও লিপি বিষয়ে গবেষণা করা।

৫) আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৭.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Research):

১) বর্তমান গবেষণায় গবেষক কেবলমাত্র বিরহড় সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা করেছেন।

২) PVTGs এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিরহড় ছাড়াও লোধা এবং টোটো উপজাতি রয়েছে, গবেষক দক্ষিণবঙ্গের লোধাদের সঙ্গে বিরহড়দের তুলনামূলক আলোচনা করেননি।

৩) বিরহড়দের উপর গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমিতে বাসকারী বিরহড়দের গবেষণায় যুক্ত করা হয়নি।

৪) বিরহড় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে কোন পি.এইচ.ডি./এম.ফিল. স্তরের গবেষণা বর্তমান গবেষকের নজরে আসেনি। যথেষ্ট গবেষণা পত্র ও প্রকাশিত হয়নি। তাই গবেষক খুব বেশি সংখ্যক গবেষণা পত্রের পর্যালোচনার সুবিধা পাননি।

৫) উপযুক্ত সহায়ক ব্যবস্থার অভাবে গবেষক যথেষ্ট সংখ্যক চিত্র এবং ভিডিও তুলে ধরতে পারেননি।

পরিশিষ্ট (APPENDICES)		
ক্রমিক নাম্বার		পৃষ্ঠা সংখ্যা
পরিশিষ্ট –I	নতুনত্ব প্রতিবেদনের ছবি প্রতিলিপি	II
পরিশিষ্ট –II	তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র-১	IV
পরিশিষ্ট –III	তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র-২	V
পরিশিষ্ট –IV	সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র	VI
পরিশিষ্ট –V	প্রকাশিত গবেষণা পত্র	VII
পরিশিষ্ট –VI	সেমিনার উপস্থাপনায় শংসাপত্র	XV
পরিশিষ্ট –VII	প্রকাশিত গবেষণা পত্র	XVI
পরিশিষ্ট –VIII	সেমিনার উপস্থাপনায় শংসাপত্র	XXIV
পরিশিষ্ট –IX	পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা পত্র	XXV
পরিশিষ্ট –X	প্রকাশিত গবেষণা পত্র	XXXII
পরিশিষ্ট –XI	সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা পত্র	XXXV

LIVELIHOOD OF BIRHOR TRIBES IN PURULIA DISTRICT: A SOURCE OF INDIAN INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEM AND ITS ROLE FOR SUSTAINABILITY OF ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

By Sunny Baskey

Sunny Baskey
14.08.2025

14/08/25
HEAD (Acting)
Department of Education
Jadavpur University

14.08.2025
DR. BISHNUPADA NANDA
PROFESSOR
DEPARTMENT OF EDUCATION
JADAVPUR UNIVERSITY

WORD COUNT 165830
TIME SUBMITTED 09-AUG-2025 10:57PM
PAPER ID 117653963

LIVELIHOOD OF BIRHOR TRIBES IN PURULIA DISTRICT: A SOURCE OF INDIAN INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEM AND ITS ROLE FOR SUSTAINABILITY OF ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT

ORIGINALITY REPORT

0%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	unesdoc.unesco.org Internet	16 words — < 1%
2	www.kaavishpost.org Internet	16 words — < 1%
3	www.ub.unimaas.nl Internet	16 words — < 1%
4	dokumen.tips Internet	15 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON
EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES < 14 WORDS

Sunny Baskey
14.08.2025

14/08/25
HEAD (Acting)
Department of Education
Jadavpur University

B Nanda
14.08.2025

DR. BISHNUPADA NANDA
PROFESSOR
DEPARTMENT OF EDUCATION
JADAVPUR UNIVERSITY

পরিশিষ্ট – II

(Appendix-II)

তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র-১

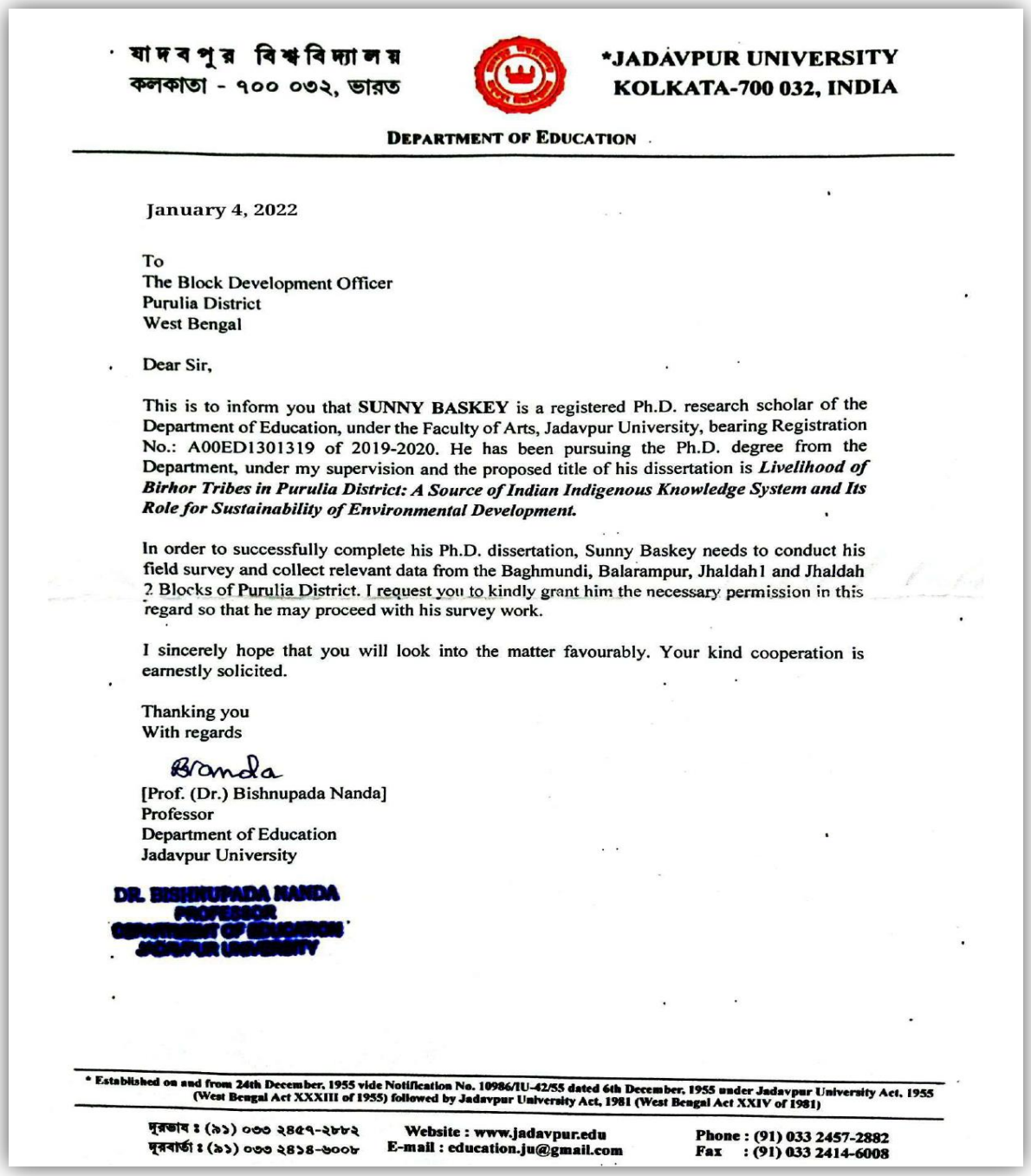

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২, ভারত

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

DEPARTMENT OF EDUCATION

January 4, 2022

To
The Block Development Officer
Purulia District
West Bengal

Dear Sir,

This is to inform you that **SUNNY BASKEY** is a registered Ph.D. research scholar of the Department of Education, under the Faculty of Arts, Jadavpur University, bearing Registration No.: A00ED1301319 of 2019-2020. He has been pursuing the Ph.D. degree from the Department, under my supervision and the proposed title of his dissertation is ***Livelihood of Birhor Tribes in Purulia District: A Source of Indian Indigenous Knowledge System and Its Role for Sustainability of Environmental Development.***

In order to successfully complete his Ph.D. dissertation, Sunny Baskey needs to conduct his field survey and collect relevant data from the Baghmundi, Balarampur, Jhaldah1 and Jhaldah 2 Blocks of Purulia District. I request you to kindly grant him the necessary permission in this regard so that he may proceed with his survey work.

I sincerely hope that you will look into the matter favourably. Your kind cooperation is earnestly solicited.

Thanking you
With regards

Bishnupada Nanda

[Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda]
Professor
Department of Education
Jadavpur University

DR. BISHNUPADA NANDA
PROFESSOR
DEPARTMENT OF EDUCATION
JADAVPUR UNIVERSITY

* Established on and from 24th December, 1955 vide Notification No. 10986/IU-42/55 dated 6th December, 1955 under Jadavpur University Act, 1955 (West Bengal Act XXXIII of 1955) followed by Jadavpur University Act, 1981 (West Bengal Act XXIV of 1981)

দূরভাষ : (৯১) ০৩৩ ২৪৫৭-২৮৮২ Website : www.jadavpur.edu Phone : (91) 033 2457-2882
দূরবার্তা : (৯১) ০৩৩ ২৪১৪-৬০০৮ E-mail : education.ju@gmail.com Fax : (91) 033 2414-6008

পরিশিষ্ট – III

(Appendix-III)

তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র-২

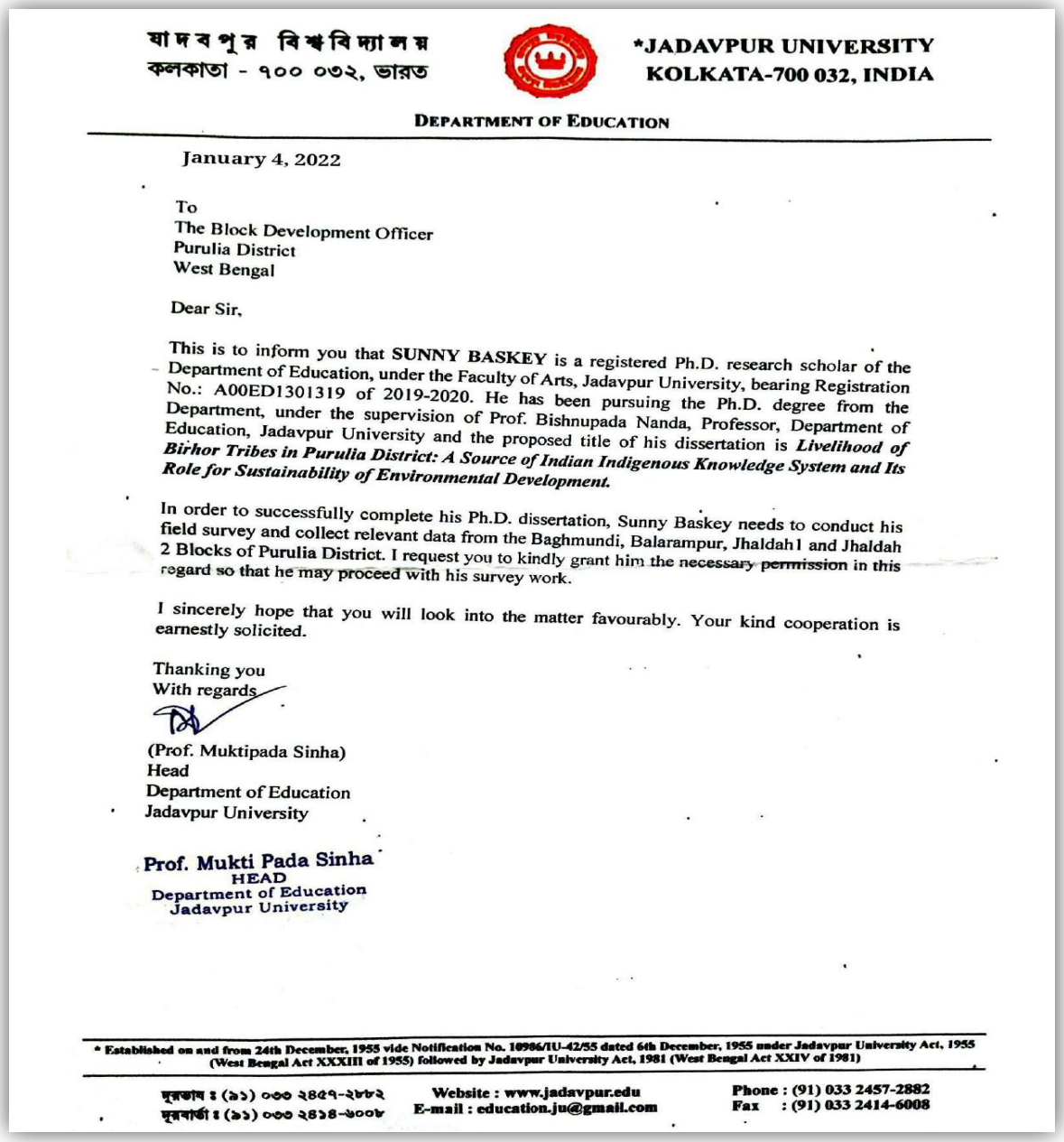

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২, ভারত

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

DEPARTMENT OF EDUCATION

January 4, 2022

To
The Block Development Officer
Purulia District
West Bengal

Dear Sir,

This is to inform you that **SUNNY BASKEY** is a registered Ph.D. research scholar of the Department of Education, under the Faculty of Arts, Jadavpur University, bearing Registration No.: A00ED1301319 of 2019-2020. He has been pursuing the Ph.D. degree from the Department, under the supervision of Prof. Bishnupada Nanda, Professor, Department of Education, Jadavpur University and the proposed title of his dissertation is ***Livelihood of Birhor Tribes in Purulia District: A Source of Indian Indigenous Knowledge System and Its Role for Sustainability of Environmental Development.***

In order to successfully complete his Ph.D. dissertation, Sunny Baskey needs to conduct his field survey and collect relevant data from the Baghmundi, Balarampur, Jhaldah1 and Jhaldah 2 Blocks of Purulia District. I request you to kindly grant him the necessary permission in this regard so that he may proceed with his survey work.

I sincerely hope that you will look into the matter favourably. Your kind cooperation is earnestly solicited.

Thanking you
With regards

(Prof. Muktipada Sinha)
Head
Department of Education
Jadavpur University

Prof. Mukti Pada Sinha
HEAD
Department of Education
Jadavpur University

* Established on and from 24th December, 1955 vide Notification No. 10986/IU-42/55 dated 6th December, 1955 under Jadavpur University Act, 1955 (West Bengal Act XXXIII of 1955) followed by Jadavpur University Act, 1981 (West Bengal Act XXIV of 1981)

দূরভাষ : (৯১) ০৩৩ ২৪৫৭-২৮৮২
দূরবার্তা : (৯১) ০৩৩ ২৪১৪-৬০০৮

Website : www.jadavpur.edu
E-mail : education.ju@gmail.com

Phone : (91) 033 2457-2882
Fax : (91) 033 2414-6008

পরিশিষ্ট – IV

(Appendix-IV)

সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র

TWO-DAY INTERNATIONAL SEMINAR
on
"SOCIO-CULTURAL, EDUCATIONAL
&
MEDICINAL PRACTICES OF TRIBALS"

Organized by
SEVAYATAN SIKSHAN MAHAVIDYALAYA
(A Govt. Sponsored College)
(Affiliated to Vidyasagar University & The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration)

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that
Prof./ Dr./ Mr./ Mrs./ Ms. Sunny Basney of Jadavpur
College/ Mahavidyalaya/ University has participated/ presented his/her paper in the Two-Day International Seminar entitled "SOCIO-CULTURAL, EDUCATIONAL & MEDICINAL PRACTICES OF TRIBALS" held on 26th & 27th August, 2022 at Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya, Sevayatan, Jhargram.

Dr. Ashis Kumar Gupta	Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda	Mr. Ram Hari Barik	Mr. Asis Manna	Mr. Ananda Nanda Bera
Principal & Secretary of GB. Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya	Patron Professor & Former Head Department of Education, Jadavpur University	Joint Coordinator Two Day International Seminar Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya	Joint Coordinator Two Day International Seminar Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya	NAAC Convener Sevayatan Sikshan Mahavidyalaya

পরিশিষ্ট – V

(Appendix-V)

প্রকাশিত গবেষণা পত্র

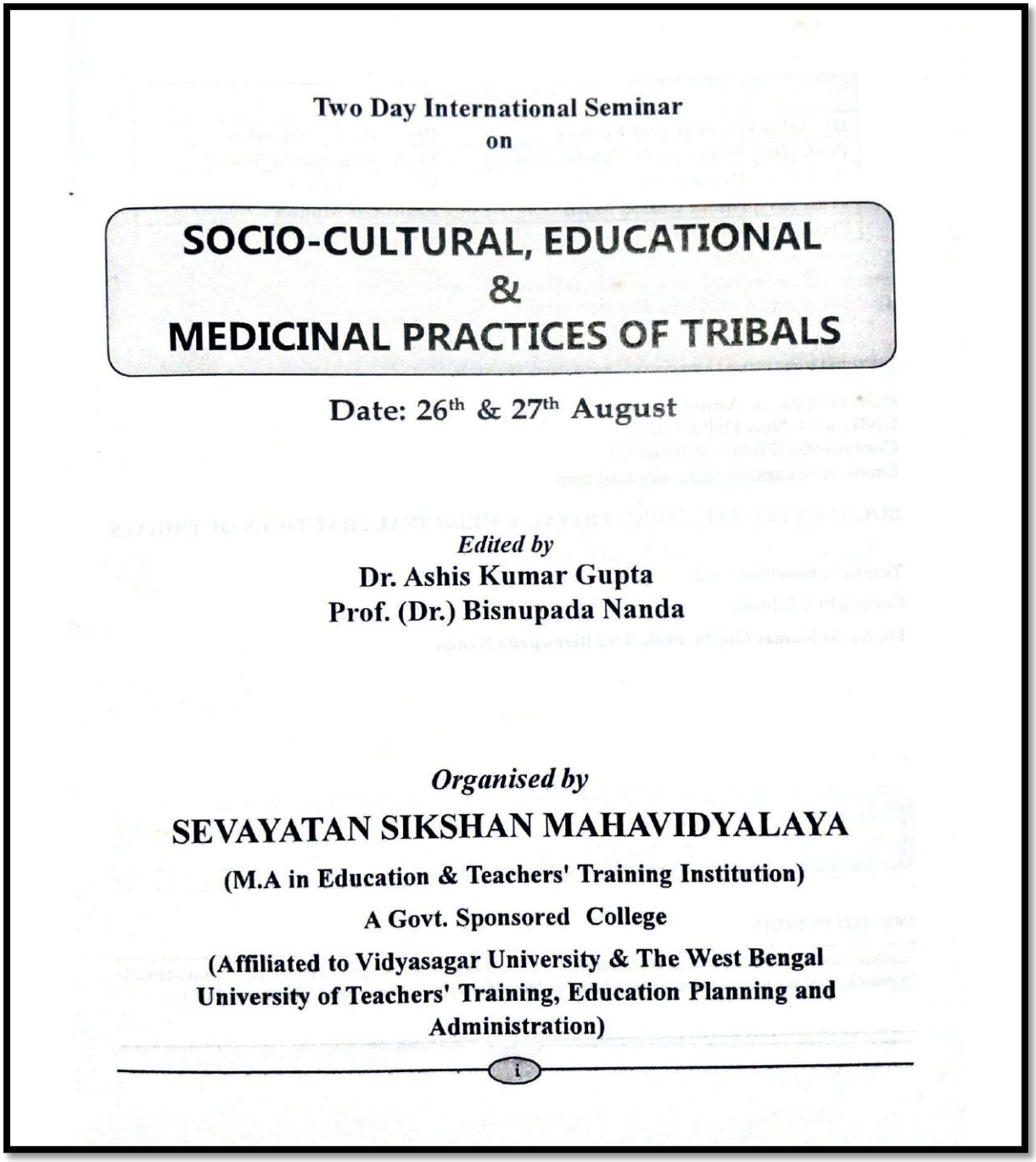

Two Day International Seminar
on

SOCIO-CULTURAL, EDUCATIONAL
&
MEDICINAL PRACTICES OF TRIBALS

Date: 26th & 27th August

Edited by
Dr. Ashis Kumar Gupta
Prof. (Dr.) Bisnupada Nanda

Organised by
SEVAYATAN SIKSHAN MAHAVIDYALAYA
(M.A in Education & Teachers' Training Institution)
A Govt. Sponsored College
(Affiliated to Vidyasagar University & The West Bengal University of Teachers' Training, Education Planning and Administration)

i

Editorial Board	
Dr. Ashis Gupta (Chief Editor)	Prof. Abusayeed Miah
Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda (Editor)	Prof. Joshobanta Nayek
Prof. (Dr.) Debjani Sengupta	Dr. Anup Biswas
Prof. (Dr.) Nimai Chand Maiti	Prof. Asis Manna
Prof.(Dr.) Abhijit Pal	Prof. Ram Hari Barik

RENOVA INTERNATIONAL PUBLICATIONS

B-39, First Floor, Aruna Nagar,
Civil Lines, New Delhi-110054
Cont no-9953776001/9910465522
Email: renovapublications@gmail.com

SOCIO-CULTURAL, EDUCATIONAL & MEDICINAL PRACTICES OF TRIBALS

Year of Publication: 2022

Copyright © Editors

Dr. Ashis Kumar Gupta, Prof. (Dr.) Bisnupada Nanda

All Right Reserved, No part of this book may be reproduced in any from or by any means without permission in writing from the publisher

PRINTED IN INDIA

Published by Renova International Publications, B-39, First Floor, Aruna Nagar, Civil Lines, New Delhi-110054,
Typeset by Renova Graphics Delhi and Printed at Milan Enterprise, Ansari Road, Daryaganj, Delhi.

7

Educational Status of Birhor People: A Semi-Nomadic Tribe of Purulia District

Sunny Baskey*
Ph.D. Scholar, Department of Education, Jadavpur University

Prof. Bishnupada Nanda**
Professor, Department of Education, Jadavpur University

Abstract:

Reported is the study of educational status of Birhor people. Birhor is the most primitive semi-nomadic tribal community in West Bengal. They settled at Bhagmundi, Jhaldah and Balarampur blocks in Purulia district. Till dates their number is very small and they collect their livelihood mainly from their nearest eco-system. Educationally they are very much backward. The present investigators visited two village- Bhupotipolly and Barria of Bhaghmundi block where Birhor community settled. They studied the present educational scenario of Birhor peoples living in Bhupotipolly and Barria villages. Further in depth study is prescribed.

Key words: *Birhor people, Semi-Nomadic tribes, Baghmundi block*

Introduction

The Birhor belong to the earliest groups of semi-nomadic tribes in India. They are the foresters or Jungle men. They consider themselves as the descendants of the sun. Origin of Birhor word is from two Mundari words- 'Bir' means (Jungle or forest) and 'Hor' means (man or human). Therefore, Birhor word means 'the Men of Jungle'. This primitive tribe live in Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Bihar and West Bengal. Birhors' are nomadic hunters, food gatherers and rope makers. They prepared rope from indigenous fibres of trees and creepers known as chop. In West Bengal they appear to have developed the attitude of living in hilly regions with dense forest of particular place i.e. in Purulia district (Jhalda I, Jhalda II, Balarampur, and Baghmundi blocks). In Purulia the Birhor settled in the villages near to forest and

hilly areas to collect the raw materials of rope and to sale it and other forest products like- leaves, fire wood etc. to the villagers and the local market named as 'Hatt'. The villages of Birhors are known as 'Tanda', which consist of at least 6 to 10 huts. They also collect medicinal drug plants from the nearby forest, which they use as a medicine as well as they sale it in the local market. They also collect honey and Mushroom from the Jungles. Birhors are grouped into four 'clan' (known as 'kalli') named Murmu, hembrom, Mudi and Mahali. Roy (1925) noted that 37 clans are present among the Birhors in Jharkhand. 'Murmu' means' one type of grass' 'Induar' Means 'Idur' Rat. The Birhors belongs hills or mountains as sacred place of their ancestral spirits.

According to 2011 Census the total population of Birhors in India is 17,241, out of which 62% live in Jharkhand. In West Bengal the total Birhor population is 2241 among which 1176 are mate and 1065 are female. Therefore, the Birhors represent 0.01 percent of the total tribal population of India. The sex ratio of Birhor is 906 females per thousand males and overall tribal literacy rate in West Bengal is 58.2 percent. Female literacy rate is 47.7 percent.

In the Constitution of India, under Article 275(1) provision for 100% fund that is exclusively to be used for infrastructure assistance in the tribal dominated areas and grand –aid under article 275(1) as 100% financial assistance is provide to the states through the nodal Ministry of Tribal Affairs.

In the Indian Constitution, article 336(25) of the constitution said that Scheduled Tribe are the tribes or tribal communities or parts of groups within search tribes or tribal communities which the Indian President may specify by public notification under article 342(1).

The PTGs are the tribal communities among the STs who live in near isolation in inaccessible habitats and are characterized by a low rate of growth of population, pre-agricultural level of technology and extremely low level of literacy (Ministry of Tribal Affairs: Government. of India).

Birhors belongs to the Proto-Austroload. Their physique is short and medium in stature, melanoderm (persons with dark pigmentation in the skin), long head (dolicho-cephalic), wavy hair (cymo-trichous) and front nose (platy Rhine).

Objective:

1. To study the educational status of Birhor people
2. To study the available identity facilities of Birhor people

Methodology:

The present investigator visited two villages of Baghmundi block, namely Bhupoti polly and Barria where many Birhor families live. He stayed among them in their vil-

lage. Therefore, he used anthropological procedure of primary data collection from the sample.

The Bhupotipolly village have total 24 families in our study were included for our study (in this village more than 60 families live) and in Barria village total 16 families selected (in this village more than 20 families live). In the following table, (table no.1) the age group of two villages of 40 families were show.

AGE	BHUPOTI POLLY	BARRIA	TOTAL NO	%
20-30 YEARS	8	6	14	35
31-50 YEARS	11	7	18	45
51-70 YEARS	5	3	8	20
TOTAL	24	16	40	

The monthly incomes of most of the families are below rupees one thousand. From table no.2 it is noted that out of 40 Birhor families selected in the two villages 23families earn only less than thousand rupees per month and the monthly income of two families are rupees 5 thousand above per month.

Monthly Income of Families	BHUPOTIPOLLY	BARRIA	Total No.	%
Below of 1000/-	12	11	23	57.5
1000-3000	10	3	13	32.5
3100-5000	0	2	2	5
5000/-above	2	0	2	5
TOTAL=	24	16	40	

- A total 168 members live in two birhor villages I,e, Bhupatipolly and Barria in 40 families. In the following table (table no.3) total Birhor population were show.

No. of Family Member	BHUPOTI POLLY		BARRIA		TOTAL		%
	Family	Total Member	Family	Total Member	Family	Total Member	
Below of 3	5	7	4	7	9	14	8.3
3-5	12	48	6	34	18	82	48.8
5-above	7	53	6	19	13	72	42.8
TOTAL=	24	108	16	60	40	168	

Most of the Birhor families possess official identity documents like aadhar card (n=33), voter card (n=34), ration card (n=35), BPL card (n=35), Job card (n=9), Bank account (n=19) out of forty (n=40) families in the two mentioned villages. Out of 40 families 24 families in Bhupoti polly and 13 family in Barria have houses provided by Govt. (shown in table no.4).

OFFICIAL DOCUMENTS OF FAMILY HEAD	BHUPOTI POLLY		BARRIA		TOTAL	
	YES	NO	YES	NO	YES	NO
AADHAR CARD	19	5	14	2	33	7
VOTER CARD	21	3	13	3	34	6
RATION CARD	20	4	15	1	35	5
BPL CARD	20	4	15	1	35	5
JOB CARD	6	18	3	13	9	31
BANK ACCOUNT	11	13	8	8	19	21
PROVIDED HOUSES BY GOVT.	24		13	3	37	3

Not a single family have any Govt. or semi- Govt. or private sector services. They are daily wage earner and for their livelihood still they depends upon forest (Ajoddha).

Discussion:

The Birhors are semi-Nomadic. They are mainly located at Baghmundi, Jhaldah and Balarampur block at purulia district. Still they are very small in number in West Bengal. Economically still they are very poor. In 1959-1960 financial year scheme of rehabilitation activities in favour of Birhor community in Bhupotti polly (Baghmundi P.S) and Chotoboghat (Jhaldah P.S) first taken as an initial activities. To overcome the severe economic crisis of these group of most primitive tribal Govt. of West Bengal supplied agricultural land, reclamation of West lands, excavation of tanks, distribution of life strove, and construction of primary school building. In the recent days a good number of Birhor family get newly constructed houses of rupees 1,20,000/- funded by Backward Class Welfare Scheme (2019-2020).

The Birhor peoples depend mainly upon their immediate eco-system, i.e., the hill, forest, spring and land. Their traditional economy mainly depends upon their surroundings I e, catching birds and animals, collecting honey, roots and tubers, fruits, sabui grasses and other minor forest products. The socio- cultural and economy of

Birhor community therefore, largely depends upon the eco-system. To some extent they maintain their eco system also.

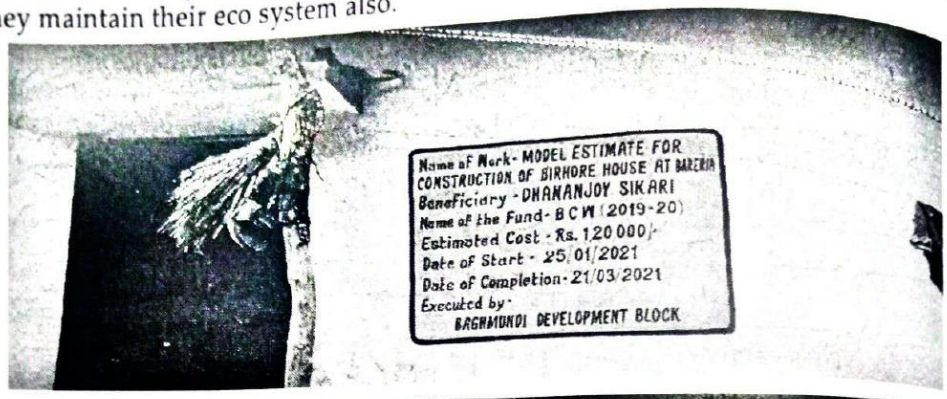

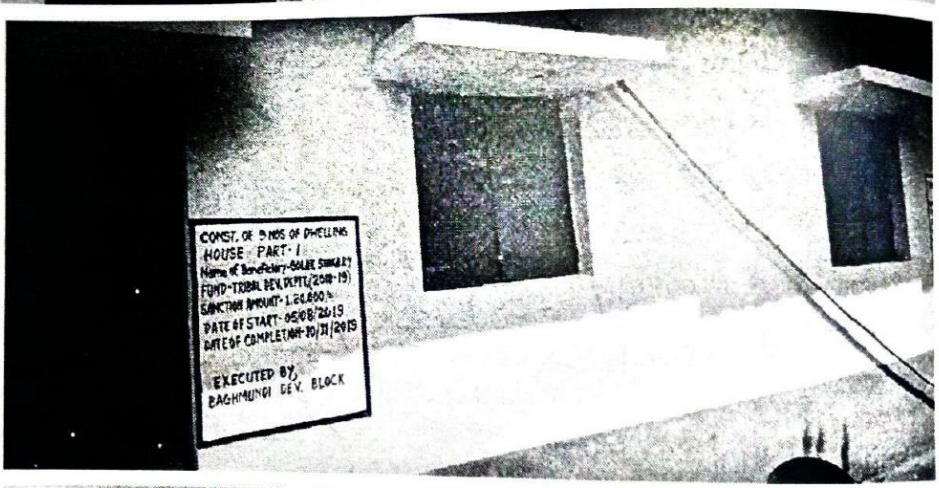

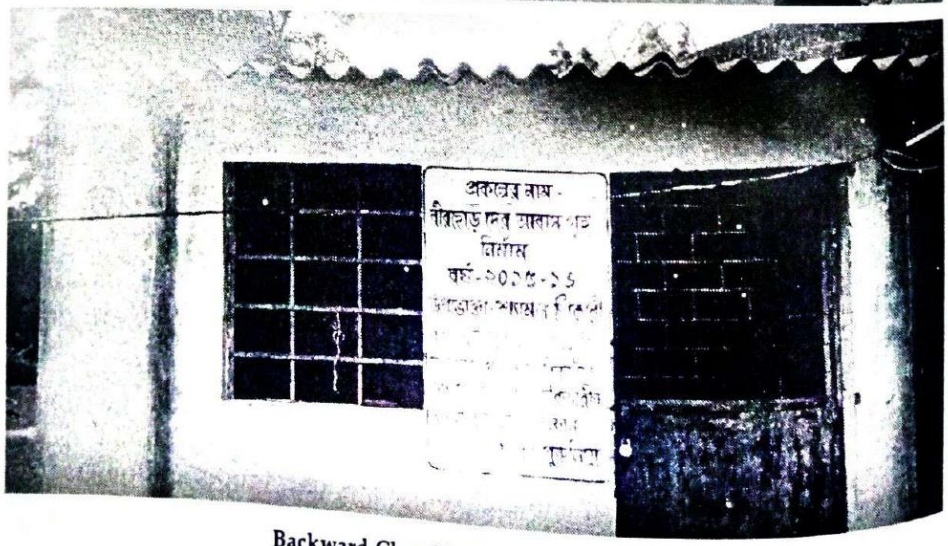

Backward Class Welfare Scheme (2015-2016)

For their improvement the present researchers suggests the following areas-

1) Educational upliftment
2) Economic betterment

Educationally they are still backward. None among them (from Bhupoti polly and Barria village) passed higher secondary

Only one candidate passed secondary standard. Therefore, they need immediate support for education. They need school in the nearest place in their community, need regular mid-day-meal and afternoon tiffin, educational kits like-reading and writing materials. For them flexible time-table and flexible curriculum are needed. Most of the teachers are less interested to go to teach in the Birhor communities. Therefore, teacher's quarter should also remain attached with the school. So or in the school premises, that the teachers may live with their families and take care of students in school time as well as in out of school time.i e, in their play time as well as in leisure time also. Parental involvement in the education of Birhor children is essential, which can be developed through Parent Teacher association. The house- wife of school teacher can be encouraged to train adult Birhors in Education, Economic development, Social and cultural programmes.

Economic rehabilitation of Birhor peoples can be done by using some of the forest products upon which they depends. Regular irrigation facilities must be available to them. Job opportunities must be increased. Road facilities must be provided so that they can market forest products within a short span of time. It will strengthen their economic condition.

References:

1. Roy, S.C. (1925). *The Birhor A Little Known Jungle Tribes of Chotanagpur*, Rachi.
2. Census Reports of Government of India 2011.
3. Rayje, K. (1991). *Birhor a Semi-Nomadic Tribe of West Bengal*. (In) Das et. .al (ed) Cultural Research Institute. Calcutta.

পরিশিষ্ট – VI

(Appendix-VI)

সেমিনার উপস্থাপনায় শংসাপত্র

TWO DAYS INTERNATIONAL SEMINAR

ON

"IMPLEMENTATION AND EXECUTION OF NEP 2020 IN THE LIGHT OF INCLUSIVE EDUCATION"

Date: 21st February, Tuesday & 22nd February, Wednesday, 2023

Organised by

VIVEKJYOTI COLLEGE

Estd. 2007

In

Association with "Internal Quality Assurance Cell" (IQAC)

Dakshin Mechogram :: Panskura :: Purba Medinipur :: W.B. :: 721139 :: India

Recognised by NCTE, Affiliated to Baba Saheb Ambedkar Education University and West Bengal Board of Primary Education

Certificate Of Participation

This is to certify that...Sunny....Baskey....., Principal / TIC /Professor /Associate Professor / Assistant Professor / Lecturer/Teacher/ Research Scholar/ Student of..Jadavpur University..... .....partook as a participator/ Paper presenter/ Speaker in the TWO DAYS INTERNATIONAL SEMINAR on 21st & 22nd February, 2023 at VIVEKJYOTI COLLEGE, Mechogram, Purba Medinipur, W.B., India. His/ Her engagement enriched and enlightened us.

Prof. (Dr.) Saumen Kumar Mahapatra
President
Vivekjyoti College

Prof. (Dr.) M. Tariq Ahsan
Institute of Education & Research (IER)
University of Dhaka

Mr. Manas kumar Sahu
Teacher-In-Charge
Vivekjyoti College

Mr. Amitava Jana and Mr. Tanmoy Das
Coordinator & Co-Coordinator
Seminar Organizing Committee
Vivekjyoti College

পরিশিষ্ট – VII

(Appendix-VII)

প্রকাশিত গবেষণা পত্র

Two Days International Seminar
on

Implementation and Execution of NEP 2020 in the Light of Inclusive Education

Date: 21st & 22nd February, 2023

Edited by
Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda
Asst. Prof. Manas Kumar Sahu

Organised by
VIVEKJYOTI COLLEGE
in Association with IQAC.

i

RENOVA INTERNATIONAL PUBLICATIONS

B-39, First Floor, Aruna Nagar,
Civil Lines, New Delhi-110054
Cont no-9953776001/9910465522
Email: renovapublications@gmail.com

Year of Publication: 2023

Copyright © Editors

Implementation and Execution of NEP 2020 in the Light of Inclusive Education

Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda, Asst. Prof. Manas Kumar Sahu

All Right Reserved, No part of this book may be reproduced in any from or by any means without permission in writing from the publisher

PRINTED IN INDIA

Published by Renova International Publications, B-39, First Floor, Aruna Nagar, Civil Lines, New Delhi-110054.
Typeset by Renova Graphics Delhi and Printed at Milan Enterprise, Ansari Road, Daryaganj, Delhi.

16

Indigenous Knowledge System and Its Implication in National Education Policy 2022

Sunny Baskey
Ph.D Scholar, Department of Education, Jadavpur University, Kolkata
Prof. Bishnupada Nanda
Professor & Former HOD, Department of Education, Jadavpur University, Kolkata

Abstract

Birhor are the Semi-Nomadic tribal community bearing most of the primitive tribal characters. In West Bengal they are mainly living in four Blocks of Purulia. Their total number in India, according to Census Report (2011), is 17241 and 0.01% of the total tribal population. According to the principle of NEP 2020, all tribes have to be included in the inclusive education programme. The present study reflects Indigenous Knowledge System that Birhor community cultivate and how it can be used in mainstream education programme. In the last part of the paper the researchers search in-depth about what are the problems of education of Birhor children in the mainstream school and how those problems can be solved. Farther in-depth research is prescribed.

Keywords: *Birhor student, Semi-Nomadic Primitive Tribes, Indigenous Knowledge System, Formal and Non-formal Education, NEP 2020*

Introduction

The term 'Indigenous' means inborn or native, that is it means originally or born naturally in a region or belonging a place. The term 'Indigenous' came from 'Latin' which means can be break three parts- Indi (In) + Gen (Born)+ Us (OUS). So Indigenous Knowledge born naturally in any place of the world. Indigenous people are the tribal people. International Labour Organization (ILO) convention 169, (1989) clearly identified. Indigenous people as, "tribal people in countries distinguish them for other section of the natural community and whose status is regulated wholly or particularly of their own custom or tradition or by special law or regulation, and people in their countries who are regulated by themselves or other, as ' Indigenous' 'on account of their decent from the population' that inhabitant in the country or a geographical re-

gion to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, written or wish to written or some of their own social, economic, spiritual, cultural and political characteristics and institution".

Therefore, Indigenous Knowledge System referred to those knowledge system which originated naturally in a laboratory of the nature in any area which the people used in day-to-day activities for era after era. Till date the Scheduled Tribes (ST) and more particularly the forest dwellers tribes used this Knowledge System in their economic persuit as well as in their live system. In most cases Indigenous Knowledge System is eco-friendly and do not disturb the natural ecosystem of any geographical area. The result is that the scheduled tribe peoples (NEP 2020 termed as Socio-Economically Disadvantaged Groups) designed all their tools and equipment's from locally available natural resources, which are naturally degradable. The Indigenous people who are forest dwellers can identify which parts of the plants are beneficial or harmful, which part are edible or non-edible, which part are soft and hard and which part have medicinal value. The Indigenous Knowledge System developed by the forest dwellers from pre historical period and this Knowledge flows from era-to-era. These are the knowledge about secrete of the nature. These knowledge systems are not being recorded in written form and its popularity gradually faded due to rapid Urbanization, Modernization and Westernization.

Still to date some Indigenous people apply their Indigenous Knowledge System in various religious activities, food style, and behaviour aspect. To protect the environment they never perform hunting and fishing throughout the year, particularly during the reproductive periods from their Indigenous Knowledge and Indigenous technique. They eat simple and chief food, fowling, roosting, steaming, baking etc. and therefore, almost never feel any health hazards. In National Education Policy 2020 Government of India has given major emphasis on Indian Knowledge System as well as Indigenous Knowledge System of tribal people. Government of India clearly given emphasis upon education of tribal children and banabasi people. Therefore, Government established 'Bonobasi Ashram School' to provide quality and free residential education to the forest based tribal children. Therefore, the present investigators become interested to study the Indigenous Knowledge System of Birhor tribes and its influence upon their education. So, the researchers take this problem as their research study.

Objective:

1. To study some of the Indigenous Knowledge used by the Birhor tribes in Purulia district.
2. Influence of Indigenous Knowledge System upon education of Birhor children.

Methodology

Sample:

For collection of data the investigator selected four blocks of Purulia district where Birhor tribes are living. They collected data by using semi-structured interview schedule and observation technique. For data collection four blocks Jhaldah 1 and Jhaldah 2, Baghmundi and Balarampur were selected as in these four blocks Birhor tribes are living.

Discussion:

The Birhor are forest dwellers or the Jungle men and belong to one of the earliest group nomadic tribes in India. They are purely Nomadic in Madhyapradesh and Semi-Nomadic in West Bengal. They are living mainly in the four blocks of Purulia district and bear primitive tribal characters. Census (2011) report noted, that in India total population of Birhor are 17241 and in West Bengal their number is 2241(male 1176 and female 1065). The Birhors represent 0.01 percent of the total tribal population of India.

Physical structures of Birhors are short and medium, dark pigmentation in the skin, long head, wavy hair and short noise. The area habited by Birhor tribes in Purulia district forms a part of Hazaribagh plateau, which is the "continuation of Hazaribagh range. A Baghmundi plateau is characterised by undulating relief and rough hills traversed by many perennial and seasonal streams". Jhaldah Blocks is also a part of Ajodhya range. So some part of this four Blocks viz. Jhaldah1, Jhaldah 2, Baghmundi and Balarampur are most difficult to access.

The Peaks of Baghmundi and Jhaldah range are covered with small but dense forest having mango, mahua, palash, sal, kusum, kend, and use full creeper 'Chihorlata' and in higher altitude Bamboos grow. Some wild fruit bearing trees are also there. Some birds like pea-fowls, grey-partridge, pegions, sparrows, paddy birds, are all found in this hill-come-forest belt. Some animals like pigs', hares, rabbits, monkey, and poisonous snakes are also living in Jungle belt. The cultivated crop regions are paddy, maize, beans, sweet potato, tubers, fruits (Guavas). All these forest based products are the sources of economy and living of Birhors.

Birhor people in Purulia district face three major problems 1) Economic problems 2) Socio-Cultural problems 3) Educational problems.

In the different parts of the world technological advancement is going on but except in the dwelling place of Birhors as this area is hilly with dense Jungle belt. The environment is too rough and tough in summer and winter. For centuries they lead isolated life in same place with least external influences. Therefore, their total livelihood depends upon are closed forest, which is the source of the food, cloth, medicine, place of sports, house hold materials, collection of ritual items and centre of worship etc.

The long interaction with nature has a help for them to acquire many secret knowledge in the nature. Therefore, the relevant Indigenous knowledge for their sustainability is important. Following are some of the medicine plants which they commonly collected from Jungle and hill area for their medication.

Table no. 1. List of plants used for the treatments of skin disease in human.

Sl No.	LOCAL NAME	BOTANICAL NAME	FAMILY	APPLICATION MODE	USED PARTS
1	Alang	Combretum Decandrum Roxb	Combretaceae	Seed Oil Is Used To Treat Skin Disease	Seed
2	Akanda	Calotropis Gigantean L.	Asclepiadaceae	Fresh Leaf Latex Is Used To Treat Ringworm And Purgative	Leaf Latex
3	Bandar Lathi	Cassia Fistula L	Ceasalpinaceae	Buds & Flowers Are Used To Treat Skin Disease & Leprosy	Bud & Flower
4	Bhingaraj	Wedelia Chinensis (Osbeek) Merr	Asteraceae	Leaf Juice Is Used To Treat Scabies	Leaf
5	Chhatim	Alstonia Scholaris (L) R. Br.	Apocynaceae	Latex With Kusum Oil Is Used To Treat Scabies	Leaf Latex
6	Ghetu	Clerodendrum Viscosum Vent	Verbenaceae	Leaves & Roots Extract Are Used To Treat Skin Disease.	Leaf & Root
7	Ghritakumari	Aloe Vera (L) Burm.F.	Liliaceae	Succulent Leaves Paste Is Used Over To Eczema & Pimples.	Leaf
8	Gulancha	Tinospora Sinesis (Lour) Merr.	Menispermaceae	Used To Treat Skin Disease, Mangy Wounds.	Stem
9	Haritaki	Terminalia Chebula Retz	Combretaceae	Used To Treat Skin Disease	Fruits
10	Kalkephul	Cascabela Thevetia (L) Lippold	Apocynaceae	Leaf Extract Is Used To Treat Skin Disease	Leaf
11	Karabi	Nerium Oleader L.	Apocynaceae	Leaf Paste Is Used To Treat Skin Disease, Scabies.	Leaf & Root Bark
12	Kunch (Lal)	Abrus Precatorius L	Papilionaceae	Fresh Paste Of Leaves Is Used To Cure Scabies, Leucoderma	Young Leaf
13	Kusum	Scheichera Oleosa (Lour) Oken	Sapindaceae	To Treats Skin Diseases, Fungal Infection	Stem Bark
14	Muktajhuri	Acalypha Indica L.	Euphorbiaceae	Leaf Paste Is Used To Cure Scabies	Mature Leaf
15	Nim	Azadirachta Indica A. Juss	Meliaceae	Neem Leaves Extract Is Used To Cure Skin Disease, Ringworm, Scabies.	Leaf
16	Ranga Alu	Ipomoea Batatas (L.) L.	Convovulaceae	Used To Treat Skin Disease.	Whole Plant
17	Tal	Borassus Flabellifer L.	Arecaceae	Pulp Is Use To Treat Skin Disease.	Fruits
18	Telakucha	Coccinia Grandis (L.) Voigt	Cucurbitaceae	Flower Is Used To Treat Skin Disease	Flower
19	Tulsi	Ocimum Sanctum L.	Lamiaceae	Decoction Of Fresh Leaves Are Used To Treat Skin Diseases	Leaf

The above mentioned Ethno medicinal plants are also regularly collected by the Birhor tribes in Purulia to treat skin diseases, ring worm, scabby, fungal infection, leucoderma, leprosy, pimples, wounds etc. but in the traditional school curriculum there is no scope of discussion about this Indigenous Knowledge, in which these tribal children are closely associated. So when we consider the commonly available forest resources of hill and Jungle areas of Ajodhya hills, it was noted that this area does not reflected in the curriculum in the primary and secondary standard. Naturally Birhor children cannot connect with the formal bookish knowledge to their Indigenous Knowledge in respect of food, medicines, Jungle belt plants and animals, food habits, daily life activities etc. Therefore, they did not get any interest in school level education. The other problems are language used in the school. The languages used by Birhor people are different from other tribal languages. There is some relationship of Birhor language with Santali language. There is no script of Birhor language. In the Birhor community their children interact in their own language. So language is a barrier for Birhor children in the mainstream school. Children do not understand teacher's language, neither language of the book. In no part of their book there is reflection of their socio-cultural life experience as well as the ancient 'puran kotha', folk-talk, folk-dance, folk-music, folk-literature etc. Nobody knows about them as if they came from the different planet. Therefore, they do not get any interest in school education; there is another question of financial crisis to bear educational expenses by the families. According to Elwin Varrier (Edited book-*A New Deal for Tribal India)*, "there are many difficulties in promoting education among the tribes. For a tribal family to send grow-up boys and girls to school is essentially a matter of economy and install dislocation of traditional pattern of division of labour. Girls give every kind of help to their mothers at household works. During the agriculture season, boys works in the field with their parents and in other sessions they are busy in collection of minor forest products and firewood, grazing goats, cattles, collecting drinking water, hunting, and fishing". (Quoted from U.K. Ray, *"Birhor-a Semi-nomadic tribe of West Bengal".)*

Conclusion

Government of India now give major emphasis upon research on Indigenous Knowledge System as well as in Ancient Indian knowledge system, the second one originated during the Vedic and post Vedic period. Birhor and other tribal peoples varies from ancient era, grow and culture the Indigenous Knowledge system, through which they get non-formal education. In the modern period when we are thinking about modern formal education (originated and practice seen in the British period), it was noted that, nowhere it came significant to the Birhor students life, neither it support to the previews knowledge of Birhor children, which they acquire now in the formal school education. Though Government of India is thinking to educate some small tribal communities having primitive characters, but without adapting their life

experience with the syllabus, as well as preparing teachers to teach these group children, will not achieve success. In new teacher education curriculum there should be enough scope for discussion about socio-cultural, economic and educational scenario with special reference to different ethnic tribal groups. In the syllabus there should have direct relationship with the Birhor style of life, as well as their dependence upon the ecosystem. Government should provide emphasis upon Adivasi language, culture, education and Indigenous Knowledge in the school and college curriculum through different science, social science, language and management subjects. Government may reinforce the tribal scholars to study in depth about tribal life. In every college and university there should be canter for Adivasi language, culture and Indigenous Knowledge System. Further in depth research is prescribed.

References

- Ray, U. K. (1976). A Semi-Nomadic Tribe of West Bengal. *Bulletin of the Cultural Research Institute, Calcutta*, Vol. XII, No. 1 & 2.
- Rayje, K. (1991). Birhor A Semi-Nomadic Tribe of West Bengal. (In) Das Et. Al (Ed) *Cultural Research Institute. Calcutta.*
- Census Report of Government of India 2011.
- NEP 2020
- Ralongham, M. (2009). *Indigenous Knowledge System of Wancho and Its Role for Sustainability of Environment*. Department Of Geography, Faculty of Environment Sciences, Rajiv Gandhi University, Rono Hills: Itanagar.
- Roy, S. C. (1925). The Birhors (A Little Jungle Tribe of Choto Nagpur). Rachi.
- Kapoor, K. & Singh, A. K. *Indian Knowledge Systems*. Indian Institute of Advanced Study, D.K Printworld (P) Ltd. New Dilhi.

পরিশিষ্ট – VIII

(Appendix-VIII)

সেমিনার উপস্থাপনায় শংসাপত্র

IBWTL-2, 2021
organized on behalf of
IBJCAL, eISSN: 2582-4716
Homepage url
http://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index

International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle:
Literature-Culture-Anthropology-Linguistics 2
(IBWTL-2, 2021)
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার
আদিবাসী জীবনযাত্রা : সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃবিজ্ঞান-ভাষাবিজ্ঞান ২
25th September, 2021 - 1st October, 2021

Certificate No. ibwtl2spPSARH_2

Certificate of Scholarly Presentation

This is to certify that SUNNY BASKEY has scholarly presented a paper on THE CULTURE, CUSTOM AND EDUCATION OF BIRHOR ADIVASIS OF PURULIA DISTRICT IN WEST BENGAL at the International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle: Literature-Culture-Anthropology-Linguistics 2/ আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার, আদিবাসী জীবনযাত্রা: সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃবিজ্ঞান-ভাষাবিজ্ঞান ২ (IBWTL-2, 2021) held on 25th September, 2021 to 1st October, 2021.

Patitpaban Pal Principal Convenor & Secretary IBWTL-2, 2021	Dr. Soumya Sankar Ghosh Co-Convenor IBWTL-2, 2021	Anusrita Mandal Co-Convenor IBWTL-2, 2021	Ratul Ghosh Co-Convenor IBWTL-2, 2021	Harichand Das Co-Convenor IBWTL-2, 2021

In Collaboration With
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University
(ii) Department of Sanskrit, Surendranath College, Kolkata
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)
(iv) Dr. Soumya Sankar Ghosh, VIT Bhopal University
(v) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India

IBJCAL eISSN: 2582-4716

Dr. Soumya Sankar Ghosh
Assistant Professor of Linguistics
School of Advanced Studies & Languages
VIT University, Bhopal
Madhya Pradesh
INDIA.

LingClub
a student's initiative
SCHOOL OF LANGUAGES & LINGUISTICS
Jadavpur University
Kolkata 700 032.

পরিশিষ্ট – IX

(Appendix-IX)

পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা পত্র

IBJCAL eISSN: 2582-4716
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনধারা (সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃবিজ্ঞান-ভাষাবিজ্ঞান)
2nd International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle (Literature-Culture-Anthropology-Linguistics) (IBWTL-2)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বিরহড় জনজাতির সংস্কৃতি, লোকাচার ও শিক্ষা

THE CULTURE, CUSTOM AND EDUCATION OF BIRHOR ADIVASIS OF PURULIA DISTRICT IN WEST BENGAL

SUNNY BASKEY
Ph.D. Scholar, Department of Education, Jadavpur University

ABSTRACT:

Reported the study is the culture, custom and education of Birhor Adivasis of Purulia district in West Bengal. Purulia is a most habitat of various Adivasi communities of West Bengal as well as the like Tribal families in Indian. The Birhors mainly reside in the area under Bhghmundi, Jhaldah and Balarampur police stations of Purulia district. Their traditions are very rich culture in India. The primitive economy of the Birhors has been based on nomadic gathering and hunting, particularly for collect rabbits, bird and sells honey. The economy of the other Birhors has been based on agriculture. They are the birth of a child is an enjoyable occasion for the couple –family and the communities. The marriage is considered as successful when the couple is blessed with child. The birth takes place in the house. The Birhors believe that marriage is significant for reproduction of children. Naturally marriage within the same clan is prohibited. Among the Birhor's the level of education is very low and illiteracy is extremely high. In this qualitative paper the other studies in depth about the culture, custom and education of Birhor Adivasis or Scheduled Tribe people from different published literature.

Keywords: Birhors, Adivasis, Scheduled Tribe, Culture, Customs and Education

1.0 ভূমিকা

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন আদিনিবাস জনগোষ্ঠী হল আদিবাসী। এই বিরাট ভারত মহাদেশের সর্বত্র স্থানে যুগ যুগান্তর ধরে বসবাস করে আসছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী , কিন্তু তাঁরা নিজ দেশে অনাদৃত ও অবহেলিত। আদিবাসিরা তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি, ধরন ধারন, আচার বিচার, সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাঁদের সমাজ ব্যবস্থাকে ধরে রেখেছে, এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে বাঁচিয়ে। আর এই আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি হল ভারতবর্ষের আদি ও মূল সমাজ সংস্কৃতি এবং বিশেষ-সতন্ত্র, অ-আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতি থেকে। যারা এখনও ভারতবর্ষে সমগ্র জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে বসবাস এবং প্রকৃতিকে রক্ষাকরে চলেছে। আর এই প্রকৃতই হল আদিবাসী দের ঈশ্বর ও ভগবান এবং প্রকৃতিকেই

IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
eISSN: 2582-4716
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃবিজ্ঞান-ভাষাবিজ্ঞান)
2nd International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology-Linguistics) (IBWTL-2)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বিরহড় জনজাতির সংস্কৃতি, লোকাচার ও শিক্ষা

SUNNY BASKEY

তাঁরা 'বোঙ্গা' বলে সম্বোধন করে। এই ভারতবর্ষে আদিবাসী সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা, এবং বিভিন্ন প্রদেশের কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী 'আদিবাসীদের' অর্থাৎ 'ট্রাইবদের' মোট জনসংখ্যা হল ১০,৪২,৮১,০৩৪ জন। তাঁর মধ্যে পুরুষদের মোট জনসংখ্যা ৫,২৪,০৯,৮২৩ জন এবং মহিলাদের মোট জনসংখ্যা ৫,১৮,৭১,২১১ জন। বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসিদের মোট জনসংখ্যা ৫২,৯৬,৯৫৩ জন। তাঁর মধ্যে গ্রামের মোট জনসংখ্যা ৪৮,৫৫,১১৫ এবং শহরের মোট জনসংখ্যা ৪,৪১,৮৩৮। সুপ্রাচীন কাল থেকে জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, মালভূমিতে আদিবাসীরা বসবাস করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ট্রাইবস এর বসবাস, মোট ৪০ টি আদিবাসী গ্রুপ আমরা দেখতে পায়। এই ৪০ টি আদিবাসী গ্রুপ হল- অসুর, করমালি, কিসান, কোরওয়, কোড়া, চেরো, নাগেসিয়া, বিরহড়, ভূমিজ, মাহলি, মাহালি, মুন্ডা, লোধ-খেরিয়া, শবর, সাঁওতাল, হো, ওঁরাও, খোন্দ, গণ্ডা, মাল পাহাড়ি, সাওরিয়া, গারো, চাকমা, তামাং, ভুটিয়া- টোটো- শেরপা-দুকপা, মগ, সুব্বা, মেচ, ভ্রু, রাভা, লেপচা, হাজং, খারওয়ার, গরেত, চিক বইরিক, পারহাইয়া, বিরজিয়া, বেদিয়া, বইগা, লোহারা- লোহরা।

পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বিরহড়' হল অন্যতম প্রাচীন একটি জনগোষ্ঠী। এই 'বিরহড়' শব্দটি দুইটি 'মুণ্ডারি' ভাষার সম্বলিত শব্দ। 'বির' শব্দটি অর্থ হল 'জঙ্গল' বা 'ফরেস্ট', অপরদিকে 'হড়' শব্দটির অর্থ হল 'মানুষ' বা 'হিউম্যান'। তাই 'বিরহড়' শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থ হল 'জঙ্গলের মানুষ' বা 'জঙ্গলের রাজা'। বিরহড়রা তাঁদের নিজস্ব 'বিরহড়' ভাষায় কথা বলে, এবং এই বিরহড় ভাষা 'মুণ্ডারি' ভাষার অংশ। এই বিরহড় ভাষার মধ্যে মুণ্ডারি ও সাঁওতালি ভাষা দেখতে পাওয়া যায়। বিরহড়রা তাঁদের মাতৃভাষা ছাড়া, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাংলা ও হিন্দি ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা বাংলা এবং হিন্দিতে কথা বলে। ভারতে বিরহড়দের মোট জনসংখ্যা ০.০১%, মোট আদিবাসী জনসংখ্যার। বিরহড়রা সাধারণত ভারতের ঝাড়খণ্ড, ছত্রিসঘড়, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে বিরহড়দের বসতি এবং জনসংখ্যা সবথেকে কম, জঙ্গলের প্রান্তে তাঁরা ছাউনি বেঁধে ঘর বানিয়ে বসবাস করত, জীবনযাপনের জন্য জঙ্গল থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের মধ্যদিয়ে জীবন নির্বাহ করে। প্রাকৃতিক সম্পত হিসাবে মধু, জ্বালানী কাঠ, ফল, শাল পাতা, মহুয়া ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রয় করে। এছাড়া শূকর, খরগোস, সজারু, কটাস, মুরগি ইত্যাদি শিকার করে জীবন নির্বাহের জন্য।

বিরহড়রা সাধারনত বিশ্বাস করে যে তারা সূর্যের সন্তান। বিরহড়রা মনে করে একটি বিশেষ ইতিহাস রয়েছে তাঁদের উৎপত্তি সম্পর্কে। তারা বলে তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সাত ভাই এসেছিল খইরাগর(কইমুর পাহাড়) থেকে এই মালভূমিতে, এবং এই সাত ভাই দের মধ্যে চার ভাই চলে যাই পূর্ব ভারতবর্ষের দিকে, আর বাকি তিন ভাই রয়ে যাই এই ছোটনাগপুর মালভূমি জঙ্গল অঞ্চলে। একটা সময় এই তিন ভাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল স্থানীয় রাজার সাথে যুদ্ধ করতে। যাওয়ার সময় ওই তিন ভাই মধ্যে ছোট ভায়ের পাগড়ি একটি গাছের ডালে লেগে মাথা থেকে মাটিতে পরে যায়। ছোট ভাই এই ঘটনাটি ঘটে যাওয়াই অশুভ বলে মনে করে। তাই ছোট ভাই বাকি দুই বর ভাই দের মানা করে দেয়। তাঁর পর দুই বর ভাই তাকে রেখে দিয়ে যুদ্ধে চলে যায়। কিছু দিন আতিবাহিত হওয়ার পর দুই ভাই জয়লাভ করে ফিরে আসে, এবং দেখে যে তাঁদের ছোট ভাই জঙ্গল পরিষ্কার করে বসবাস করছে। এইটা দেখার পর ভাই কে

উপহাস করে 'বিরহড়' বলে ডাকে। বর ভাই দের উপহাসে ছোট ভাই অনেক দুঃখ পায়। ছোট ভাই রেগে গিয়ে বর ভাইদের বলে 'সহানুভূতি বিহীন আত্মীয়ের চেয়ে বনভূমি অনেক আপনার। তাঁদের সাথে লকালয়ে থাকার থেকে এই প্রকৃতির কলে থাকা অনেক ভাল এবং জঙ্গলে থাকা অনেক শ্রেয়। তাই এই ভাবেই 'বিরহড়দের' উৎপত্তি হয়। এবং পরবর্তী সময়ে বাকি দুই ভাই রামগর এর রাজা হয়। এই ভাবেই গভীর জঙ্গলে 'বিরহড়রা' বসবাস করতে থাকে এবং তাঁদের জীবন নির্বাহ হয় এই জঙ্গলের প্রকৃতির মধ্যে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জেলায় ভুপতিপল্লীতে ১৯৬৩ সালে বিরহড়দের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। তখন বিরহড়দের ২৯ টি পরিবারের লোক সংখ্যা ছিল ১০৬ জন, তার মধ্যে ৫৪ জন পুরুষ এবং ৫২ জন স্ত্রীলোক। স্বাধীন ভারতে পরবর্তী সময়ে ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বিরহরদের মোট জনসংখ্যা ৬৫৮ জন; তাঁর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩৫৪ জন এবং মহিলাদের সংখ্যা ৩০৪ জন। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলায় মোট আদিবাসী জনসংখ্যার বিরহড়দের জনসংখ্যা হল ১.০০%। বর্তমানে প্রতিবেশী বাঙ্গালি, বিহারী এবং ওড়িয়া হিন্দু সমাজের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তারা বাংলা, হিন্দি ও ওড়িশা ভাষায় কথা বলতে পারে। তবে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে বিরহড় আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনে এমন বিরাট পরিবর্তন ঘটেনি যা তাঁদের জীবনকে শিক্ষা দীক্ষা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারা গেছে।

2.0 পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী

এই গবেষণা পত্রটি হল তাত্ত্বিক ও গুনগত গবেষণা। এই গবেষণায় বিভিন্ন জাতীয় প্রবন্ধ বা অনুছেদ, বই, সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি কে ভিত্তিকরে ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণা পত্রটি করা হয়েছে।

3.0 আলোচনা

3.1 সমাজ-সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

3.1.1 বাসস্থান ও ঘরবারি

বিরহড় আদিবাসীরা সাধারানত পাহাড়-পর্বতে, জঙ্গলে, পাহাড়ের ঢালে বাস করত এবং গাছের ডাল পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি বানিয়ে কুঁড়ে ঘর তৈরি করে বসবাস করত। বর্তমানে পাহাড়ের ঢালে এবং সমতল ভুমিতে অ-আদিবাসিদের গ্রামের পাসে ঘর বানিয়ে ও সরকারি পক্ষ থেকে পাওয়া সরকারি পাকা বাড়িতে বসবাস করে। এই সমস্ত ঘর গুলিতে একটি দরজা থাকে এবং একটি জানালা, আর বাড়িগুলি ইটের দেয়াল ও টালির ছাউনি। দুইটি ঘরের মাঝখানে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার উনুন তৈরি করত রান্না বান্না করার জন্য। রান্না করার প্রয়োজনে জঙ্গল থেকে শুকনো গাছের ডাল ব্যবহার করত জ্বালানির জন্য।

3.1.2 আসবাবপত্র ও পোশাক পরিচ্ছেদ

আদিবাসী বিরহড়রা সাধারণত ঘরে বেশি কিছু আসবাবপত্র ব্যবহার করেনা। তবে আসবারপত্রের মধ্যে বিশেষ ভাবে মাটির হাঁড়ি, অ্যালুমিনিয়াম জিনিস, কাঁসার ঘইরা, থালা-বাটি আর বর্তমানে স্টিল এর বাসনপত্র ইত্যাদি ব্যবহার করছে তাঁরা। এছারা ঘরেতে তীর-ধনুক, টাঙ্গি এবং শিকার করার জন্য জাল বিশেষ ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এবং চাষের জন্য লাঙ্গল, কোদাল, কাস্তে, ইত্যাদি ব্যবহার করে।

পোশাক হিসাবে বর্তমানে বিরহড় পুরুষরা সাদা ধুতি, লুঙ্গি, সার্ট, প্যান্ট, গামছা ব্যবহার করে এবং বিরহড় মহিলারা শাড়ী, কম বয়সের মেয়েরা চুড়িদার, ফ্রক ইত্যাদি ব্যবহার করে। বিরহড় মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার তাঁরা পরে থাকে কাচের চুড়ি, কানের, টিপ, পায়ের নুপুর, মাথার খপাই ফুল ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

3.1.3 পেশা

বিরহড় আদিবাসীদের মূল পেশা হল চাষবাস, দড়ি তৈরি, প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করা, শিকার করা ইত্যাদি।সারা বছরে একবার বর্ষার সময়ে তাঁরা শস্য হিসাবে ধান, ভুট্টা, সরষে ইত্যাদি চাষবাস করে। এছাড়া তাঁরা দড়ি তৈরি কাজে দক্ষ এবং গ্রামের সবাই এই পেশার সাথে যুক্ত। বিরহড়রা তাঁদের জীবন নির্বাহের জন্য জালের মাধ্যমে শুকর, সজারু খরগোস এবং অন্যান্য বন্য পশু শিকার করে থাকে। এই বিরহড়রা বিশেষ পেশা হিসাবে জঙ্গলে বছরের একটা বিশেষ সময়ে মধু সংগ্রহ করে এবং বাজারে রপ্তানি করে।

3.1.4 গোত্র

আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী গুলির মধ্যে বিভিন্ন গোত্র পরিলক্ষিত হয়, এবং বিরহড়রাও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। এই গোত্র গুলি বিবাহের সময় প্রয়োজন হয়। বিরহড়রা যে গোত্র গুলি ব্যবহার করে সেগুলি হল-হেমব্রম, মুরমু, সাউরিয়া, মারানডি, কইডা ইত্যাদি। এই গোত্র গুলি হিসাবে পরিচয় দিলেও তাঁরা পদবি হিসাবে 'বিরহড়' ব্যবহার করত। তবে বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার বাঘমুনডি ব্লক অন্তর্গত বাড়িয়া ও ভুপতিপল্লী গ্রামের বিরহড়রা 'শিকারি' পদবি ব্যবহার করে। এই বিরহড়রা গোত্র হিসাবে আলাদা আলাদা হলেও তাঁদের প্রকৃতির পূজা ও সমাজে উৎসব অনুষ্ঠান সময়ে সকলে একত্রে মিলিত হয়।

3.1.5 সামাজিক সংগঠন

আদিবাসী সামাজিক সংগঠন গুলির মধ্যে বিরহড়দের বিশেষ সামাজিক সংগঠন রয়েছে।বিরহড়রা বিভিন্ন গোত্রের লোকেদের নিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েই থাকতে ভালবাসে। তাঁদের গোষ্ঠী পতিকে 'নায়া' বলা হয়, এবং এই 'নায়া' সমাজের সমগ্র সমস্যা সমাধান, মীমাংসা, দায়িত্ব এবং গোষ্ঠীর ভালমন্দ তিনিই দেখেন। আদিবাসী বিরহড় সমাজে 'নায়া' বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে পুরোহিতের কাজ তিনিই করেন। এই বিরহড়দের মধ্যে 'নায়া' কে সাহায্য করার জন্য ও গ্রামের সকলকে কোন তথ্য দেবার জন্য একজন সহকারি থাকেন তাকে 'দিগুয়ার' বলা হয়। 'নায়া' সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য বা কাজকরার জন্য কোন পারিশ্রমিক নেন না।

3.1.6 জন্ম

বিরহড় সমাজে কোন নারী অন্তঃস্বত্বা থাকা কালীন বিভিন্ন প্রকার বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন ভূত-প্রেত, তুক-তাক তাঁরা বিশ্বাস করে, এবং নারীরা সন্ধ্যা বেলায় কোথাও বের হয় না ইত্যাদি। শিশু জন্মের সময় সাধারনত গ্রামের কোন বৃদ্বা মহিলা ধাইমার যাবতীয় কাজ তিনই করেন। এবং বিরহড়রা তাঁদের গ্রামের বাড়িতেই শিশু জন্ম দিত। তবে বর্তমানে গ্রামের কাছাকাছি কোন হসপিটালে নবজাতকের নাভিছেদন করে। নাভিছেদন পর একুশ দিন পালন করেন। এছাড়া বিরহড়রা নবজাতক শিশুর 'শাটিয়ারি' অনুষ্ঠান পালন করে এবং নামে করন হয় একুশ দিন পর। এই 'শাটিয়াড়ি' অনুষ্ঠান মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পালন করতে হয়।

3.1.7 বিবাহ

আদিবাসী বিরহড় সমাজে সাঁওতালদের মত বিভিন্ন ধরনের বিবাহ এই সমাজে স্বীকৃত। বিরহড় সমাজে পণ প্রথা দেখা যায় না, তবে ছেলে মেয়ের বাবাকে পাঁচ আনা দিয়ে মেয়ে কে বিয়ে করে। তবে বর্তমানে পাঁচশ টাকা দিতে হয় মেয়ের বাবার হাতে। বিরহর সমাজে বাল্য বিবাহ দেখতে পায়া যায় না, এবং আইন সম্পর্কে তাঁরা সচেতনতায় কম বয়সে ছেলে মেয়েকে বিবাহ দেয়না। ছেলে মেয়ে বিবাহযোগ্য হলেই তবেই বিবাহ দেয়া হয়। বিরহড় সমাজে আকই গোত্রে কখন বিবাহ হয়না। এই সমাজের মধ্যে কেউ যদি সমাজ বিরোধ ও ব্যভিচার করে থাকে তাহলে তাকে সমাজ থেকে বহিস্কার করা হয়ে থাকে। বিরহড় সমাজে বিরহড় গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হয়, গোষ্ঠীর বাইরে কেও বিবাহ করেনা।

3.1.8 মৃত্যু ও সৎকার

আদিবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠীরা মৃত দেহকে দাহ করে, যেমন আদিবাসীদের মধ্যে বড় গোষ্ঠী সাঁওতালরা । কিন্তু বিরহড় সমাজে মৃত দেহকে তাঁরা দাহ করে না কবর দেয়। কেউ মারা গেলে মৃত দেহকে সাদা কাপড়ে জড়িয়ে ঢেকে রেখে কবরের উত্তর দিকে মাথা করিয়ে শুয়ে রাখা হয়। তাঁর পর মৃত ব্যক্তির ব্যবহত বাসন ও পোশাক কবরে তাঁর সাথে দিয়ে দিতে হয়। কবর দেওয়ার দশ দিন পর শ্রাদ্ধ করা হয় আর এই দশদিন কোন তেল ব্যবহার করে না তাঁরা। দশদিন পর শ্রাদ্ধ সময় মৃত বাক্তির নামে একটা মুরগি উৎসর্গ করা হয় বাক্তির আত্মা শান্তির জন্য। এই দিনে পরিবারের লোকেরা মাথা মুণ্ডন করে। এই দিন সমাজে গ্রামের লোকেরা তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী চাল, ডাল, মুড়ি, চিড়া ইত্যাদি নিয়ে শ্রাদ্ধ স্থানে বা অনুষ্ঠানে যায়।

3.1.9 ধর্মবিশ্বাস ও উৎসব

আদিবাসীরা প্রকৃতির উপাসক, বিরহড় গোষ্ঠীরা আদিবাসী সম্প্রদায়, আদিবাসীদের অন্যান্য গোষ্ঠীর মত বিরহড়রাও প্রকৃতির আরাধনা, পূজা আর্চনা করে। বিরহড়রা তাঁদের ভগবানকে বা ঈশ্বরকে 'বোঙ্গা' নামে ডাকে। আর এই বোঙ্গা হল 'সিংবোঙ্গা' বা 'সূর্য'। তাঁরা বিশ্বাস করে যে সিংবোঙ্গাই এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। এছাড়া বিরহড়দের বিভিন্ন গোত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। এবং এই প্রকৃতিকে সর্ব ক্ষমতার ভগবান বলে মনে করে। এছাড়া হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে বিরহড়রা নিজেদের ধর্ম পালনের সাথে সাথে অন্যান্য ধর্ম পালন ও পূজা আর্চনা করে।

IBJCAL eISSN: 2582-4716
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃবিজ্ঞান-ভাষাবিজ্ঞান)
2nd International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology-Linguistics) (IBWTL-2)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index

বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মত বিরহড়রাও বিভিন্ন উৎসব পালন করে। এই উৎসব গুলি হল বোঙ্গা পরব, সহরায়, কারাম, বাহা ইত্যাদি। এই উৎসব গুলি সাঁওতাল, মুণ্ডারি যে সময়ে পালন করে থাকে ঠীক ঐ সময়ই বিরহড়রা এই উৎসব পালন করে। ফাল্গুন মাসে সাড়হুল উৎসব পালন করে, এই সময়ই সারা জঙ্গলে শাল ফুলের গন্ধে ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রাম। পৌষ মাসে তারা সহরায় উৎসব পালন করে। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব পালন করে এবং নানান বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করে, যেমন ধামসা, মাদল, লেগরা, বাঁশি ইত্যাদি।এই উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে ভারতের আদি ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে আদিবাসী বিরহড় জনগোষ্ঠীরা।

3.2 শিক্ষা

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরও ভারতের আদিবাসীরা শিক্ষার দিক থেকে এখন অনেক পিছিয়ে আছে। বিশেষ ভাবে ভারতের প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠী গুলির মধ্যে বিরহড়রা বর্তমানে তারা জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের জীবন যাপন শিকার করা, জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ, শুকনো কাঠ বিক্রি করা ইত্যাদি ।তবে বিরহড়দের শিক্ষার জন্য তাঁদের গ্রামে নিম্ন উচ্চ বিদ্যালয় করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিরহড় গ্রামে বিদ্যালয় থাকা সত্তেও বিরহড় শিশুরা স্কুল ছুট হচ্ছে। এর জন্য বিদ্যালয়ে শিশুর উপযোগী পাঠ্যক্রম, আদিবাসী শিক্ষক, যথার্থ পরিমানে শিক্ষক, স্কুল বিল্ডিং ও পানীয় জলের অভাবের কারনে বিরহড় শিশুরা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ ও প্রেষণা না পাওয়ায় স্কুল ছুট অনেকটাই বেরে গেছে। তাঁদের নিজস্ব বিরহড় ভাষা থাকতেও সরকার এদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষা গ্রহনের জন্য কোন সুবিধা প্রদান করেনি, তাই তারা মাতৃভাষা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বিরহড় শিশুদের শিক্ষার জন্য কোন সচেতনা মূলক পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে না। এবং সরকারের ব্যাপক উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিরহড়দের শিক্ষা বিকাশের লক্ষে। ২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে আদিবাসীদের সাক্ষরতার হার হল ৫৯% এবং পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ৫৭.৯%, যেখানে ছেলেদের সাক্ষরতার হার ৬৭.২% এবং মেয়েদের সাক্ষরতার হার ৪৬.২%। পশ্চিমবঙ্গে বিরহড়দের সাক্ষরতার হার অনেক কম, এবং বেশির ভাগ নিরক্ষরতা।

4.0 উপসংহার

ভারতবর্ষের ভূমিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী গুলির মধ্যে বিরহড়রা অন্যতম, এবং ভারতের আদিম-সমাজ-সংস্কৃতি বহন করে চলেছে এই বিরহড় আদিবাসী সম্প্রদায়। তারা এখন প্রকৃতির কলে- পাহাড়ে, জঙ্গলে, পাহাড়ের ঢালে বসবাস করে চলেছে এবং আধুনিক সমাজ থেকে দূরে নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতি নিতি, সমাজ বাবস্থা, নিজস্ব ধর্ম, ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। তাঁদের সমাজ সংস্কৃতি অআদিবাসীদের থেকে ভিন্ন এক সংস্কৃতি। তবে বিরহড়দের বিকাশেরর জন্য সরকার প্রথম ১৯৫৮ সালে এদের কে সমতল ভূমিতে একটি গ্রামে তৎ কালীন আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারের নামানুসারে পল্লীর নাম রাখা হয় 'ভূপতিপল্লী'। তখন ২৯ টি বিরহড় পরিবারকে মাটির বাড়ি, চাষের জমি, গৃহপালিত পশু দেওয়া হয়ে ছিল। বিরহরদের মূল কাজ ছিল গাছের ছাল দিয়ে দড়ি তৈরি আর শিকার, মধু সংগ্রহ। তাই পুনর্বাসন বাবস্থা করে বিরহড়দের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা বিকাশ জাতে হয় তাঁর জন্য সরকার বাবস্থা গ্রহন করে ছিল।

বর্তমানে বিরহড়দের বিকাশেরর জন্য আদিবাসী কল্যাণ সমিতি ও অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ প্রকল্প থেকে তাঁদের বাড়ি দেওয়া হয়েছে। তবে বিরহড়দের বিকাশেরর জন্য সরকার আর কাজ থেকে যে পরিমানে বিকাস হওয়ার কথা ততটা বিকাশ হয়নি ফলে বিরহড়রা অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং শিক্ষা দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এদের জন্য ভাষাগত, কৃষ্টিগত, অর্থনীতি এবং শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার স্থান করে না দিলে ভারতের স্বরাজ দুর্বল হয়ে পরবে। তাই ভারতের সামগ্রিক বিকাস করতে গেলে আদিবাসী বিকাস আগে করতে হবে, তাহলেই সম্পূর্ণরুপে ভারতের বিকাস হওয়া সম্ভব।

5.0 তথ্যসূত্র

Census of India 2011

Roy, S. C. (1925). The Birhor: a little known Jungle Tribe of Choto Nagpur, "Man in India" office, church road, Ranchi.

Ray, U. K. (1991). Birhor- a semi-nomadic tribe of West Bengal. (In) das et al. (ed) Cultural Research Institute. Calcutta.

Census of India 1981

Baskey, D. (1987). Poschim Bonger Adivasi Somaj. Srimoti rinki baskey publication. Santinagar, Calcutta.

পরিশিষ্ট – X

(Appendix-X)

প্রকাশিত গবেষণা পত্র

Educational and Social Inclusion of Learners with Diverse Learning Needs in the Light of NEP 2020

Editor-in-Chief

Dr. Jayashree Laha
Principal
Raja Narendralal Khan Women's College
Medinipur, West Bengal

Editors

Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda
Professor and Former Head
Department of Education
Jadavpur University
Kolkata, West Bengal

Dr. Souravi Ata
College Contractual Teacher
Department of Education (PG)
Raja Narendralal Khan Women's College
Medinipur, West Bengal

MANGLAM PUBLICATIONS
DELHI-110053 (INDIA)

Published by :
MANGLAM PUBLICATIONS
K-129, Ground Floor, 3-1/2 Pusta Main Road
Gautam Vihar, Delhi-110053
Mob.: 9868572512, 9811477588
E-mail: manglam.books2007@rediffmail.com
Web.: www.manglampublications.com

Educational and Social Inclusion of Learners with Diverse Learning Needs in the Light of NEP 2020

© ***Editors***

First Edition : **2024**
ISBN : **978-81-19681-83-9**
Price : **Rs. 1495/-**

All rights reserved no part of this work may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the Publisher.

This Book has been published in good faith that the material provided by author is original. Every effort is made to ensure accuracy of material but the publisher and printer will not be held responsible for any inadvertent errors.

PRINTED IN INDIA

Published by Manglam Publications, Delhi-53 Laser Typesetting at Shaury Systems Delhi-92, Printed at Sachin Printers Maujpur, Delhi-53

24

Rehabilitation of the Birhor People as Suggested in NEP 2020

Sunny Baskey*, Prof. Bishnupada Nanda**

*Ph.D. Scholar, Department of Education, Jadavpur University.
sunnybaskey3@gmail.com
**Department of Education, Jadavpur University

ABSTRACT

Reported is the study of Birhor children/people and their education. Very less no of research were noticed by the present researchers in the field of education of the Birhors. The investigators used Qualitative Research Method and for data collection they used Focus Group Discussion (FGD) as the tool. Result showed that tribal children particularly the Birhors are backward in respect of education and socio-economic status. The investigators outline some major points to educate the Birhor children in the mainstream of the society and also how to eradicate the poverty of Birhor community. In discussion the researchers summarized the report of NEP 2020 in favour of the tribal people in general and specifically Birhor children.

Keyword: Birhor People, Rehabilitation, NEP 2020.

INTRODUCTION

The Birhor are the Jungle man as the name Birhor significies. 'Bir' means Jungle or Forest and 'Hor' means Man or Human. They have Nomadic or Semi-Nomadic characters. In West Bengal Birhor peoples living mainly in Purulia district, particularly in Jhalda-1 block, Balarampur block and Baghmundi block. According to 1991 Census Report Birhors are present not only in Purulia district, but in some other districts also- like the Darjeeling, Mednipur, Jalpaiguri, Howrah, Bankura, Burdwan, Hooghly, Nadia, North 24 Parganas and Malda. In Purulia district in three mentioned blocks they are concentrated in four villages- like Bhupotipally, Bareria, Bersa, Dakai. In other districts their number is very scanty. It is because their livelihood patterns are steel governed by primitive hill and forest oriented sources of livelihood. So, in Purulia district their nomadic nature of life shaped, because of present of Ajodhya hill and forest. So, hill and forest are two contributing factors for Birhor people livelihood as Nomadic or Semi-Nomadic nature.

In the study of Cultural Research Institute, Kolkata it was reported that number of Birhor families increase in Birhor villages. The researchers physically meet the Birhor

পরিশিষ্ট – XI

(Appendix-XI)

সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণা পত্র

একুশ শতকে আদিবাসী চর্চা: প্রয়োজন নয়া উদ্যোগের

ড. সুরঞ্জন মিদ্দে